# পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

## সংবাদপত্রে প্রতিফলন

প্রথম খণ্ড

পপি দেবী থাপা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
প্রথম খণ্ড
পপি দেবী থাপা

978-984-35-3242-8
978-984-35-3242-8

# পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
## সংবাদপত্রে প্রতিফলন
## প্রথম খণ্ড

**পপি দেবী থাপা**

**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০



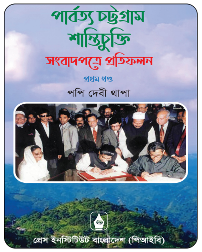


**পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন**
**প্রথম খণ্ড**

| | |
|---|---|
| প্রকাশক | জাফর ওয়াজেদ<br>মহাপরিচালক<br>প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) |
| প্রচ্ছদ | সোহেল আশরাফ খান |
| প্রথম প্রকাশ | অক্টোবর ২০২২ |
| কম্পিউটার বিন্যাস | ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল |
| বানান সমন্বয় | রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান<br>মো. লুৎফর রহমান |
| মুদ্রণ | তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং<br>২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড<br>মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। |
| গ্রন্থস্বত্ব | পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত |
| মূল্য | ১০০০.০০ টাকা মাত্র |

*PARBOTTA CHATTOGRAM SHANTICHUKTI: SONGBADPOTRE PROTIFALAN*
*PROTHOM KHONDO*
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 1000 Taka. ■ $ 10 Only
ISBN : 978-984-35-3242-8
Phone : 9361424, 9330081-84, Fax : 880-02-48317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

# মহাপরিচালকের কথা

অশান্তি, হিংসা, হানাহানি, সংঘাত, সন্ত্রাস, শাসন-শোষণ, বঞ্চনার বিপরীতে শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ আর মানবিকতার উন্মেষ অবারিত হোক–এমন চাওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি তা না হয়, তবে সংকটের মাত্রা ও পরিধি তীব্রতর হতে বাধ্য। হয়েছেও তাই। সংঘাতে-সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়েছে জনপদ। ঝরেছে অঝোর ধারায় রক্ত। বিপর্যস্ত জীবন, বিপন্নতায় আক্রান্ত যুগের পর যুগ। সবুজ পাহাড়, বন-বনান্ত, নদী-নালা, ঝরনার ধারায় রক্তের বহতা স্রোত মানবজীবনকে করেছে অশান্ত। সংকট তীব্রতর হয়ে উঠে যখন সমাধানের দরজাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলটিতে জনজীবন স্বাভাবিক পথ ও পন্থা হারিয়ে সংঘাতের তীব্রতায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বিদেশি শক্তির ইন্ধনও ছিল এই সশস্ত্র অবস্থানের নেপথ্যে। আর তা থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ এই অঞ্চলে অশান্তি, হানাহানি অব্যাহত থাকলে যারা ফায়দা নেবে, তারা মত্ত হয়ে উঠেছিল।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহে ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতার সীমারেখার দোলাচলে ছিল বহমান। সময়গুলো ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে বৈষম্যমূলক। পশ্চাৎপদতার যে সার্বিক অবস্থা তা বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ দূরে থাক, নিজ অঞ্চলেও ছিল একধরনের বিচ্ছিন্নতা। পার্বত্য ভূমিতে নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার পথ ও পন্থা নিয়ে নিজেরাও সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছেন, এমনটাও নয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল হিসাবে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনটি জেলার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চল। সমতলবাসী আর পাহাড়ি জনপদের বাসিন্দাদের জীবনপ্রবাহ, সাংস্কৃতিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভিন্নতর ধারায় প্রবহমান। মোগল যুগে তেমন প্রবাহ তৈরি না হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলকে তাদের করায়ত্ত করে। একই সঙ্গে তাদের সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আলাদা শাসন পদ্ধতি চালু করেছিল। সেসময়ই স্পষ্ট হয় যে, পার্বত্য জনপদের সংকট সমতলের সংকটের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা চালু হয়। পার্বত্যবাসীর মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এর ফলে একটি গোষ্ঠী দেশ ছেড়ে চলে যায় প্রতিবেশী দেশে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য চালু করা শাসনব্যবস্থায় পাকিস্তানি শাসকরা বেশকিছু পরিবর্তন আনে। যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অধিবাসীদের মধ্যে। কাপ্তাই লেকে বাঁধ নির্মাণ করে



বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ফলাফল–লাখ খানেক অধিবাসী বাস্তুহারা হয়। যথাযথ পুনর্বাসন হয়নি তাদের। অর্ধলাখ অধিবাসী দেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হিসাবে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি শাসকরা পার্বত্য অঞ্চলে ভারতের মিজো, নাগা, মনিপুরি বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণশিবির গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায় এরা মাঝেমধ্যেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে হামলা চালাত।

আর বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে উপজাতিদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তাদের নেতারা পাকিস্তানিদের গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে উপজাতিদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। যদিও অনেক নেতা ও কর্মী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর দেশ হানাদারমুক্ত হলেও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আলবদর, রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনীসহ পাকিস্তানপন্থিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তাদের উৎখাতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অব্যাহত অভিযান চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সংকট নতুন করে দানা বাঁধে। গড়ে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তি, হানাহানি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তা শাসক জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যার সমাধান দূরে থাক বরং পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলে। যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থান পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা অংশ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। হয়ে যায় শরণার্থী। সেই সঙ্গে চলে শান্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলা। শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়।

টানা পনেরো বছরের সামরিক শাসনকালে পার্বত্য অঞ্চলে গোলযোগ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। ব্যাপক হারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনকে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া বিভেদ দূর করেনি। বরং রেষারেষি এবং বিভেদের মাত্রা হয়েছে তীব্রতর। ব্যাপক হারে বিভিন্ন জেলার ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি অধিক হারে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত করা হয়। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রায়ই সংঘাতের ঘটনা ঘটে আসছিল। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিরাশি সালের পর শান্তির নামে আলোচনা চালানো হলেও ফলপ্রসূ হয়নি। সামরিক জান্তা শাসক এরশাদের ৬টি এবং জিয়ার উত্তরসূরি খালেদা সরকার ১৩টি বৈঠক করেও কোনো সুফল আনতে পারেনি। বরং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। শাসক পক্ষের সদিচ্ছার অভাবে এবং

অশান্তি জিইয়ে রাখার অভিপ্রায়ে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কোনো পন্থাই সামনে আনা যায়নি। বরং অবিশ্বাস, অসন্তোষ, সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে। কোনোদিন এর সমাধান হবে না বরং সশস্ত্র পন্থাই অব্যাহত থাকবে–এমনটাই উভয় পক্ষের বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়। খোলা দূরে থাক, বরং জট আরও বেড়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী তো আর এক জায়গায় স্থির থাকে না। পরিবর্তন তো ঘটেই। পার্বত্যবাসীর জীবনে অমানিশার অন্ধকার যে একদিন দূর হবে, সে আভাসটুকু মিলছিল যখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে সফর করেন। পার্বত্যবাসীর সঙ্গে মতবিনিময়কালেই তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অর্থাৎ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক সেখানে অশান্তি আর হানাহানির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সম্প্রীতি, সৌহার্দের কোনো অবস্থানই অক্ষুণ্ণ রাখেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তি দূরীভূত করার কথা তিনি ছিয়ান্নব্বই সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছিলেন। একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পরই শুরু হয় পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটিতে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরাও ছিলেন। বিএনপির দুই সদস্যের নাম কমিটিতে থাকলেও তারা কোনো ভূমিকা নেননি। বরং এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিরোধিতার আশ্রয় নেয়। পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সাতটি বৈঠকের পর শান্তির আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সই হয়েছিল ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি। দীর্ঘদিনের অশান্তির বিপরীতে এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাটি অকল্পনীয়, অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। শেখ হাসিনা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। যদিও তৎকালীন বিরোধী দল ও তাদের নেত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, শন্তিচুক্তি হলে চট্টগ্রামসহ ফেনী ভারতের অংশ হয়ে যাবে। কিন্তু তার সেই ভাষ্য প্রলাপের তালিকায় রয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের চলে আসা পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চুক্তি এক অনন্য নজির, সেই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। চুক্তি সইয়ের পরবর্তী এই আড়াই দশকে পার্বত্যাঞ্চলের যে সমৃদ্ধি তাও শান্তিচুক্তিরই সুফল।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর এই সংকলন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সন্নিবেশিত করেছে। নিয়মিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি সম্পাদকীয়,



উপসম্পাদকীয়, কলামগুলো যুক্ত হয়ে গ্রন্থটিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। যেখানে পাঠক কেবল সংবাদ নয়–সংবাদ বিশ্লেষণ, ইতিহাস, দ্বন্দ্বের কারণগুলোর গভীর অনুসন্ধান, শান্তিচুক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন পক্ষের মতামতের একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন। গ্রন্থটি পাঠকের সামনে শান্তিচুক্তিকে ঘিরে তৎকালীন রাজনীতিরও একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসে একটি অন্যতম বড়ো ঘটনা–অর্জন। এই পুরো প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার কথাও আলাদা করে বলতে হয়, যার স্বীকৃতি ওঠে এসেছে স্বয়ং জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার কণ্ঠেও।

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন’ গ্রন্থটির আধেয় সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচটি পত্রিকা: (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ ও (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। সময়সীমা ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। কলেবর বেড়ে যাওয়ায় গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঠাঁই পেয়েছে সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও ভোরের কাগজ। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দ্য বাংলাদেশ অবজারভার থেকে সংগৃহীত আধেয়। গ্রন্থটি প্রণয়নে নিরলস পরিশ্রমের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গবেষক পপি দেবী থাপাকে ধন্যবাদ। বিশ্বাস এই যে, যাদের জন্য এই প্রকাশনা, সেই আগ্রহী পাঠক, গবেষকদের প্রয়োজন পূরণে গ্রন্থটি সক্ষম হবে।

জয় বাংলা।

**জাফর ওয়াজেদ**
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

# ভূমিকা

পার্বত্য জীবনপ্রবাহে ইতিহাসের পরতে পরতে অস্তিত্বের টানাপোড়েন। নিজ জাতিসত্তা, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সবুজ পাহাড়ে রক্তের লেপন। বঞ্চিত, রক্তস্রোতে ভাসা প্রাণ যুগে যুগে প্রজন্মের চেতনায় জাগিয়েছে বিপ্লব। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের জনজীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। অশান্ত, অনিশ্চিত জীবনধারা তাদের রেখেছিল পশ্চাৎপদতা, বিদ্বেষ আর বিচ্ছিন্নতার আবর্তে। সময়ে তীব্র হওয়া সংকটের শিকড় ক্রমেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছিল মাটির গভীরে, যার গণ্ডি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ছুঁয়েছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গন।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতে উত্তপ্ত-অস্থির পার্বত্য চট্টগ্রামে থমকে গিয়েছিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, উন্নয়ন-অগ্রগতি। এ অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের জীবনাচার, অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সংস্কৃতি সমতলের অধিবাসীদের তুলনায় ভিন্নতর। যে কারণে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ রাজশক্তি পর্যন্ত এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানা মাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে শাসন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এরপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ে দেখা দেয় বিভক্তি। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি গ্রুপ চলে যায় ভারতে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসকরা কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করে স্থানীয় জনমত উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, উন্নয়ন প্রকল্পের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় অধিবাসীদের বিষয়টিও তেমন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। এসব ঘটনায় উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে বিপুলসংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর উপজাতি নেতাদের কিছু দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে সংকট নতুন রূপ লাভ করে। এ সময়ে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দাবি আদায়ে গঠন করে তাদের সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। সদ্য স্বাধীন দেশে সবাইকে নিয়ে একযোগে এগিয়ে চলার যে অঙ্গীকার, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কমে আসে দূরত্ব। তাদের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার



বাকশালে যোগদান সেই সাক্ষ্যই দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সে প্রচেষ্টা যায় থমকে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসনের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। তাতে কোনো সুফল তো মেলেইনি, বেড়ে যায় জাতিগত বিদ্বেষ, সংকট হয় আরও ঘনীভূত। তীব্র হয় অশান্তি, হানাহানি, সহিংসতা। অপর সামরিক শাসক এরশাদ শাসনামলে ৬টি, পরবর্তী সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি শাসনামলে ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সমাধানের দুয়ার খোলেনি, আসেনি প্রত্যাশিত শান্তি। অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা জমে হয়েছে পাহাড়সম। যে বৈঠকগুলো সম্পর্কে উপজাতীয় নেতাদের মূল্যায়ন ছিল–'লোক দেখানো, তাতে ছিল আন্তরিকতার অভাব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছাও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।'

সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির দ্বীপশিখা জ্বালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের জুনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যা সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানকল্পে ১৯৯৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি। কমিটিতে সরকারদলীয় সদস্যদের পাশাপাশি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও বিএনপিদলীয় দুই সংসদ সদস্য শেষ পর্যন্ত কমিটির কাজে অংশগ্রহণ করেননি। সংঘাত, হানাহানি, বিভেদের দিনগুলো পেছনে ফেলে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এই কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপে অংশ নেয়। জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর, খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। এরই ধারাবাহিকতায় আরও ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় শুরু হওয়া সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তম বৈঠকে চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি।

বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় চলে আসা অস্থিরতা, রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধে এ শান্তিচুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জমাট বরফ গলিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ চুক্তি বিশ্বেও এক অনন্য নজির। সংগত কারণেই শান্তি প্রক্রিয়ার পুরোটা সময় এ সংক্রান্ত যে কোনো ঘটনা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে গুরুত্বসহকারে। গবেষক, আগ্রহী পাঠক যাতে

পার্বত্য শান্তিচুক্তিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে পেতে পারেন, সেজন্য আমাদের এই সংকলনগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে শুধু শান্তিচুক্তির পুরো প্রক্রিয়ার সংবাদ নয়, তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝাতে পক্ষ-বিপক্ষের সংবাদের পাশাপাশি পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামগুলোও গুরুত্বানুসারে সংযোজিত হয়েছে। আধেয় সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচটি পত্রিকা: (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ, (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। সময়সীমা ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। কলেবর বেড়ে যাওয়ায় গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঠাঁই পেয়েছে সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও ভোরের কাগজ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দ্য বাংলাদেশ অবজারভার থেকে সংগৃহীত আধেয়। দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও বানানে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পুরোনো সংবাদপত্র বিধায়, একেবারেই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি–এমন কিছু শব্দের ক্ষেত্রে ত্রিবিন্দুচিহ্ন (...) ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে পাঠক কেবল শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সংবাদ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম-সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও দ্বন্দ্বের নানা মাত্রিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি শান্তিচুক্তিকে ঘিরে তৎকালীন রাজনীতির একটি সম্যক চিত্রও পাবেন। বিশ্বাস করি–গ্রন্থটি পাঠক, গবেষকসহ এ বিষয়ে আগ্রহীজনের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা যেমন অপরিহার্য, তেমনই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রশ্নটিও ছিল জড়িত। এসবকিছু বিবেচনায় নিয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হয়েছেন রাজনৈতিক সমাধান ও শান্তি স্থাপনের পথে। তাঁরই সুযোগ্য নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে মাত্র ১৭ মাসের মাথায় দীর্ঘ দুই দশকের সশস্ত্র সংঘাতের যবনিকাপাত ঘটে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭' স্বাক্ষরের মাধ্যমে। চুক্তি স্বাক্ষরের ২৫ বছর পরও আজ পার্বত্যাঞ্চলে যে শান্তির সুবাতাস ও উন্নয়নের ছোঁয়া, তা এই শান্তিচুক্তিরই ফল। সময়ের সঙ্গে এ চুক্তির তাৎপর্য জাতীয় জীবনে উদ্ভাসিত হবে বহুমাত্রিকতায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা–অর্জন।

**পপি দেবী থাপা**
গবেষক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| পটভূমি | ১৩-২২ |
| সংবাদ | ২৩-২৫১ |
| দৈনিক ইত্তেফাক | ২৫৩-৪০৯ |
| ভোরের কাগজ | ৪১১-৬৭২ |

# পটভূমি

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, মঙ্গলবার, সকাল ১০টা ২৪ মিনিট। ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্মলগ্ন। মুহূর্তটি ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের। শিল্পী শাহাবুদ্দিনের স্বাধীনতার পতাকা আর অ, আ, ক, খ বর্ণমালা আঁকা তৈলচিত্রের নিচে রাখা টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলেন দুই নেতা–আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বসেছিলেন অপর চেয়ারটিতে। মুখোমুখি দুই সারির একটিতে মন্ত্রিসভার সদস্য, অপর সারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনসংহতির নেতা ও স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে। মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রীসহ সবার। মুখে স্মিত হাসি বিজয়ের। বিশেষ দুটি কলম হাতে তুলে নিলেন দুই নেতা–আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও সন্তু লারমা। পনেরো পৃষ্ঠার চূড়ান্ত চুক্তির দুটি ফাইলে বাংলায় পরপর স্বাক্ষর করলেন দুইজন। একজন ফাইল তুলে দিলেন আরেকজনের হাতে। চারদিকে উচ্ছ্বাস আর অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। উপস্থিত সবার হৃদয়জুড়ে মঙ্গল আর শান্তির প্রার্থনা। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা বিভেদ, হানাহানি, জাতিগত সংঘাতের দিনগুলো পেছনে ফেলে নতুন পথ চলার শুরু। যে পথ শান্তির, যে পথ কল্যাণের। মুহূর্তটি সৃষ্টির কারিকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের জুনে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র ১৭ মাসের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিরোধীয় পক্ষগুলো মিলল মিলনমোহনায়। মাত্র ১৭ মাস সময়ের মধ্যে এ ধরনের একটি সম্মানজনক সাংবিধানিক সমাধান, তা অনেক অতি আশাবাদীরও ছিল কল্পনার বাইরে। অথচ এই হিরণ্ময় মুহূর্তে সেটিই বাস্তবতা। এখানে সবাই মিলেছে হৃদয়ে হৃদয়ে। শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়ের।

দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা বন-বনানী, পাহাড়-পর্বত আর সবুজে ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের শিকড়ের সন্ধানে আমাদের আলো ফেলতে হবে সুদূর অতীতের গর্ভে। সৃষ্ট সংকট, সংঘাতে গড়াতে নিয়েছে দীর্ঘ সময়। প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের হিংস্রতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে রচিত হয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সংকট রূপ নিয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গড়ে ওঠার ইতিহাসে দৃষ্টি ফেলে আমরা দেখি, চাকমা রাজা মংছুই ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) থেকে বিতাড়িত হয়ে রামু, টেকনাফ প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় নেন।



পরে মারমারা এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মোগলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে এবং বাংলায় মোগল শাসকদের কাছে এ অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে। ওই সময় থেকেই সমতল ভূমির বাঙালিরা চাকমা রাজা দেওয়ান বক্স খান ও পরবর্তী শাসক রানি কালিন্দির আমন্ত্রণে এই অঞ্চলে আসেন। ১৭৬০-এর ১৫ অক্টোবর বাংলার নওয়াব মীর কাশেম খান পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। তবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইংরেজদেরও বাধার মুখে পড়তে হয়, বিশেষ করে ১৭৭৭-১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমা যোদ্ধারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ ১৭৮৭ সালে ইংরেজ বড়োলাটের কাছে গিয়ে শান্তি কামনা করে আনুগত্যের ঘোষণা দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে ব্রিটিশরা এলাকাটির প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করে। ১৮৬০ সালের ৩৩০২নং প্রজ্ঞাপন বলে চট্টগ্রাম জেলার মূল পার্বত্য অংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একজন সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ইংরেজ রাজশক্তি এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানামাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে তাদের শাসনের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০–এই একশ বছরে ইংরেজ তার নিজস্ব অবস্থানকে সংহত করেছে। যুদ্ধবিগ্রহের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৯০০ সালের ১ মে তারা জারি করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অ্যাক্ট' (CHT Regulation Act 1900)। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন-রেগুলেটেড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯০০-এর অ্যাক্টের ৩৪, ৫১ ও ৫২ ধারায় এই এলাকার উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ৩৪ ধারা অনুযায়ী বহিরাগত অ-উপজাতিদের জন্য জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ; ৫১ ধারায় অ-উপজাতি কোনো ব্যক্তি উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থবিরোধী কোনো তৎপরতায় লিপ্ত হলে তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করা যাবে। অন্যদিকে ৫২ ধারায় বলা আছে, কোনো অ-উপজাতি শুধু জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়েই ওই এলাকায় প্রবেশ বা বসবাস করতে পারবে।

১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area হিসাবে ঘোষণা করে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় উপজাতিদের একটা অংশ এর বিরোধিতা করে। তারা ভারতের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হলে তাদের অধিকার সংরক্ষিত

হবে কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। সমিতি রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বোমাং রাজপরিবারের কিছু নেতা এর প্রতিবাদে বান্দরবানে বর্মী পতাকা উত্তোলন করে।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১ আগস্ট বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে। তারা ভারতীয় পতাকা নামানোর জন্য বিক্ষুব্ধদের ওপর বল প্রয়োগ করে এবং সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। পাকিস্তানে উপজাতিদের অধিকার সংরক্ষিত হবে কি না, তা নিয়ে উপজাতি নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা কলহে লিপ্ত হন। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি বড়ো গ্রুপ তাদের ভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এ সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদা খর্ব হতে থাকে। পার্বত্যবাসীদের রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনা শুরু হয়। এ সময় পার্বত্যাঞ্চল স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীরবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৮৮১' বাতিল করে। সরকারের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হন জেলা প্রশাসক। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার এক সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area-এর পরিবর্তে উপজাতীয় এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৬৪তে উপজাতীয় এলাকার বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করে রেগুলেশন ১৯০০ চালু রাখা হয়। তবে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ওই রেগুলেশনের ৫১ ধারাকে Ultra-Vires বা রীতিবিরুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩৪নং ধারারও সংশোধন করা হয়। এর ফলে জেলা প্রশাসক কোনো অ-উপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা হারান এবং যেসব অ-উপজাতি ১৫ বছর বা এর বেশি সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন, তাদের জমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দেও অবশ্য ৫২ ধারার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এলাকার জনগণের মতামত এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সম্মতি বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা হয়নি। এমনকি উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বা অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। বরং কোনো কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ ও কাঠের ওপর নির্ভর করে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল (কর্ণফুলী) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রকল্পসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে পাহাড়িরা চাকরিবাকরির সুযোগ-সুবিধা প্রায় পায়নি বললেই চলে। ষাটের দশকে কাপ্তাইয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে



গিয়ে প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বাঁধ নির্মাণের ফলে ব্যাপক ফসলহানিসহ ওই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনের ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। পাহাড়িদের জীবনধারণের অবলম্বন কৃষি অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। কাপ্তাই বাঁধের কারণে ৯৯ হাজার ৯৭৭ জন লোক বাস্তুহারা হয়ে যায়। এতে তলিয়ে যায় চাষযোগ্য জমির ৫৪ শতাংশ। পথে নেমে পড়ে ওই এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িরা। এমনকি জমি অধিগ্রহণ করে পাহাড়িদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি। ব্যবস্থা করা হয়নি পুনর্বাসনের। জানা যায়, ওই সময়ে উপযুক্ত পুনর্বাসনের অভাবে প্রায় ৫০ হাজার উপজাতি নর-নারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়, তৎকালীন বার্মা তথা আজকের মিয়ানমারেও আশ্রয় নেয় অনেকেই। কর্ণফুলী পেপার মিলস প্রতিষ্ঠাকালে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ঘোষণা থাকলেও পাহাড়িরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে বিপুলসংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। এমনকি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ আসনগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যায়। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতীয়তার পরিচয়ে পরিচিত হতে পাহাড়িরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে উপজাতিদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। বঙ্গবন্ধু তাদের আশ্বাস দেন যে, তারা সরকারি চাকরিতে তাদের যথাযোগ্য অংশ পাবে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠিত হয় (মতান্তরে ২৪ জুন ১৯৭২)। ওই সময়ে গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়িদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ৪ দফা দাবিনামা পেশ করে। সেগুলো হচ্ছে: (১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা এবং তার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ রাখা (২) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে (৩) উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধিব্যবস্থা

শাসনতন্ত্রে থাকবে। বঙ্গবন্ধু এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলধারায় মিশে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ প্রস্তাবের মর্মার্থ তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির। তৎকালীন বিরোধীদলগুলোর অনেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করে মেতে ওঠে অপপ্রচারে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের শেষদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অভিবাসী প্রেরণ বন্ধ এবং অবৈধভাবে পাহাড়িদের দখল করা জমিজমা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উপজাতিদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন এবং বৈশিষ্ট্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন। বাকশাল কমিটিতে উপজাতি নেতাদের সম্মানজনক পদ দেন। যাতে তারা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরতে পারেন। বোমাং চিফ মং শু প্রু চৌধুরীকে বান্দরবান এবং মং চিফ মং প্রু সাইনকে খাগড়াছড়ি জেলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তিন জেলার বাকশাল সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া হয় তিনজন উপজাতি নেতাকে। এমনকি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কথায় আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে বাকশালে যোগদান করেন।

১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখারূপে যে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়, বঙ্গবন্ধুর গঠনমূলক কাজের দরুন ওই বাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু যখনই পাহাড়িদের বুঝতে এবং কাছে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং উপজাতিরা বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিক তখনই ঘাতকের বুলেটে বঙ্গবন্ধু শহিদ হন। আবার পুরো পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সরকার এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজিত সমস্যাকে কেবল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ করে উপজাতীয় জীবনবিন্যাস, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৬ সালে গঠন করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড'। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঙালি বসতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে জিয়া সরকার পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসন শুরু করে। পাশাপাশি তাদের জানমাল রক্ষার অজুহাতে বেশি পরিমাণ সৈন্য ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। সেসময় উপজাতিদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তাতে কিছুই লাভ হয়নি। সহিংসতা ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। জোরদার হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৮০ সালের



২৯ জুলাই একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে। একই বছরের ২৫ মার্চ বাঙালি-পাহাড়ি দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়। ১৯৮১ সালে পুনর্বাসিত বাঙালিদের পাহাড়ে জমি ও টাকা দেওয়া শুরু হয়। ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি ট্রাইবাল কনভেনশন বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে জনসংহতি সমিতির আটদিনব্যাপী দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্টি মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী–এ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন থেকে শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। একই বছরের ১ অক্টোবর ক্ষমতা দখলকারী অপর সামরিক শাসক এরশাদ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করতে পারেনি। ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হামলায় মানবেন্দ্র লারমা তার ৮ সহযোগীসহ নিহত হন। ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারি রাঙামাটির মারিশ্যা এলাকায় বহুল আলোচিত শেল ওয়েল কোম্পানির ৫ জন বিশেষজ্ঞকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহরণের ঘটনা ঘটে। পরে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৮৪ সালের ১০ মে পার্বত্য এলাকার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ৩১ মে বরকলে ১০০ জন অ-উপজাতিকে শান্তিবাহিনী হত্যা করে। ২৮ নভেম্বর ২ জন উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী। ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্য জীবনে ফিরে আসে। ওই বছরের ২১ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার পুজগাং এলাকায় সর্বপ্রথম সরকার ও জনসংহতি বৈঠকে বসে। সরকার প্রথম এক মাসের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ১৯৮৬ সালের ২৪ মে। ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট পার্বত্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশে আসেন। ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জেলা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে পানছড়ি থানার পুজগাংয়ে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বৈঠক। ১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি তৃতীয় এবং ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বৈঠক, ১৯ জুন পঞ্চম এবং ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর এরশাদ শাসনামলে মোট ছয়টি বৈঠকের শেষ বৈঠকটিও সমাধান ছাড়াই শেষ হয়। বৈঠকগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল না আসায় পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি, সংঘাত থাকে অব্যাহত।

ক্ষমতার পটপরিবর্তনে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯২ সালের ১০ জুলাই পার্বত্য সংকট নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। ১ আগস্ট জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। এ সময় থেকে দফায় দফায়

অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়। কখনো জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে, কখনো সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথভাবে এই অস্ত্রবিরতি পালিত হয়। বিএনপি সরকারের আমলে অলি আহমদের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে শুরু হয় ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর। জনসংহতির পক্ষে জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের ৫ মে পর্যন্ত খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে বিএনপি সরকারের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সাতটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের কমিটির একটি সাব-কমিটি গঠিত হলে ওই কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক হয় ১৯৯৪ সালের ৪ জুন। সাব-কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে মোট ছয়টি বৈঠক করে। ১৯৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর বিএনপি সরকারের আমলে কোনো সমাধান ছাড়াই মেননের সাব-কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ ও সরকারের সঙ্গে ত্রয়োদশ বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকগুলোর সময় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টি যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তেমনই প্রতিপক্ষের আস্থাহীনতার বিষয়টিও সামনে এসেছে। পাশাপাশি সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল চলমান। শেষ পর্যন্ত আসেনি কাঙ্ক্ষিত ফল।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২৩ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সংকট সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানকল্পে ৩০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে সরকার, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও বিএনপির দুই সংসদ সদস্য এই কমিটির কাজে শেষ পর্যন্ত অংশ নেননি। এই কমিটিই পরে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপের প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ২১ ডিসেম্বর শুরু হয়। প্রথম বৈঠকে সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির পক্ষে রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা



আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়া যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, কে শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, মহাপরিচালক সিএম মোহসীন, বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সন্তু লারমা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত থাকায় দুইদিন মুলতুবি থাকার পর ২৪ ডিসেম্বর বৈঠক আবার শুরু হয়। প্রথম বৈঠকে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা তাদের সংশোধিত পাঁচ দফা দাবিনামা পেশ করেন এবং অতীতের সরকারগুলো কীভাবে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে একের পর এক ঘটনার জন্ম দিতে থাকে, তার চিত্র তুলে ধরেন। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে টানা সোয়া তিন ঘণ্টা বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সাংবাদিকদের বলেন, সমাধান আসন্ন। তার ভাষায়, 'ডেফিনিটলি আই অ্যাম হোপফুল'। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ উল্লসিত মুখে জানালেন, 'আমরা আনন্দিত, বৈঠক ফলপ্রসূ। ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রয়োজনে চলবে ম্যারাথন বৈঠক।' প্রথম বৈঠকের এই ফলাফলকে ব্যতিক্রমধর্মী বলাই যায়। বিগত বছরগুলোয় সরকার নিয়োজিত কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির যতগুলো বৈঠক হয়েছে, তার কোনোটাতেই এই বৈঠকটির মতো সৌহার্দ, আন্তরিকতা ও আশাবাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়নি। বৈঠক চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে টেলিফোনে খোঁজখবর নেন এবং জনসংহতি সমিতির নেতাদের ঢাকায় এসে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আন্তরিকতা আস্থার সংকট কাটাতে ভূমিকা রেখেছে ব্যাপক। যার প্রতিফলন আমরা দেখব দ্বিতীয় বৈঠকে।

দ্বিতীয় বৈঠকের চমক ছিল এর স্থান। বিরোধের দুই যুগের মধ্যে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির নেতাদের প্রথমবারের মতো ঢাকায় আগমন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে উভয়পক্ষের তিনদিনব্যাপী দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ জানুয়ারি। ঢাকা পর্যন্ত তাদের আসতে সম্মত হওয়ার বিষয়টিকে তখনই আস্থার সংকট কেটে যাওয়ার লক্ষণ মনে করা হচ্ছিল। এরশাদ আমলের বৈঠকগুলোতে তারা এমনকি ছবি তুলতে দিতেও রাজি ছিলেন না। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে প্রথম দফা বৈঠক খাগড়াছড়িতে হলেও এর পরের সব বৈঠক হয়েছে ঢাকায়। সরকার ও জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১২-১৩ মার্চ। ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৪ মে। বৈঠক শেষে

উভয়পক্ষ ঘোষণা করে আলোচনায় সব বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন এবং শীঘ্রই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবেন। পাঁচদিনব্যাপী চলা পঞ্চম বৈঠকটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৮ জুলাই। ষষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমার কণ্ঠে শান্তিচুক্তি নিয়ে পরিষ্কার বার্তা আসে। ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সরকারি কমিটি ও জনসংহতি সমিতির চারদিনের ষষ্ঠ বৈঠক শেষে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের জানান, তারা খসড়া শান্তিচুক্তি প্রণয়ন করেছেন। সর্বশেষ ও সপ্তম বৈঠকের আলোচনা ঢাকায় শুরু হয় ২৬ নভেম্বর। শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল জনসংহতি সমিতির নেতারা একটি চূড়ান্ত সমাধানের প্রস্তুতি নিয়েই ঢাকায় এসেছেন। সপ্তম দফা বৈঠকের প্রথম দিনে বৈঠক হয়েছে ৪ ঘণ্টা। দুপুর আড়াইটায় শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অমীমাংসিত সব বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। বৈঠক সমাপ্ত হয় ৩০ নভেম্বর রাত ১টা ২০ মিনিটে। এরপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ−১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনন্দঘন পরিবেশে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি।

এই অর্জনের পথ মসৃণ ছিল না কখনোই। সেখানে বসবাসরত বাঙালি ও উপজাতিসহ বিবদমান পক্ষগুলোর দীর্ঘদিনের জমাট ক্ষোভ প্রশমনে নিতে হয়েছে কার্যকর উদ্যোগ। আলোচনা চলাকালেও পাহাড়ের পরিস্থিতিকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বারবার। স্বার্থান্বেষী মহল শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পাহাড়ে রক্ত ঝরিয়েছে, চালিয়েছে নানা অপচেষ্টা। তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর বড়ো একটি অংশ শান্তি প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, হরতালের মতো কর্মসূচি দেওয়াসহ 'অশান্তিবাহিনী' গঠনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ আনা হয়েছে দেশ বিক্রির। দেশের অভ্যন্তরে এই প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলায় শান্তিচুক্তির পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি সরকারকে আন্তর্জাতিক মহলের মতামতকেও বিবেচনায় নিতে হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সংকট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচিত ছিল দীর্ঘ সময় ধরে। সংগত কারণেই পুরো প্রক্রিয়াটিকে তারা রেখেছিলেন আতশকাচের নিচে। ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বসবাসের পরিস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিতে নিতে হয়েছে কূটনৈতিক উদ্যোগ। সবকিছু মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী



লীগ সরকার মাত্র ১৭ মাসের মাথায় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। শান্তি আলোচনা শুরুর পর থেকেই সব বিরোধিতার বিপরীতে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে আসছিলেন, কোনো অপচেষ্টাই শান্তির এই পথচলাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। যেমনটা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।' সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই শান্তিচুক্তিবিষয়ক আলোচনার পুরোটা পথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রসর হয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭'। বিশ্বে এমন চুক্তির নজির তেমন নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইছে। জনজীবন সংঘাতবিমুখ। এমন ধারা থাক অব্যাহত, চিরায়ত− এই প্রত্যাশায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আধেয় নিয়ে এ প্রকাশনা। প্রথম খণ্ডে থাকছে (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ থেকে সংগৃহীত আধেয়, সময় ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর; শুরুটা 'সংবাদ' দিয়ে।

***তথ্যসূত্র:*** *সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দ্য বাংলাদেশ অবজারভার।*

সংবাদ

## সংবাদ
## ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
## পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যেখান থেকে শুরু

**সমীর দেবনাথ ॥** রামগড়, ৭ই সেপ্টেম্বর।–পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা বহু পুরনো। পার্বত্যবাসী এ সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান চাইলেও তা আরও জটিল হয়ে উঠছে দিনদিনই! চেঙ্গী, মাইনী, কাচালং, শংখ, ফেনী নদী ও নানাছড়ার বিধৌত পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের এক দশমাংশ। সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় অগণতি পাহাড় পর্বত। বন-বনানী চির সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য সমৃদ্ধ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে অশান্তি দীর্ঘদিন ধরে।

প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের হিংস্রতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে রচিত হয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সর্বস্তরের মানুষ। সরকার আসছে সরকার যাচ্ছে সকলেই চেষ্টা করছে সমস্যা সমাধানের। কিন্তু সমাধান কিছুই হয়নি।

প্রায় ৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। গঠিত হয়েছে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা নিয়ে। ছোটবড় মিলে ১৩টি উপজাতীয় গোষ্ঠী বসবাস করছে এ তিন পার্বত্য জেলায়। পাহাড়ী জমি, বনভূমি, আর জলাশয় ঘেরা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচারানুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমতলবাসীদের চেয়ে ভিন্নতর। তাদের অর্থনীতি কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। প্রায় ২৫ লাখ জন অধ্যুষিত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসও ভিন্নতর।

১৮৮৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইংরেজরা তাদের অধীনে নেয়। তারপর পার্বত্য চট্টগ্রামের আধা-স্বায়ত্তশাসন দিয়ে রাজাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার পর সমতলবাসীদের যাতায়াত, বসতি স্থাপন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। তবে এ সংখ্যা হাতেগোনা। সে থেকে পাহাড়িদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে ক্ষোভ ও অসন্তোষ। তৎকালীন শাসক পার্বত্য চট্টগ্রামের উপনিবেশ কঠোরভাবে ধরে রাখার জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে ১৯০০ সালে। যা "পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০" নামে পরিচিত। এই আইন অনুযায়ী অ-উপজাতিদের অত্রাঞ্চলে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং জমি বন্দোবস্তের অনুমোদন নিষিদ্ধ করা হয়। ইংরেজ সরকার একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম এবং তাদের তাবেদারি সৃষ্টির জন্য রাজা,



হেডম্যান কারবারি এ তিনটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। আইন-শৃঙ্খলা আয়ত্তে রাখার জন্য বৃটিশ ফ্রন্টিয়ার পুলিশ ১৯০০ সালের রেগুলেশনের আওতায় পার্বত্য উপজাতিদের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ''পাশ্চাৎপদ" অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে পার্বত্য এলাকার অনগ্রসরতা অবসানের জন্য পার্বত্য এলাকার পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এর সংশোধন করে ১৯২১ সালে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদা খর্ব হতে থাকে। পার্বত্যবাসীদের রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনা শুরু হয়। এ সময় পার্বত্যাঞ্চল স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সরকারের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন জেলা প্রশাসক। '৬০-এর দশকে কাপ্তাই-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে ব্যাপক ফসলহানিসহ ওই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনের ঘর-বাড়ি তলিয়ে যায়। ফলে পাহাড়ীদের জীবন ধারণের একমাত্র কৃষি অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। পথে নেমে পড়ে ওই এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়ীরা। এমনকি জমি অধিগ্রহণ করেও পাহাড়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। ব্যবস্থা করা হয়নি পুনর্বাসনের। জানা যায়–ওই সময়ে উপযুক্ত পুনর্বাসনের অভাবে প্রায় ৬০ হাজার উপজাতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠা হলে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে ঘোষণা থাকলেও পাহাড়ীরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। এর ফলে দানা বাঁধতে থাকে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। জন্ম নেয় জনসংহতি সমিতি নামক সংগঠন।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে রাজা ত্রিদিব রায় এবং অংশুপ্রু চৌধুরীর খপ্পরে পড়ে বিপুল সংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। এমনকি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ আসনগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যায়। ফলে ওই সময়ে উপজাতিদের 'স্বাধীনতা বিরোধী' বলে বলা হত। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করে। এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতীয়তার পরিচয়ে পরিচিত হতে পাহাড়ীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ীদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে ৪ দফা দাবিনামা পেশ করে। সেগুলো হচ্ছে (১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা এবং তার একটি নিজস্ব পরিষদ রাখা (২) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০-এর ন্যায় সংবিধি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা

(৩) উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা যাবে না। বঙ্গবন্ধু তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতে তাদের ক্ষুদ্র জাতি সত্তার পরিবর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ধারায় মিশে যাবার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ প্রস্তাব প্রতিনিধিদল গ্রহণ করতে পারেনি। এতে বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা সুকৌশলে কাজে লাগায় আওয়ামী লীগ বিরোধীরা। রাজনৈতিকভাবে নতুন সরকারের কার্যক্রমের ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য জাসদ সর্বহারা পার্টির সদস্যরা বেছে নেয় এ পার্বত্য চট্টগ্রাম। অবশ্য তাদের রাজনীতি এবং আদর্শ পাহাড়ীদের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

পরে বঙ্গবন্ধু **১৯৭৩** সালের শেষদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অভিবাসী প্রেরণ বন্ধ এবং অবৈধভাবে পাহাড়ীদের দখল করা জমিজমা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। উপজাতীয়দের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন এবং বৈশিষ্ট্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন। বাকশাল কমিটিতে উপজাতীয় নেতাদের সম্মানজনক পদ দেন। যাতে তারা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরতে পারেন। বোমাং চীফ মংশুপ্রু চৌধুরীকে বান্দরবান এবং মং চীফ মং প্রু সাইনকে খাগড়াছড়ি জেলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তিন জেলার বাকশাল সেক্রেটারি নিয়োগ দেয়া হয় তিন জন উপজাতি নেতাকে। এমনকি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কথায় আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে বাকশালে যোগদান করেছিলেন।

**১৯৭৩** সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা রূপে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর গঠনমূলক কাজের দরুন ওই বাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু যখনই পাহাড়ীদের বুঝতে এবং কাছে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং উপজাতিরা বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন ঠিক তখনই ঘাতকের বুলেটে বঙ্গবন্ধু শহীদ হন। আবার পুরো পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। জিয়াউর রহমান সরকার এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজিত সমস্যাকে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। উপজাতীয় জীবন বিন্যাস আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গঠন করেন **১৯৭৬** সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঙালি বসতি স্থাপনের পাশাপাশি তাদের জানমাল রক্ষার জন্য বেশি পরিমাণ সৈন্য ও নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে উপজাতীয়দের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুই লাভ হয়নি। বরং ওই সময়ে সহিংসতা ব্যাপক আকার রূপ নেয়। জোরদার হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে।



**সংবাদ**

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

বিবিসিকে সামাদ আজাদ

**পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হবে**

**লন্ডন, ১৯শে সেপ্টেম্বর (বিবিসি)**। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেছেন, তার সরকার খুব শিগগিরই চাকমাদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্যে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কলকাতায় বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর চাকমাদের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে এবং সেই মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই বাংলাদেশের নতুন সরকার এই সমস্যার সমাধান খুঁজবে।

তিনি আরো বলেন, তার সরকার সামরিক কায়দায় নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান খুঁজবে রাজনৈতিক কায়দায়। এজন্য শিগগিরই ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটার একটা রাজনৈতিক সমাধান দরকার। চাকমাদের সমস্যাটাকে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ভাবে দেখে, এটার সমাধান আমরা সেভাবেই করবো। আমাদের ওপর তাদের আস্থা থাকা স্বাভাবিক এবং এই আস্থার ভিত্তিতেই আমরা সমস্যার সমাধান করবো।

তিনি অবশ্য গত সপ্তাহের হত্যাকান্ডের জন্য কোন গোষ্ঠীকে দায়ী করেননি।

**সংবাদ**

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

**বিবিসি'র কাছে বিবৃতি**
**জনসংহতি সমিতি জড়িত নয়**

**লন্ডন, ১৮ই সেপ্টেম্বর (বিবিসি)**। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগ্রামরত জনসংহতি সমিতি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করেছে যে, আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে তাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু এই সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে কোনরকম আলোচনার উদ্যোগ এখনো না নেয়ায় তারা বেশ হতাশ বোধ করছে।

বিবিসি'র দফতরে আজ পাঠানো এক বিবৃতিতে জনসংহতি সমিতির প্রচার সচিব জগদীশ চাকমা বলেছেন, গত সপ্তাহে রাঙামাটি জেলার বনাঞ্চলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে তার দলের কোন ভূমিকাই নেই।

তিনি বলেন, তার দল কোনদিনই পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত বাঙালিদের ঐ জায়গার বৈধ অধিবাসী বলে মনে করেনি। তাই তাদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে কর আদায় করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেমনটি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে।

জগদীশ চাকমা বলেন, বাংলাদেশের নতুন সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জনসংহতি সমিতিকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

তিনি জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা শুরু করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পুনরায় অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের ওপর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বন্ধ করে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি একথাও বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি জনসংহতি সমিতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে; কিন্তু তার লংঘন করছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী।

সংবাদ

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

**পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন**
**কর্মকাণ্ড জোরদার করা**
**হবে : প্রধানমন্ত্রী**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নতুন নতুন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসমুক্ত করার প্রধান শর্তই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতা।

বাসস জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করার সময় তিনি একথা বলেন। যারা সাক্ষাৎ করেন তারা হচ্ছেন রাঙামাটি জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্রলাল চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান এবং বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান মইযুঙ্গ কিম চিং চৌধুরী।



তিনজন চেয়ারম্যান এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে দীর্ঘদিন পর জনগণের রায়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসায় পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার তাদের সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে পাবে বলে তারা আশাবাদী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য এলাকায় বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সরকার তাদের সমস্যা এবং এলাকায় প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত আছে। প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডেরও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন।

এলাকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই সেখানে বহু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে এলাকায় কর্মসংস্থান ও উত্তেজনা প্রশমনের সহায়ক হবে।

সংবাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

**পার্বত্য চট্টগ্রাম : অস্ত্র বিরতির**
**মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে**
**পার্বত্য অঞ্চলজুড়ে উদ্বেগ**

**মনির হোসেন/সুনীল দে ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যকার অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আজ সোমবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে গতকাল রাত পর্যন্ত সরকার ও শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য জনসংহতি সমিতির মধ্যে কোন পক্ষই উদ্যোগ না নেয়ায় বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তবে কয়েকটি সূত্র আভাস দিয়েছে যে, সরকার পক্ষ থেকে কোন অনুরোধ না পেলেও জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে আজ অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণা দিতে পারে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক অস্ত্রবিরতি বহাল থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে পার্বত্যবাসীদের মনে আশার সঞ্চার হয়। এই প্রত্যাশা নিয়েই সবাই ধরে নিয়েছিল যে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের আগে জনসংহতি সমিতির কাছে অস্ত্রবিরতি বৃদ্ধির প্রস্তাব

দেবে। কিন্তু কল্পনা চাকমা অপহরণের পরবর্তী ঘটনাবলি এবং অতি সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার মাহিল্যায় ২৮ জন কাঠুরিয়া হত্যার ঘটনার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এই দুটো ঘটনাকে শান্তি উদ্যোগ পণ্ড করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহলের সুপরিকল্পিত কাণ্ড বলে সন্দেহ করছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে জনসংহতি প্রথম অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। পরে তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদ সদ্যসদের নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটির অনুরোধে এবং কোনবার একতরফাভাবে জনসংহতি সমিতি মোট ২৫ দফা অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ঘোষণা করে। সর্বশেষ গত ২৮শে জুলাই জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতির মেয়াদ সোমবার ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার জন্য সরকারের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অস্ত্রবিরতি বজায় রাখার কথা দু'পক্ষ থেকে বলা হলেও একটি পক্ষ কিছুদিন যাবৎ অস্ত্রবিরতির সমঝোতা করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু সংগঠন এবং রাজধানী থেকে প্রকাশিত মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত একটি দৈনিক পত্রিকা প্রচার করতে থাকে যে, অস্ত্রবিরতির আড়ালে শান্তি বাহিনীতে নতুন যুবকদের রিক্রুট এবং অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চলছে। শান্তি বাহিনী নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অচিরেই বাঙালিদের আক্রমণ শুরু করবে।

অভিযোগ রয়েছে যে, জনসংহতি প্রকৃতপক্ষে শান্তি আলোচনা শুরু হোক তা চায় না। কারণ শান্তি ফিরে এলে তাদের সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনীর মাধ্যমে চাঁদা আদায় বন্ধ হয়ে যাবে, উপজাতীয়রাও তাদেরকে কোন রকম প্রশ্রয় দেবে না। এই চিন্তা থেকেই শান্তিবাহিনী সাম্প্রতিক কাঠুরিয়া হত্যার ঘটনা ঘটিয়ে উপজাতি-বাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি এবং শান্তি উদ্যোগ পণ্ড করতে চাইছে। এক হিসেবে বলা যায়, শান্তি বাহিনী আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাৎসরিক প্রায় ৩ কোটি টাকা আদায় করত। বর্তমানে তা বাৎসরিক ... লাখ টাকায় নেমে এসেছে।

অপরদিকে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অস্ত্রবিরতি ঘোষণার পর সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম শুধু ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সীমিত রাখা, গ্রেফতারকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মুক্তি দেয়া এবং অভিবাসিত বাঙালিদেরকে প্রত্যাহার সহ বেশকিছু দাবি জানিয়েছিল। সরকার এর সবগুলো না মানলেও বিভিন্ন স্থান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারসহ কয়েকটি



দাবি মানার আশ্বাস দেয়ার পর অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ...বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনের ওপর তাদের আধিপত্য খর্ব হওয়া এবং কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার কাঠের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শংকায় শান্তি উদ্যোগ চায় না। তাই সরকারকে তার আশ্বাস পূরণ করতে দেয়া হয়নি। সরকারকে এ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এ সম্পর্কে কোনকিছু জানাতে অস্বীকার করেন। কর্মকর্তারা বিষয়টিকে অত্যন্ত 'স্পর্শকাতর' বলে অভিহিত করেন।

খাগড়াছড়ি জেলার ডিসি মোঃ ইসমাইলের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, এখনও বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে কোন চিঠি আসেনি। তিনি সরকারি কোন চিঠি না এলেও অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়বে বলে দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতি না থাকলে এ অঞ্চলে জনসাধারনের চলাচলের ক্ষেত্রে বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে।

**সংবাদ**

১লা অক্টোবর ১৯৯৬

**পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা**

**সমাধানে কমিটি গঠন**

**অস্ত্র বিরতি অনুমোদন**

মন্ত্রি পরিষদ বৈঠকে বেসরকারি স্টল সার্ভিসের অনুমতি

**মহিদুল ইসলাম রাজু ॥** মন্ত্রিসভা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে একান্তভাবেই রাজনৈতিক হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের সার্বভৌমত্বের আওতায় অতিদ্রুততার সাথে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিসভা একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি ওই কমিটির কাজ সুচারুভাবে সমন্বয়ের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিসভা পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো সংক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একতরফা ঘোষণাকে সরকারের দিক থেকেও অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার দুপুরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভা সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি সভার আলোচনাসূচিতে না

থাকলেও সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক মনোভাব সম্বলিত জনসংহতি সমিতির একটি চিঠি সরকারের হাতে পৌঁছানোর পরিপ্রেক্ষিতে তা বৈঠকের বিশেষ আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক অস্ত্র, সোনা ও মাদকদ্রব্য চোরাচালানের ব্যাপারে এদেশকে ব্যবহার করার যেকোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মন্ত্রীরা অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনার পর বিষয়টি সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় বলে সূত্র জানায়। মন্ত্রিসভা দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি খাতে স্টলসহ উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন ছাড়াও দেশে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সভা সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদের হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আওয়ামী লীগ দলীয় তিন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, চট্টগ্রামের বিএনপি দলীয় সাংসদ আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বি, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী রয়েছেন। সূত্র জানায়, এই কমিটির কাজ সফল ও সমন্বয় করার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান, সাংসদ মেজর জেনারেল (অবঃ) আবদুস সালামের নেতৃত্বে কমিটিতে ব্রিগেডিয়ার শরিফ আজিজ, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব গোলাম রহমান, স্বরাষ্ট্র সচিব সৈয়দ রেজাউল হায়াত ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকবেন।

সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি রোববার সরকারের কাছে যে চিঠি দিয়েছে তাতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চাওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফকে সভাপতি করে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটিতে পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, পরমাণু বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মন্তিসভা দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি খাতে স্টল সার্ভিসসহ উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করে।



মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিতপূর্ণ এ সিদ্ধান্তের ফলে পর্যায়ক্রমে দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি উদ্যোগে বিমান ও হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রবর্তনের সুযোগ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। সূত্র জানায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স সার্ভিস থাকার প্রাথমিক পর্যায়ে এই তিনটি স্থান বাদে দেশের অন্যান্য স্থানে বেসরকারি সার্ভিস প্রসারের পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মন্ত্রিসভা দি স্টান্ডার্ডস অফ ওয়েট্স এন্ড মেজারস অর্ডিন্যান্স ১৯৮২-এর সংশোধনী প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করে তবে তা বিল আকারে আনার আগে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব আইয়ুবুর রহমানের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ... নেতৃত্বের অবদান এবং ১৯৯১ ও ১৯৯৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাদ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় তার প্রশংনীয় ভূমিকা জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়।

মন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী, বিদায়ী মন্ত্রিপরিসদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও অন্যান্য সচিবরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

**সংবাদ**

৬ই অক্টোবর ১৯৯৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

## জাতীয় কমিটি আজ যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কাজ শুরু করেছে। বিগত সরকারের আমলে গঠিত সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যকার যোগাযোগ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে জাতীয় কমিটির সদস্যরা আজ রোববার খাগড়াছড়িতে বৈঠক করবেন।

গতকাল জাতীয় কমিটির সভাপতি সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শান্তিবাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় বসার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে জানা গেছে। এই লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে বিগত সরকারের সময়ে গঠিত যোগাযোগ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আজই আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গতকাল বৈঠকের পরই বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে যোগাযোগ কমিটির সদস্যদেরকে আজকের বৈঠকে অংশ নেয়ার জন্য খবর দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ৬ সদস্যবিশিষ্ট যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বর্তমানে চিকিৎসার জন্য ভারতের কলকাতায় রয়েছেন।

জানা গেছে, জাতীয় কমিটির সভাপতি সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যেতে পারেন। তাই তিনি নিউইয়র্ক যাওয়ার আগেই কমিটির কাজ শুরু করার অংশ হিসেবে গতকাল এ কমিটি প্রথমবারের মত বৈঠকে বসে। বৈঠকের পর কমিটির সদস্যরা রাতে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় কমিটির সদস্যরা আজ খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেবেন। তবে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারণ করে দেয়া হবে না।

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ছাড়া কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন: আওয়ামী লীগের সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীরবাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, বিএনপি'র সাংসদ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বি, আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আলী হায়দার খান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের মহাপরিচালক চৌধুরী মোঃ মহসীনসহ অন্য সরকারি কর্মকর্তারাও বৈঠকে অংশ নেবেন।

খাগড়াছড়ি থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানান: জাতীয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আজকের বৈঠকে যোগাযোগ কমিটির ৬ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন অংশ নিচ্ছেন। এরা হলেন: রামগড় থানার নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, পানছড়ির মোহাম্মদ শফি, রাঙ্গামাটির মথুরাপাল চাকমা ও বান্দরবানের কংশো অং মারমা। কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা ভারতে চিকিৎসাধীন থাকায় বৈঠকে অংশ নিতে পারছেন না। অপর সদস্য অনন্ত বিহারী খীসা আগেই কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।



**সংবাদ**

**৭ই অক্টোবর ১৯৯৬**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

## জাতীয় কমিটি চায় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসতে

**খাগড়াছড়ি, ৬ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফ্যাক্স)।-** পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি সরকার ও শান্তি বাহিনীর সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার দিনক্ষণ ও স্থান নির্ধারণের জন্যে শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে জাতীয় কমিটি ও যোগাযোগ কমিটির মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ আহ্বান জানানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্যে গঠিত জাতীয় কমিটির সদস্যরা এখন খাগড়াছড়িতে রয়েছেন। এ কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি গতকাল উল্লিখিত বৈঠকে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চায়। পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সরকারের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা রয়েছে। তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতি যখনই সংলাপে বসতে চাইবে তখনই সংলাপের আয়োজন করা হবে। চিফ হুইপ যোগাযোগ কমিটিকে সংলাপ শুরু করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ারও অনুরোধ জানান।

বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, বান্দরবানের বীর বাহাদুর; যোগাযোগ কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, মোহাম্মদ শফি; প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ মোহসীন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াৎ হোসেন, ব্রিগেডিয়ার কাজি আশফাক, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল প্রমুখ।

## সংবাদ
## ২২শে অক্টোবর ১৯৯৬
## সরকারের কাছে জনসংহতি কমিটির চিঠি
## পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সংসদীয় কমিটি গঠনের আহ্বান

**খাগড়াছড়ি থেকে জহুরুল আলম ॥** শান্তিবাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটি গঠনের ও দ্রুত সংলাপ শুরুর ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার স্বার্থে সরকার পার্বত্য অঞ্চলে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে রাজি কিনা তা আগামী ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে জনসংহতি সমিতিকে জানাতে বলেছে। গতকাল সোমবার জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে দেয়া এক চিঠিতে একথা বলেছে।

উল্লেখ্য, আগামী ৩১শে অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যকার অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হবে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছিল।

এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে লিয়াজোঁ রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে অবিলম্বে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপ শুরুর আগ্রহের কথা জানায়। জাতীয় কমিটি ও যোগাযোগ কমিটির মধ্যকার বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ চিঠির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির কাছে গত ১১ই অক্টোবর পাঠানো হয়।

জাতীয় কমিটির এ চিঠিরই জবাবে জনসংহতি সমিতি গতকাল তাদের চিঠিতে জানায় যে, সরকার যে কমিটি গঠন করেছে তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। কারণ জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানো চিঠিতে সরকার গঠিত কমিটির সদস্যদের নামপরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। এই কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতটুকু তাও জানানো হয়নি।

জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'পদ্ধতিগতভাবে অতিদ্রুত কার্যকর' পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়াও সমিতির প্রস্তাবে বলা হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি ও বিরোধী দলসমূহ থেকে সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি 'সংসদীয় কমিটি' গঠন করতে



হবে। এই কমিটির হাতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের স্থান, নিরাপত্তা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রচার, পরিচালনা ও যোগাযোগ বিষয়ে গত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সেসব ব্যবস্থাই অনুসরণ করতে হবে।

গতকাল পার্বত্য জনসংহতি সমিতির পক্ষে ঊষাতন তালুকদারের সই করা চিঠিটি যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে দেয়া হয়।

জনসংহতি সমিতি এছাড়াও শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার স্বার্থে ও পুনরায় সংলাপ শুরু করার লক্ষ্যে উভয়পক্ষের অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে সরকার পক্ষ রাজি হওয়া এবং সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, সরকারি ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান, বনায়ন বন্ধ ও অস্ত্রবিরতি চলাকালে গ্রেফতারকৃত সমিতির সদস্যদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি প্রস্তাব দেয়।

এদিকে দ্রুত সংলাপ শুরুর কাজ অন্তত আগামী ১লা নভেম্বরের আগে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিউইয়র্ক গেছেন। আগামী ৩১শে অক্টোবর তিনি দেশে ফিরবেন। তবে জাতীয় কমিটির অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যে জনসংহতি সমিতিকে চিঠি দিতে পারে।

## সংবাদ
## ৩১শে অক্টোবর ১৯৯৬
## পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ শেষ হচ্ছে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ

**খাগড়াছড়ি, ৩০শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফ্যাক্স)।-** পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর মধ্যকার অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামীকাল বৃহস্পতিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আজ বুধবার পর্যন্ত সরকার বা শান্তি বাহিনীর দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

এর আগে শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের এক চিঠিতে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে সমিতিকে জানাতে বলেছিল। এই চিঠির জবাবে সরকারের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতিকে গত রোববার আরেকটি চিঠি দিলেও এতে অস্ত্রবিরতি সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না বলে জানা গেছে। ঢাকায় সরকার

পক্ষের সূত্রগুলো জানায়, অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকেই আসতে হবে। জনসংহতি সমিতি এ প্রস্তাব দিলে সরকারপক্ষ একে স্বাগত জানাবে বলেও সূত্রগুলো জানায়।

উল্লেখ্য, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল।

সরকারপক্ষ এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে লিয়াজোঁ রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির সূত্রগুলো জানায়, গত রোববার সরকারের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতিকে দেয়া চিঠির কোন জবাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই এ মুহূর্তে বলা যাবে না জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াবে কিনা। তবে অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে আজ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

## জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি কমিটির বৈঠক আজ শুরু হচ্ছে

**খাগড়াছড়ি থেকে সুনীল কান্তি দে ও মোঃ জহুরুল আলম ॥** ২০শে ডিসেম্বর। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি নিরসনকল্পে গঠিত জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে আগামীকালের বৈঠকের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। আজ সন্ধ্যার আগে জাতীয় কমিটির আহ্বায়কসহ ৮ জন সদস্য খাগড়াছড়িতে এসে পৌঁছেছেন।

যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এ বৈঠক হবে। বৈঠকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে যাবতীয় দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। যোগাযোগ কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান বিশ্বজিত চাকমা আজ সকালে পানছড়ি থানার দুদুকছড়িতে অবস্থানরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানাতে চলে গেছেন। জানা গেছে, সেখান থেকে আগামীকাল সকাল ১০টার আগেই জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে নিয়ে আসবেন।



আগামীকালের বৈঠকে জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও এই কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী, সাংসদ বীর বাহাদুর এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও এই কমিটির সদস্য মোঃ আতাউর রহমান খান কায়সার উপস্থিত থাকবেন। সাংসদ বীর বাহাদুরের নাম জাতীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে কমিটির অপর দু' সদস্য বিএনপি'র সাংসদ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম কালকের বৈঠকে যাবেন কিনা জানা জায়নি।

আগামীকালের বৈঠকে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ছাড়াও সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক ও অপর ৫ জন সদস্য ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

## অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়লো মার্চ পর্যন্ত, আবার বৈঠক পরশু

অন্যের দায় শান্তিবাহিনীর ওপর চাপানো ঠিক নয় ঃ জ্যোতিরিন্দ্র লারমা

**খাগড়াছড়ি থেকে সুনীল কান্তি দে ও মোঃ জহুরুল আলম ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফা দাবিকে পরবর্তীতে দফাওয়ারী আলোচনা ও তিন পার্বত্য জেলায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আজ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির বৈঠকটি আগামী ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। ২৪শে ডিসেম্বরের বৈঠকেই আলোচনার কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে বলেও যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

সকাল ১০টা ৫৫ মিনিট থেকে শুরু করে দুপুর ১টা পর্যন্ত একটানা ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতি দু'নেতা সার্কিট হাউসের দোতলায় এক সংক্ষিপ্ত প্রেসব্রিফিংয়ে বলেন–আজকের আলোচনা

অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা উভয়েই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমাধানে গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। জনসংহতি সমিতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমাকে রাঙ্গামাটি জেলার মাহিল্যায় ২৮ জন কাঠুরিয়া হত্যা, পানছড়ির ৯ জন কাঠুরিয়াকে অপহরণ ও গুম করা এবং সর্বশেষ বান্দরবানের থানচি থানার টিএনওসহ অন্যান্যকে অপহরণের সাথে তাদের সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সম্পৃক্ততার কথা জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন–পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক বাহিনীই বর্তমানে অবস্থান করছে–সুতরাং অন্যের দায় শান্তিবাহিনীর ওপর চাপানো ঠিক নয়। বৈঠকটি মুলতবি হওয়ার বিষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতীয় কমিটির নেতা চিফ হুইপ আবুল হাসনাত বলেন জনসংহতি সমিতি নেতা সান্টু লারমার শারীরিক অবস্থার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে–আজকের বৈঠক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। মাহিল্যা হত্যাকাণ্ড, পানছড়ির কাঠুরিয়া অপহরণ ও থানচির টিএনও অপহরণের পর এই বৈঠকটি প্রথম থেকেই উত্তপ্ত হবে বলে ধারণা করা হলেও বাস্তবে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। বৈঠকের শুরুতেই জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তাদের সংশোধিত ৫ দফা দাবিনামা জাতীয় কমিটির কাছে জমা দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২৪শে ডিসেম্বরের শুরু হওয়া মুলতবি সভাতে এই ৫ দফার অধীনস্থ দফাওয়ারী আলোচনা করা হবে। বৈঠকে সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রবিরতি লংঘনের অভিযোগ এনেছে। জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফায় সংবিধান সংশোধন ও স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ থাকার কথা আলোচনাকালে জাতীয় কমিটির এক সদস্যের আপত্তির প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতি নেতা সান্টু লারমা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বর্তমান সংবিধানের আওতায় থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা যায় বলে উল্লেখ করেন।

গতকাল সকাল ১০-১৫ মিনিটে খাগড়াছড়ি জেলার দুদকছড়ি এলাকা থেকে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে জনসংহতি সমিতি নেতারা এসে পৌছলে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও অন্য সদস্যবৃন্দ তাদের স্বাগত জানান। প্রথমে হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসেন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সান্টু লারমা। তাকে চিফ হুইপ ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে স্বাগত জানান। এরপর একে একে সমিতি নেতা রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা হেলিকপ্টার থেকে নামেন।



জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ছাড়াও কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, সাংসদ বীর বাহাদুর, সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী ও আতাউর রহমান খান কায়সার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব ও মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়কসহ অপর ৫ জন সদস্য এবং খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকশেষে হেলিকপ্টারযোগে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে আবার পৌঁছে দেয়া হয়।

**প্রধানমন্ত্রী খোঁজখবর নিয়েছেন**

বৈঠক চলাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে টেলিফোনে বৈঠকের অবস্থা জানতে চান এবং পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্য বৈঠকে উপস্থিত জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে আলোচনা চালানোর পরামর্শ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে চিফ হুইপ বিষয়টি জনসংহতি সমিতি নেতা সান্টু লারমাকে জানালে তিনি তার অসুস্থতার কথা জানান।

**সংবাদ**

**২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৬**

**পার্বত্য সমস্যা : আজ আলোচনা আবার শুরু হচ্ছে**

॥ সুনীল কান্তি দে ও মোঃ জহুরুল আলম ॥ খাগড়াছড়ি, ২৩শে ডিসেম্বর।-

আগামীকাল থেকে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে মুলতবি সভা আবার শুরু হতে যাচ্ছে। একটি সূত্র জানিয়েছে যে, উভয়পক্ষই একটানা আলাপ-আলোচনার বিষয়ে একমত।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে নির্বাচিত সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা আজ সন্ধ্যায় দুদুকছড়িতে গিয়ে পৌঁছেছেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের রাজনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে বর্তমান সংলাপ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধন্যবাদসূচক বক্তব্য এবং এ সমস্যা সমাধানে আলোচনার জন্য ঢাকায় যাওয়ার প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক আমন্ত্রণ সন্তু লারমার কাছে পৌছুবেন। উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতি নেতা বর্তমানে গুরুতর অসুস্থাবস্থায় দুদুকছড়ায়

অবস্থান করছেন। তার এ শারীরিক অবস্থায় আগামী কালের বৈঠকে যোগদান সম্ভব হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এ প্রতিনিধিকে জানান যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় তিনি অবশ্যই যোগ দেবেন। সাংসদ কল্পরঞ্জনকে দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির নেতাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছেন যোগাযোগ কমিটির অন্যতম সদস্য মথুরালাল চাকমা।

**সংবাদ**

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

আবার বৈঠক ২৫শে জানুয়ারি

**পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা**

**সমাধানের রূপরেখা**

**প্রণয়নের সিদ্ধান্ত**

**॥ খাগড়াছড়ি থেকে সুনীল কান্তি দে ও মোঃ জহুরুল আলম ॥**

২৪শে ডিসেম্বর।–আগামী ২৫শে জানুয়ারির সভাতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে গতকাল খাগড়াছড়িতে জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির আলোচনা শেষ হয়েছে। গতকালের বৈঠক শেষ হওয়ার পর এক যৌথ প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এ ঘোষণা দেন। এ সময় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) উপস্থিত ছিলেন।

আজ সকাল ১১টা থেকে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শুরু হওয়া বৈঠকটি দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে। জনসংহতি সমিতির উপস্থাপিত সংশোধিত ৫ দফার ওপর দফাওয়ারি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বৈঠকটি কয়েকদিন পর্যন্ত গড়ানোর কথা থাকলেও জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমার শারীরিক অবস্থার কারণে তা মাত্র ৩ ঘন্টার মধ্যেই শেষ করা হয়েছে। তবে আগামী ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে সমস্যা সমাধানের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা আগামী ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে।

গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখের মুলতবি সভাটি আজ পুনরায় শুরু করে এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের সম্মতিক্রমে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজের ২নং ভিআইপি রুমে প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী রুদ্ধদ্বার আলোচনা চলে। এ সময় জাতীয়



কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আ'লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে চেয়ারম্যান সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা ও রূপায়ন দেওয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা বিস্তারিত জানা না গেলেও জানা গেছে উভয়পক্ষই মনে করে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অতি দ্রুততম সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও জনসংহতি সমিতির নেতাকে অনেকটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। চিফ হুইপের পাশে বসা সন্তু বাবুকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, পার্বত্য সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে তিনি কতটুকু আশাবাদী। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দেন–অবশ্যই আশাবাদী। বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে সন্তু লারমা চিফ হুইপের বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন ঃ তার কথাতে যা বেরিয়ে এসেছে তার সাথে আমি সম্পূর্ণই একমত। বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে যে উদ্যোগ চলছে তাতে তিনি আশাবাদী কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মানুষমাত্রই আশাবাদী। বৈঠক চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে বৈঠক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খোঁজ-খবর নেয়ার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে সন্তু লারমা বলেন, আমি মনে করি তিনি এবং তার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে অবশ্যই আন্তরিক।

আগামী ২৫শে জানুয়ারির সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে জানতে চাওয়া হলে সমিতি নেতা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা তা পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে। প্রেস ব্রিফিংয়ের পর চিফ হুইপকে সমস্যা সমাধানের রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন ঃ অপেক্ষা করুন, আমরা উভয়পক্ষই সমস্যা নিরূপণ করতে যেমন সক্ষম হয়েছি, সমাধানও নিশ্চিত করে সমগ্র জাতিকে জানাতে পারবো ইনশাল্লাহ।

বৈঠকে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত ছাড়াও চট্টগ্রামের মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দীন চৌধুরী, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, সাংসদ বীর বাহাদুর, সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও শিল্পপতি আতাউর রহমান কায়সার উপস্থিত ছিলেন। জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ব্যতীত সমিতির উর্ধ্বতন নেতা গৌতম চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ

চাকমা এবং সদস্য মথুরালাল চাকমা, নকুলচন্দ্র ত্রিপুরা, মোহাম্মদ শফি, ক্যশ্যে অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা ছাড়াও ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক বৈঠকের শৃংখলা রক্ষা ও যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজি গোলামুর রহমান, মহাপরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ মোহসীন, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

**সংবাদ**
**২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৬**
সম্পাদকীয়

## পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনার প্রথম পর্যায় উভয় পক্ষের আশাবাদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। গত শনিবার এ আলোচনা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শান্তি বাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকার পক্ষের এটাই ছিল প্রথম আলোচনা।

সরকার কয়েক দশক ধরে ঝুলে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে নতুন করে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করায় সংশ্লিষ্ট সকল মহল আশান্বিত হয়েছে। সরকার দ্রুত এ শান্তি আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য আলোচনাস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম দিনের আলোচনা দু'ঘন্টা স্থায়ী হয়। তাতে জনসংহতি সমিতি তাদের 'সংশোধিত পাঁচ দফা দাবি' উত্থাপন করে। জাতীয় কমিটি এসব দাবি নিয়ে দফাওয়ারি আলোচনা করছে। প্রথম বৈঠকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত হয়। আলোচনাশেষে সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র লারমা সরকারের মনোভাবকে 'নতুন ও আন্তরিক' বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে বহুবার এ ধরনের শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট বলছে, এবারের মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা আর কখনো দেখা যায়নি। আলোচনা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী ফোনে কথা বলেছেন জাতীয় কমিটির নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে। অসুস্থ জ্যোতিরিন্দ্র লারমাকে ঢাকায় এনে চিকিৎসারও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।



পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ সময় ধরে যে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা কোন পক্ষকেই আর সন্তুষ্ট রাখতে পারছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার মধ্যে পাহাড়ীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে তিনটি পার্বত্য জেলায় শান্তি, সৌহার্দ্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরি কর্তব্যকর্ম হয়ে পড়েছে। অব্যাহত রক্তক্ষয় ও অনাচারের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হচ্ছে। সাম্প্রতিক শান্তি উদ্যোগ ও আলোচনার প্রাথমিক সাফল্য তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫শে জানুয়ারি। এই বৈঠকে সমস্যা সমাধানের একটি চূড়ান্ত রূপরেখা উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকারের আলোচনায় সমস্যা সমাধানে উভয়পক্ষের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। দীর্ঘদিনের পুরনো রক্তক্ষয়ী এ সমস্যার সমাধান হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের শান্তি ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নেরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। দু'রাষ্ট্র তার ভূভাগকে কোন জঙ্গীবাদী তৎপরতার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেবে না বলে নতুন করে অঙ্গীকার করেছে। এই অঙ্গীকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনটি পার্বত্য জেলায় সক্রিয় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপকে নিষ্ক্রিয় করাও সহজ হবে।

**সংবাদ**
**৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৬**
সম্পাদকীয়

## সুবিনয় চাকমা হত্যাকাণ্ড ও শান্তি আলোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনায় প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হতে না হতেই রক্ত ঝরলো রাঙ্গামাটি শহরে। দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হলেন সুবিনয় চাকমা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের মহাসচিব ছিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তার বাসভবনের খুব কাছেই গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

সরকার পরিবর্তনের পর নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হওয়া শান্তি আলোচনা ও অস্ত্রবিরতি চলাকালে যারাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকুক না

কেন, তারা যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এটা পরিষ্কার। অতীতেও শান্তি আলোচনা শুরুর আগে কিংবা আলোচনা চলাকালে একই ধরনের হত্যাকাণ্ড কিংবা গোলযোগ ঘটতে দেখা গেছে। এবারও সে ধরনের আশংকা কোন কোন মহল থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন বলেও খবর বেরিয়েছিল। কিন্তু সুবিনয় চাকমার হত্যাকারীদের নিবৃত্ত করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী এ ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন এবং দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সেনাবাহিনী প্রধান দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। নিহত পাহাড়ি নেতার বাসভবনে যেয়ে তার স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে তাদের জন্য সরকারি সহায়তার ঘোষণা দেন। স্থানীয়ভাবে ডাকা এক মতবিনিময় সভায় জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য যাই হোক–শান্তি আলোচনা অব্যাহত থাকবে। সেনা প্রধানও এই আশবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীও নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে চায়।

সুবিনয় চাকমা নিহত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই। এই হত্যাকাণ্ডের পর সরকারের প্রতিক্রিয়াও দ্রুত ও যথাযথ। সরকার শান্তি আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জোরদার করেছেন বলেও জানা গেছে। স্থানীয় প্রশাসনকে এখন শুধু ঐ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ধরার কাজে উদ্যোগী হলেই চলবে না, প্রতিশোধমূলক কোন ঘটনা যাতে কোন পক্ষ না ঘটাতে পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে বেশ কিছুসংখ্যক বাঙালি কাঠুরিয়া নিহত হওয়ার যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, তাতে পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের ইতিবাচক পদক্ষেপ তেমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেয়নি। সুবিনয় চাকমা হত্যাকাণ্ডের পর সরকার একই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন দেখে সবাই আশ্বস্ত হবেন বলে আমরা মনে করি।

দু'দফা শান্তি আলোচনা শেষে শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক নেতারা সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। নিরাপত্তা বাহিনী আবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। আগামী ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতির মধ্যে পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবার কথা রয়েছে তাকে সফল করে তোলার ব্যাপারে উভয় পক্ষই প্রত্যাশিত সদিচ্ছা দেখাচ্ছেন। শান্তি আলোচনা চলাকালে পার্বত্য এলাকা ঘুরে এসে দেশের এক বিশিষ্ট নাগরিক পত্রিকায় যে নিবন্ধ লিখেছেন তাতেও



তিনি এবারকার শান্তি উদ্যোগ ও আলোচনায় স্থানীয় জনসাধারণের গভীর আগ্রহ ও আস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। সুবিনয় চাকমা, পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত এক কর্মীর জীবননাশের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই সমস্যাটির দ্রুত সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

**সংবাদ**

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

## পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন বসতকারী বাঙালিরা কেমন আছেন?

**-এস এস চাকমা**

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল, তবে জেলাটির সর্বত্র উঁচুনিচু পাহাড় পর্বত এবং টিলা থাকায় চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। সেজন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলে একটি ধারা রাখা হয় যাতে কোন পরিবার ২৫ একরের বেশি জমির মালিক হতে পারবে না। উল্লেখ্য, ঐ সময় জেলার মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,২৪,৭৬২ জন। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হলে ৫৪,০০০ একর কৃষিজমি হ্রদের পানিতে ডুবে যায়। এই জমি জেলার মোট কৃষিজমির ৪০% ছিল। কৃষিজমির স্বল্পতার জন্য কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১ লাখ উদ্বাস্তুর মধ্যে মাত্র ৬০,০০০কে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়। বাকি ৪০,০০০ প্রধানত পুনর্বাসিত হতে না পেরে ভারতে চলে যায়। উল্লেখ্য, সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ১০ একর কৃষি জমি দেয়া হয় এবং একটি সরকারি আদেশ জারি করা হয় যে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাউকেও ১০ একরের বেশি কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না। বাংলাদেশ হওয়ার পরে এ জমির পরিমাণ ৫ একরে কমিয়ে আনা হয় এবং এ বিষয়ে আবার একটি নতুন আদেশ জারি করা হয়।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার একটি কানাডিয়ান কোম্পানি Forestal Forestry And Engineering International Ltd. নামে একটি কোম্পানিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি ও ভূমির ব্যবহার জরিপের জন্য নিয়োগ করেন। ঐ কোম্পানি ২ বছর জরিপ করে ৯ খন্ডে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। ঐ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ঃ ক. চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৭৭,০০০ একর অর্থাৎ ২%, খ. ফলের বাগানের জন্য উপযুক্ত ৬,৭০,০০০ একর অর্থাৎ ২১%; গ. বন করার জন্য উপযুক্ত ১,৬০,০০০ একর অর্থাৎ ৫১%, ঘ. সংরক্ষিত বন ৪,০০,০০০ একর অর্থাৎ ২৬%।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষিজমির এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়ার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩০,০০০ বাঙালি পরিবার পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রতি পরিবারকে ৫ একর পাহাড়ি জমি, ৪ একর মিশ্রিত জমি এবং আড়াই একর কৃষিজমি দেয়া হবে। তাছাড়া পরিবারপিছু এককালীন নগদ ৭০০ টাকা এবং প্রতি মাসে ২০০ টাকা ৫ মাস পর্যন্ত এবং ৬ মাস পর্যন্ত সপ্তাহে ১২ সের গম দেয়া হবে। প্রথম সিদ্ধান্তে ৩০,০০০ পরিবার পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও আসলে ৩ দফায় মোট ৮০,০০০ পরিবার অর্থাৎ প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনা হয়।

পর্যাপ্ত পরিমাণ চাষাবাদযোগ্য খাস জমি না পেয়ে অনেক ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের বন্দোবস্তিকৃত, দখলিকৃত এমন কি তাদের ফলবাগানসুদ্ধ জমি নতুন বসতিকারীদের নামে বন্দোবস্তি দেয়া হয় এবং নতুন বসতিকারীরা এসব জমি দখল করতে থাকে এবং অনেক সময় মাঠ হতে পাকা ফসল নিতে থাকে। শান্তিবাহিনী প্রথমদিকে বাঙালি পুনর্বাসনে কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু যখন দেখল যে, নতুন বসতকারীরা পাহাড়িদের জমি দখল করছে, পাকা ধান কেটে নিচ্ছে, বাগানের ফলমূলও নিয়ে যাচ্ছে তখন তারা বাঙালি বসতিকারীদের আক্রমণ করতে থাকে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নতুন বসতকারীদের সহযোগিতায় উপজাতিদের গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করতে থাকে। শান্তিবাহিনীও সুযোগ পেলেই নতুন বসতকারীদের আক্রমণ করতে থাকে। এভাবে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে শত শত উপজাতি এবং অউপজাতি হত এবং আহত হতে থাকে এবং অনেকে নিখোঁজ হয়। অনেক নতুন বসতকারী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে চলে আসতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের পথে বাধা দেয়া হয় এবং ফেরত যেতে বাধ্য করা হয়।

প্রদীপ্ত খীসার লেখা এবং সাহিত্য প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা' হতে ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিহত, আহত এবং অপহরণকৃত বাঙালিদের একটি পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলো।

| সাল | নিহত | আহত | অপহরণকৃত |
|---|---|---|---|
| ১৯৮০ | ৮৭ | ৭৫ | ৫৭ |
| ১৯৮১ | ৪২ | ২৮ | ৩ |
| ১৯৮২ | ১৬ | ২০ | ৫১ |
| ১৯৮৩ | ৮ | ৮ | ১৫ |
| ১৯৮৪ | ১০৮ | ৪৫ | ১৮ |
| ১৯৮৫ | ১১ | ১৯ | ২৫ |



| সাল | নিহত | আহত | অপহরণকৃত |
|---|---|---|---|
| ১৯৮৬ | ২৪৮ | ১১৮ | ৩৩ |
| ১৯৮৭ | ১১৭ | ৬৭ | ১৭ |
| ১৯৮৮ | ১২৮ | ৬৫ | ১৩১ |
| ১৯৮৯ | ৭২ | ১৩৮ | ২২ |
| ১৯৯০ | ৪৭ | ৩৮ | ১৮ |
| ১৯৯১ | ১২ | ৩ | ১১ |

তবে উল্লিখিত হিসাবটি খুবই রক্ষণশীল বলে মনে হয়। প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে।

উপজাতি এবং অউপজাতি ব্যাপক হারে নিহত, আহত এবং নিখোঁজ হতে থাকলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গুচ্ছগ্রাম ব্যবস্থা চালু করে। এই ব্যবস্থার ফলে নতুন বসতকারী ও বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসকারী অনেক উপজাতিকে গুচ্ছগ্রামে নিয়ে আসা হয় এবং এই গ্রামগুলো নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন বসতকারীদের গুচ্ছগ্রামে নিয়ে আসা হয় তাদের নিরাপত্তার জন্য। আর উপজাতিদের নিয়ে আসা হয় যাতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উপজাতি গ্রামে শান্তিবাহিনীর লোকজন আশ্রয় নিতে না পারে। অধিকাংশ গুচ্ছগ্রাম খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় স্থাপন করা হয়। বান্দরবান জেলায় গুচ্ছগ্রামগুলো কেবল উপজাতিদের জন্য করা হয়।

১৯৯১ সালের মে মাসে প্রকাশিত একটি বিদেশী গ্রন্থ 'Life is not ours' হতে দেখা যায় যে, কেবল খাগড়াছড়ি জেলায় নতুন বসতকারীদের জন্য ১০৯টি, ত্রিপুরা এবং মার্মাদের জন্য ৮০টি এবং চাকমাদের জন্য ১৬টি গুচ্ছগ্রাম স্থাপন করা হয়। উপজাতি গুচ্ছগ্রামগুলোতে ৬ মাস পর্যন্ত রেশন দেয়া হয়। গুচ্ছগ্রামগুলোর বাঙালি বসতকারীরা বাইরে কাজ করতে গেলে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের হামলার শিকার হয় বলে দীর্ঘদিনের জন্য তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। মাসে মাসে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হলেও গুচ্ছগ্রামের অধিবাসী উপজাতীয় হোক অথবা অউপজাতীয় হোক অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হয়। উপজাতিদের ৩/4 মাইল দূরে গিয়ে তাদের জমি চাষ করতে হয় এবং নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে থাকতে হয়। অউপজাতিরা গুচ্ছগ্রামের বাইরে কাজ করতে পারে না বলে কেবল সরকারি রেশনের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। শান্তিবাহিনীর সাথে অস্ত্রবিরতির ফলে অবশ্য এখন অউপজাতিরা বাইরে যেতে পারে। তবে তাদের মাসিক খাদ্য বন্ধ করা হয়নি।

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পরে শান্তিবাহিনীর সাথে সরকারের পুনরায় আলোচনা শুরু হয়। ভারতে অবস্থিত উপজাতিদের ফেরত আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ঐ সময় শরণার্থী এসোসিয়েশনের একটি প্রধান দাবি ছিল উপজাতি: গুগ্রামগুলো ভেঙে দেয়া। সরকার এ দাবি মেনে নেয় এবং উপজাতি গুচ্ছগ্রামগুলো ভেঙে যায়; কিন্তু নতুন বসতকারীদের জন্য স্থাপিত এখনও ৫৩টি গ্রাম রয়েছে এবং এসব গ্রামে ২৬০০০ পরিবার রয়েছে। সরকার প্রতি মাসে পরিবারপিছু ৮৮ কেজি খাদ্যশস্য বরাদ্দ করে থাকেন। একটি সরকারি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত সাহায্য এবং পুনর্বাসন খাতে মোট ৮১, ৬৮৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য খরচ হয়েছে।

গত ২৬-১১-৯৬ তারিখে 'লংগদু বাঘাইছড়ি এলাকায় নীরব দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, গত ৯ই সেপ্টেম্বর বাঘাইছড়ি থানার ২৮ জন কাঠুরিয়া হত্যার ঘটনা নিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি সম্পর্ক নাজুক হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গত ২৮শে অক্টোবর রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে এক জায়গায় অবাধে চলাফেরাসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ব্যাপারে চুক্তি হয়। তারপরও এসব এলাকার বাঙালিরা যেমন বনেজঙ্গলে গাছ, বাঁশ আহরণে যাচ্ছে না, তেমনি পাহাড়িরাও হাটবাজারে অবাধে আসছে না। ফলে কর্মসংস্থানের অভাবে লংগদু ও বাঘাইছড়ি থানার ৩৫/৪০ হাজার মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিনযাপন করছে। মাস তিনেক ধরে তারা গাছ, বাঁশ আহরণ ও মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং এলাকায় নীরব দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। পত্রিকাটির প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, এসব তথ্য প্রদান করেছেন গুলশাখাদি ইউপি চেয়ারম্যান আবু নাসির এবং বাঘাইছড়ি থানার মারিশ্যা ইউপি চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান।

উল্লিখিত বিবরণ হতে একথা স্পষ্ট যে, পুনর্বাসনের নামে আনা হলেও হাজার হাজার বাঙালি পুনর্বাসনের সুবিধা পায়নি এবং তারা এখনও জঙ্গল হতে গাছ, বাঁশ আহরণ ও মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রতিদিন শত শত লোকের বন হতে গাছ, বাঁশ আহরণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন প্রায় বনশূন্য হতে চলেছে। সরকারি নথিপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪৫২১২৪ বর্গমাইল এলাকা সংরক্ষিত এবং আধা-সংরক্ষিত বন হলেও আসলে এখন কেমন বন আছে একবার পার্বত্য চট্টগ্রাম গেলে কারো পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয় না।



ব্যাপকভাবে বন ধ্বংসের ফলে এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। বন ধ্বংসের পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে ভূমিক্ষয় হচ্ছে এবং ক্রমশ কাপ্তাই হ্রদ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতে এককালে যেসব এলাকায় নৌপথে যাতায়াত করা যেত, সেসব জায়গায় নৌপথে যাতায়াত বন্ধ হয়েছে এবং স্থলপথ না থাকায় ঐ সব এলাকায় যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়েছে এবং ঐসব স্থানে উৎপাদিত পণ্যশস্য, বিভিন্ন ফলমূল যেমন আনারস, কাঁঠাল, তরিতরকারি বিক্রি করা যাচ্ছে না। ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বিভিন্ন বন্যজন্তু যেমন: বাঘ, ভালুক, হাতি এবং অন্যান্য পশুপাখিতে ভরপুর ছিল। এমন কি এককালে হাতি ধরার জন্য খেদাও হতো; কিন্তু সেসব পশুপাখি এখন আর দেখাও যায় না। বন উজাড়ের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে এবং এখন প্রায় প্রতি বছরই কাপ্তাই হ্রদে পর্যাপ্ত জলের অভাবে গ্রীষ্মকালে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিছুদিনের জন্য হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করতে হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে জেনারেল জিয়া ৪ লাখ বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনে যে উপজাতি সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন, তাতে সমস্যাটির সমাধান না হয়ে বরং বিষয়টি আরো জটিল হয়েছে। এতে কেবল হাজার হাজার উপজাতি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয়, যাদের পুনর্বাসনের জন্য আনা হয়েছিল তারাও পুনর্বাসিত হয়নি, বরং কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সে টাকা দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যেতো। তাছাড়া এর ফলে দেশের বনজ সম্পদ এবং মৎস্য সম্পদও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের শর্ত হিসেবে জনসংহতি সমিতি ভারতে অবস্থানকারী ৬০ হাজার উদ্বাস্তু এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতরে আরো প্রায় ৫০ হাজার উদ্বাস্তুকে তাদের বাস্তুভিটাসহ জায়গাজমি ফেরত পাওয়ার দাবি করতে পারে। তাদের এ দাবি মেনে নেয়া হলে বর্তমানে ঐসব জায়গায় অবস্থানকারী হাজার হাজার নতুন বসতকারীকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং তাদেরও পুনর্বাসনের প্রশ্ন দেখা দেবে। অথচ সরকারের সম্পদ খুবই সীমিত এবং সরকারের পক্ষে এরকম বিপুলসংখ্যক উপজাতি ও অউপজাতিদের পুনর্বাসন করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এরকম অবস্থায় সরকার সকল উপজাতি এবং অউপজাতিদের নিজ নিজ জায়গায় পুনর্বাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি খুবই গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন।

## সংবাদ
৪ঠা জানুয়ারি ১৯৯৭

## পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠনের চিন্তাভাবনা

**॥ কাশেম হুমায়ুন ॥**

তিনজন জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই শান্তিবাহিনীর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। সরকার আশা করছে, শিগগিরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া বাংলাদেশ সফরের সময়ও শীর্ষ পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

শান্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কাউন্সিল গঠনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। শান্তিবাহিনীর দাবিতে এই কাউন্সিলের ওপর খাজনা আদায়সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পণের কথা বলা হয়েছে।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সরকার শান্তিবাহিনীর দাবি খতিয়ে দেখছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে তিনজন জেলা চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করছে। এই কাউন্সিলের ওপর পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে কি ধরনের ক্ষমতা দেয়া যায় তা নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত নেয়া হচ্ছে। কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে একমত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পর্যায়ক্রমে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

সূত্রগুলো জানায়, সরকার 'প্যাকেজ ডিল' হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি সই, কাউন্সিল গঠন, অস্ত্র সমর্পণ এবং ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেবে।

সরকারের হিসেব অনুযায়ী ভারতে অবস্থানকারী উপজাতীয় শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। তা বেড়ে এখন প্রায় ৪২ হাজারে দাঁড়িয়েছে।



## সংবাদ
২০শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম

## ২৫শে জানুয়ারির বৈঠকে হবে সমস্যা সমাধানের সূচনা

**॥ মনির হোসেন ॥**

আগামী দু'মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এদিকে জাতীয় কমিটি এবং শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে আগামী ২৫শে জানুয়ারির বৈঠকের স্থান ও সময় গতকাল রোববার পর্যন্ত চূড়ান্ত করা হয়নি। আজ সোমবার স্থান ও সময় চূড়ান্ত করা হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের একজন কর্মকর্তা গতকাল এ প্রতিবেদককে জানান যে, ঢাকায় বৈঠকের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির সম্মতিপত্র মাত্র শনিবার পাওয়া গেছে। জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ তিনদিন বরিশালে থাকার পর গতকাল রোববার ঢাকায় ফিরেছেন। তাকে জনসংহতি সমিতির চিঠির বিষয় অবহিত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার পর বৈঠকের স্থান ও সময় নির্ধারণ চূড়ান্ত করা হবে।

বিশেষ কার্যাদি বিভাগের এই কর্মকর্তা আরো জানান, বৈঠকের জন্য ৪/৫টি সম্ভাব্য স্থানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। তবে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা, বৈঠক যদি সন্ধ্যার পরেও চলে তাহলে তাদের প্রত্যাবর্তন অথবা ঢাকায় রাত্রিযাপন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই বৈঠকের স্থান নির্ধারণ করা হবে। আজ সোমবারই বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।

এদিকে জাতীয় কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা আশা প্রকাশ করে বলেন যে, আগামী দু'মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই আশাবাদের ভিত্তি কি জানতে চাইলে তারা বলেন, আগে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করা যায়নি। গত সরকারের আমলে প্রতিটি বৈঠকের পরও সন্দেহ থেকেই গেছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই উভয়পক্ষ খোলা মনে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'পক্ষের মধ্যে কোন ধরনের অবিশ্বাস না থাকার

কারণেই জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ঢাকায় বৈঠক করতে রাজি হয়েছেন, যা আগে চিন্তাও করা যেত না।

গত সরকারের আমলে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ছিলেন এবারও জাতীয় কমিটির সদস্য হয়েছেন এমন একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান যে, বিএনপি আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে সরকারপক্ষকে উদার মনে হয়নি। বরং সরকার কোনভাবে ত্রিপুরা থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেই বেশি সচেষ্ট ছিল। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের আলোচনাকে মনে হয়েছে শুধুমাত্র সময়ক্ষেপণ করা।

এবারের আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতির মূল দাবি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এখন মতপার্থক্য যা আছে তা হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের রূপরেখা কেমন হবে তা নিয়ে। এক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতিও তাদের দাবি থেকে কিছুটা ছাড় দেবে বলে তিনি মনে করেন। জনসংহতি সমিতি চাইছে নামে আঞ্চলিক পরিষদ হলেও কার্যত একটি ভিন্ন প্রদেশের মর্যাদায় ও ক্ষমতায় স্বায়ত্তশাসন সংবলিত পরিষদ গঠন।

জাতীয় কমিটির এই সদস্য জানান, আগামী ২৫শে জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বৈঠকে মূলত আঞ্চলিক পরিষদের রূপরেখা কেমন হতে পারে তা নিয়েই আলোচনা হবে। এছাড়া জনসংহতি সমিতি ১৯৪৭ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদেরকে সমতল এলাকায় ফিরিয়ে আনা এবং '৬০ সাল থেকে ভারতে চলে যাওয়া উপজাতীয়দেরকে ফিরিয়ে আনার যে দাবি জানিয়েছে সেটি এ বৈঠকের প্রথম দিকেই ফয়সালা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি তাদের দাবি পরিত্যাগ করার সম্ভাবনাই বেশি বলে তিনি মনে করেন। তবে এখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসতি স্থাপন এবং জমিজমা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত জনসংহতি সমিতির দাবি সরকার মেনে নেয়ার সম্ভাবনা বেশি।

উভয়পক্ষই অবশ্য বর্তমানের জেলা পরিষদ বহাল রেখে একে আরো শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক করার পক্ষে মত দিয়েছে বলেও জাতীয় কমিটির সদস্যরা জানান।



**সংবাদ**

২৪শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এসেছেন, দুদুকছড়ায় উৎসবের আমেজ

**॥ মোঃ জহুরুল আলম ॥**

**খাগড়াছড়ি, ২৩শে জানুয়ারি।-** আগামী ২৫শে জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে যোগদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আজ (বৃহস্পতিবার) খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া গ্রামে এসে পৌঁছেছেন। শান্তি বাহিনীতে কর্মরত নেতা-কর্মীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগত আত্মীয়স্বজনদের পদচারণায় প্রত্যন্ত অঞ্চল দুদুকছড়া এখন অনেকটা উৎসবের অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে ঃ জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আজ দুপুরের দিকে দুদুকছড়া এসে পৌঁছান। তাদের পৌঁছানোর আগে থেকেই গত দু'দিন ধরে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা পুরো এলাকাকে ঘিরে রাখে। জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)র শারীরিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে বলেও জানা গেছে। দুদুকছড়াতে অবস্থানরত জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন দিক দেখাশুনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির অন্যতম সদস্য মথুরালাল চাকমা ও মোহাম্মদ শফি আজ দুপুরেই দুদুকছড়ায় গিয়ে পৌঁছেছেন। তারা সেখানে বৈঠকশেষে সমিতি নেতৃবৃন্দ ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবেন।

যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ২৫শে জানুয়ারি সকালে দুদুকছড়ার হেলিপ্যাডে জাতীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ও চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানাবেন। এ সময়ে তার সাথে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ও যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা উপস্থিত থাকবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসার পথে হেলিকপ্টারে মেয়র মহিউদ্দীন, বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল এবং জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা, সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা ছাড়াও যোগাযোগ কমিটির সদস্য বান্দরবানের কৈসৈ অং মারমা ও খাগড়াছড়ির

বিশ্বজিৎ চাকমা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশীষ চাকমা থাকবেন।

বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত হবে বলে তিন পার্বত্য জেলার সর্বস্তরের মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। অনেকের মতে গঙ্গার পানি চুক্তির ন্যায় একটি জটিল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যেখানে বর্তমান সরকার সাফল্যের প্রমাণ রেখেছে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের বিষয়টিরও দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটবে। সব মিলিয়ে পার্বত্যবাসীরা ঢাকা বৈঠকের প্রতি অত্যধিক আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

**আজ জাতীয় কমিটির সভা**

এদিকে আজ বিকেল ৩টায় স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক ও সংসদের চীফ হুইপের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে কমিটির সকল সদস্যকে এ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

**সংবাদ**

২৫শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে ঢাকা বৈঠক আজ শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ শনিবার থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে রাজধানীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে আলোচনা শুরু হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দুপুরে এ আলোচনা শুরু হবে।

বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতারা আজ সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারে করে রওনা দিয়ে রাজধানীতে আসবেন। দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে তারা অতিথি ভবন পদ্মায় পৌঁছবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের মেয়র ও জাতীয় কমিটির সদস্য এবিএম মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আসবেন। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন কমিটির প্রধান সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির



পক্ষে সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। জনসংহতি সমিতির অন্য সদস্যদের মধ্যে রক্তোৎপল ত্রিপুরা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা ও সুধাসিন্ধু খীসা। এছাড়াও খাগড়াছড়ি থেকে আসবেন সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে

লিয়াজোঁ রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এবং সদস্য খৈ শৈ মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ রাজধানী থেকে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত দুদুকছড়িতে অবস্থান করবেন যোগাযোগ কমিটির অন্য দু'জন সদস্য মথুরালাল চাকমা ও মোহাম্মদ শফি।

জাতীয় কমিটির পক্ষে কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর ও ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন অংশ নেবেন বলে সংশ্লিষ্ট একজন জানিয়েছেন। এছাড়াও কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার বৈঠকে থাকবেন। তবে দলের নীতিগত কারণে বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না কমিটির সদস্য বিএনপি দলীয় সাংসদ আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম। বিএনপি'কে না জানিয়েই তাদেরকে সদস্য করার কারণে দল থেকে বৈঠকে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে কমিটির অপর সদস্য জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী বর্তমানে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। ফলে তিনিও বৈঠকে অংশ নিতে পারছেন না।

আজকের বৈঠক উপলক্ষে জাতীয় কমিটি গতকাল বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগে এক বৈঠক করে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, মূলত আজকের বৈঠকের প্রস্তুতি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠক টানা কয়েকদিন চলবে বলে জানা গেছে। এই হিসেবেই সকল প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির নেতারা অতিথি ভবন পদ্মাতেই রাত্রিযাপন করবেন।

উল্লেখ্য, এটি হবে বর্তমান সরকারের আমলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে তৃতীয় দফা বৈঠক। এর আগে ডিসেম্বর মাসে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে দু'দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

## সংবাদ

## ২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : জেএসএস-জাতীয় কমিটির ঢাকা বৈঠক শুরু

### সমস্যা সমাধানের পথেই এগিয়ে যাবো : সন্তু লারমা

### সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা করছি : আবুল হাসনাত

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে তৃতীয় দফা বৈঠক গতকাল শনিবার রাজধানীতে শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের আলোচনাশেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে উভয়পক্ষের প্রধানগণ আলোচনা সফল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কমিটির উপনেতা জানিয়েছেন যে, দেশের বর্তমান সংবিধানের আওতায়ই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

গতকাল দুপুর দেড়টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় প্রথম আলোচনা শুরু হয়। এতে জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। এছাড়াও বৈঠকে জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, আতাউর রহমান খান কায়সার, আলী হায়দার খান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের মহাপরিচালক মুবাইদুল ইসলাম অংশ নেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমার নেতৃত্বে রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা বৈঠকে অংশ নেন। জাতীয় কমিটিকে সহায়তা দেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের মহাপরিচালক মুবাইদুল ইসলাম ও খাগড়াছড়ি জেলার ডিসি মোঃ ইসমাইল। দুপুর আড়াইটার দিকে আলোচনার স্থান পরিবর্তন করে পার্শ্ববর্তী অতিথি ভবন মেঘনায় নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় ইফতারের আগেভাগে আলোচনা মূলতবি করা হয়। আলোচনা আজও চলবে।

আলোচনাশেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা বলেন যে, আন্তরিক পরিবেশে দু'পক্ষের



মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার ফল সম্পর্কে তারা আশাবাদী কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষই আশাবাদী। চলতি আলোচনাও সমস্যা সমাধানের দিকেই এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আগামী কতদিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে- এ প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা হেসে বলেন যে, যত শিগগিরই সমস্যার সমাধান করা যাবে ততই ভাল।

গত সরকারের আমলে গঠিত কমিটির সঙ্গে আলোচনা এবং বর্তমান কমিটির সঙ্গে আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করছেন কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা হেসে ফেলেন। পাশ থেকে জাতীয় কমিটির উপনেতা মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার ফলেই জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসতে রাজি হয়েছেন। ঢাকায় থেকে চিকিৎসার জন্য সন্তু লারমার প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা প্রস্তাবের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, এখন তার কোন চিকিৎসার দরকার পড়ছে না। ঢাকায় অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে এখনো কিছু জানেন না বলে জবাব দেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। দু'পক্ষই আলোচনায় সমঝোতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি আলোচনার বিষয়বস্তু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, চূড়ান্তভাবে আলোচনা শেষ হলেই জাতি সকল কিছু জানতে পারবে। আজ সকাল ১০টায় একই স্থানে আবার আলোচনা শুরু হবে।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাতীয় কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি ও মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী আলোচনা যেভাবে চলছে তাতে অচিরেই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

একটি সূত্রে জানা গেছে, গতকালকের বৈঠকে আলোচনা মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার ওপরই নিবদ্ধ ছিল। সরকারিপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। সূত্রটি আরো জানায়, সরকারপক্ষ বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় থেকেই সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ সংবিধান সংশোধন করতে হলে সরকার আন্তরিক হলেও সংসদে সে ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিএনপি সমর্থন না দিলে সমস্য দেখা দেবে। সরকারপক্ষ এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি

অনুরোধ জানিয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এই দফায় যতদিন আলোচনা চলবে ততদিন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় থাকবেন।

এর আগে গতকাল সকালে জাতীয় কমিটির উপনেতা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ির ডিসি মোঃ ইসমাইল জনসংহতি সমিতির নেতাদের আনার জন্য হেলিকপ্টার নিয়ে দুদুকছড়ি যান। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়িতে পৌঁছানোর জন্য এর আগে সেখানকার সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এর ৮টি ছাউনি প্রত্যাহার ও ৫টি ছাউনি নিষ্ক্রিয় করা হয়। মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও সমিতির অন্য চারজন সদস্য এবং যোগাযোগ কমিটির দু'জন সদস্যকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দুপুর ১২টা ১৪ মিনিটে তাদেরকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি তেজগাঁও-এর পুরনো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এখানে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমাকে স্বাগত জানান জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। পরে চিফ হুইপের পতাকাবাহী গাড়িতে করে সন্তু লারমা, মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের দিকে রওনা দেন। তারা দুপুর ১২টা ৩৩ মিনিটে অতিথি ভবন মেঘনায় প্রবেশ করেন। কালচে রঙের সাফারি পরিহিত সন্তু লারমাকে দেখাচ্ছিল একেবারেই সাদাসিধা এবং স্বাভাবিক।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের আগমন এবং রাত্রি যাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা ও মেঘনার চারপাশে গত শুক্রবার থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। দুই অতিথি ভবনের চারদিকেই সশস্ত্র পুলিশ পাহারা বসানো হয়। জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার দিকটি দেখাশোনা করছে ঢাকার মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

কালকের বৈঠকে জনসংহতি সমিতির অন্যতম ঊর্ধ্বতন নেতা সুধাসিন্ধু খীসা আসেননি। জনসংহতি সমিতির 'উগ্রপন্থী' বলে পরিচিত এই নেতা কেন আসেননি এটা জানার আগ্রহ ছিল অনেকেরই। তার অনুপস্থিতির বিষয়টি জানতে চেয়ে সাংবাদিকরা যখন সন্তু লারমাকে প্রশ্ন করেন তিনি বিষয়টির ব্যাপারে কোন সরাসরি উত্তর না দিয়ে শুধু একথাই বলেন- আমাদের প্রতিনিধিদলে আগে যে ৫ জন ছিলাম তারা এখনো আছি।

**একজন ডাক্তার :** কাল দুদুকছড়ি থেকে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে জনসংহতি সমিতির যে পাঁচজন নেতা ঢাকায় এসেছেন তাদের মধ্যে একজন ডাক্তারও রয়েছেন। তার নাম হচ্ছে ডাঃ বাবুল। জানা গেছে, এই ডাক্তারই জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। ধারণা করা হচ্ছে পরপর কয়েকদিন ঢাকায় থাকতে হবে এটা ধারণা করেই এই ডাক্তারকে সন্তু লারমার সফরসঙ্গী করে নিয়ে আসা হয়েছে।



**সংবাদ**

২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে ঢাকা বৈঠক

**আলোচনা আজ শেষ হতে পারে**

**চূড়ান্ত কোন ঘোষণা এখনই নয়**

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকারের গঠিত জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর নেতাদের মধ্যে রাজধানীতে আলোচনা চলছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টা থেকে রাত প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের আলোচনা চলে। সন্ধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিং-এ জাতীয় কমিটির উপনেতা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী জানান, আলোচনা মোটামুটি একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তিনি বর্তমান বৈঠকেই সমঝোতায় আসা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। জনসংহতি সমিতির কেউ প্রেস ব্রিফিং-এ আসেননি। গতকাল সকাল ১০টায় বৈঠক শুরু হয়ে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলে। মাঝখানে নামাজ এবং দুপুরের খাবারের বিরতি দিয়ে বেলা আড়াইটায় আবার বৈঠক শুরু হয়। সন্ধ্যায় ইফতার পর্যন্ত বৈঠক চলে। এ সময় বৈঠকে জাতীয় কমিটির প্রায় সকল সদস্য এবং শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন জনসংহতি সমিতির ৪ জন নেতা অংশ নেন। জাতীয় কমিটির সদস্য বিএনপি'র ২ জন সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের ফলে এবং জাতীয় পার্টির ১ জন সাংসদ অসুস্থ থাকার কারণে বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন না।

সন্ধ্যায় ইফতারের পর জাতীয় কমিটির ৩ জন এবং জনসংহতি সমিতির ৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। জাতীয় কমিটির পক্ষে ছিলেন কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার। জনসংহতি সমিতির পক্ষে ছিলেন সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), গৌতম চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান। আজ সোমবার সকালে আবার আলোচনা শুরু হবে। জানা গেছে, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আজই রাজধানী থেকে চলে যেতে আগ্রহী। এজন্যেই গতকাল রাত পর্যন্ত আলোচনা চালানো হয়। সূত্রটি আরো জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা কম।

সন্ধ্যায় প্রেস ব্রিফিং-এ জাতীয় কমিটির উপনেতা মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী বলেন, জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবির বিপরীতে সরকারের পক্ষ থেকেও দফাওয়ারি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ দফা নিয়ে আলোচনা চলছে তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সকল সমস্যা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত কোন কিছু বলা যাবে না। তিনি আরো বলেন, 'আলোচনায় আমরা মোটামুটিভাবে একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।'

সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে যে, গতকাল বৈঠকে ভূমির মালিকানা, উপজাতীয়দের অধিকার রক্ষায় জনসংহতি সমিতির দাবি সাংবিধানিক গ্যারান্টি এবং আঞ্চলিক পরিষদের রূপরেখার ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। সূত্রগুলো জানায়, এই তিনটি বিষয়েই উভয় পক্ষ সমঝোতার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কিংবা অন্য কোন বিষয়ে বর্তমান সরকার এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না– এ বাস্তবতা জনসংহতি সমিতি মেনে নিয়েছে। ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি মালিকানার জমির পরিমাণ নিয়ে মতভেদও দূর হয়েছে। বৈঠকে জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দেয়ার মনোভাব দেখিয়েছে বলেও জানা গেছে। জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক সরকারের অনুরূপ আইনসভা সংবলিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবি জানিয়ে আসছিল; কিন্তু প্রথমবারের মতো গতকাল বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এব্যাপারে নমনীয়মনোভাব দেখিয়েছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান বৈঠক থেকে সমাধানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন চূড়ান্ত ঘোষণা না আসার সম্ভাবনাই বেশি। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আজকেই খাগড়াছড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছেন। তারা জনসংহতি সমিতির কংগ্রেস ডেকে সেখানে সরকারের সঙ্গে তাদের বৈঠক নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসতে পারে। বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, আজ দু'পক্ষের মধ্যকার আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি প্রত্যাহার ও সেনাবাহিনী সরিয়ে আনার বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।



**সংবাদ**

**২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৭**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : ঢাকা বৈঠক শেষ, জেএসএস নেতারা ফিরে গেছেন

## কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতা

## আবার বৈঠক ১২ই মার্চ

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের রূপরেখা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ঘোষণা ছাড়াই গতকাল সোমবার রাজধানীতে সরকারের জাতীয় কমিটি ও শান্তি বাহিনীর মধ্যকার তিন দিনব্যাপী আলোচনা শেষ হয়েছে। তবে ঢাকার এই বৈঠকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। শান্তি বাহিনীর নেতৃবৃন্দ গতকাল বিকেলেই ফিরে গেছেন খাগড়াছড়ির দুদুকছড়িতে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আগামী ১২ই মার্চ আবার বৈঠক হবে। তবে বৈঠকের জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। গতকাল বেলা আড়াইটায় রাজধানী ত্যাগের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনার গেটে এক সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিং-এ শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং জাতীয় কমিটির নেতা সংসদের হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, তিনদিন ধরে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে গেছে তা জানতে চাইলে চিফ হুইপ বা সন্তু লারমা কেউই কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সকল বিষয়ে মোটামুটি সমঝোতা হয়ে গেছে কিনা তা সন্তু লারমার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরবর্তী আলোচনার আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না। এ সময় তারা জানান যে, আগামী ১২ই মার্চ আবার ৪র্থ দফা বৈঠক হবে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় অতিথি ভবন মেঘনায় তৃতীয় দিনের আলোচনা শুরু হয়ে বেলা দেড়টা পর্যন্ত চলে। গতকালও আগের দিনের সন্ধ্যার মতো দু'পক্ষ থেকে ৩ জন করে আলোচনায় অংশ নেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত মোট ৬ জনের এই আলোচনায় জাতীয় কমিটির নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান অংশ নেন। ঢাকা থেকে রওনা দেয়ার আগে চিফ হুইপ একা প্রায় ২০ মিনিট শান্তি বাহিনীর ৩ জনের সঙ্গে কথা বলেন। বিকেল ২টা ৪০ মিনিটে সন্তু লারমা ও তার ৩ জন সহযোগী অতিথি ভবন থেকে সরাসরি

তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দরে গিয়ে হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ি রওনা দেন। তাদের সঙ্গে যান আতাউর রহমান খান কায়সার।

কয়েকটি সূত্র জানায়, উপজাতীয়দের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক গ্যারান্টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুনর্বাসিত বাঙালিদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসার বিষয় দু'টিতে সরকারপক্ষ এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে দূরত্ব প্রায় আগের মতই রয়ে গেছে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের রূপরেখা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক পরিষদের ভূমি ব্যবহারের ক্ষমতা সম্পর্কে উভয়পক্ষ সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছুলেও পুরোপুরি মতৈক্য হয়নি। তবে আঞ্চলিক পরিষদ তথা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর নিয়ন্ত্রণে কি কি বিষয় থাকবে, সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাউনি প্রত্যাহার করা, কাপ্তাই বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ভবিষ্যতে আঞ্চলিক পরিষদের অনুমোদন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয়ার মতো বিষয়গুলোতে উভয়পক্ষের মধ্যে মোটামুটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

জনসংহতি সমিতি সাংবিধানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ তাদের অধিকার যাতে ভবিষ্যতেও কখনো ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা না থাকে এজন্য সেখান থেকে পুনর্বাসিত বাঙালিদেরকে সরিয়ে আনার দাবিতে মোটামুটি অটল রয়েছে। সরকারপক্ষ আবারও সংবিধান সংশোধনে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদে সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছে। এছাড়া বাঙালি প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সরকারপক্ষ প্রস্তাব দেয় যে, যারা ইতিমধ্যে সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত পেয়ে জমির মালিক হয়েছে তারা সেখানেই থাকবে, যারা অবৈধভাবে জমি দখল করে রেখেছে তাদেরকে এবং যারা বন্দোবস্ত পেয়েও জমি অব্যবহৃত রেখেছে সে বন্দোবস্ত বাতিল করে তাদেরকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

বৈঠক সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতির নেতারা এসব বিষয়ে সরকারপক্ষের প্রস্তাবগুলো শুধুমাত্র লিখে নিয়েছেন। সরকারি প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই জানাননি। এসব বিষয়ে জনসংহতি সমিতির নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, ১২ই মার্চের বৈঠক রাজধানীতে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।



**সংবাদ**

**২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৭**

ঢাকা বৈঠক থেকে ফিরে দুদুকছড়িতে সন্তু লারমা

## সরকারের কাছে দেয়া ৫ দফা থেকে আমরা সরে আসিনি

**জহুরুল আলম ॥ দুদুকছড়ি (পানছড়ি), ২৭শে জানুয়ারি।**– শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন যে, জনসংহতি সমিতি আগে সরকারের কাছে দেয়া ৫ দফা দাবি থেকে পিছপা হয়নি। আজ বিকেলে রাজধানী থেকে ফিরে দুদুকছড়িতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন। বিকেল সাড়ে ৪টায় পানছড়ির সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে অপেক্ষমাণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ঢাকার বৈঠকে কোন প্রকার চুক্তি বা চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়নি। বর্তমান সরকার আলোচনায় আন্তরিকতা দেখিয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

সন্তু লারমা বক্তৃতাকালে বলেন, আমরা সরকারের কাছে সংশোধিত ৫-দফা উপস্থাপন করেছি এবং এ দফা থেকে আমরা এখনও পিছপা হইনি। তিনি বলেন, সংশোধিত ৫-দফায় জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণের বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে।

সন্তু লারমা উপজাতীয় সমাবেশে জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। তিনি সকলকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান। ঢাকায় ৩দিনব্যাপী বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে তিনি বলেন, বৈঠকে ভূমি, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও পুনর্বাসিত বাঙালিদের বিষয়ে আলোচনা করেছি। তবে আমরা কোন প্রকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়নি। আলোচনা আগামী ১২ই মার্চ আবারও বসবে বলে সমাবেশে তিনি জানান।

সমাবেশ থেকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, বৈঠক আবার কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? এর উত্তরে জেএসএস নেতা লারমা বলেন, বৈঠক কোথায় হবে তা আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যমে ঠিক করা হবে। তবে আগামী ১২ই মার্চ বৈঠক আবারও হবে।

সমাবেশে প্রথমেই উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ঢাকার তিনদিনের বৈঠক সম্পর্কে ও বিগত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত বৈঠক সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা গৌতম চাকমা ব্যাখ্যা দেন। গৌতম চাকমা বলেন, আমরা এরশাদ সরকারের আমলে প্রাদেশিক সরকার দাবি করেছি। তা থেকে ছাড় দিয়ে এখন আমরা সংশোধিত ৫ দফার মাধ্যমে আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠনের দাবি রেখেছি।

তিনিও জুম জনগণের সার্বিক সহযোগিতার কথা তুলে ধরে দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সমাবেশে জে,এস,এস চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ও গৌতম চাকমা দু'জনেই চাকমা ভাষায় বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী পুরুষরা পায়ে হেঁটে, চাদের গাড়ি (জীপ) যোগে সমাবেশে যোগ দেন।

গতকাল বেলা সোয়া ৪টায় পানছড়ির দুদুকছড়ির বিডিআর ক্যাম্পের কাছে ঢাকা থেকে সরাসরি জে,এস,এস নেতাদের নিয়ে হেলিকপ্টার অবতরণ করে।

হেলিপ্যাড থেকে শান্তি বাহিনীর ক্যাডারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিতে বেশ কয়েকজন কমান্ডার, স্যালুট দিয়ে জে,এস,এস নেতা সন্তু লারমাসহ অন্যদের নিয়ে আসেন। এ সময় অপেক্ষমাণ জনতা তাদের নেতাকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

পায়ে হেঁটে জে, এস, এস নেতা যখন তাদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলেন তার শত শত জনতাও তার সঙ্গে যান। এ সময় জনতার উদ্দেশে সন্তু লারমা হাত নেড়ে অভিবাদন জানান।

পরে দুদুকছড়ি থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' গজ দূরে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে জনতার উদ্দেশে সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় যোগাযোগ কমিটির মথুরা লাল চাকমা ও কৈশ অং মারমাও জে, এস, এস নেতাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১০ই মার্চ ১৯৯৭

**ত্রিপুরা থেকে চাকমা শরণার্থীরা দেশে আসবে ২৮শে মার্চ থেকে প্রথম পর্যায়ে ফিরবে ৫ হাজার**

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থানরত পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থীরা আগামী ২৮শে মার্চ থেকে দেশে ফেরা শুরু করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে যৌথভাবে গতকাল রোববার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে ৫ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদল ৪ দিনের ত্রিপুরা সফরশেষে গতকালই ঢাকায় ফিরে এসেছে। জানা গেছে যে, জাতীয়



কমিটি গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রথম দফায় ত্রিপুরা সফরে গিয়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ২০ দফা প্রস্তাব ঘোষণা করে। শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ২০ দফার মধ্যে ২টি দফা সংশোধন এবং শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনকে সংশ্লিষ্ট করার দাবি জানান। শরণার্থীদের পক্ষ থেকে যে দু'টি দফা সংশোধনের দাবি জানানো হয় সেগুলো হচ্ছে পুনর্বাসিত শরণার্থীদের গরু কেনার জন্য ৮ হাজার টাকার পরিবর্তে ২০ হাজার টাকা প্রদান এবং পুনর্বাসিতদেরকে ৬ মাসের পরিবর্তে ১ বছর রেশন প্রদান করা।

জাতীয় কমিটি প্রথম দফায় ঢাকা ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরণার্থীদের দাবি নিয়ে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনর্বাসিতদের অর্থ সহায়তা ও রেশন প্রদানের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত দেন। তবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনকে সংশ্লিষ্ট করার দাবি নাকচ করে দেয়া হয়। সরকারের এই প্রস্তাব নিয়ে জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ছোট আকারের একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ই মার্চ দ্বিতীয় দফায় ত্রিপুরা সফর করে। প্রতিনিধিদলটি সেখানকার শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আবারো আলোচনায় সরকারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। এতে পুনর্বাসিত শরণার্থীদেরকে গরু কেনা বাবদ ৮ হাজার টাকার পরিবর্তে ১৫ হাজার টাকা এবং ৬ মাসের বদলে ৯ মাস রেশন দেয়ার কথা বলা হয়। শরণার্থী নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাব মেনে নেন।

দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনায় ঠিক হয় যে, প্রথম ব্যাচে ৫ হাজার শরণার্থী দেশে ফেরার পর শরণার্থী কল্যাণ সমিতির একটি প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দেখে যাবে। প্রতিনিধিদলটি সরকারের পুনর্বাসন কাজে সন্তুষ্ট হলে পর্যায়ক্রমে সকল শরণার্থীর দেশে ফিরে আসার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

জাতীয় কমিটির সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় ত্রিপুরা সফরকারী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মোবাইদুল ইসলাম গতরাতে জানান, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন কাজের সার্বিক বন্দোবস্ত করার জন্য খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম ব্যাচের ৫ হাজার শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ৮ থেকে ১০ দিন লাগতে পারে বলে তিনি জানান। শরণার্থীরা খাগড়াছড়ির রামগড় দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে ফিরবে বলেও জানা গেছে।

ত্রিপুরার ৬টি শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীর সংখ্যা সম্পর্কে সরকার এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির মধ্যে খুব একটা মতপার্থক্য নেই বলে জানা গেছে।

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ এ সংখ্যা ৫০ হাজার বলে দাবি করছেন। সরকারপক্ষ এ সংখ্যা ৫০ হাজারের নিচে বলে জানাচ্ছেন। তবে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনায় ঐকমত্য হয়েছে যে, শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ত্রিপুরার জেলা প্রশাসকের কাছে শরণার্থীদের তালিকা দেবে। বাংলাদেশ পক্ষও একটি তালিকা প্রণয়ন করবে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে কাজ করবেন। দুই জেলা প্রশাসক এই তালিকা অনুযায়ী প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নেবেন। তবে কারো নাম সরকার পক্ষের তালিকায় না থাকলে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির তালিকায় থাকা নাম যাচাই করে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য যে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছে এর মধ্যে রয়েছে শরণার্থীদের জায়গা-জমি ফেরত দেয়া, যদি জায়গা-জমি ইতিমধ্যে অন্যের নামে লিজ দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সে লিজ বাতিল করে পুনর্বাসিত বাঙালিদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া, শরণার্থীদেরকে প্রয়োজনমত নতুন জমি লিজ দেয়া, তাদের পুরনো কোন ক্ষুদ্র ঋণ যেমন কৃষি ঋণ থাকলে তা মওকুফ করা, চাকরি-বাকরিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যাবাসিতদেরকে সুযোগ দেয়া, ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য বাংলাদেশে বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি। একটি সূত্রে জানা গেছে, ত্রিপুরায় অবস্থানরত চাকমা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজে সরকারের প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

**সংবাদ**

**১২ই মার্চ ১৯৯৭**

## পার্বত্য সমস্যা : ৪র্থ দফা বৈঠক আজ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আজ বুধবার থেকে রাজধানীতে সরকারি পক্ষ ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে চতুর্থ দফা শান্তি আলোচনা শুরু হচ্ছে। একটি সূত্রে জানা গেছে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি ফিরিয়ে আনতে কিছুতেই রাজি হবে না। শান্তি আলোচনায় সরকার পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং শান্তিবাহিনীর পক্ষে এর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) নেতৃত্ব দেবেন।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের সেখানে বসবাসের অধিকার সংরক্ষণের দাবিতে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাতে



ইসলামীর সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ এবং বসতি স্থাপনকারীদের সংগঠন পার্বত্য গণপরিষদ আজ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে।

জানা গেছে, তিনটি পার্বত্য জেলায় হরতাল আহ্বানের ব্যাপারে জাতীয় কমিটির সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা একে শান্তি আলোচনায় বাধা সৃষ্টির জন্য বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্র বলেও আখ্যায়িত করেছেন বলেও জানা গেছে। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই দফার আলোচনায় সরকারের পক্ষ থেকে নতুন কোন প্রস্তাব দেয়া হবে না। বরং সরকারের আগের দেয়া প্রস্তাব সম্পর্কে শান্তি বাহিনী নেতৃবৃন্দের মতামত জানতে চাওয়া হবে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুনর্বাসিত বাঙালিদের প্রত্যাবাসন প্রশ্নে সরকার কোনরকম ছাড় দেবে না। অর্থাৎ পুনর্বাসিতদেরকে সমতলভূমিতে ফিরিয়ে আনতে সরকার রাজি হবে না।

জানা গেছে, জাতীয় কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি আজ সকালে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারে করে শান্তি বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আসবেন। এজন্য দুদুকছড়িতে সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এর কয়েকটি ক্যাম্প প্রত্যাহার ও নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। জানা গেছে, সন্তু লারমার সঙ্গে শান্তি বাহিনীর নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরা, অশোক চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান আসবেন। গত দফার বৈঠকে সুধাসিন্ধু খীসা না আসলেও এবার তার আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আসবেন সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ বাবুল চাকমা, সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ চাকমা ও কৈশ্যয়ং মারমা। জাতীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিএনপির সাংসদ আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়হিদুল আলম আগের তিনবারের মত এবারও বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না। জাতীয় কমিটির উপ-প্রধান চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী আজ বৈঠকে থাকছেন না। প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম সফরের কারণে তিনি আজ চট্টগ্রামেই থাকছেন। কমিটির সদস্য জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী অসুস্থতার কারণে তৃতীয় দফা আলোচনায় অংশ নিতে না পারলেও এবার যোগ দেবেন। এছাড়া প্রথমবারের মতো আলোচনায় যোগ দেবেন জাতীয় কমিটিতে কয়েকদিন আগে অন্তর্ভুক্ত এস এস চাকমা। উল্লেখ্য, আগে তিনি এ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য ছিলেন।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে সেখানকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে ৩ জেলায় হরতাল আহ্বান সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজ-খবর নেবেন।

**সংবাদ**
**১৩ই মার্চ ১৯৯৭**

## সরকার ও শান্তিবাহিনীর আলোচনা : কয়েকটি বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে

'পার্বত্য জেলায় হরতাল শান্তি বিনষ্টকারীদের কাজ'

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গতকাল বুধবার রাজধানীতে সরকারপক্ষ ও শান্তি বাহিনীর মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। একটি সূত্রে জানা গেছে যে, গতকালের বৈঠকে কোন পক্ষই নতুন কোন প্রস্তাব দেয়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ে উভয় পক্ষে মতৈক্য হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। তবে বিষয় তিনটি জানাতে সূত্র অপারগতা জানান। দু'পক্ষই নিজেদের আগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করে। তবে উভয়পক্ষই শান্তি আলোচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বানকে শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়াকে বিনষ্টকারী মহলের কাজ হিসেবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে। গতকাল দুপুর থেকে রাত সোয়া ৮টা পর্যন্ত বৈঠক হয়েছে। আজ আবার আলোচনা শুরু হবে। তবে আলোচনা আজই শেষ হতে পারে। শান্তি আলোচনায় সরকারপক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং শান্তি বাহিনীর পক্ষে এর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। একটি সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির কাছে সরকারি প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বসতি স্থাপনকারী বাঙালি প্রত্যাহার ও স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক পরিষদের দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন। এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সকল পর্যায় থেকে মতামত নিয়েই এ দাবি করা হচ্ছে।

জাতীয় কমিটির উপ-প্রধান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজধানীতে পৌঁছেই বৈঠকে যোগ দিতে আসেন। জাতীয় কমিটির সদস্য বিএনপি দলীয় দু'জন সাংসদ গতকালও বৈঠকে যোগ দেননি। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমার সঙ্গে ছিলেন সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। শান্তি বাহিনীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত হার্ড লাইনার



হিসেবে পরিচিত সুধাসিন্ধু খীসা রাজধানীতে অনুষ্ঠিত আগের বৈঠকে আসেননি। এবার আসেননি রূপায়ণ দেওয়ান। জানা গেছে যে, খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর নিরাপত্তার বিষয়-আশয় দেখাশোনার জন্যই রূপায়ণ দেওয়ান সেখানে রয়ে গেছেন। এছাড়াও সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে লিয়াজোঁ রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ চাকমা ও কৈস্যয়ং মারমা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আশিস চাকমা ও সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডঃ বাবুল চাকমা ঢাকায় আসেন।

গতকাল সকাল ১১টার দিকে জাতীয় কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি সন্তু লারমা ও অন্যদেরকে নিয়ে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় রওনা হন। বেলা সোয়া ১২টার দিকে তারা ঢাকায় পুরনো এয়ারপোর্টে অবতরণ করলে জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় আসেন ও পৌনে ১টার দিকে বৈঠক শুরু করেন। পৌনে ২টার দিকে প্রায় সোয়া ১ ঘন্টা বিরতি দিয়ে বেলা ৩টায় আবার বৈঠক শুরু হয়। রাত ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত টানা এ বৈঠক চলে। আজ সকাল ১০টায় একই স্থানে আবার আলোচনা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম গতকাল এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল পক্ষকে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করার এবং কোন উস্কানিতে পা না দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা সরকারকে জাতিগত সংখ্যালঘুদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে সবদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

**সংবাদ**
**১৪ই মার্চ ১৯৯৭**

সরকার-শান্তিবাহিনী ঢাকা বৈঠক শেষ হয়েছে

## পুনর্বাসিতদের প্রত্যাহার প্রশ্নে মতৈক্য হয়নি : আবার বৈঠক ৩০ এপ্রিল

**মনির হোসেন ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুনর্বাসিত বাঙালিদেরকে প্রত্যাহার প্রশ্নে কোন ঐকমত্য ছাড়াই গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যকার ৪র্থ দফা আলোচনা শেষ হয়েছে। তবে এই ইস্যুটি ছাড়া অন্য সব ইস্যুতে দু'পক্ষ প্রায় মতৈক্যে পৌঁছার মত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামে আগামী ৩০শে জুন

পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ৩০শে এপ্রিল পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে একমত হয়েছে। শান্তি বাহিনীর নেতৃবৃন্দ আজ শুক্রবার খাগড়াছড়ি ফিরে যাবেন।

একটি সূত্র থেকে জানা গেছে যে, গতকাল সমাপ্ত আলোচনায় শান্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে ৩টি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পরিষদগুলোর বিদ্যমান আইনে ৫টি সংশোধনী আনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সরকারপক্ষ এই প্রস্তাব বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছে।

গতকাল রাত ৮টায় আলোচনাশেষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং শান্তি বাহিনীর মূল সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা সাংবাদিকদেরকে অতি সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দেন। আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, 'অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। আমরা একমত হয়েছি, আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ৩০শে এপ্রিল পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।' সন্তু লারমা এ সময় বলেন, 'আমাদের বক্তব্যও এটাই।' সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে যে, জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন প্রশ্নে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের আভাস দিয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল যে, ৩টি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ ৩টি জেলা পরিষদের কাজে সমন্বয় এবং তদারক করবে। সূত্রটি জানায়, গতকাল সমাপ্ত বৈঠকে জনসংহতি সমিতি জেলা পরিষদগুলোর বিদ্যমান আইন সংশোধন করে ভূমির মালিকানাসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে ক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূত্রটি জানায়, অধিক শক্তিশালী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশিরভাগ বিষয়ে প্রায় নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণক্ষমতাসম্পন্ন স্থানীয় সরকার পরিষদ চাচ্ছে জনসংহতি সমিতি। এতে করে স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক পরিষদের পরিবর্তে সমন্বয় পরিষদ এলেই চলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া পুনর্বাসিত বাঙালিদের প্রত্যাহার প্রশ্নে জনসংহতি সমিতি তাদের দাবি পুনরায় উত্থাপন করে প্রস্তাব দেন যে, সকল পুনর্বাসিতকে একবারে না হলেও পর্যায়ক্রমে ফিরিয়ে এনে সমতলভূমিতে পুনর্বাসন করতে পারে।

অপর একটি সূত্র জানায়, জাতীয় কমিটি পরবর্তী বৈঠক ৩০শে এপ্রিলের আগেই করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ



নিজেদের মধ্যে আলোচনা এবং পরবর্তী বৈঠকের পর্যাপ্ত সময়ের জন্য নিজেরাই বৈঠকের তারিখ জানায়।

গতকাল প্রথমে সকাল সাড়ে ১০টায় আলোচনা শুরু হয়ে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত চলে। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর বিকেল সোয়া ৪টায় আবার আলোচনা শুরু হয়ে ৮টায় শেষ হয়। আজ সকাল ৯টায় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়ির উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে করে রওয়ানা দেবেন বলে জানা গেছে।

জাতীয় কমিটির পক্ষে গতকাল আলোচনায় অংশ নেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আতাউর রহমান খান কায়সার, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, এডভোকেট ফজলে রাব্বি এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, বীর বাহাদুর এমপি ও আলী হায়দার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে অংশ নেন সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও গৌতম চাকমা।

**সংবাদ**

**১১ই মে ১৯৯৭**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

**বৈঠক বসছে ঢাকায়**

**হরতাল তিন জেলায়**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের জাতীয় কমিটির মধ্যে আজ ৪র্থ বৈঠক শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকায়। পার্বত্য জেলাগুলোতে আজ বিএনপি হরতাল ডেকেছে।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) যথাক্রমে জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দেবেন। খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চল দুদুকছড়া থেকে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে সকাল ১০টায় জনসংহতির নেতারা ঢাকায় আসবেন। একই হেলিকপ্টারে থাকছেন চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ইসমাইল হোসেন।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে গত বৈঠকে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। পূর্বের আলোচিত দাবিগুলো ছাড়াও জনসংহতি সমিতির নতুন দাবি ৪ জন পাহাড়িকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হবে।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছেন, এ বৈঠকে কোন রকম চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চুক্তি হতে আরো কমপক্ষে ৩টি বৈঠকের প্রয়োজন হবে। সূত্র জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আরো তিন মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হতে পারে।

এবারের বৈঠক হবে ৩ দিন। দুদুকছড়া থেকে ঢাকায় পৌঁছানোর পর জনসংহতি সমিতির নেতারা দুপুরের আহার সম্পন্ন করে বৈঠকে বসবেন। বিকেল ৩টা নাগাদ এ বৈঠক শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে।

আজ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বিএনপিপন্থী পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করেছে। এই সংগঠন ৭ দফা দাবি পূরণের দাবিতে এ হরতাল করছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আমাদের খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জহুরুল আলম জানিয়েছেন, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা সার্বিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য খাগড়াছড়িতেই অবস্থান করবেন।

হরতালের সমর্থনে গতকাল খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

**সংবাদ**

**১২ই মে ১৯৯৭**

জনসংহতির সঙ্গে জাতীয় কমিটির বৈঠক

**থানছির ঘটনা ও শান্তিবাহিনীর সদস্য গ্রেফতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত**

**॥ সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের জাতীয় কমিটির ৪র্থ বৈঠক গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয়েছে। গত ১২-১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকের ফলাফলের আলোচনা ছাড়াও এ বৈঠকে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বলে বৈঠকের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছেন।

সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চল দুদুকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারযোগে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে সমিতির নেতারা ঢাকায় এসে পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানান চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি।

বিশ্রামের পর বৈঠক শুরু হয় দুপুর ২টা ২০ মিনিটে। জাতীয় কমিটির পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জ, স, স'র পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) নেতৃত্ব দেন। বিকেল ৫টায় খানিক বিরতির পর দু'পক্ষের মধ্যে তিনজন তিনজন করে একটি একান্ত



বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দু'পক্ষে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। জনসংহতি সমিতির নেতা যথাক্রমে সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা ও সুধাসিন্ধু খীসা। ৪ ঘন্টা স্থায়ী এ বৈঠকে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে জানা গেছে, আজকের বৈঠক আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পূর্বে গত বৈঠকের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জনসংহতি কমিটি নেতৃবৃন্দ বান্দরবানের থানছি থানার সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেন এবং অস্ত্রবিরতিকালীন সময়ে শান্তিবাহিনী সদস্যদের গ্রেফতারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। জানা গেছে, সরকারি কমিটির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অস্ত্র-বিরতির শর্ত সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়।

একই সূত্রমতে, আজকের বিকেল বেলার বৈঠকে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের সংশোধনী বিষয়ে জনসংহতি সমিতির উত্থাপিত দাবি নিয়েই আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে, তৃতীয় বৈঠকের পরপরই সরকারের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির আনীত সংশোধনীর ব্যাপারে লিখিত মতামত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং জনসংহতি সমিতি তার উপর যে লিখিত মন্তব্য আগে নিয়ে এসেছে সে বিষয়গুলোই আজকের বৈঠকে প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি তাদের দাবি পূর্বের ন্যায় বারবার উত্থাপন করেছে বলেও জানা গেছে।

আজকের বিকেলের বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও শিল্পপতি আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু লারমা), গৌতম চাকমা ও সুধাসিন্ধু খীসা উপস্থিত ছিলেন।

রাত ৯টায় গতকালের মত বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকশেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় আবার বৈঠক শুরু হবে। চিফ হুইপ বলেন, বৈঠকে গত বৈঠকে আলোচিত ইস্যু ছাড়াও অন্য অনেক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা খুব ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বিকেলে খানিক বিরতির পর পুনরায় বৈঠক শুরু হলে সরকার পক্ষের ৩ জন এবং জনসংহতি সমিতির ৩ জন মিলে একান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৪ ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছে তা জানাতে চিফ হুইপ অপারগতা প্রকাশ করেন। মিটিংয়ের স্থায়িত্ব কতদিন হবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তা বলা কঠিন। এটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এক রাত কিংবা দু'রাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না।

শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পাহাড়ি নেতাদের প্রতিক্রিয়া কি এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকারের গৃহীত শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জনসংহতির নেতারা খুশি। সেটেলার ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে জনসংহতি নেতারা কোন অভিযোগ করেনি।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতালের ব্যাপারে চিফ হুইপের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এ হরতাল কেন ডাকা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের যে ধোয়া তোলা হয়েছে তা সত্যি নয়। যারা হরতাল করেছেন তারা কি চান তা দেশবাসী সহজেই বুঝতে পারছেন। তারা অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চান না।

আজকের বৈঠকে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ছাড়াও কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ, পার্বত্যাঞ্চলের তিন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার ও বীর বাহাদুর, জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী, শিল্পপতি আতাউর রহমান খান কায়সার, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান ও কমিটির নব মনোনীত সদস্য প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব এস, এস চাকমা। এছাড়া স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক যোবায়দুল ইসলাম ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান ছাড়াও সমিতির উর্ধ্বতন নেতা গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

এ সময়ে তাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ চাকমা ও ক্যসৈ মং মারমা এবং স্বেচ্ছাসেবক শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশীষ চাকমা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**সংবাদ**

**১৩ই মে ১৯৯৭**

জনসংহতির সঙ্গে জাতীয় কমিটির বৈঠক

## দু'পক্ষই সমঝোতার ব্যাপারে আশাবাদী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চলমান বৈঠক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিগগিরই সমঝোতায় পৌছানো যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন দুই পক্ষের দুই নেতা।



পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির চলমান চতুর্থ বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে গতকাল রাত ৮টা ২০ মিনিটে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে উপরের কথাগুলো বলা হয়। কথাগুলো পড়ে শুনিয়েছেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং সন্তু লারমা এতে সমর্থন দেন। গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় পদ্মায় এ বৈঠক শুরু হলে গত রোববারের মতো একইভাবে তিনজন করে ছয়জনের একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ একান্ত বৈঠকে গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা এবং সন্তু লারমা জ, স, স'র পক্ষে এবং জাতীয় কমিটির পক্ষে আতাউর রহমান খান কায়ছার, কল্পরঞ্জন চাকমা এবং চিপ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। দুপুরের বিশ্রামের তিন ঘন্টা বিরতির পর পুনরায় একইভাবে ৬ জনের একান্ত বৈঠক চলতে থাকে। এবং এ বৈঠকের স্থায়িত্ব হয় রাত ৮টা পর্যন্ত। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটা থেকে দু'পক্ষের ৬ জনের মধ্যে পুনরায় বৈঠক শুরু হবে।

অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আজকের বৈঠক চললেও স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তন আনার বিষয়টিই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মতে গত ১২ ও ১৩ই মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকেই জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে সংশোধনী আকারে এই সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-এর সংশোধনী ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(১), ২৭, ২৮(১), ২৮(৩), ২৯(১) ও ৩৬ ধারা যাতে লংঘিত না হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি রেখেই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইনের যে সমস্ত ধারায় সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছে সেগুলো হচ্ছে, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে আকস্মিক পদশূন্যতা, পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময় পরিষদ বাতিল, পরিষদের তহবিল গঠন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ... কর্তৃক আরোপনীয় কর, জেলা পুলিশ, ভূমি হস্তান্তরে বাধা নিষেধ, উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান, প্রবিধান প্রণয়নে ক্ষমতা, ক্ষমতা অর্পণ, পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য বিষয়ক ধারা।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, আজ বৈঠক শেষ নাও হতে পারে। বৈঠকের মেয়াদ আরো দুই কিংবা একদিন বাড়তে পারে বলে একই সূত্রে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সংবাদ

১৪ই মে ১৯৯৭

জনসংহতির সঙ্গে জাতীয় কমিটির বৈঠক

## জেলা পরিষদ অবকাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা

॥ **সুনীল কান্তি দে/সাগর সারওয়ার** ॥ জেলা পরিষদের অবকাঠামোকে নতুনভাবে গড়ে তোলা এবং এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটির মধ্যে চলমান সংলাপের ৪র্থ দফা বৈঠকের তৃতীয় দিনের আলোচনা গতকাল রাত ৮টা পর্যন্ত চলেছে। বৈঠক আজও চলবে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় বৈঠক শুরু হলে আগের মতই ৩ জন করে ৬ জনের বৈঠক চলতে থাকে। এ বৈঠকে দুপুরের খাবার ও বিশ্রামের বিরতি হয় এবং আবার শুরু হয় বিকেল সাড়ে ৪টায়।

দু'পক্ষের দু'দল নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সন্তু লারমার মধ্যে গতকাল সকালে তাদের সোমবারের বৈঠকে আলোচিত হওয়া বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা চলতে থাকে।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ভূমি এবং সেটেলার প্রশ্নে উভয় পক্ষই সমাধানের ব্যাপারে কাছাকাছি অবস্থান করছেন। তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের অবকাঠামো নিয়ে ভবিষ্যতে কোন 'আমলাতান্ত্রিক জটিলতা' হবে কিনা সে ব্যাপারে জনসংহতির দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা চালাচ্ছে জাতীয় কমিটি।

বিশেষত তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-এ তিন জেলার জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে সচিবের দায়িত্ব পালনের বিধান রয়েছে। সচিব হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যক্রম কি হবে তা স্পষ্টত উল্লেখ না থাকায় পরিষদগুলো গত ৮ বছর যাবৎ যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংহতি সমিতি ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বলে জানা যায়।

যে কারণে গত দু'দিনের আলোচনায় তারা আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদে প্রেষণে আগত সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা কি হবে সে ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, গত দু'দিন ধরে স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ও জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের কাগজপত্র সরবরাহের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন।



অন্য এক সূত্র থেকে জানা যায়, জনসংহতি সমিতি প্রণীত আঞ্চলিক পরিষদের গঠন প্রণালী কেমন হবে সে ব্যাপারে সমিতির নেতৃবৃন্দ জাতীয় কমিটির কাছে তাদের প্রস্তাব পুনরায় ব্যক্ত করেছে।

জেলা পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় ও অউপজাতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান জনসংখ্যা অনুপাতে নির্ধারিত হবে কিনা জানা যায়নি। তবে আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি অউপজাতীয়দের জন্য নির্ধারণ করে তাদের যে প্রস্তাব দিয়েছিল সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে নতুন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

ভূমি অধিকার সম্পর্কিত যে আলোচনা বর্তমানে উভয়পক্ষে চলছে সেখানে জনসংহতি সমিতি জেলা পরিষদের ক্ষমতা বেশি রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে ভূমি সম্পর্কিত যে ধারা রয়েছে তাতে ভূমি বন্দোবস্তি ও ভূমি প্রশাসনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে জনসংহতি সমিতি বৈঠকে জানিয়ে দিয়ে ভূমি সার্ভেসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমকে পরিষদের আওতায় আনার দাবিতে অনড় অবস্থান নিয়েছে।

বৈঠক আজও সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হবে। বৈঠকের মেয়াদ আর একদিন বাড়ল কেন এ ব্যাপারে বৈঠকের একজন উচ্চ পর্যায়ের সদস্য জানান, যেহেতু আলোচনা এখনো শেষ হয়নি, আলোচনার স্বার্থেই সময় বাড়ানো হবে। আগামীকালও আলোচনা চলবে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সেটা নির্ভর করবে আজকের বৈঠকের উপর। বৈঠকে অবস্থানকারী অন্য একটি সূত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসংহতি নেতাদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ সম্পর্কিত কোন খবরের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

গতকাল সমিতির পক্ষে সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও সন্তু লারমা এবং জাতীয় কমিটির পক্ষে আতাউর রহমান খান কায়সার, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

### এরশাদ খোঁজ-খবর নিচ্ছেন

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও সাংসদ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চলমান ৪র্থ বৈঠকের ফলাফল জানতে চেষ্টা করে চলেছেন। জাতীয় কমিটির একজন সাংসদ (যিনি একজন উপজাতীয়)কে নাকি এরশাদ এই বলে প্রশ্ন করেছেন যে, বৈঠকের অবস্থা কি? তিনি আরো বলেছেন, ১৯৮৯ সালে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা সময়ের অভাবে শেষ করতে পারেননি। তিনি এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সফলতাও কামনা করেছেন।

## সংবাদ
## ১৫ই মে ১৯৯৭
## পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্য, ৩০ জুনের মধ্যে চুক্তি

জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতির বৈঠক ■ শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত হচ্ছে

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠকে উভয়পক্ষ সকল বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ দফা বৈঠকের চতুর্থ দিনে তারা এই মতৈক্যে পৌঁছেন। জানা গেছে, বৈঠকে জনসংহতি সমিতি সংবিধান পরিবর্তন করে পাহাড়ি জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত দাবি ছেড়ে দিয়েছেন। এছাড়া শান্তিবাহিনী বিলুপ্তকরণ, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেয়া, স্থানীয় সরকার পরিষদে পাহাড়িদের আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে দু'পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছে। এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জনসংহতি পূর্বতন দাবি ১৯৪৭ সালের পর সেখানে বাঙালি অভিবাসীদের ফেরত নেয়ার দাবি থেকেও সরে এসেছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন এবং প্রথমবারের মতো জনসংহতি নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় জাতীয় কমিটির বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। এরশাদ আমলে জনসংহতির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে বিএনপি আমলে কয়েক দফা বৈঠক হলেও সীমিত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ব্যতীত কোন সমঝোতা হয়নি।

গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় চলমান বৈঠকের ৪র্থ দিনের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি। বিকেল ৩টায় এ বৈঠক শুরু হয়। পূর্বের মতো তিনজন তিনজন মুখোমুখি এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), সুধাসিন্দু খীসা ও গৌতম চাকমা। জাতীয় কমিটির পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার উপস্থিত ছিলেন।

গত চারদিনের বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের মূল দাবিগুলোর বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিয়েই আলোচনা করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, বৈঠকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে জাতীয় কমিটি জ,স,স'র দাবিগুলো কি করে বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছে। গত



মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটায় উভয় পক্ষ আলোচনায় একমতে পৌঁছে বলে জানা যায়।

সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি তাদের পাঁচদফা মূল দাবি থেকে অনেক বড় ছাড় দিয়েছে। পাহাড়ি জাতিগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার যে দাবি জ,স,স এতোদিন করে এসেছিল, তা থেকে তারা সরে এসেছে। এ বৈঠকের প্রথম দিকেই জ,স,সকে জানানো হয় আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সাংবিধানিক গ্যারান্টি দিতে গিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ সংবিধান পরিবর্তন করতে বিরোধীদল বিএনপি'রও সমর্থন লাগবে। এরপর জ,স,স'র নেতারা সংসদে পাহাড়ি জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকারপূর্বক সাধারণ একটি আইন পাস করার কথা উল্লেখ করে। জাতীয় কমিটি এ ব্যাপারে রাজি হলে সমঝোতার সবচেয়ে বড় বাধা অপসারিত হয়।

সূত্র জানান, আজকের বৈঠকে 'সংসদের তিনটি আসন পাহাড়িদের জন্য রিজার্ভ' রাখার যে প্রস্তাব জ,স,স'র ছিল তারও প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছেন জনসংহতি নেতারা। বরং তারা সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদসমূহ পাহাড়িদের জন্য রিজার্ভ থাকার কথা বললে জাতীয় কমিটি সে দাবি মেনে নিয়েছে।

সেটেলার প্রশ্নেও জনসংহতি ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে তাদের সরিয়ে নেয়ার জন্য যে দাবি তুলেছিল তা থেকে সরে এসেছে। বৈঠকে তারা জাতীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে জানিয়েছে, ১৯৮৭-র পর সরকার যাদের সেখানে অভিবাসী করেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি সূত্র জানান, সেনাবাহিনীকে চুক্তি সম্পাদনের পরই ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে তাদের প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত করা হবে। শান্তিবাহিনীর নেতাদের পুনর্বাসিত করার যাবতীয় প্রস্তাব দেয়া হয়েছে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে।

জনসংহতি নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজ দেখা করবেন কিনা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

এছাড়া ভূমি প্রসঙ্গে জাতীয় কমিটি পাহাড়িদের ভূমি ফিরিয়ে দেয়ার যে আশ্বাস দিয়েছে তাও মেনে নিয়েছে জনসংহতি সমিতির নেতারা।

সরকার কবে জনসংহতির সঙ্গে চুক্তি করবে তা স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও এটা নিশ্চিত যে, ৩০শে জুনের আগেই সম্পাদন করা হবে। এই চুক্তি সম্পাদন করার জন্য জনসংহতি এবং জাতীয় কমিটি পৃথক দু'টি চুক্তিপত্র আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি বৈঠকে উপস্থাপন করবে। এ

মাসের শেষের দিকে এ বৈঠক ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হবে। তবে কারা এ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তা জানা যায়নি। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছেন, যেহেতু আগামী ৩০শে জুন যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হবে, ঐদিনই চুক্তি হতে পারে। চুক্তি ঢাকাতেই সম্পাদন হবে বলে এ সূত্র জানিয়েছেন।

চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অতি শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পর তাকে বৈঠকের সব বিষয় জানানোর পর পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি বলেন, যখন চুক্তি হবে, তখনই কেবল তা প্রকাশ করা হবে। পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এ বৈঠকটিই ছিল শেষ বৈঠক। শান্তি বাহিনীর দাবি মেনে নেয়া হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে চিফ হুইপ জানান, চুক্তি সম্পাদনের পরই তা জানতে পারবেন।

কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি জানান, খুব শিগগিরই চুক্তি সম্পাদন হবে। সব দাবি মেনে নেয়া হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি কিছুই বলেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে খুব শিগগিরই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতারা দেখা করবেন বলে কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি জানিয়েছেন।

**সংবাদ**

**১৩ই জুলাই ১৯৯৭**

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা

## কাল ঢাকায় শুরু হচ্ছে ৫ম বৈঠক

**॥ সাগর সরওয়ার/সুনীল কান্তি দে ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৫ম বৈঠকটি আগামীকাল ১৪ই জুলাই ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত হবে। তবে বর্তমান খারাপ আবহাওয়ার কারণে বৈঠকটি পিছিয়ে যেতে পারে বলে সরকারের উচ্চপদস্থ এক সূত্র জানিয়েছেন।

এবারের বৈঠকে ৩টি পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ নিয়ে চলমান আইনগত জটিলতার প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে। যদি বৈঠকটি বৃষ্টির কারণে বিঘ্নিত না হয় তাহলে একনাগাড়ে তিনদিন বৈঠকটি চলবে বলে সূত্র জানিয়েছেন।

আগামীকালের এ বৈঠকে সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। অন্যদিকে জনসংহতির পক্ষ্যে নেতৃত্ব দেবেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। জাতীয় কমিটির অন্য সদস্য



যারা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তারা হলেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, জাতীয় পার্টির এডভোকেট ফজলে রাব্বী এমপি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান ও প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব শরদিন্দু চাকমা। কমিটির অন্য দুই সদস্য বিএনপি দলীয় সাংসদ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ বৈঠকে যোগ দেবেন কিনা জানা যায়নি। জনসংহতির অন্যান্য উচ্চপদস্থ নেতার মধ্যে থাকবেন গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা।

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এবারের বৈঠকে মূলত আলোচনা হবে ৩ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নিয়ে। বর্তমানে হাইকোর্টে রিট আবেদনের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়েই এবারের বৈঠকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে যোগদানের জন্য গতকাল শনিবার বিকেল নাগাদ জনসংহতির অগ্রবর্তী দলটি খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ির দুদুকছড়ায় এসে পৌঁছেছেন বলে জানা গেছে। তাদের শনিবার সকালে আসার কথা থাকলেও পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির কারণে তারা সময়মতো দুদুকছড়ায় এসে পৌঁছাতে পারেননি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি নেতা ও সাবেক সাংসদ আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার দাখিল করা ১৯৮৯ সালের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ২০-এর ৪ ও ৫ নং ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার ফলে আদালত কর্তৃক যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে এ বৈঠকে আলোচনা করা হতে পারে।

**সংবাদ**

**১৪ই জুলাই ১৯৯৭**

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রতিষ্ঠা

## ৫ম বৈঠক আজ শুরু হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫ম বৈঠক আজ ঢাকায় শুরু হচ্ছে। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে এ বৈঠকে

দু'পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চুক্তি হতে আরো দু' একটি বৈঠকের দরকার হবে।

আজকের বৈঠকে মূলত গত মে মাসে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বৈঠকে দু'পক্ষ চুক্তির ব্যাপারে যেসব খসড়া তৈরি করেছিল সেগুলো নিয়েই আলোচনা করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) যথাক্রমে দু'পক্ষের নেতৃত্ব দেবেন। জাতীয় কমিটির পক্ষে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়ছার, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব শরদিন্দু চাকমা এবং চার সাংসদ যথাক্রমে কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর, দীপংকর তালুকদার এবং এডভোকেট ফজলে রাব্বি। জনসংহতির পক্ষে থাকবেন গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা।

**সংবাদ**

**১৫ই জুলাই ১৯৯৭**

**পার্বত্যাঞ্চলে**

**শান্তি : ৫ম**

**বৈঠক শুরু**

॥ **সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার** ॥ সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ৫ম বৈঠক গতকাল সোমবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয়েছে।

গতকালের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থা, পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

দু'পক্ষের বৈঠকে নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। বৈঠকে জাতীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান, প্রাক্তন



অতিরিক্ত সচিব শরদিন্দু চাকমা। কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী বিকেলে 'পদ্মায়' আসেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আবার বাইরে চলে যান। সাংসদ বীর বাহাদুর অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। খাগড়াছড়ির ডিসি মোঃ ইসমাইল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। স্পেশাল এফেয়ার্স-এর সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা ও সুধাসিন্ধু খীসা।

গতকাল দু'পক্ষের মধ্যে বৈঠক শুরু হয় বিকেল ৩টায়। জনসংহতি সমিতির নেতারা খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চল দুদুকছড়া থেকে হেলিকপ্টারে উঠেন সকাল সাড়ে ১০টায়। হেলিকপ্টারে তাদের সঙ্গে ছিলেন আতাউর রহমান খান কায়সার এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন। ঢাকায় তাদের স্বাগত জানান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি।

গতকালের বৈঠক হয়েছে দু'দফায়। প্রথমে বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এবং পরে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত। প্রথম দফায় সরকারি কমিটির দু'জন সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও এমপি বীর বাহাদুর ছাড়া অন্য সকলেই এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে তাদের চেয়ারম্যান ও অপর ৪ জনই উপস্থিত ছিলেন।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এ বৈঠকের শুরুতেই জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চান। উত্তরে সরকারি কমিটি এবারের শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে। এ সময় সরকারি কমিটি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার আগে ভারতের ত্রিপুরার আগরতলায় উপজাতীয় শরণার্থীদের নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ও সরকারি কমিটির নেতা চিফ হুইপ আবুল হাসনাতের মধ্যে ২০ দফা চুক্তি সম্পাদনের যাবতীয় তথ্যও জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। জানা গেছে, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ২০ দফা বাস্তবায়ন কমিটির গত ১৩ই জুলাইয়ের ঢাকার সাংবাদিক সম্মেলন ও কিছুদিন আগে খাগড়াছড়িতে একই সংগঠনের পক্ষ থেকে যে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাও এই বৈঠকে আলোচিত হয়। এর জবাবে সরকারি কমিটির পক্ষ থেকে একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয় যে, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে আন্তরিক। অতএব এই সমস্যার সমাধানে প্রতিশ্রুতির কোন হেরফের করা হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে

উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে পার্বত্যাঞ্চলের সাংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে যে একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে তাও বৈঠকে জানানো হয় সরকারি কমিটির পক্ষ থেকে। অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দফা বৈঠকের আলোচনাকে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা বলে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা মন্তব্য করেছেন। একই সূত্র জানিয়েছে, এই বৈঠকে সরকারি কমিটির নেতা চিফ হুইপ ও অন্য সদস্যরা আলোচনায় অংশ নিলেও জনসংহতি সমিতির পক্ষে শুধুমাত্র তাদের চেয়ারম্যানই অংশ নেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দু'পক্ষের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আতাউর রহমান খান কায়সার। জনসংহতি সমিতির তিন নেতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা।

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মূলত গত ৪র্থ বৈঠকে দু'পক্ষের মধ্যে যে পাঁচ দফা ঐকমত্য হয় তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এ আলোচনা হয় বলে সূত্র জানিয়েছেন। সূত্র জানান, এ বিষয়গুলো হচ্ছে ভূমির উপর পাহাড়িদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তিন পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট বাদে সকল সেনা ছাউনি প্রত্যাহার, খাস জমিতে সেটেলারদেরকে বসবাস করতে সুযোগ দেয়া, আঞ্চলিক পরিষদের জনসংহতি সমিতির নেতাদের কর্তৃত্ব প্রদান পাহাড়ি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। জনসংহতি নেতারা সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি করেছে বলে জানা গেছে। সূত্র জানান, দু'পক্ষের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে এ আলোচনা আবার শুরু হবে আজ সকালে। রাত পৌনে নয়টায় স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, আগামীকালও এ বৈঠক চলবে। এ বৈঠকের ব্যাপারে কোন প্রেস ব্রিফিং দেয়া হয়নি।

**সংবাদ**

**১৬ই জুলাই ১৯৯৭**

পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি : বৈঠক আজও চলবে

## চুক্তির খসড়া নিয়েই আলোচনা হচ্ছে, চূড়ান্ত হতে সময় লাগবে

**সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বর্তমান সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৫ম বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে চুক্তির খসড়া নিয়ে আলোচনা



চলছে। গতকালের বৈঠক শেষ হওয়ার পর রাত পৌনে ৯টায় জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এক প্রেস ব্রিফিং-এ জানিয়েছেন, 'খসড়া চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে।' এ সময় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) উপস্থিত ছিলেন। গতকালও প্রথম দিনের মত রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দু'পক্ষের মধ্যে। গতকাল বৈঠক শুরু হয় সকাল সোয়া এগারটায়। দুপুর আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বিরতির পর বৈঠক পুনরায় শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। উভয়পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। দু'পক্ষে অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় কমিটির কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আতাউর রহমান খান কায়সার। অন্যদিকে জন সংহতির গৌতম চাকমা ও রুপায়ন দেওয়ান এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সকালে শুরু হওয়া এ বৈঠকে মূলত শান্তি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন। এবারে বৈঠকে যে সমস্ত বিষয় খসড়ায় লেখা হয়েছে তা বারবার সংশোধন চলছে।

সূত্র জানান, দু'পক্ষের মধ্যে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা নিয়ে দরকষাকষি হচ্ছে। সেনাবাহিনী প্রশ্নে বর্তমান সরকার তাদের আগের অবস্থানে থাকার কথা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছে। দু'পক্ষই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এভাবে আলোচনা চলতে থাকলে কোন সমাধান আসবে না। শিগগিরই একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করা দরকার। দু'পক্ষ এ নিয়ে বিভিন্ন মহলের চাপের কথা গতকাল উল্লেখ করেছেন। এ বৈঠকে যে খসড়া সম্পাদন করা হয় তার স্থায়ী রূপ পেতে আরো একটি বা দু'টি বৈঠকের প্রয়োজনের কথা দু'পক্ষই স্বীকার করেছে। বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছেন, আজ দুপুর নাগাদ এ বৈঠক শেষ হয়ে যেতে পারে।

অপর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তির খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই সরকার বিভিন্ন প্রস্তাব রাখছে। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি নেতারাও চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যগুলো যেন ভবিষ্যতে কোন আইনগত জটিলতার মুখোমুখি না হয়ে পড়ে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখে গতকালের বৈঠকে কথাবার্তা বলেছেন। জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে বর্ণিত জেলা পুলিশ গঠন ও পুলিশের দায়িত্ব এবং পরিষদসমূহে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা কি হবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা যাতে চুক্তিতে উল্লেখ করা

হয়- সে ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি বার বার অনুরোধ করেছেন। উক্ত সূত্র মতে- যেহেতু জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার পদে তিন পার্বত্য জেলার বাইরের লোকজনরা নিয়োজিত থাকবেন সেহেতু তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সমিতি নেতৃবৃন্দ সর্বদাই সন্দেহ প্রকাশ করে আসছেন। এ ব্যাপারে সমিতির সন্দেহ দূর করতে সরকারের পক্ষ থেকে বাস্তবানুগ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকাল বৈঠক শেষে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিং-এর স্থায়িত্ব ছিলো মাত্র ৩০ সেকেন্ড। এ অর্ধ মিনিটের প্রেস ব্রিফিং-এ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, জনসংহতি সমিতির নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরা, যোগাযোগ কমিটির বিশ্বজিৎ চাকমা এবং স্বেচ্ছাসেবক শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশিষ চাকমা।

**সংবাদ**

**১৬ই জুলাই ১৯৯৭**

**পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি : দু'পক্ষই কাছাকাছি এমন বিষয় আসছে খসড়া চুক্তিতে**

**সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দিতে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫ম দফা বৈঠকের ৩য় দিন গতকাল বুধবার অতিবাহিত হয়েছে। গতকালের বৈঠকে চুক্তির খসড়া বিষয়গুলোর আইনগত দিক খতিয়ে দেখতে দু'পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। আলোচনায় স্থান পেয়েছে ভূমি, স্থানীয় সরকার পরিষদ সেনাবাহিনী ও বাঙালি অভিবাসী।

রুদ্ধদ্বার এ বৈঠকে উভয়পক্ষের ৩ জন করে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন। জাতীয় কমিটির নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) নিজ নিজ দলের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সূত্র জানান, পার্বত্য জেলাগুলোতে সেনাবাহিনী ও অভিবাসীদের অবস্থান সম্পর্কে জনসংহতি সমিতি তাদের পূর্ব অবস্থান থেকে এখনো সরে আসেনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান জনসংহতির নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেছেন জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ।



বৈঠকে জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ যে সকল বিষয়ে কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করছেন, সেগুলোকে খসড়া চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছেন।

গতকালের বৈঠক শুরু হয় সকাল সোয়া এগারটায়। বৈঠক চলে দুপুর দুটো পর্যন্ত। মধ্যাহ্ন বিরতির পর টানা ৪ ঘন্টা বৈঠক চলে শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। গতকালের বৈঠকেও পূর্বের মতো তিন জন করে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জনসংহতির রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, জাতীয় কমিটির সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়ছার উপস্থিত ছিলেন। আজ বৈঠক শুরু হবে সকাল সোয়া এগারটায়। গতকাল কোন প্রেস ব্রিফিং হয়নি।

**সংবাদ**

**২০শে জুলাই ১৯৯৭**

**পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি ॥ ৫ম বৈঠক শেষ হলো চেকপোস্ট প্রত্যাহার, আঞ্চলিক পরিষদ গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে**

**॥ সুনীল কান্তি দে/ সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তি প্রণয়নের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যের মধ্য দিয়ে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক, জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৫ম দফা বৈঠক গত শুক্রবার শেষ হয়েছে।

গতকাল শনিবার সমিতির নেতারা দুদুকছড়া ফিরে গেছেন। এর আগে শনিবার সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে একটি যৌথ প্রেস ব্রিফিং-এ জাতীয় কমিটির প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া সন্তোষজনক। পরবর্তী বৈঠকের দিন যোগাযোগের মাধ্যমে ঠিক করা হবে।' এ সময় জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) উপস্থিত ছিলেন। ৫ দিন স্থায়ী এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতির দাবি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও বর্তমান স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে অধিকতর শক্তিশালীকরণের ব্যাপারে দু'পক্ষই মতৈক্যে পৌঁছেছে। এছাড়া পার্বত্য জেলাগুলোর বিভিন্ন স্থান থেকে সেনা ছাউনি (চেক পোস্ট) প্রত্যাহার, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে পরিষদের কর্তৃত্ব, পাহাড়ি শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে যথাযথ

পূনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে উভয়পক্ষই ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছেন।

সূত্র জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির পূর্বে যে ৪টি বৈঠক হয়েছে, তাতে যা আলোচনা হয়ে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করা হলেও, তাতে দু'পক্ষের কোন সই ছিল না। ফলে দু'পক্ষই তাদের সিদ্ধান্তগুলো থেকে বার বার সরে এসেছে। এবারের বৈঠকে চুক্তির ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্তে দু'পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছেছে সে সিদ্ধান্তগুলোতে দু'পক্ষই সই দিয়েছে।

সূত্র জানিয়েছেন, শান্তি চুক্তি সই হতে একটি বৈঠকের প্রয়োজন হবে। আগামী আগস্ট মাসে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিষয়ে হাইকোর্টে যে চারটি রিট দাখিল করা হয়েছে, সেগুলোর নিস্পত্তি হওয়ার পরই শান্তি চুক্তি সই হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন।

শনিবারের প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত সন্তু লারমাকে কিছু বলতে বলা হলে তিনি বলেন, আপাতত আমার কিছু বলার নেই। যা বলার তা তিনিই (আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ) বলেছেন। চুক্তির প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তিনি সন্তুষ্ট কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন উত্তর দেননি।

এবারের বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, সরকার জনসংহতি সমিতির দাবি অনুযায়ী বর্তমানের তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করা ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে সম্মত হয়েছে। তবে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে সমহারে প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদের গঠনপদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর গঠনপ্রণালী অনুসরণ করা হবে অর্থাৎ পাহাড়ি ও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। একই সূত্র আরো জানিয়েছেন, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি উপজাতীয়দের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। একই নিয়ম তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় দরকার পরিষদের ক্ষেত্রেও বজায় থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পূর্ণমন্ত্রীর পদমর্যাদা পাবেন কিনা সে বিষয়টি দেশের বাকি ৬১টি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের পদমর্যাদা নির্ধারণের উপর নির্ভর করবে। সরকার এ বৈঠকে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যক্রম বর্তমানের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে বোর্ডের বর্তমান কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে এটিকে কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে বলেও এবারের জনসংহতি সমিতিকে অবহিত করে লিখিতভাবে জানিয়েছে সরকার। তবে তিন পার্বত্য



জেলায় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে স্থানীয় সরকার পরিষদে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে জনসংহতির দাবির উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট মতামত এবারও দেয়া হয়নি। পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রশ্নে সরকারকে ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থিত সকল শরণার্থীকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আরো তৎপর হওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতি চাপ সৃষ্টি করলে সরকার যত দ্রুত সম্ভব সকল শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের সম্মতি জানিয়েছে। এ লক্ষ্যে আগামী ২৮শে জুলাই সরকারের যে দলটি ভারতের ত্রিপুরা যাচ্ছে তারা এ ব্যাপারে যথাযথ কাজ করবে বলে সরকার জনসংহতির নেতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জনসংহতির নেতারা পাহাড়ি শরণার্থী সমিতির সঙ্গে সরকারের যে ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি হয়েছিল বা সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা তলিয়ে দেখতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে বলে সূত্র জানায়।

বহুল প্রতীক্ষিত ভূমি অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে দু'পক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, 'ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর'। তাই এ ব্যাপারে আগামী বৈঠকে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। জনসংহতি সমিতি সাংবিধানিকভাবে পাহাড়ি জাতিগতসত্তার গ্যারান্টির ব্যাপারে পূর্বে যে দাবি তুলেছিল তা সরকারের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে লিখিতভাবে জনসংহতি সমিতিকে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে, বর্তমান সরকারের পক্ষে অভিবাসী বাঙালিদেরকে তিন পার্বত্য জেলা থেকে সরানোও সম্ভব নয়। তবে তাদের জন্য সরকারি খাস জমি দেয়ার ব্যাপারে জাতীয় কমিটি মত প্রকাশ করেছে। জনসংহতি সমিতি এ দুটো ব্যাপারে আপাতত কিছুই জানায়নি।

সেনা ছাউনি প্রত্যাহারের প্রশ্নে সরকারের বক্তব্য হলো তিন পার্বত্য জেলায় অশান্ত পরিবেশ যদি বজায় না থাকে তাহলে সেনা ছাউনিগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। তবে এ ব্যাপারে দু'পক্ষ একমত হয়েছে যে, তিন জেলাতেই অবস্থিত বর্তমান ক্যান্টনমেন্টগুলো থাকবে।

৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এবারের ৫ম বৈঠকটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল গত শুক্রবার। এদিন সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এ বৈঠকটি আড়াই ঘন্টা স্থায়ী হয়। এ দিনের বৈঠকে ৪ দিনব্যাপী আলোচিত বিষয়াবলির উপর গৃহীত সিদ্ধান্তে উভয়পক্ষের নেতারা সই করেন। এই সিদ্ধান্তসমূহের একটি সুদৃশ্য বাঁধানো কপি গতকাল শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা ত্যাগ করার পূর্বে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমার হাতে তুলে দেয়া হয়।

**সংবাদ**
৭ই আগস্ট ১৯৯৭
পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসন
**টাস্ক ফোর্স ত্রিপুরা**
**যাচ্ছে, আজ বৈঠক**

**সাগর সরওয়ার, আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে ঃ** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬টি শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থীদেরকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আজ বৃহস্পতিবার পাহাড়ি শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সফরকারী প্রতিনিধিরা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব ও পাহাড়ি শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। ৭ সদস্যের এ সফরকারী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি। উল্লেখ্য, প্রায় ৪৩ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী এখন ত্রিপুরায় বসবাস করছেন।

আজ দুপুরে আগরতলা সার্কিট হাউসে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতাদের সঙ্গে এ প্রতিনিধি দল প্রথম আলোচনা করবে। ৪র্থ পর্যায়ে পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে এ প্রতিনিধিদল আগামীকাল ৮ ও ৯ই আগস্ট বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করবে।

আজ বৃহস্পতিবার টাস্ক ফোর্সের যে দলটি আসছে তাতে আছেন বীর বাহাদুর এমপি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইল, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের ডিজি মোবায়দুল ইসলাম ও শরণার্থী নেতা অক্ষয় মনি চাকমা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের সঙ্গে আরো যারা টাস্ক ফোর্সের সদস্যের সঙ্গে মিলিত হবেন তারা হলেন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী ও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ।

**সংবাদ**
১৭ই আগস্ট ১৯৯৭
'সংবাদ'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার
**কেবল শান্তি চুক্তি হলেই শরণার্থীরা**
**স্বদেশে ফিরে যাবে ঃ উপেন্দ্র**

**নুরুর রহমান ও সাগর সরওয়ার, আগরতলা থেকে ফিরে ঃ** জুম্ম (পাহাড়ি) শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা বলেছেন, শরণার্থী



প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে ইউএনএইচসিআর'কে সম্পৃক্ত করার যে দাবি তারা তুলেছেন তা বাংলাদেশ সরকারকে মানতেই হবে এমন কথা নয়। ভারত সরকারকেই তারা শরণার্থী শিবিরগুলোর দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন ভারত সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সম্প্রতি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের টাকুমবাড়ি শরণার্থী শিবিরে 'সংবাদ'কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রায় ২০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী ইতিমধ্যে স্ব-উদ্যোগে দেশে ফিরে গেছে। শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সকে তিনি 'ক্ষমতাহীন একটি কমিটি' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন তাদের কারণেই আলোচনা ভেঙে গেছে। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যদি সরকারের শান্তি চুক্তি সই হয় তাহলে সকল পাহাড়ি শরণার্থী দেশে তাদের নিরাপত্তা খুঁজে পাবে এবং স্বদেশে ফিরে যাবে।

**সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ**
**সংবাদ ঃ** গত মে মাসে পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া দেখতে আপনাদের যে প্রতিনিধি বাংলাদেশে গিয়েছিল তাদের মতামত কি?

**উপেন্দ্রলাল চাকমা ঃ** আমাদের পাঠানো প্রতিনিধিদের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার আমাদের সঙ্গে ২০ দফার একটি কমিটমেন্টে সই করা সত্ত্বেও সেটার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করছে না। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন এবং সন্দেহ জাগে, আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করছে না, তাই সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার এ সমস্যার আদৌ কোন সমাধান করবে কি না। তারা বলেছিল, পার্বত্য এলাকা থেকে সেটেলারদেরকে দখলি ভূমি থেকে প্রত্যাহার ও ফিরে যাওয়া শরণার্থীদেরকে ভূমির মালিকানা ও দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু তা গত ৪ মাসে করা হয়নি। এখনও সেসমস্ত ভূমির উপর থেকে সেনাবাহিনী ও সেটেলারদেরকে প্রত্যাহার করা হয়নি। শরণার্থীরা আবেদন করেছিল, তাও শোনা হয়নি। এসবই আমাদের পাঠানো প্রতিনিধির রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি। যারা চাকরিতে আগে ছিলেন তাদের হারানো চাকরিও ফেরত দেয়া হয়নি; দেয়া হয়নি কোন নতুন চাকরির সুযোগ। ভূমিহীনদের জমি দেয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। তাদেরকে খাস জমি দেয়ারও প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়ন হবে তা আমরা কেউ জানি না।

**সংবাদ ঃ** আপনারা এবারে টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে বৈঠকে শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ইউএনএইচসিআর'কেও আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে সংযুক্ত করার দাবি তুলেছেন, কিন্তু কেন?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** ইউএনএইচসিআর হচ্ছে জাতিসংঘের একটি সংস্থা। এটা শুধু বিশিষ্ট কয়েকটি দেশের সংস্থা নয়, এটা সকল দেশের সংস্থা। শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্যই জাতিসংঘ এ সংস্থা তৈরি করেছে। এ সংস্থার এক্সিকিউটিভ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও অন্যতম। এ সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাজ করছে। একইভাবে আমরাও পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চাই। সেজন্য আমরা জাতিসংঘের এ সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি।

**সংবাদ ঃ** আপনি জানেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে ইউএনএইচসিআর সাহায্য-সহযোগিতা করছে; কিন্তু বার্মায় পাঠিয়ে শরণার্থীদের কি হলো সেটা তো এ সংস্থা দেখছে না কিংবা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তারা জড়িত হচ্ছে না। বাংলাদেশের মাটিতে থেকে ইউএনএইচসিআর কেবল সাহায্য করছে। এভাবে আপনারা কি ভারত সরকারের কাছে এধরনের কোন আবেদন করেছিলেন?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** ভারত সরকারের কাছে আমরা এ ধরনের একটি আবেদন করেছিলাম, ভারত সরকার যেন আমাদেরকে দেখভালের দায়িত্ব ইউএনএইচসিআর'কে দেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। এ আবেদনপত্রের কোন জবাব আজো দেয়নি।

**সংবাদ ঃ** ভারতের ব্যাপারে এ দাবি আপনারা কেন করলেন? ভারতের উপর আপনাদের কি আস্থাহীনতা রয়েছে?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ভারত থেকে আমরা যে পরিমাণ রেশন ও অন্য সুবিধা পাচ্ছি তা পর্যাপ্ত নয়। আমরা এর থেকেও উন্নতমানের ও বেশি সুবিধা চাই। আমরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা চাই। তাই আমরা এ দাবি করেছি।

**সংবাদ ঃ** বাংলাদেশে পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসনে ইউএনএইচসিআর'কে সম্পৃক্ত করার আপনাদের যে দাবি রয়েছে সেই দাবি না মানলে আপনারা কি করবেন?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** ব্যাপারটি হলো, আমরা তো দাবি করবই। দাবি যদি যথাসময়ে পূরণ না হয় আমরা তখন এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব।

**সংবাদ ঃ** আপনারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসন নাকি প্রত্যাবাসন প্রশ্নে ইউএনএইচসিআর'কে সম্পৃক্তের কথা বলছেন?



**উপেন্দ্রলাল ঃ** শরণার্থীদেরকে দেশে পুনর্বাসনের ব্যাপারে আপনারা জানেন, আমরা খালেদা জিয়া সরকারের সময়ে দু'কিস্তিতে দেশে শরণার্থী পাঠিয়েছিলাম। তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন আজো হয়নি। এ সরকারের সময়ও তা হয়নি। তাই আমরা মনে করি একটি আন্তর্জাতিক শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা এ কাজ ভালভাবে করতে পারবে। আমরা উপকৃত হব।

**সংবাদ ঃ** কঠোর কোন সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** আবারো বলছি, আমরা কেবলমাত্র আবেদন করেছি। কঠোর কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা আমরা কখনো বলিনি।

**সংবাদ ঃ** আপনারা হঠাৎ করেই কি ইউএনএইচসিআর-এর সম্পৃক্ততার দাবি তুলেছেন?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** কথাটি ঠিক নয়। আমরা অনেক দিন ধরেই এ দাবি করে আসছি। আমাদের ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি আমরা করেছি। জাতিসংঘকে সাথে রাখা হবে–এমন একটি প্রস্তাব আমরা প্রথমেই চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর কাছে করেছিলাম। তিনি বিবেচনায় রেখেছিলেন বলে সে দফাটি আমরা চুক্তিতে আনতে পারিনি। তাই বলে আমরা চুক্তি মানব না–এমন তো কখনোই বলিনি।

**সংবাদ ঃ** ভারত সরকার আপনাদেরকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে কি কোন চাপ কখনো দিয়েছে?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** কখনোই না। তবে 'ইনডাইরেক্ট' কিছু চাপ তো থাকবেই।

**সংবাদ ঃ** শোনা যাচ্ছে আপনাদের শিবির থেকে স্ব-উদ্যোগে অনেকে দেশে ফিরে যাচ্ছে, কথাটা ঠিক?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** অনেকটা ঠিক।

**সংবাদ ঃ** এদের সংখ্যা কত? কতদিন আগে তারা দেশে ফিরে গেছেন?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** গত তিন বছরে। এদের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এরা সকলেই রেজিস্টার্ড শরণার্থী।

**সংবাদ ঃ** বিভিন্ন সূত্র বলছে আপনাদের শরণার্থী শিবিরগুলোতে শান্তিবাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে, কথাটা কতটুকু সত্য।

**উপেন্দ্রলাল ঃ** এগুলো শরণার্থী শিবির, শান্তিবাহিনীর শিবির নয়। আপনার সূত্রের খবর শুধুই এক শ্রেণীর লোকের অসৎ উদ্দেশ্যকে সফল করবে। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

**সংবাদ ঃ** সরকারের শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে ৮ ও ৯ই আগস্টের আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর আপনারা কি ভাবছেন?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** সরকারের এ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তা আমরা ভাঙিনি। আলোচনায় যেসব দাবি আমরা উপস্থাপন করেছি, তা পূরণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা ভেঙে গেছে। ২০ দফার ভিত্তিতে সরকার যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়নি। যে যৌথ ইশতেহার আমরা সই করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতেই ৬ই মার্চ আগরতলায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। ২০ দফায় যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়ে গেছে তা আগের সরকারের সময় যারা দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, তাদের প্রতিও এই সুযোগসুবিধাগুলো প্রযোজ্য হবে। কিন্তু তা হয়নি। যেহেতু কথাটা লিপিবদ্ধ করিনি, তাই সমস্যা হয়েছে। আমরা চিফ হুইপের কথাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম ১২ মাস রেশন দেয়া হোক। তিনি এতে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছিলেন। বিভিন্ন গণহত্যায় যারা আত্মীয়স্বজন হারিয়েছে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা চেয়েছিলাম, তিনি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাও পালন হয়নি। আমরা বলেছি, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সব বিষয় যথাযথ বাস্তবায়ন করলে তবেই আমরা দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে দেশে ২০ দফা বাস্তবায়ন কমিটির গ্রিন সিগন্যাল চাইব, সিগন্যাল পেলেই আমরা পরবর্তী দলকে দেশে পাঠাব। এই সমস্ত বিষয়ে আমরা সফরকারী টাস্ক ফোর্স প্রতিনিধিদের জানিয়েছিলাম। তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। ফলে বৈঠকে ব্যর্থতা এসেছে এবং এজন্য দায়ী টাস্ক ফোর্সই।

একথা ঠিক চিফ হুইপ এলে এ সমস্যাটা হতো না। কিন্তু এমন এক কমিটি পাঠানো হয়েছে যার কোন ক্ষমতা নেই।

**সংবাদ ঃ** আপনি কি মনে করেন টাস্ক ফোর্স কমিটি শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন কাজে ব্যর্থ?

**উপেন্দ্রলাল ঃ** শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্স কেবল একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি, এটি তার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যে কমিটির কোন এক্সিকিউটিভ পাওয়ার নেই, সে কমিটি কিভাবে কাজ করবে? সরকারের উচিত শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে আরো গতিশীল হওয়া।



**সংবাদ**
২২শে আগস্ট ১৯৯৭

## সরকার-জনসংহতি সমিতির ৬ষ্ঠ বৈঠক ৭ই সেপ্টেম্বর

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর সরকারের চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৬ষ্ঠ বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে সরকারের উচ্চপদস্থ এক সূত্র জানিয়েছেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষে উষাতন তালুকদারের সই করা এক চিঠিতে ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বৈঠকের প্রস্তাবের পর সরকারের জাতীয় কমিটি এ সিদ্ধান্ত নেয় বলে সূত্র জানান। উষাতন তালুকদারের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে যোগদানের জন্য ঐদিন (৭ই সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ১০টায় দুদুকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারযোগে সরাসরি ঢাকায় আসবে। সমিতি গত মার্চ মাসে বান্দরবান জেলার তারাসা থেকে জনসংহতি সমিতির যে ৩ জন সদস্য ও ১ জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দেবেন সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

**সংবাদ**
২৩শে আগস্ট ১৯৯৭
সরজমিন ঃ ত্রিপুরা থেকে

## শান্তি বাহিনী নয়া অস্ত্র কিনছে না রিক্রুটমেন্ট ও প্রশিক্ষণও বন্ধ

**নূরুর রহমান ও সাগর সরওয়ার, আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে ফিরে ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনী নতুন করে অস্ত্র কিনছে না। শান্তি বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আগরতলায় বসবাসকারী একটি সূত্র জানিয়েছেন, শান্তি বাহিনী নতুন করে কোন সদস্য সংগ্রহ করছে না, প্রশিক্ষণও দিচ্ছে না। সূত্র জানান, শান্তি বাহিনী এতদিন থাইল্যান্ড থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করত। অস্ত্র কেনার অর্থের একটি অংশ যোগান দিত দ্বিতীয় একটি দেশ। বাংলাদেশ সরকারের সাথে শান্তি আলোচনার বিপক্ষে শান্তি বাহিনীর বেশকিছু যুবক অবস্থান নিয়েছে। সূত্রমতে, এই গ্রুপটি তেমন

শক্তিশালী নয়। জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি বৈঠক হওয়ার পর শান্তি বাহিনী অস্ত্র কেনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, অস্ত্র কেনার মতো পর্যাপ্ত টাকা শান্তি বাহিনীর কাছে রয়েছে। এ টাকার প্রধান উৎস বিভিন্ন মহল থেকে আদায় করা চাঁদা। তবে সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্য ৫শ'জনের একটি দলকে গত ডিসেম্বরে শান্তি বাহিনীতে রিক্রুট করা হয়েছে। এই দলটি প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। এরপর শান্তি বাহিনী নতুন কোন সদস্য সংগ্রহ করেনি, প্রশিক্ষণও দেয়নি।

আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের অস্ত্র কেনার সাম্প্রতিক প্রস্তাবে শান্তি বাহিনী সাড়া দেয়নি। শান্তি বাহিনীর এখনকার মনোভাব হচ্ছে, যেহেতু শান্তি আলোচনা চলছে এবং শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে দু'পক্ষই কাছাকাছি অবস্থান করছে, সে কারণে নতুন করে অস্ত্র কেনা টাকার অপচয় হবে। এছাড়া সন্তু লারমা শান্তি বাহিনীর সদস্যসংখ্যাও বাড়াতে চাইছেন না। কারণ সদস্যসংখ্যা বাড়লে সমস্যাও বাড়বে। শান্তি স্থাপিত হলে তাদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে। সূত্র আরো জানিয়েছে, ভারত সরকার বর্তমানে শান্তি বাহিনীকে দেয়া অর্থ সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। তবে এখনও ভারতের অভ্যন্তরে শান্তি বাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। এই ক্যাম্পগুলো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। শান্তি বাহিনীর যে তরুণ সদস্যরা শান্তি চুক্তির বিপক্ষে, তাদেরকে মদদ দিচ্ছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এই কথা বলেছেন আগরতলার সূত্রগুলো।

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় আইএসআই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কাজ করছে। তিনি বলেছেন, আমরা কোন ক্যাম্প স্থাপন করিনি এবং কোন ক্যাম্প ত্রিপুরায় নেই। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বেশ কয়েকটি ক্যাম্প ভেঙে দেয়া হয়েছে। কতটি ক্যাম্প ভেঙে দেয়া হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা সমর চৌধুরি জানাননি। তার ভাষায়, 'ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে বৈরী তৎপরতা রোধে বর্ডার সিল করে দেয়া উচিত।' তিনি দাবি করেছেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের টংবাড়ি, গঙ্গামা, দাঙ্গামা, কাচলং রিজার্ভ ফরেস্ট, মাদানী রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় ভারতের সশস্ত্র গ্রুপগুলোর ক্যাম্প রয়েছে। সিলেটের ক্যাম্পগুলো ভেঙে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তবে কিছু কিছু এলাকায় সন্ত্রাসীরা বাড়িঘর তৈরি করে থাকছে। তিনি বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সকল উগ্রপন্থী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। এটা বাংলাদেশ এবং ভারত দু'দেশের জন্যই ক্ষতিকর।



ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার এ প্রসঙ্গে 'সংবাদ'কে বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার ৮শ' কিলোমিটারের উপর সীমান্ত রয়েছে। সে তুলনায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ততোটা নেই। এসব কারণে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। তিনি জানান, এই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হবে। শিগগিরই একাজ শুরু হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা ২ হাজার। তবে বাংলাদেশ সরকারের হিসেব অনুযায়ী এ সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি। এছাড়া প্রশিক্ষিত কিন্তু অস্ত্রবিহীন সদস্যও রয়েছে। তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করছে।

শান্তি বাহিনীর অর্থের উৎস সম্পর্কে সূত্রটি বলেছে, তিনটি পার্বত্য জেলার কাঠ ব্যবসায়ী ও পাহাড়ি জনগণের কাছ থেকে তারা নিয়মিত চাঁদা আদায় করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক চক্র থেকেও তারা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। এই 'টাকা' হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে 'রুপি'তে রূপান্তর করা হয়। রূপান্তরিত 'রুপি' থাকে ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকে এবং শান্তি বাহিনীর নিজস্ব 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকে'।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শান্তি বাহিনী আগরতলায় অবস্থিত একটি মানবাধিকার সংস্থার সহযোগিতা পেয়ে থাকে। সূত্রটি আরো বলেছে, প্রায় ১৫ হাজার শরণার্থী দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছে। এদের সকলেই শান্তি বাহিনী সদস্যদের পরিবারের সদস্য। শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পরই তারা দেশে ফিরে আসবে। এরা শান্তি চুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু শান্তি বাহিনীর কিছু যুবক সদস্য চুক্তির বিরোধিতা করে বলেছে, 'শান্তি যদি না আসে, তাহলে---?'

শান্তি বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এ সূত্র জানিয়েছেন, সম্প্রতি বান্দরবানসহ অন্যান্য এলাকায় খুন, অপহরণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে তার সাথে শান্তি বাহিনী জড়িত নয়।

**সংবাদ**

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

## জনসংহতি সমিতির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান

**॥ সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতারা আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় শান্তি বৈঠকের কোন এক দিন পার্বত্যাঞ্চল বিষয়ে অমীমাংসিত সমস্যাগুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। যোগাযোগ কমিটি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সূত্র জানান, এবারের ৬ষ্ঠ বৈঠকেই জনসংহতি সমিতি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। তারা মনে করেন, কেবল প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি সইয়ের ক্ষেত্রে বাধাগুলো সরাতে পারে। জনসংহতি সমিতি এ বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই করতে চান বলে সূত্র জানিয়েছেন। সূত্র জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ইচ্ছের ব্যাপারটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ সম্পর্ক বিভাগকে জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এজেন্ডা কি থাকবে এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির এক সভায় আলোচনা হয়েছে। তারা পার্বত্যাঞ্চলে ভূমি সমস্যা, সেটেলার ইস্যু, পরিষদের নেতৃত্ব ও গঠন এবং আত্মসমর্পণ করা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানতে চাইবেন।

সূত্র আরো জানিয়েছেন, জনসংহতি সমিতি তাদের সদস্যদের তালিকা তৈরি করছে। প্রায় ৪ হাজার সদস্যের মধ্যে দেড় হাজার সদস্য অস্ত্রধারী। এদেরকে পুনর্বাসন করার ব্যাপারে সরকার কি কি পদক্ষেপ নেয়, সে বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তারা কথা বলতে চান।

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এ বৈঠক কতদিন স্থায়ী হবে তা জানা যায়নি।

**সংবাদ**

**১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## পার্বত্য সমস্যা ঃ আগামী বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই হতে পারে

অনানুষ্ঠানিক নানা তৎপরতা চলছে

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকেই 'শান্তি চুক্তি' সই হতে পারে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। শান্তি চুক্তি সইয়ের ক্ষেত্রে বড় বাধাগুলো দূর করার জন্য সরকার ও জনসংহতি কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠানের আগেই খুব দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। দু'পক্ষের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক বৈঠক হচ্ছে এবং ব্যাখ্যা আলোচনা চলছে। এসব পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সরকারের শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ত্রিপুরায় অবস্থানকারী পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে



ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি বৈঠকে যোগ দিতে গতকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেছেন। আজ আখাউড়ার সীমান্তবর্তী কোন এক স্থানে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতাদের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ খবর জানিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, গত বুধবার জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে জাতীয় কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চিফ হুইপের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বরের আগেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে যেসব সমস্যা রয়েছে সরকারপক্ষ সেসব সমাধান করতে চায়। ত্রিপুরায় অবস্থানকারী পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি শান্তি চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে বড় বাধা হিসেবে দাঁড়াতে পারে। এই চিন্তা থেকেই দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের প্রধান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও স্পেশাল বিভাগের একজন কর্মকর্তা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গেছেন। এ বৈঠকে যোগ দিতে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতারাও সম্মতি দিয়েছেন।

বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাতে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমস্যাটি প্রাধান্য পেতে পারে। দেশে ফেরা পাহাড়ি শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন হয়নি বলে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল সে বিষয়ে জনসংহতি নেতারা তাদের মতামত জানাবেন ও সরকারের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইবেন। এছাড়া এবারের বৈঠকে পাহাড়িদের ভূমি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকার কত দূর কি করতে পারবে তাও জানতে চাইবে জনসংহতি সমিতি।

**সংবাদ**

**১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরণার্থী নেতাদের বৈঠক

প্রত্যাবাসন শুরু ও ঘোষিত সুবিধা বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা

**সাগর সরওয়ার ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গতকাল শুক্রবার বিকেলে জুম্ম (পাহাড়ি) শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করেছে। শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ২ ঘন্টা স্থায়ী এ বৈঠকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী উপেন্দ্রলাল চাকমার কাছে পাহাড়ি শরণার্থীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে

জানতে চান। তিনি তাদেরকে দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, এ আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। শিগগিরই ত্রিপুরা থেকে পাহাড়ি শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসবে বলে এ বৈঠকে উপেন্দ্রলাল চাকমা জানিয়েছেন। কবে নাগাদ আবার শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হবে প্রধানমন্ত্রী তা জানতে চাইলে শরণার্থী নেতারা পরবর্তী তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য রাখেননি। তারা আগামী মাসের ২য় সপ্তাহে শরণার্থীদের পরবর্তী দলকে বাংলাদেশে পাঠানোর আভাস দিয়েছেন। তবে এসব কিছু নির্ভর করবে দেশে ফিরে আসা শরণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা কতটুকু দেয়া হয়েছে তার উপর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বৈঠকে উপেন্দ্রলাল চাকমাকে শরণার্থীদের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন বলে সূত্র জানিয়েছেন।

সূত্র জানান ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব শিগগিরই শরণার্থীদের বাড়তি কিছু সুবিধা দেয়ার ঘোষণা দিতে পারেন। এ সম্পর্কেও গতকালের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শরণার্থী নেতাদের একটি প্রাথমিক ধারণা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বৈঠকে সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি। এছাড়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এ বৈঠকে যোগ দেন। শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষে উপেন্দ্রলাল চাকমা, প্রভাকর চাকমা, জাদোয়া মগ ও আরো একজনসহ মোট ৪ জনই নেতা ওই বৈঠকে যোগ দেন। বিকেল পৌনে ৬টায় এ বৈঠক শেষ হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেই কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের ডিজি মোবাইদুল ইসলাম শরণার্থী নেতাদের নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সকালে পাহাড়ি শরণার্থী নেতারা ঢাকায় পৌছে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বৈঠকে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে আলোচনা করেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন। আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা জানান ঃ গতকাল শুক্রবার সকালে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির একটি প্রতিনিধিদল আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে আসে। এ সময় তাদের স্বাগত জানান শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের প্রধান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের মহাপরিচালক মোবায়দুল ইসলাম। রাতে তারা সার্কিট হাউসে অবস্থান করেন। আজ সকালে তাদের ত্রিপুরা ফিরে যাওয়ার কথা।



**সংবাদ**
**১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ষষ্ঠ বৈঠক আজ শুরু

**৷৷ সাগর সরওয়ার ৷৷** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ দফা বৈঠক আজ রোববার বিকেলে ঢাকায় শুরু হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এবারের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে সব আয়োজন সম্পন্ন করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন। জনসংহতি সমিতির নেতারা বৈঠকের কোন এক দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করবেন। এবারের বৈঠকের মেয়াদ ৪ দিন হতে পারে বলে সূত্র জানান। সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বেশ কয়েকটি ইস্যুতে গত পঞ্চম দফা বৈঠকেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এসব ইস্যুর মধ্যে ভূমির অধিকার, ল্যান্ড কমিশন গঠন, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও কর্তৃত্ব এবং বাঙালি সেটেলার প্রত্যাহার অন্যতম। সূত্র জানান, এবারের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে জনসংহতি সমিতিকে সরকার তাদের সর্বশেষ অবস্থান জানিয়ে দেবে। সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ মনে করেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে কোন চুক্তি করতে হলে সরকারপ্রধানের মন্তব্য জানা দরকার। অনুষ্ঠিতব্য চুক্তিটির কতটুকু এবং কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য শুনতে চায় জনসংহতি সমিতি। ভিন্ন একটি সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতির নেতারা খুব শিগগিরই পার্বত্য সমস্যা সমাধান করতে চান। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে তারা চুক্তি সইয়ের অনুকূল বলে মনে করেন। বিএনপি ও অন্যান্য ডানপন্থী দলের রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার আগেই তারা চান সরকার সংসদে বিল এনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলা মিলিয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করুক। আজ বিকেল আড়াইটায় এ বৈঠক শুরু হবে। সকাল ১১টায় জনসংহতি সমিতির নেতারা ঢাকায় এসে পৌছাবেন। খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া থেকে সকাল ১০টায় পাহাড়ি নেতাদের হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে আসবেন আতাউর রহমান খান কায়সার। বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু সারমা)। জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও কমিটি প্রধান

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। জনসংহতি সমিতির পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা। জাতীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ এ,বি,এম মহিউদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, চার সংসদ সদস্য যথাক্রমে কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর এবং এডভোকেট ফজলে রাব্বি।

**সংবাদ**

**১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে ষষ্ঠ বৈঠক

**আলোচনা হয়েছে ভূমি, সেটেলার ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা নিয়ে**

**সুনীল কান্তি দে ও সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে ষষ্ঠ বৈঠক গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকায় শুরু হয়েছে। বৈঠকের প্রথম দিনে জনসংহতি সমিতির ভূমি, সেটেলার ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে উথাপিত দাবি আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় গতকাল বিকেল সোয়া তিনটায় শুরু হওয়া এ বৈঠক চলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

বৈঠকের শুরুতে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির নেতাদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মূল বৈঠক শুরু হয়। মূল বৈঠকে উভয়পক্ষের ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। উভয়পক্ষের দু'দলনেতা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিটির কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতির দু'নেতা গৌতম চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান ঃ গতকালের বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের আগের তিনটি দাবির পুনরুল্লেখ করেন। দাবিগুলোর মধ্যে আছে ভূমির অধিকার, আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং বাঙালি সেটেলারদের পুনর্বাসন। সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি ভূমির উপর পাহাড়িদের অধিকার এবং ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের সর্বময় ক্ষমতা দেয়ার দাবি জানান। সরকার পক্ষ সে দাবি মানা সম্ভব নয় বলে জানায়। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে জেলা



পরিষদের হাতে পার্বত্য ভূমির সকল অধিকার ন্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সংবিধান সংশোধন করে এ দাবি মানা সম্ভব। আর এ সরকারের সংবিধান সংশোধন করার মতো জাতীয় সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের কোন দ্বিমত নেই। তবে সরকার জনসংহতির দাবি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানকে জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন তৈরির ক্ষমতা দিতে চায় না বলে সূত্র জানান। গতকালের প্রথমদিনের বৈঠকে এ ব্যাপারে সরকারকে আবার ভেবে দেখার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতারা অনুরোধ করেছেন বলে সূত্র জানান।

সেটেলারদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি গতকালের বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। জানা গেছে, জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ সেটেলারদের পাহাড়ি এলাকা থেকে খাস জমিতে স্থানান্তরের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উপর জোর দেন। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে অন্যবারের মতো এবারও বলা হয় যে, এ বিষয়টি সার্ভের উপর নির্ভর করছে। সরকার কোন পাহাড়ির জমি অন্য কারো দখলে থাকুক এটা যেমন চায় না, তেমনিভাবে বিতর্কিত জমিটি যে একজন পাহাড়ির তাও সরকারকে নিশ্চিত হতে হবে।

গতকালের বৈঠকে জাতীয় রাজনীতির বাস্তবতায় পার্বত্য সমস্যার সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতিকে অনুরোধ জানানো হয়। জানা গেছে, জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য এডভোকেট ফজলে রাব্বির গতকালের সভায় অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ জানতে চাইলে সরকারি কমিটির পক্ষ থেকে সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলা হয়, এজন্যই প্রয়োজন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের।

গতকালের বৈঠকে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে দুদুকছড়া থেকে হেলিকপ্টারযোগে আনতে গিয়েছিলেন জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন। অন্যবারের চেয়ে ১ ঘন্টা দেরিতে অর্থাৎ সকাল ১১টায় হেলিকপ্টার দুদুকছড়ি ছেড়ে আসে। বেলা ১২টা ২৭ মিনিটে হেলিকপ্টারটি তেজগাঁওয়ের পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ জনসংহতি সমিতির নেতাদের স্বাগত জানান। দুপুর ১২টা ৫৩ মিনিটে চিফ হুইপ জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমাকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে প্রবেশ করেন। এ সময় তাদের গাড়ির পেছনে জনসংহতি সমিতির অন্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আসা গাড়িগুলো একে একে পদ্মার গেট অতিক্রম করে।

জানা গেছে, এবারের বৈঠক চলাকালীন ৪ দিনের যেকোন একদিন জনসংহতি সমিতির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

গতকালের বৈঠকে উভয়পক্ষের নেতারা ছাড়াও অন্যদের মধ্যে জাতীয় কমিটির পক্ষে কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, প্রাক্তন অতিরিক্ত সদস্য শরদিন্দু শেখর চাকমা, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজী গোলাম রহমান, মহাপরিচালক যোবায়দুল ইসলাম ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

**সংবাদ**

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান বৈঠক

**ভূমি ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক পরিষদ**
**শাসনবিধি সংশোধনে মতৈক্য**

**সুনীল কান্তি দে ও সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রায় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ দফা বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনের ব্যাপারে দু'পক্ষ একমত হয়েছে। গতকাল সোমবারের এ বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

গতকালের বৈঠকে পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা ও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকের একটি সূত্রে জানা গেছে, সরকারি জমি, খাসজমি ও অধিগ্রহণকৃত জমির ব্যাখ্যার ব্যাপারে উভয়পক্ষই একমত হয়েছে। সূত্রমতে, ভূমি ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসংহতি সমিতি যে কয়েকটি সুপারিশ ইতোপূর্বে জাতীয় কমিটির কাছে উত্থাপন করেছিল সেগুলোর বেশিরভাগই সময়োপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে দু'পক্ষই একমত প্রকাশ করেছে। তবে ভূমি প্রশাসনে সরকারের কর্তৃত্বই প্রাধান্য পাবে বলে উল্লেখ করা হয়। তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতি অনেকটা কাছাকাছি অবস্থানে চলে এসেছে গতকালের বৈঠকে। তবে পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতার আওতার ক্ষেত্রে দু'একটি মতপার্থক্য এখনও রয়ে গেছে বলে জানা যায়।



বিশেষত জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর কতটুকু ক্ষমতা থাকবে, তা এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। তবে আঞ্চলিক পরিষদের গঠনপ্রণালীর ক্ষেত্রেও একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছেন।

সূত্র আরো জানান, গতকালের বৈঠকে তিন পার্বত্য জেলায় বলবৎ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির কয়েকটি আর্টিকেলের পরিবর্তন আনার ব্যাপারে উভয়পক্ষ একমত প্রকাশ করেছে। এই বিধিতে ট্রাইবাল চিফ (রাজা), হেডম্যান ও কার্বারীদের যে ক্ষমতা থাকার বিধান রাখা হয়েছে তাকে অধিকতর উন্নত করার বিষয়টি আলোচিত হয় এবং সে অনুসারে এই ক্ষমতাকে আরো বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রবর্তিত আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদগুলোর নেতৃত্বও যাতে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে নতুনভাবে উল্লেখ করা হয় সে বিষয়েও ঐকমত্য হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে পার্বত্যাঞ্চলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা পালনের বিষয় উল্লেখিত নেই। যদিও-বা ইতোমধ্যে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা জাতীয় সংসদের সদস্য ও স্থানীয় সরকার পরিষদের মতো নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বের কোন ভূমিকার কথা ওই শাসনবিধিতে রাখা হয়নি। গতকালের বৈঠকে উভয়পক্ষের ৩ জন করে আলোচনা করেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা এবং রূপায়ণ দেওয়ান এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে জাতীয় সংসদের চিফ হুইফ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আতাউর রহমান খান কায়সার আলোচনায় অংশ নেন।

গতকালের এ বৈঠক সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয়। খাবারের বিরতির পর বৈঠক পুনরায় বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় মুলতবি করা হয়। আজ পুনরায় সকাল ১০টায় এ বৈঠক শুরু হবে। গতকালও কোন প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়নি।

**সংবাদ**

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে বৈঠক

**অস্ত্র সমর্পণের পর শান্তিবাহিনী সদস্যদের**
**পুনর্বাসনে মতৈক্য, ভূমি প্রশ্নে অগ্রগতি**

**সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটির বৈঠকের তৃতীয়

দিনে গতকাল মঙ্গলবার ভূমির অধিকার প্রশ্নে সৃষ্ট জটিলতার বেশিরভাগই নিরসন হয়েছে। এছাড়া গতকালের বৈঠকে শান্তি চুক্তির পরবর্তীতে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের পর তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সরকারপক্ষ রাজি হয়েছে। জাতীয় কমিটির ৩ জন শীর্ষস্থানীয় সদস্য চলমান বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গতকাল দুপুরে সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবারের আলোচনায় পৌঁছা ঐকমত্যের ভিত্তিতে গতকালের বৈঠকে অগ্রগতি হয়েছে বেশি। ভূমি সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে যুগোপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছেছে। ভূমি বিষয়ক জটিলতা কাটিয়ে উঠার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সইয়ের বিষয়টি অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সূত্রমতে, গতকালের বৈঠকের শেষের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ ও তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। সরকারের পক্ষ থেকে অস্ত্র সমর্পণকারী শান্তিবাহিনী সদস্যদের যথাযথভাবে পুনর্বাসনের আশ্বাস বৈঠকে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অস্ত্র সমর্পণকারীদের যোগ্যতা অনুসারে পুনর্বাসনের বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়। একই সূত্র জানিয়েছেন, এবারের বৈঠক আরো কয়েকদিন চলতে পারে। সূত্রমতে চুক্তির একটি খসড়া এবারের বৈঠকেই উত্থাপন করা হবে এবং চুক্তি সইয়ের দিন-ক্ষণ ও স্থান সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের মতামত সম্পর্কে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত হতে চান। তারা এবারের বৈঠকের যেকোন একদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে সরকারের মতামত জানার ইচ্ছা পোষণ করেছেন কয়েকবার। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত জনসংহতি নেতৃবৃন্দকে জানানো হয়নি। দুপুরের খাবারের বিরতিতে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ তিন নেতা প্রধানমন্ত্রীকে চলমান ষষ্ঠ দফা বৈঠকের ব্যাপারে খুঁটিনাটি সব বিষয় জানিয়েছেন বলে সূত্র জানান। সূত্র জানান, জনসংহতি নেতারা ভূমির অধিকার প্রশ্নে এখনো অনড় রয়েছেন যেসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তা জানানো হয়েছে। গতকালের বৈঠকটি যথারীতি সকাল সোয়া ১০টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পাদ্মায় শুরু হয়ে দুপুরের লাঞ্চ পর্যন্ত এক নাগাড়ে চলে।



লাঞ্চের পর বিকেল ৫টায় শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। বৈঠকে সরকারের জাতীয় কমিটির নেতা জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), গৌতম চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। আজ সকাল ১০টা থেকে পুনরায় বৈঠক শুরু হবে।

**সংবাদ**

**১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## পার্বত্য সমস্যা সমাধানে শান্তি চুক্তি আগামী বৈঠকেই

চুক্তির খসড়া হয়েছে ■ অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়লো ডিসেম্বর পর্যন্ত

**সুনীল কান্তি দে ও সাগর সরওয়ার ॥** চব্বিশ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা অবশেষে সমাধান হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার এবং জনসংহতি সমিতি শান্তি চুক্তি সই করবে আগামী বৈঠকেই। এই বৈঠকেই খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এক প্রেস ব্রিফিং-এ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এই ঘোষণা দেন। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এ ঘোষণার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে দু'পক্ষের সম্মতিতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পার্বত্যাঞ্চলে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছেন আগামী মাসের শেষের দিকে শান্তি চুক্তিটি সই হতে পারে। প্রেস ব্রিফিং-এ সন্তু লারমা বলেন, 'খসড়া চুক্তি' প্রণীত হয়েছে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি সই করতে যাচ্ছি। ৩১শে ডিসেম্বর '৯৭ পর্যন্ত উভয় পক্ষের অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের দু'জনারই মত।' সন্তু লারমা এই প্রথম সাংবাদিকদেরকে ব্রিফিং করলেন। এরপর কোন কথা না বলে তিনি আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে চলে যান। আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ পরে আতাউর রহমান খান কায়সারকে নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেননি।

এবারের বৈঠকে পার্বত্য সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেছেন। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে ভূমি, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, তিন

পার্বত্য জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনায় পরিষদসমূহের সাথে জেলা প্রশাসকদের ভূমিকা ইত্যাদি। সবচেয়ে জটিল ভূমি সমস্যার ব্যাপারে উভয় পক্ষ আলোচনা করেছেন বেশি। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ভূমি বিষয়ে তাদের পূর্বের ৯ দফা দাবি বারংবার উত্থাপন করেছেন, উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে সব সমস্যার সমাধান সংবিধানের আওতায় করার কথা বলা হয়েছে। গত ৪ দিনের বৈঠকে আলোচিত সমস্যাদির আলোকে বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে নেয়ার পর উভয়পক্ষ চুক্তির খসড়া প্রণয়নে একমত হন।

খসড়া প্রণয়নকালে উভয় পক্ষই চুক্তির বিষয়গুলো যাতে ভবিষ্যতে আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন বলে জানা যায়। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সরকারের জাতীয় কমিটি ইতোমধ্যেই খসড়া চুক্তির বিভিন্ন ধারা-উপধারা সম্পর্কে কয়েকজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ ও আইনবিদের মতামত নিয়েছেন। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে যোগাযোগ কমিটির একজন সদস্য ঢাকায় কয়েকজন আইনবিদের সাথে আলোচনা করেছেন। এও জানা গেছে, জনসংহতি সমিতি এ ব্যাপারে গতকাল রাত থেকেই কাজ শুরু করেছে।

পুনর্বাসিত বাঙালিদের বিষয়টি চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এক্ষেত্রে ভূমি সমস্যার সমাধানে উপায় নির্ধারিত হবে তার আলোকে সরকারি খাস জমিতে তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে গঠিতব্য ভূমি কমিশনের রিপোর্টটিকে প্রাধান্য দেয়া হবে বলে খসড়ায় উল্লেখ রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করতে বেশকিছু সংশোধনী আনতে সরকার ও জনসংহতি সমিতি একমত হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যাপারটি চুক্তিতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিষদের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অথবা পার্বত্য পরিষদ রাখার প্রস্তাব খসড়ায় রাখা হয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় স্থাপনের বিষয়টি চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। তবে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মর্যাদা কি হবে সেটা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। একটি অসমর্থিত সূত্র জানিয়েছে যে, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানই এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন।

পাহাড়ি শরণার্থীদের বিষয়ে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী অক্টোবরের ২য় সপ্তাহে আরো কিছু শরণার্থীকে প্রত্যাবাসন কর্মসূচির অধীনে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানা গেছে এবং পুনর্বাসিত পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সব ধরনের সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হবে।



১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি শান্তি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট অবস্থায় ব্যবহারের জন্য যুগোপযোগী করে তোলার ব্যাপারে খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলায় যদি যুদ্ধ না থাকে তাহলে এখানে সেনাবাহিনীর কোন অস্থায়ী ছাউনির প্রয়োজন নেই বলে দু'পক্ষই ঐকমত্যে পৌঁছেছে। খসড়া চুক্তিতে তিন জেলায় সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট রাখারও ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি একমত হয়েছে। চুক্তিতে জরুরি প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে তলব করার কথা বলা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে আগামী অক্টোবরের শেষের দিকে পার্বত্য সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত ৭ম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে বৈঠকের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় জনসংহতি সমিতির নেতারা সামরিক হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়িতে ফিরে যাবেন।

**সংবাদ**

**১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

**শান্তি চুক্তি : দু'পক্ষই**
**চায় দ্রুত হোক**

**সুনীল কান্তি দে ও সাগর সরওয়ার ॥** আগামী মাসের শেষ সপ্তাহেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন চায় বলে সরকারের উচ্চপদস্থ একটি সূত্র জানিয়েছে। সরকার অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই ত্রিপুরায় অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের একাংশকে দেশে ফিরিয়ে আনবে বলে ঐ সূত্র জানান। সূত্র জানান, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই চুক্তির খসড়াটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূমি, অর্থ, স্থানীয় সরকার ও আইন মন্ত্রণালয়ে এ চুক্তির খসড়া পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আইনগত সমস্যা থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হলো তার সফলতাকে ধরে রাখতে চায় দু'পক্ষই। বৈঠকশেষে সরকারের একটি সূত্রকে জনসংহতি সমিতির একজন নেতা জানিয়েছেন তারাও চান দ্রুত চুক্তিটি সই করতে।

সূত্র জানিয়েছেন, সরকারও ত্রিপুরাস্থ পাহাড়ি শরণার্থী ফিরিয়ে আনতে চায়। তারা ফিরে আসা শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন করতে চান। এ ব্যাপারে জনসংহতি নেতাদেরকে জানিয়েও দেয়া হয়েছে। সূত্র জানান, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন করে এটিকে জনসংহতি সমিতির সামনে একটা ভাল উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো।

আরেকটি সূত্র জানিয়েছেন, ভূমি সম্পর্কে যে খুচরো অসুবিধাগুলোর সমাধান গেল বৈঠকেও হয়নি, সেগুলো যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে চিঠি আদান-প্রদান করে ঠিক করা হবে। একই সূত্র আরো জানিয়েছেন, পার্বত্যাঞ্চলের বর্তমান অবস্থা ও সরকারের কি করণীয় এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকায় আসছেন। সরকারি সূত্র আরো জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রশ্নে যে রিট আবেদনটি এখন হাইকোর্টে রয়েছে, তার মীমাংসা করতে এটর্নি জেনারেলের অফিসকে জানানো হয়েছে। এছাড়া এই তিন জেলার আন্তর্বর্তীকালীন পরিষদসমূহের মেয়াদ নির্ধারণ করে হাইকোর্টে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের বিষয়টিকেও ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

চুক্তি সইয়ের সময়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন, অক্টোবর মাসের ৯ থেকে ২৬ তারিখের মধ্যে চুক্তি সই হতে পারে। বৈঠক ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হবে বলে সূত্র জানান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২ বছরের মধ্যে ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সৃষ্টি হয়। এর মাত্র ১১ মাস পরে '৭৩-এর ৭ই জানুয়ারি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তি বাহিনীর সৃষ্টি হয়। এর পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে পুনর্বাসিত বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণের কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে '৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন শান্তি বাহিনীর হাতেই। পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। এ সময়ে জনসংহতি সমিতি ও সেনাবহিনীর মধ্যেই এ আলোচনা চলতো। পরপর ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠানের পর ১৯৮৯ সালে এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ওই সালেই তিন পার্বত্য জেলায় প্রবর্তিত হয় তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ। ১৯৯২ সালের ১০ই আগস্ট থেকে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দেয়



এবং তৎকালীন সরকার ওই বছরেই যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি গঠন করে। এই কমিটি এবং একটি সাব-কমিটি মোট ১৩টি বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকারের পতনের পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারায় সমস্যার সমাধান হয়নি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর গঠিত বর্তমান জাতীয় কমিটি খাগড়াছড়িতে ২টি এবং ঢাকায় ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠান করে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বরের ৬ষ্ঠ বৈঠকে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে একটি চুক্তির খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতি ঐকমত্য প্রকাশ করে।

**সংবাদ**

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়িতে সন্তু লারমা

## পাহাড়ি ও বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হবে

**খাগড়াছড়ি থেকে মোঃ জহুরুল আলম ॥** দুদুকছড়ায় ফিরে গিয়ে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি ও বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হবে। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে একটি সুন্দর পরিবেশ।

গতকাল দুপুর ১টায় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার দুদুকছড়ায় পাহাড়ি জনগণের উদ্দেশে তিনি একথা বলেন। সকাল সোয়া ১১টায় দুদুকছড়ার বিডিআর-এর হেলিপ্যাডে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারটি অবতরণ করার সাথে সাথে ওই স্থানে অপেক্ষমাণ উৎফুল্ল পাহাড়ি নারী-পুরুষরা জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় হেলপ্যাডে সরকারের জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার ও খাড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল উপস্থিত ছিলেন। তারা জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান।

হেলিকপ্টারটি আকাশে উড্ডয়নের সাথে সাথেই জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা, সদস্য গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা এবং সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ বাবুল দুদুকছড়ার গভীর অরণ্যে অবস্থানরত সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে মিলে যান।

দুদুকছড়ার পাহাড়ি টিলার চারদিকে অবস্থানরত পাহাড়ি নরনারীদের উদ্দেশে ভাষণে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জনসংহতি সরকারকে যে সমস্ত দাবি দিয়েছে তার সবগুলো মানা সম্ভব নয়। তবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য পরিষদ গঠিত হবে। ভূমি অধিকার সম্পর্কে সরকারের সাথে চূড়ান্ত মতৈক্য হয়নি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্য বিষয়াদি ও চুক্তি সম্পর্কে এ মহূর্তে সবকিছু বলা যাবে না। তিনি চুক্তি সম্পর্কে আগাম বিরূপ প্রতিক্রিয়া না জানাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রায় ১২ মিনিটব্যাপী বক্তব্য প্রদানকালে সন্তু লারমাকে অনেকটা দৃঢ় মনোভাবাপন্ন দেখাচ্ছিল।

সংবাদ

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

কমান্ডার ইভার মন্তব্য

**শান্তিবাহিনীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই**

**মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** 'শান্তিবাহিনীর আর্মস ক্যাডারদের মধ্যে কোন গ্রুপিং কিংবা দ্বন্দ্ব নেই। পার্বত্য সমস্যা সমাধান প্রশ্নে যে চুক্তি হতে যাচ্ছে তাতেও আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। শান্তি চুক্তি হলে আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবো।' গতকাল শুক্রবার খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার দুদুকছড়ায় সংবাদ ও অন্য একটি দৈনিকের প্রতিনিধিকে একথা বলেন শান্তি বাহিনীর সিলেট জোনের সামরিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার ইভা।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার কারণেই শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে। আমরা শান্তি চুক্তির ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা চাই।

তিনি বলেন, বিএনপি, জাতীয় পার্টির সরকারের আমলেও আমরা সমঝোতা চেয়েছি, তবে তাদের আন্তরিকতা পাইনি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার তাদের নির্বাচনে ম্যানুফেস্টো অনুযায়ী শান্তি সংলাপে হাত দিয়েছে। ফলে শিগগিরই শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে।

ইভা ১৯৮৬ সালে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন। বর্তমানে শান্তিবাহিনীর আর্মস ক্যাডারদের মধ্যে তার অবস্থান খুব শক্ত বলে জানা গেছে। ইভা সংবাদ প্রতিনিধিকে বলেন, সকলেই স্বাভাবিক জীবন চায়। শান্তি চুক্তি হলে আমরাও ফিরে আসবো।

গতকাল দুদুকছড়া ছিল জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের দিন। বিভিন্ন পর্যায়ের পাহাড়ি ও অপাহাড়িয়া তাদের সঙ্গে দেখা



করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে এ সময় আলাপকালে একটি বড় ছাত্র সংগঠনের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

**সংবাদ**

**২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাজা দেবাশীষ রায়

**পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় চাই রাজনীতিবিদদের ঐক্য**

**॥ সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য খসড়া চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় বলেছেন, এটি একটি শুভ উদ্যোগ। এটাকে সফল করার লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে রাজনীতিবিদদের এক হয়ে কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকে প্রণীত খসড়া চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করতে বলা হলে চাকমা রাজা একথা বলেন।

পার্বত্য ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি প্রশাসনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি সত্যিই একটি জটিল বিষয় এবং স্পর্শকাতরও বটে। তাই এটার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন ঘটানোর আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে এ বিষয়ে রিসার্চ করতে হবে।

খসড়া চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে যে একটি আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন জেলায় তিনটি পৃথক জেলা পরিষদ গঠিত হচ্ছে সেগুলোকে অধিকতর ক্ষমতা দেয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে দেবাশীষ রায় বলেন, ক্ষমতা কতটুকু দেয়া হয়েছে তা বড় কথা নয়। দেখতে হবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থবহ প্রশাসন প্রবর্তন করা যাচ্ছে কিনা।

**সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ**

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে চুক্তি হতে যাচ্ছে তার মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ সৃষ্টির কথা শোনা যাচ্ছে। এও শোনা যাচ্ছে যে, এবারের পরিষদগুলো অধিকতর ক্ষমতাশালী হবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

**দে. রায় ঃ** আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদগুলোর কাছে যে সমস্ত ক্ষমতা দেয়ার কথা শোনা যাচ্ছে সেগুলো অর্থবহ হওয়া উচিত। অর্থাৎ সরকারের যে সমস্ত বিষয় এ সমস্ত পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত হবে সেগুলোর উপর পরিষদের

কর্তৃত্বটা যথেষ্ট হওয়া চাই। অতীতে দেখা গেছে, হস্তান্তরিত বিষয়গুলোর মধ্যে রাজস্ব বাজেটের উপরেই পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থাকত আর উন্নয়ন বাজেটের ব্যাপারে কোন কর্তৃত্বই ছিল না। এটা অর্থবহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না কোনদিনই। যদি উন্নয়ন পরিকল্পনাই প্রণয়ন করতে পারবে না তাহলে যত ক্ষমতাই পরিষদগুলোকে দেয়া হোক না কেন তাতে কোন ফলোদয় হবে না। এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর কথাই বলি। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ের গুর্খা কাউন্সিলকে প্রতিবছর ৬০ থেকে ৭০ কোটি ভারতীয় রুপি দেয়া হচ্ছে, মিজোরামের একটি ছোট্ট চাকমা কাউন্সিলকে দেয়া হচ্ছে বছরে ৩ থেকে ৪ কোটি ভারতীয় রুপি। আর আমাদের তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদকে দেয়া হয়ে থাকে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা প্রতিবছর। এ থেকেই বোঝা উচিত, শুধুমাত্র কর্তৃত্ব থাকলে চলবে না, অর্থনৈতিকভাবেও এগুলোকে শক্তিশালী করে তোলার সদিচ্ছা রাখতে হবে। জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে সরকারকে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শোনা যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় হতে যাচ্ছে। যদি হয় তাহলে সেটাকে আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদগুলোর সাথে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়কে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এগুলো করে যদি একটি সিস্টেম দাঁড় করানো যায় তাহলেই পার্বত্যবাসীদের মঙ্গল হবে।

**সংবাদ ঃ** পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি ধরনের প্রশাসনিক উদ্যোগ গৃহীত হলে পার্বত্যবাসীরা উপকৃত হবে বলে আপনি মনে করেন?

**দে. রায় ঃ** পার্বত্যবাসীদের স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি দীর্ঘদিনের। তাই বলে সবকিছুই এক দিনে হয়ে যাবে এ ধরনের আশা করাটা বাস্তবসম্মত নয়। বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটেই সবকিছু বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি। গরিব এই দেশের অবস্থাকে চিন্তায় রেখে আমাদের এগুতে হবে। তাই আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদগুলোর বাস্তবায়নেও সে চিন্তা কাজ করা উচিত। তবে পূর্বেকার অভিজ্ঞতার আলোকে একথা বলা দরকার যে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বশাসিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। নতুবা পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার ও জনগণের মধ্যে যে দূরত্ব ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়ে আছে তা ঘুচানো সম্ভব হবে না। পাশাপাশি এ পরিষদগুলোকে যে অধিক হারে রাজনৈতিক প্রভাবে আচ্ছন্ন করা না হয় সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো যদি সত্যিকারভাবে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তাহলে পার্বত্যবাসীরা অনেকটা আস্থাশীল হয়ে উঠবেন।



**সংবাদ ঃ** বলা হয়ে থাকে ভূমি সমস্যাই পার্বত্য সমস্যার প্রধান কারণ। এটার নিরসন ঘটাতে কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

**দে. রায় ঃ** আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি প্রশাসন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পৃথক। এখানে কিছুটা ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত। চলমান সংলাপ প্রক্রিয়ায় পার্বত্য ভূমি ব্যবস্থায় ভূমি অধিকার নিয়ে অনেক কথাবার্তা চলছে বলে শোনা যায়। যেহেতু পার্বত্য ভূমি ব্যবস্থা জটিলতর, সেহেতু সেগুলোতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে গেলে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, হেডম্যান, কারবারিদের নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়কে অনেক রিসার্চ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শোনা যাচ্ছে চুক্তির মধ্যে ল্যান্ড কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করা থাকবে। দেখতে হবে এ কমিশনের উপর কি কি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্তির ব্যাপারে যে প্রথাগত অধিকার রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রেও কন্সালটেশানটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ হচ্ছে সবকিছু জেনেশুনেই নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে প্রপার কন্সালটেশান ও কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে। তাহলে জটিলতার নিরসন ঘটতে পারে।

**সংবাদ ঃ** ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংস্কারের যে উদ্যোগ চলছে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? এর মাধ্যমে কোন সুফল আসবে বলে আপনি মনে করেন?

**দে. রায় ঃ** যেকোন শাসনব্যবস্থা যুগোপযোগী হওয়া উচিত। তাই হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল-এর সংশোধনকল্পে যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তাকে আমি স্বাগত জানাই। তবে এক্ষেত্রে দেখতে হবে সংশোধনের কারণে যেন পাহাড়িদের প্রথাগত অধিকার ক্ষুণ্ন করা না হয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বৃটিশ আমলে প্রণীত সবকিছুকেই ঔপনিবেশিকতার অভিযোগে দোষী করলে সুবিচার করা হবে না। আমাদের দেশে অনেক কিছুই তো ঔপনিবেশিক আমলের সৃষ্ট। কিন্তু সেগুলোকেও একেবারেই ফেলে দেয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন, এর মাধ্যমে রাজা হেডম্যান ও কারবারিদের স্বার্থরক্ষারই সুযোগ রয়েছে বেশি। কিন্তু বলবো তা নয়, অনেক আগেই এ শাসনবিধির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজা ও অন্যান্যদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। কিন্তু এখনও যা আছে তা দিয়ে শুধুমাত্র পাহাড়িদের নয়, বাঙালিদেরও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সবকিছুই খারাপ মনে করে 'গামলার ময়লা

পানি ফেলে দেয়ার নামে গামলার শিশুটিকেই ফেলে দেয়া'র মতো করলে তো হবে না। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ১৯৮৯ সালে প্রণীত ১৬নং আইনের মাধ্যমে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি (হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল) রহিত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেখানে কিন্তু রাজা বা হেডম্যানের ক্ষমতা রাখা হয়েছিল, যদিও বা পাহাড়িদের প্রথাগত অধিকারের বিষয়টি লংঘিত হয়েছিল বেশিরভাগই। আমি মনে করি বিষয়গুলোতে সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে এ চিন্তাগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আমি এটাও মনে করি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দেওয়ানি কার্যবিধি প্রযোজ্য হওয়া উচিত হবে না। যদি প্রযোজ্যও হয় তাও সীমিত হওয়া উচিত। নতুবা এখানে তথাকথিত আধুনিকতা ও আইনের শাসনের নামে উকিলের রাজত্বই কায়েম করা হবে। ফলে গরিব পাহাড়ি ও বাঙালিদের দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। এমনিতে তো বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো প্রচলিত আইনগুলোর শতকরা ৯০ ভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত হয়ে গেছে। বাকি তো মাত্র ১০ ভাগ। তাই হিলট্র্যাক্টস ম্যানুয়েলের মাধ্যমে এখানে ভূমি অধিকার, আয়কর না দেয়া এবং বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম যদি রাখতেই হয় তাহলে তো কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। সবকিছু বিবেচনা করে হিলট্র্যাক্টস ম্যানুয়েলের সংশোধন করা উচিত বলে আমি মনে করি।

**সংবাদ ঃ** পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসন শান্তির ব্যাপারে একটি বড় ব্যাপার। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

**দে. রায় ঃ** এটি অন্যতম জটিল সমস্যা। অনেক শরণার্থীর জায়গা-জমি অন্যরা দখল করে নিয়েছে। কিছু কিছু জমি ডাবল সেটেলমেন্ট ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু জমির সেটেলমেন্টই হয়নি। কিন্তু সেগুলো বেদখল হয়ে গেছে। এমনও দেখা গেছে জমি বর্গা হিসেবে দেয়ার পর বর্গাদার দখল করে নিয়ে বলছে তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ সমস্যা তো অহরহ দেখা যাচ্ছে।

এমনও ঘটনা আছে যে একটা গ্রামের এক অংশে পাহাড়ি অন্য অংশ বাঙালি অভিবাসীরা সেটেলমেন্ট পেয়েছে। দেখা গেছে সেই গ্রামের পুরোটাই এক সময় অভিবাসী গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামের অনেকেই হয়তো শরণার্থী হয়ে গেছে। তারা ফিরে আসলে কি হবে, তা অনুমেয়। এসব নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহও সৃষ্টি হচ্ছে বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে, যেখানে পরস্পর সন্দেহের প্রশ্ন জাগছে। কাজেই শরণার্থীদের ব্যাপারে, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক শরণার্থী নয়, রাঙামাটির অভ্যন্তরীণ যে উদ্বাস্তুরা আছে, তাদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাদের ব্যাপারটিও খুবই জটিল। চুক্তির মাধ্যমে হয়তো একটা



ভূমি কমিশন হবে। আমি মনে করি এসকল সমস্যা সমাধানের জন্য এ ভূমি কমিশনের পরিধি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়া দরকার।

**সংবাদ ঃ** তো ভূমির দখল বেদখল নিয়ে যে প্রশ্ন আসছে, তার সহজ সমাধান কি?

**দে. রায় ঃ** এগুলোর সহজ উত্তর দেয়া কঠিন। সবার অধিকারের দিকেই নজর দিতে হবে। একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে যে, শুধু কারো উপর দোষ চাপিয়ে দিলেই চলবে না, দোষ শুধরানোর চেষ্টা করতে হবে। কে কি করছে সে প্রশ্ন আগে নয়, যা হবার হয়ে গেছে। এখন সমাধানের প্রস্তাব কি–এ প্রসঙ্গে আমি বলব, এর সমাধান সরকার করতে পারে, আমরাও করতে পারি।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্তৃত্ব সেনাবাহিনীর হাতে। এটার কি প্রয়োজন আছে?

**দে. রায় ঃ** সেনাবাহিনীর কাজ তো প্রতিরক্ষা। আমার যতটুকু মনে পড়ে এর আগের জিওসি কোন এক সরকারি মিটিংয়ে ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে সেনাবাহিনীকে না রাখার পক্ষে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা তো এ পদে থাকতে চাই না। সরকার বললে ছেড়ে দেব। সেনাবাহিনী যখন এ পদে থাকতে চাইছে না, স্বাভাবিকভাবেই সেনাবাহিনীর কাজ সেনাবাহিনীই করবে। তাদের কাজ হলো প্রতিরক্ষা বিষয়ক। কাজেই ডেভেলপমেন্ট-এর ব্যাপারটা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। উন্নয়নমূলক কাজগুলো জনপ্রতিনিধিরাই করুক।

**সংবাদ ঃ** বলা হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রীর ক্ষমতা পাচ্ছেন। এতে করে কি ঐ ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না?

**দে. রায় ঃ** যে কোন ক্ষমতা, সেটা শুধু আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষেত্রে নয়, ডেপুটি কমিশনার থেকে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে কথা উঠতে পারে। ক্ষমতা থাকলেই ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা উঠবে। কাজেই ঐ পদে যিনি থাকবেন, তার নিষ্ঠার উপরই সব নির্ভর করবে।

**সংবাদ ঃ** আঞ্চলিক পরিষদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিয়ে ইতোমধ্যে কথা উঠেছে।

**দে. রায় ঃ** আসলে পত্রিকায় যা দেখেছি, তা নিয়েই কথা বলছি। সংখ্যা দিয়ে আসলে তো সফলতা বোঝা যায় না। এটা পরিষদ গঠনের পরই বলতে পারব। সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ফলে স্থানীয় সরকার পরিষদে পাহাড়ি

বাঙালির যে আনুপাতিক হার রয়েছে সে অনুসারেই হয়তো-বা নতুন পরিষদে এ হার নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিষদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের কথা উল্লেখ ছিল না। খসড়ায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে। আমার মনে হয় মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সমাধান প্রশ্নে অন্য দুই রাজার সাথে আপনার যোগাযোগ আছে কি?

**দে. রায় ঃ** মং সার্কেলের রাজা নেই দীর্ঘদিন যাবৎ। সেখানে রাজার পদ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে। অন্যদিকে বোমাং সার্কেলের রাজা মারা গেছেন সম্প্রতি। এখানেও রাজা মনোনয়নের ব্যাপারটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে প্রাক্তন বোমাং রাজার জীবদ্দশায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান নিয়ে অনেকবার কথাবার্তা হয়েছে। তিনিও আমার মতো চাইতেন যে পার্বত্যাঞ্চলে একটি অর্থবহ ও বাস্তবসম্মত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। তার মত আমিও চাই এখানে একটি কো-অর্ডিনেটেড প্রশাসন চালু করা হোক।

**সংবাদ ঃ** আপনার পিতা প্রাক্তন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের একটি দৈনিকে যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তাতে তিনি পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সহায়তার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

**দে. রায় ঃ** সংবাদটি আমি পড়েছি। তিনি সেখানে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতার কথা বলেছেন। আমি জানি না চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজন হবে কিনা। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে ইনসারজেন্সি রয়েছে যেমন–শ্রীলঙ্কা, প্যালেস্টাইন এবং মিজোরামের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। সেখানে চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা দেখা দেয়ায় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন ছিল। তবে এক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরকারী দু'পক্ষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের সহায়তা লাগবে কিনা; তবে আমার মতে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য আরবিট্রেশনে সুযোগ রাখা দরকার। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যদি কোন আরবিট্রেশনের প্রয়োজন হয়, সেখানে যদি ত্রিদিব রায় কোন ভূমিকা রাখতে চান সেটাকে বিবেচনা করা উচিত।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানকল্পে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তির খসড়া সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য উঠছে, বিশেষত পিসিপি'র একটি অংশ বিরূপ মন্তব্য করেছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?



**দে. রায় ঃ** চুক্তির খসড়ায় কি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা না জেনে কোন মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না। কেননা এটা জানতে পারলেই হয়তো বলা যেতো যে এই চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে কি হয়নি। আমি আবারও বলতে চাই বাস্তবতার কারণে চুক্তি সম্পর্কে সবকিছু জেনেই মন্তব্য করা উচিত।

**সংবাদ ঃ** তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি অনেকেই করে থাকেন। এমন কোন ব্যবস্থার কথা বা ধারণা আপনার রয়েছে কি?

**দে. রায় ঃ** আমি মনে করি শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, বাংলাদেশের সর্বত্রই শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ দেয়া উচিত। এর মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে শিক্ষার বিষয়টাকে যেভাবে দেখা হয়ে থাকে সেভাবেই দেখতে সকলকে অনুরোধ করব। কেননা বাংলাদেশ বিশ্বেরই একটি অংশ।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত কোটা সিস্টেমটাকে নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। বিষয়টার ব্যাপারে একটা সুরাহা হওয়া উচিত। আমি মনে করি এক্ষেত্রে পাহাড়িদের জন্য নির্ধারিত কোটা অপরিবর্তিত রেখে পার্বত্যাঞ্চলের বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের জন্যও একটি কোটা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা গেলে ভাল হয়। আমি মনে করি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে পার্বত্যবাসীদের (পাহাড়ি-বাঙালি) প্রাধান্যের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেয়ার বিধান রাখতে হবে। এর ফলে মেধার প্রতিযোগিতা যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য সমস্যা সমাধানে যে চুক্তি হতে যাচ্ছে একে আপনি কিভাবে দেখছেন?

**দে. রায় ঃ** অবশ্যই এটি একটি শুভ উদ্যোগ। তবে ভূমি সমস্যাটাই সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্যই এ সমস্যাটিকে আগে সমাধান করতে হবে। তবে আবারও বলছি, এতে যেন কারো মানবাধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। চুক্তির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি চমৎকার শান্তিপূর্ণ পাহাড়ি পরিবেশ গড়তে রাজনীতিবিদদের অবশ্যই এক হয়ে কাজ করা দরকার।

## সংবাদ
## ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
## পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত

সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করতে সম্মত হয়েছে। খবর সরকারি তথ্য বিবরণীর।

## সংবাদ
## ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
মত ও মন্তব্য
## শান্তির খোঁজে পার্বত্য চট্টগ্রাম
**–হারুন হাবীব**

অক্টোবর মাসের কোন এক সময়ে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিটি সম্পাদিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারটা নিশ্চিত। অন্তত এখনো পর্যন্ত। অনেককাল ধরে অনেক মহলেরই সন্দেহ ছিল। আসলে ব্যাপারটা হয়তো ঘটবে না। শুধু আলোচনাই চলবে। আমার মনে হয়, একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে অন্তত সেই সন্দেহটি এখন আর নেই। আলোচনা বা বৈঠক যে সংঘাত বা যুদ্ধের চেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, এই সত্যটির আরেকবার প্রমাণ হতে চলেছে প্রস্তাবিত এই চুক্তির ফলে।

শুরু থেকেই শান্তি বাহিনী আইনসিদ্ধ কোন সংগঠন ছিল না। দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলো ওদের সম্পর্কে লিখতো ''আউটলড'' –অর্থাৎ বে-আইনি। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে শান্তি স্থাপন বা সার্বিক সমঝোতার স্বার্থেই তাদের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়েছে। ১৯৮৫ সালের কথা। জেঃ এরশাদের সামরিক সরকার তখন ক্ষমতায়। তবে শান্তি বাহিনী বা জনসংহতি সমিতির সাথে তখনকার বৈঠকগুলোতে সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসারগণই কেবল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন, কোন রাজনীতিবিদ নন। ব্যাপারটি যেহেতু রাজনৈতিক সেহেতু রাজনৈতিকভাবেই এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এর সমাধানের পথ খোঁজা উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। যদ্দূর জানি, সর্বমোট ছয়টি বৈঠক হয়েছিল তখন। কিন্তু কার্যকর কোন ফলাফল বেরিয়ে আসেনি।



বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে আলোচনা পরিস্থিতির বেশ খানিকটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর নতুন দিল্লি সফরের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হলো। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সেই কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করলেন। তখনকার মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদের নেতৃত্বে ত্রিপুরার আগরতলা আর বাংলাদেশের খাগড়াছড়িতে বহুবার বৈঠক হল জনসংহতি সমিতি বা শান্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সরকারের। কিছু কিছু বৈঠকে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা এবং তখনকার বিরোধী দলীয় সাংসদ রাশেদ খান মেনন প্রতিনিধিত্ব করলেন। মেনন সাহেব বেশ কয়েকবার সরকারের বা জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিত্ব করতে ত্রিপুরাতেও গেলেন। অনেক বৈঠকও করলেন। বিএনপি সরকারের আমলে ত্রিপুরার ক্যাম্পগুলো থেকে উপজাতি শরণার্থীদের দেশে ফেরার বিষয় নিয়েও পর্যাপ্ত কথা হয়েছিল। এরপর সবকিছু ভেস্তে গেছে। চুক্তি স্বাক্ষর যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি সকল শরণার্থীকেও ফিরিয়ে আনা যায়নি। কোন পক্ষই একমত হতে পারেনি বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

জেঃ এরশাদের আমলে ১৯৮৯ সালে গঠিত হয়েছে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ। জনসংহতি সমিতি বা শান্তি বাহিনী এই পরিষদ গঠনের বিরোধিতা করেছিল। আমার মনে আছে, আমরা যারা বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত, তাদের কয়েকজনকে সেবার সরকারি আয়োজনে নেয়া হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে। বিদ্রোহীদের বশ মানাতে সরকারি কার্যক্রম ঘুরে দেখানো হয়েছিল। বলাই বাহুল্য জোর করে সমাধান চাপিয়ে দেয়ার প্রশাসনিক কৌশলকে আমাদের বেশির ভাগের কাছেই তখন উপযুক্ত পদক্ষেপ মনে হয়নি। স্পষ্ট বুঝেছিলাম, এভাবে অন্তত একটা বড় রাজনৈতিক সংকটের সমাধান হয় না। তখন চট্টগ্রামের এরিয়া কমান্ডার ছিলেন মেঃ জেঃ আবদুস সালাম। তার সাথেও আমরা কথা বলেছি দীর্ঘক্ষণ ধরে। আমার ধারণা, একজন প্রাজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনিও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন।

এরপর দেশে প্রবল গণআন্দোলন হলো। জেঃ এরশাদের সরকার ধরাশায়ী হলো। একানব্বইয়ের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করলেন। নতুন সরকার নতুন করে শান্তি বাহিনীর সাথে বৈঠক শুরু করল। আগে বৈঠকগুলো হতো অফিসার পর্যায়ে, এখন হতে থাকল রাজনীতিবিদ পর্যায়ে। শান্তি বাহিনী প্রথমত এক তরফাভাবে অস্ত্রবিরতি কার্যকর করল ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট। তারপর দু'পক্ষ মিলেই এর ঘোষণা দেয়া হতে থাকল। শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এই অস্ত্রবিরতি নিঃসন্দেহে এক বড় অর্জন। কিন্তু ১৩ দফা বৈঠক করেও বিএনপি'র আমলে প্রত্যাশিত সমঝোতাটি ঘটল না। সংকট সেভাবেই রয়ে গেল।

এরপর এলো আওয়ামী লীগ। রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে রক্তাক্ত অসাংবিধানিক পন্থায় নির্বাসিত হবার একুশ বছর পর। দলটির নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে জোর দেয়া হলো। বলা হলো, তারা ক্ষমতায় গেলে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করবে। তারা নতুন করে জাতীয় কমিটির পুনর্গঠন করল। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এর প্রধান হলেন। শুরু হলো নতুন করে শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা। নতুন কমিটিও ত্রিপুরায় গেল, খাগড়াছড়িতে বৈঠকে বসল, শেষের কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করল তারা ঢাকাতে।

সে কারণেই বলি, আওয়ামী লীগের সরকার জনসংহতি সমিতি বা শান্তি বাহিনীর সাথে বৈঠক করে এবং সেই সাথে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হয়ে অপরাধ করে ফেলেছে, তা আমার কাছে একেবারেই মনে হয়নি। অথচ এই বৈঠক নিয়েও সমালোচনা হয়েছে দেখেছি। এমনও বলা হয়েছে, যে শান্তি বাহিনী বাঙালি নিধন করছে তাদের সাথে বৈঠক করা চলবে না। অথচ যারা এই দাবি তুলছেন তারাই এই ধরনের বৈঠক করেছেন ১৩ বার। আমরা রাজনীতি করিনে তাই রাজনৈতিক কৌশল বা ফন্দি না বোঝারই কথা আমাদের। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, এই ধরনের দাবি বা উচ্চারণগুলোকে রীতিমতো 'হিপক্রেসি' বলে মনে হয় আমার কাছে। রাজনীতি করলেই কাণ্ডজ্ঞানটা পর্যন্ত খোয়াতে হবে কেন? আমরা যা পারিনি ওরা তা পারবে কেন? এ ধরনের মনোবৃত্তি শুভ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছোট্ট এই বাংলাদেশের একটি বড় অংশ। দীর্ঘকাল ধরে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ শুধুমাত্র এই সংকটের কারণেই দেশের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারছে না। এখানকার অধিবাসীরা ভয়-সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এককালে উপজাতি বা জুম জাতীয়তার অংশীদাররা এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু সময়ে পরিস্থিতি পাল্টেছে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অনেক সমতলবাসীও সেখানে গিয়ে বসতবাটী গড়েছে। বাংলাদেশের মতো ঠাঁসা জনসংখ্যার এবং সীমিত ভূখণ্ডের দেশে এটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। তবে একটা সময় ছিল যখন সরকার থেকেই সমতলবাসীদের পরিকল্পনা মাফিক বসানো হয়েছিল সেখানে। সম্ভবত এই ভাবা হয়েছিল, পাহাড়িরা যখন বাগ মানছেই না তখন এক হাত দেখিয়ে দেই তাদের। আর সে কারণেই দলে দলে সমতলবাসীদের চালান করা হয়েছিল সেখানে, যাতে পাহাড়িরা ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। আমার বিশ্বাস, এই ধরনের কু-বুদ্ধিই পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে। সামরিক সমাধানের



সহজ বুদ্ধিও কম সংকটের সৃষ্টি করেনি। শেষ পর্যন্ত সবাইকে আলোচনার মাধ্যমেই সমাধানের পথে আসতে হয়েছে, কিন্তু দুই পক্ষেরই জেদ আর নির্বুদ্ধিতা কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে এরই মধ্যে। শুধু তাই নয়, যে পাহাড়ি আর অপাহাড়িরা যুগের পর যুগ বন্ধু হয়ে বসবাস করছিল তারাও পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

আমি পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ আর সরকারের বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য জেলাগুলোতে সুস্থিরতা ফিরিয়ে আনার পথ প্রশস্ত করার জন্যে। দীর্ঘকালীন অস্থিরতা কাটিয়ে সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাবার জন্যে। জানিনে, এই চুক্তি বা সমঝোতাই শেষ কথা হবে কিনা। হয়তো হবে না। তবে এই শান্তি চুক্তি স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথে প্রথম বড় পদক্ষেপ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই চুক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজনা হতে পারে। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এর বিকল্প নেই। এর বিকল্প নেই এ কারণে যে, এই চুক্তির বিনির্মাণ হয়েছে দীর্ঘকালীন আলোচনায়–কোন মারণাস্ত্রের ব্যবহারে নয়। মারণাস্ত্র সংকটের স্থায়ী সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে বরাবরই। তবে প্রস্তাবিত চুক্তিটির ধারাগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত। জাতীয় সংসদেও তা উপস্থাপন করা যেতে পারে যাতে গোটা জাতি তা জানতে পারে, আর এর বিরুদ্ধবাদিরা বলতে না পারে যে, সরকার গোপন চুক্তি করে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে। সরকারের প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা বা 'ট্রেন্সপারেন্সি' থাকবে–এটাই কাম্য।

উপজাতি বা পাহাড়িরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমতলবাসীদের জন্যে সযতনে রক্ষার মানবিক সম্পদ। একই সাথে তাদের সংরক্ষণ বা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আমাদের গণতান্ত্রিক মনমানসিকতার পরিচায়ক। ছোট বলেই কাউকে ধ্বংসের অধিকার বড়র নেই, কিংবা পারাও সম্ভব নয় আজকের এই যুগে। ক্ষুদ্র বলেই তার অধিকারকে অস্বীকার করারও জো নেই, নেই ছোটরও বড়কে অস্বীকারের। 'মাইনরিটি'কে রক্ষা করতে না পারলে 'মেজরিটি' তার সভ্যতার সম্মানবোধকে জলাঞ্জলি দেয়। আমার বিশ্বাস, দুই পক্ষই ব্যাপারটিকে অনুধাবন করবেন। উত্তেজনা, অবিশ্বাস আর রক্তপাত অনেক হয়েছে, এবার অন্তত শান্তির সুবাতাস বইবার সুযোগ করে দেয়া হোক।

যদ্দূর বুঝি, 'রিয়েলিটি' বা বাস্তবতাকে দু'পক্ষই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন আজ। 'রিয়েলিটি' হচ্ছে, অস্ত্রের ব্যবহারে জুম জাতীয়তার কট্টরপন্থীরা যেমন তাদের ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন না কখনোই, তেমনি অস্ত্রের ব্যবহারে কোন সরকারও সক্ষম হবে না পাহাড়িদের বাগ মানাতে। দু'পক্ষের এই জেদ উত্তরোত্তর ধ্বংস আর রক্তপাতই বাড়াতে পারে

শুধু। শান্তি চুক্তির খসড়া তৈরির পর ঢাকাতে এবং দুদুকছড়িতে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বা সন্তু লারমার বক্তব্যগুলো আমার কাছে একজন জ্ঞানী আর প্রাজ্ঞ নেতার বক্তব্য বলে মনে হয়েছে। সরকারের সদিচ্ছা আর সংকট সমাধানের ঐকান্তিক ইচ্ছেকে মিঃ লারমা প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সূত্রগুলো মিঃ লারমা এবং তার সহকর্মীদের সংকট অনুধাবনের যোগ্যতাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে আর একটি বড় ব্যাপার যা হয়েছে, তা হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের আওতাতেই সংকটটির সমাধান হচ্ছে। এতে করে এর বিরুদ্ধবাদিরা জল ঘোলা করার কাজে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এই দেশের মাটি, যে দেশের জন্ম দিতে ত্রিশ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে উনিশশ' একাত্তরে। এই সত্যটিকে অস্বীকার করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতি কিংবা তাদের রাজনৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করে তা কখনোই সম্ভব নয়। আইনসঙ্গতভাবে যে সমতলবাসীরা সেখানে আছে এবং দীর্ঘদিন ধরে আছে, তাদের সেখানে সম-অধিকারে থাকবার অধিকার আছে। দেশের সেনাবাহিনীকে সেখানে থেকে গোটাটাই তুলে নিতে হবে–এমন দাবি না মানার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কিন্তু সেনাবাহিনী সেখানে যুদ্ধাবস্থায় এবং আজকের অবস্থায় থাকবে না–এটাই সবার কাম্য।

শেষ করার আগে বলতে চাই, যত শিগ্‌গির চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ততই মঙ্গল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অনেকের কাছেই কমবেশি একটা 'ট্রেড', কারও কারও কাছে আবার 'পলিটিক্স'ও। কাজেই প্রস্তাবিত চুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটাও অস্বাভিক নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অস্থিতিশীল থাকুক–এটা অনেকেই মনেপ্রাণে চায়। এই শ্রেণীটির কাছে মানুষ বড় নয়, স্বার্থ বড়।

**সংবাদ**

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

স্থানীয় পরিষদ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

**শান্তি প্রক্রিয়া সমর্থনে জনমত**
**গড়ে তোলার আহ্বান**

**॥ সুনীল কান্তি দে ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রক্রিয়ার সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল জাতীয় সংসদের সম্মেলন কক্ষে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের চেয়ারম্যান



সদস্য ও পার্বত্য সাংসদদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিফ হুইপ এ আহ্বান জানান।

সভায় তিনি আরো বলেন, স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর উন্নয়ন বাজেট বাড়ানো এবং পরিষদের কাছে স্থানান্তরিত বিষয় ও বিভাগসমূহের শূন্য পদগুলো অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি খাগড়াছড়ি থেকে চন্দনাইশে স্থানান্তরিত সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (সার্কেল) খাগড়াছড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানান।

স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ সূত্রে পাওয়া তথ্য মতে, গতকালের সভায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান থোয়াই ব প্রু মাস্টার ছাড়াও কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি ও তিন পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের ৪ জন করে মোট ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩ ঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকে পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থায় পরিষদগুলোকে শক্তিশালী করার অনুরোধ জানান।

**সংবাদ**

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

বিশেষ সাক্ষাৎকারে হংসধ্বজ চাকমা

**শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধীরা খুবই নগণ্য**
**পাহাড়ের মানুষ চায় শান্তি**

**॥ সুনীল কান্তি দে ও সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বলেছেন, চূড়ান্তভাবে চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তির সব শর্ত বাস্তবায়ন নির্ভর করবে সরকারের সদিচ্ছার উপর। গতকাল সংবাদ-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বিষয়ে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হবে। চুক্তি সম্পাদনের পর জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। তিনি মনে করেন সেনাবাহিনী পার্বত্য সমস্যা সমাধানে খুব একটা বড় বাধা নয়। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভূমি সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে সরকার ও জনসংহতি সমিতি প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। দু'একটি ব্যাপারে মতভেদ আছে। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যদি আরেকবার সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়, তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি না।

তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, খসড়া চুক্তি প্রণয়নের পর যারা এর বিরোধিতা করছে, তাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতিই একমাত্র সংগঠন, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। তিনি বলেন, পাহাড়ের মানুষ খসড়া চুক্তির খবর পেয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে। কারণ তারা চায় শান্তি।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে যে সংলাপ শুরু হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে এবার একটি খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি আসবে এ ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

**হংসধ্বজ ঃ** আমি আশাবাদী, পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ শান্তির জন্য আশাবাদী, পত্রপত্রিকা এবং রেডিও-টেলিভিশনে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের সংবাদ পেয়ে মানুষ উল্লাস প্রকাশ করছে মিটিং মিছিলের মাধ্যমে। ২০ থেকে ২৪ বছর সময়ের একটা অস্থিতিশীল অবস্থায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল, অন্যায়-নিপীড়নে যখন মানুষ জর্জরিত হচ্ছিল তখন এতবড় আনন্দ সংবাদ পার্বত্যবাসীদের কাছে একটা বড় পাওনা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

**প্রশ্ন ঃ** বর্তমান সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে পরপর ৬টি বৈঠকের পর একটি খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। এটি চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বাস্তবায়িত হতে গেলে কি কি বাধা আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

**হংসধ্বজ ঃ** বাধা কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। চুক্তির খসড়া হয়েছে, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্ত হওয়ার পর বাস্তবায়নকালে সবকিছুই নির্ভর করবে সরকারের সদিচ্ছার উপর। চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুখ-শান্তি আসবে।

**প্রশ্ন ঃ** পার্বত্যবাসীদের অনেকেই সেখানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীকে সমস্যার একটা কারণ বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

**হংসধ্বজ ঃ** সেনাবাহিনী কোন সমস্যা নয়, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী আছে, আমি মনে করি তাদের বাসস্থল সেনানিবাস। সমস্যার সমাধান যখন হয়ে যাবে তখন ওখানে সেনাবাহিনী থাকার কোন প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই সেনাবাহিনী পার্বত্য সমস্যা সমাধানে খুব একটা বড় বাধা নয়।

**প্রশ্ন ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে ভূমি সমস্যাটাই প্রধান বলে অনেকে মনে করেন। শোনা যাচ্ছে, ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার ও জনসংহতি সমিতি এখনও খুব একটা কাছাকাছি অবস্থানে আসতে পারেনি।



**হংসধ্বজ ঃ** ভূমি সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে সরকার ও জনসংহতি সমিতি প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। দু'একটা ব্যাপারে ভেদাভেদ আছে। আমি সেজন্যই বলি যে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে সব কিছুর সমাধান সম্ভব।

**সংবাদ ঃ** ভূমি সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে কোন কোন পয়েন্টে মতপার্থক্য রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

**হংসধ্বজ ঃ** যেহেতু চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি, সেহেতু এই মুহূর্তে এসব কথা বলা ঠিক হবে না; কেননা কোন কথা যদি বিতর্কিত হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক।

**সংবাদ ঃ** কবে নাগাদ চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হতে পারে?

**হংসধ্বজ ঃ** সরকার যদি সদিচ্ছা দেখায় তাহলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে অথবা নভেম্বর মাসের মধ্যে যেকোন তারিখেও হতে পারে।

**সংবাদ ঃ** নভেম্বর মাসটাকেই আপনি চুক্তি স্বাক্ষরের মাস হিসেবে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা হচ্ছে এটা অক্টোবরেই হবে। তা নভেম্বর মাসে চুক্তি করার পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

**হংসধ্বজ ঃ** এত বছরের আন্দোলনের পর একটা অধিকার আমরা পেতে যাচ্ছি, সরকার দিতে যাচ্ছে। এটাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব এজন্য আমাদেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এর সাথে জনমতের প্রয়োজন আছে। নভেম্বর মাসকে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় হিসেবে বেছে নেয়ার যুক্তি হলো, ১০ই নভেম্বর তারিখে পাহাড়িদের প্রিয় নেতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু দিবস। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণ প্রতিবছর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তা পালন করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কাজেই এর প্রস্তুতি হিসেবে এটা করার সাথে সাথে আমরা তার স্মৃতি রক্ষণার্থে তিনি যে সংগ্রাম করে গেছেন, আন্দোলন করে গেছেন, এই অধিকার আদায়ের জন্য তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন, তার স্মৃতি রক্ষার্থে যদি চুক্তি হয় নভেম্বরেই হবে।

**সংবাদ ঃ** জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধান হতে চলেছে তাতে কি সংবিধান লংঘিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

**হংসধ্বজ ঃ** সংবিধানের প্রশ্ন তুললে আমাকে কিছুটা পিছনের দিকে ফিরে যেতে হবে। '৭২-এর সংবিধান রচনা হচ্ছিল যখন প্রয়াত সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার দলবল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সংবিধানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা উল্লেখ নেই

বলেই তো এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সে সময়েই প্রয়াত লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের কথা লিখে রাখার কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। এখনকার সংবিধানের কথা বললে তো হবে না। বৃটিশ আমলের সংবিধানেওতো উপজাতীয়দের কথা লিখা ছিল, একইভাবে পাকিস্তান আমলেও ছিল। অচিরেই পার্বত্যবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াবলি সংবিধানে যুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

**সংবাদ ঃ** কিন্তু সংবিধানে কোন সংযোজন বা সংশোধনী আনার মতো মেজরিটিতো বর্তমান সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেই।

**হংসধ্বজ ঃ** আমি মনে করি দেশের ও জনগণের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। সংবিধানে তো অনেকবার সংশোধন করা হয়েছে। তাই পার্বত্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে যদি আরেকবার সংশোধনী আনা হয় তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি না।

**সংবাদ ঃ** আপনি তো জানেন যে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে বর্তমান জাতীয় সংসদের বেশিরভাগ বিরোধীদলই আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতা করছে না, এ অবস্থায় সংবিধান পরিবর্তন না করেও যদি এ সমস্যার একটা সমাধান বের করা হয় তা কতটুকু কার্যকর হবে?

**হংসধ্বজ ঃ** সংবিধান পরিবর্তন না করে যদি পার্বত্য সমস্যা সমাধান করা হয় তাহলে উল্লেখ করতে হবে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদের ৩টি আইনের কথা এই আইনের মাধ্যমে তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে ২২টি বিষয় হস্তান্তরের কথা ছিল। এরমধ্যে কয়েকটি বিষয় হস্তান্তরের পর বাকিগুলো দেখা হয়নি। '৮৯ সালে দেয় বিষয়গুলো যখন '৯৭ সালে প্রণীত চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট আঞ্চলিক পরিষদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এর আগে দু'টি চুক্তি হয়েছিল। আগের অভিজ্ঞতায় এবারের চুক্তি কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়?

**হংসধ্বজ ঃ** আমি মনে করি বাংলাদেশের মূল রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে আওয়ামী লীগ। অন্য সংগঠন যেগুলো সেগুলোর বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ থেকে ঝরে পড়া নেতাদের নিয়েই। কজেই মনে করছি যে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একটা সদিচ্ছা আছে–যা উনারা দেখাচ্ছেন তাতে আমি উনাদের অর্থাৎ আওয়ামী লীগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কাজেই আওয়ামী লীগের আমলে যদি পার্বত্য সমস্যার সমাধান না হয়, অর্থাৎ শান্তি না আসে তাহলে অন্য কোন দলের কাছ থেকে তা আমি আশা



করতে পারি না। আমরা দেখেছি এরশাদের আমলে দুটি চুক্তি হয়েছে। একটার মাধ্যমে ২শ'র বেশি সংখ্যক শান্তিবাহিনী নেতা-কর্মী সারেন্ডার করেছিল, ওই চুক্তিটা তো মোটেই বাস্তবায়ন করা হয়নি। '৮৯-এর চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা হয়। ওই সরকার অর্থাৎ এরশাদ সরকার টিকে থাকলে দ্বিতীয় চুক্তিটি সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হতো কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। এখন আওয়ামী লীগ সরকার পূর্বতন স্থানীয় সরকার পরিষদের অনুকরণে ওগুলোর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে ও অধিকার দিয়ে যে চুক্তি করতে যাচ্ছেন সেই সদিচ্ছার মূল্য যদি আমরা না দিই তাহলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন যথাযথ হবে না। এজন্য আমি মনে করি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যে চুক্তি হবে সরকার তা বাস্তবায়ন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

**সংবাদ ঃ** দাবি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পুনর্বাসিত বাঙালিদের প্রত্যাহারের দাবিটা দীর্ঘদিনের। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর দুদুকছড়ায় জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা বলেছেন–চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি ও বাঙালি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি?

**হংসধ্বজ ঃ** আমার ধারণা হচ্ছে–অনাদিকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বাঙালি সহাবস্থান করে আসছে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু, এখানে কিন্তু আছে। সেটেলারদের ব্যাপারে এখনও প্রশ্ন আছে। তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে নেয়া হয়েছিল, এখনও তারা পুনর্বাসিত হননি। এখনও তারা ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হননি। ভোটাধিকার পেলেই যে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া যায় আমি তা মনে করি না। তারা যদি পুনর্বাসিত ও স্থায়ী বাসিন্দা হতেন তাহলে তাদের এখনও পর্যন্ত রসদ বা রেশন দিয়ে গুচ্ছগ্রামে রাখা হতো না। রেশন প্রদানের মাধ্যমে যদি পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে তাহলে উপজাতীয় শরণার্থী যারা দেশে ফিরে আসছেন তাদেরকেও লালন-পালন করতে হবে। এটা কি সম্ভব? তাই আমি সন্তু লারমার বক্তব্যের ভিতরে সেটেলারদের থাকার বিষয়টি নেই বলে মনে করি।

**সংবাদ ঃ** শান্তি বাহিনীর সদস্যরা শান্তির ব্যাপারে কি ভাবছেন? অর্থাৎ অস্ত্রধারীরা কি ভাবছেন?

**হংসধ্বজ ঃ** জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপ হচ্ছে শান্তি বাহিনী। কাজেই জনসংহতি সমিতি যা মনে করবে শান্তি বাহিনীও সে চিন্তা করবে। জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে নিম্নস্তরের কর্মীরা চাচ্ছেন বলেই সমাধানের পথে সকলে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এ কথাও মনে রাখতে হবে, ১৯৯২ সালের ১০ই আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। শান্তিবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়ে এখনও পর্যন্ত চলছে।

**সংবাদ ঃ** জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর সদস্যসংখ্যা কত?

**হংসধ্বজ ঃ** সদস্যসংখ্যা অনেক। তাদের অনেক গ্রুপ আছে গ্রাম পর্যন্ত। তারা যখন লিস্ট বের করবে তখনই বলা যাবে প্রকৃত সদস্যসংখ্যা কত।

**সংবাদ ঃ** পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, জনসংহতি সমিতি আগামী ৮ই অক্টোবর তাদের কংগ্রেস করবে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি?

**হংসধ্বজ ঃ** আমি এ ধরনের কোন খবর শুনিনি। আমি মনে করি কংগ্রেস আহ্বানের কোন প্রয়োজন নেই। অনেক আগেই তারা একমত হয়েছেন।

**সংবাদ ঃ** ত্রিপুরায় অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ চলছে। কবে নাগাদ তারা ফিরতে পারেন এ ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কি?

**হংসধ্বজ ঃ** আমি আগেও বহুবার বলেছি যে, জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের চুক্তি হয়ে গেলে পাহাড়ি শরণার্থীদের কেউ ধরে রাখতে পারবে না–তারা এমনিই চলে আসবেন। তাদের নিরাপত্তার অভাবেই তো তারা চলে গেছেন। তাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সম্পদ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা চলে গিয়েছিলেন। এখন শান্তি যদি ফিরে আসে, স্বাভাবিকতা ফিরে আসে তখন শরণার্থীরা অবশ্যই ফিরে আসবেন। তাদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে একের পর এক যে সমস্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যখন কাজ করা হয়নি তখন তারা আসতে চাননি। আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর ২০ দফা গুচ্ছচুক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত ঘোষণা মোতাবেক অনেক কিছু দেয়া হয়নি বলেই তো বাকিরা আসছেন না। বেশি যে সমস্ত দাবি নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো আমার মতে ২০ দফার উপর জোর দেয়ার জন্যই করা হয়েছে। তাহলে এগুলো বাস্তবায়ন হলে তারা অবশ্যই আসবেন। আমি মনে করি প্রথমে একটু ভুলত্রুটি থাকবে।

**সংবাদ ঃ** পিসিপি, গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মধ্যে শান্তি চুক্তির ব্যাপারে যে মতদ্বৈততা চলছে তাতে কি চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে?



**হংসধ্বজ ঃ** না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না মাত্র দু'একজন বিরোধিতা করলেও বেশিরভাগই চুক্তির পক্ষে রয়েছেন এবং সকলেই একসাথে কাজ করছেন। একটা ছোট পক্ষ ঢাকায় বসে এসব বিরোধিতা করলেও শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে শান্তি সবাই চায়।

**সংবাদ**

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

সংবাদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিন স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান

**চুক্তি হলে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আসবে, সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে**

॥ **সুনীল কান্তি দে ও সাগর সরওয়ার** ॥ তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন তিন চেয়ারম্যান বলেছেন, চুক্তি হলে এই অঞ্চলে অবশ্যই শান্তি আসবে। সংবাদ-এর সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎকারে তারা বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে পাহাড়ি ও বাঙালিকে এক সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে হবে। সরকার এবং জনসংহতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি যত শিগগির হয় ততই ভাল বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

রাঙামাটির চিং কিউ রোয়াজা, খাগড়াছড়ির সমীরণ দেওয়ান এবং বান্দরবানের থোয়াই চ প্রু মাস্টার এই সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তারা মনে করেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান নিশ্চিত করতে পারবে। সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ ঃ

**চিং কিউ রোয়াজা,** চেয়ারম্যান, রাঙামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আগামী ৭ম বৈঠকে চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হবে কি না।

**চিং কিউ ঃ** আশা করি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ থেকে ৮ বছর আগে আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে, আজকে সেটা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত। চুক্তি যে হবে এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। আমি রাঙামাটি থেকে আসছি, বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি যে জনগণ অনেকটা নীরব। এই নীরবতা দেখে আমার মনে সাহস সঞ্চারিত হয়েছে, কেননা আমি বিশ্বাস করি মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। তবে কিছু সমস্যা যে নেই তা বলাটা ঠিক হবে না। কেননা আপনারা জানেন যে, ১৯৯১ সালে বিএনপি যখন রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছিল এবং তারা এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। তাদের সে চেষ্টার মধ্যে কতটুকু আন্তরিকতা ছিল তা তারাই জানে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি তারা কতটুকু আন্তরিক ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে জনগণ ও জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণেই আজ সরকার ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে এ পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব আস্থা স্থাপন করেছেন বলেই তারা সুদূর দুদুকছড়ি থেকে রাজধানী ঢাকায় এসে আলোচনায় বসার সাহস পেয়েছেন। আমি একথা বলছি এ জন্যেই যে, বিএনপি আমলেও জনসংহতি সমিতিকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল; কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি বলেই তারা তখন ঢাকায় আসেননি। বর্তমান সরকারের আমলে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন বলেই তারা ঢাকায় ছুটে এসেছেন।

**সংবাদ ঃ** শোনা যাচ্ছে ত্রিপুরায় অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীরা একযোগে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। একবারে সকলে ফিরে আসলে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে?

**চিং কিউ ঃ** আসলে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। একটা দেশে তড়িঘড়ি করে যেভাবে যাওয়া যায়, আবার ওখান থেকে ফিরে আসার ব্যাপারটি সেভাবে করা গেলেও শরণার্থীদের কাঙ্ক্ষিত পুনর্বাসন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমি মনে করি শরণার্থীদের সংখ্যানুপাতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই প্রত্যাবর্তন কাজ শুরু করা দরকার। এর বাইরে অতিরিক্ত কিছু করাটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি না। তারপরও যদি কিছু অতিরিক্ত করা হয় তাহলে পূর্বেকার সরকারগুলোর আমলের পুনর্বাসনের মত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

**সংবাদ ঃ** শান্তি চুক্তির পর ফিরে আসা শান্তি বাহিনী সদস্যদের কিভাবে পুনর্বাসন করা যায়?

**চিং কিউ ঃ** আমি মনে করি সকলকেই যোগ্যতা অনুসারে পুনর্বাসিত করার উদ্যোগ নেয়া দরকার।

**সংবাদ ঃ** সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার বিষয়ে যে প্রচার চলছে সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

**চিং কিউ ঃ** যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ সেহেতু এখানে সেনাবাহিনী থাকবে। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর অস্থায়ী



সেনাক্যাম্প যেহেতু থাকার প্রয়োজন নেই সেহেতু সে সমস্ত ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের সেখানে থাকার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

**সংবাদ ঃ** আগামীতে শান্তি চুক্তি যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করেন?

**চিং কিউ ঃ** বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার মতে রাজনৈতিক বিরোধিতা তো আছেই, অর্থাৎ একটা দল যদি কোনকিছু ভাল করতে চায় তাহলে আরেকটি দল এটার মধ্যে বটল নেক সৃষ্টি করতে উঠেপড়ে লাগে। এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের একটা কমন ফেনোমেনা বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ অন্য দলের সুনাম বাড়ুক তা প্রতিপক্ষ সহ্য করতে পারে না। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটবে বলে আমি মনে করি না। তবে আমরা মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের সকলে কিন্তু এটা চায় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি ইতিবাচক সমাধান নিশ্চিত হোক। আর আমরা চাই বলেই আমি মনে করি সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে একটা চুক্তি হতে যাচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। যদি কোন বাধা আসে তাহলে তা মটিভেশনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তা দূরীভূত করা উচিত। পুনর্বাসিত বাঙালিদের অনেকের মধ্যে এ ধারণা কাজ করে যে তারা একটি ছত্রছায়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছেন, সেই দল যদি তাদের আশ্রয় না দেয় তাহলে তারা অসহায় হয়ে পড়বেন। কিন্তু আমি বলব ১৯৯১ ও ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পরবর্তী ফলাফল থেকে তাদের ভুল ভাঙা উচিত।

**বাবু সমীরণ দেওয়ান**, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ

**সংবাদ ঃ** পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?

**সমীরণ ঃ** দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যার কারণে সংঘাত, সাম্প্রদায়িকতা এবং রক্তক্ষরণের ঘটনায় পার্বত্যাঞ্চল কলুষিত ছিল। যেহেতু পৃথিবীর কোন সমস্যাই সংঘাতের মাধ্যমে সমাধান হয়নি সেহেতু পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যাও সংঘাতের পথে নয়, শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

**সংবাদ ঃ** শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

**সমীরণ ঃ** জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পার্বত্যাঞ্চলের দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যাকে একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর সমাধানের জন্য মাননীয় চিফ হুইপের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন। জাতীয় কমিটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ

ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তাই জনসংহতি সমিতিও বাস্তবতার উপলব্ধিতে অনেক দূরত্ব কমিয়ে এনে বর্তমান সুন্দর একটি সমাধানের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী একটি মহলের চক্রান্ত বন্ধ থাকবে না। সকল ষড়যন্ত্রকে ভেদ করে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক সিংহভাগ পার্বত্যবাসী তাই কামনা করে। তাদেরই একজন হিসেবে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী।

**সংবাদ ঃ** পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন।

**সমীরণ ঃ** যারা ত্রিপুরায় আছেন, তারা বাংলাদেশেরই নাগরিক। তারা পার্বত্য এলাকার বিরাজমান সমস্যার শিকার। বর্তমান সরকার একদিকে যেমনি পার্বত্য এলাকার চলমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের প্রয়াস চালাচ্ছেন, তেমনি অন্যদিকে শরণার্থীদের দেশে ফেরত এনে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

আমার মনে হয় সরকারের এই মহতী প্রয়াস সফলতার মুখ দেখেছে। প্রায় ৭ হাজার শরণার্থী ফেরত এসেছে। সরকার তাদের ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির আওতায় পুনর্বাসন করেছে। আশা করি বাকিরাও ফেরত আসবে এবং তাদেরকেও যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হবে।

**সংবাদ ঃ** শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন কিভাবে করা হবে বলে আপনি মনে করেন?

**সমীরণ ঃ** শান্তি বাহিনীর সাথে সম্পৃক্তরা এ দেশেরই সন্তান। সরকার যেহেতু তাদের রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য এলাকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের প্রয়াস চালাচ্ছেন সেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের নাগরিক হিসেবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার সুষ্ঠু পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে মনে করি।

**থোয়াই চ প্রু,** চেয়ারম্যান, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ

**সংবাদ ঃ** শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

**থোয়াই চ প্রু ঃ** দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যাকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের যে উদ্যোগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়ে আমি বলব, এর মাধ্যমে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

**সংবাদ ঃ** বান্দরবানের বিভিন্ন জায়গায় বর্মী সন্ত্রাসীদের অবস্থানের কারণে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে কি?



**থোয়াই চ প্রু ঃ** অতীতেও বর্মী সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন অপকর্ম করেছে বান্দরবানে, যদিও বা অনেকে এগুলোকে শান্তি বাহিনীর কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন। আমি মনে করি সেটা ভুল। তাই আমি মনে করি অতীতের মতো ভবিষ্যতেও বর্মী সন্ত্রাসীদের কারণে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালিদের সহাবস্থান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

**থোয়াই চ প্রু ঃ** এ কথাতো সত্য যে আমরা যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছি। আমাদের মধ্যে তো কোন অবিশ্বাস বা অসন্তোষ নেই। তাছাড়া অতিসম্প্রতি জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা এ ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তারপর তো আর কোনকিছু বলার বা সন্দেহ করার থাকতে পারে না। সর্বোপরি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরতদের ব্যাপারে যে ঘোষণা দিয়েছেন তাতে আশা করি অনেকের সন্দেহই দূর হয়ে গেছে ও যাবে।

**সংবাদ ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

**থোয়াই চ প্রু ঃ** আমার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেখানে ইমারজেন্সি রয়েছে সেখানেই সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প আছে। যদি শান্তি ফিরে আসে, সে সমস্ত অস্থায়ী ক্যাম্পের আর প্রয়োজনই হবে না।

**সংবাদ ঃ** শোনা যাচ্ছে শান্তি চুক্তি সই করতে আরো কিছুটা সময় নেবে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

**থোয়াই চ প্রু ঃ** আমি মনে করি অতিশিগগির শান্তি চুক্তি সই করা দরকার। কেননা পরিস্থিতি ও পরিবেশকে যেভাবে ঘোলাটে করার চেষ্টা চলছে তাতে আমার মনে হয় চুক্তি সম্পাদন দেরি করাটা ঠিক হবে না।

**সংবাদ**
**১লা অক্টোবর ১৯৯৭**

## শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন জোরদার হবে –প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল মঙ্গলবার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, শান্তি চুক্তি সইয়ের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরো জোরদার হবে। খবর বাসস’র।

তিনি বলেন, এই এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার আগে আমাদের অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যানগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি একথা বলেন। স্থানীয় পরিষদগুলোর সদস্যবৃন্দও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, শান্তি প্রক্রিয়া এখন চলছে এবং চুক্তি সইয়ের পর উন্নয়ন কার্যক্রম আরো জোরদার হবে। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই অঞ্চলের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের কল্যাণে এসব ব্যবহার করা হবে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে যাতে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য জেলাসমূহের নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, সরকার গঠনের আগেও তার দল এই এলাকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কাজ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে।

চেয়ারম্যানগণ শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পেছনে শেখ হাসিনার প্রগতিশীল ভূমিকার জন্য তাকে অভিনন্দন জানান। তারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

তারা স্থানীয় কিছু সমস্যা সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তিনি এসব সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য সকল ধরনের সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেন।

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ আমির হোসেন আমু, আবদুল জলিল, শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি ও বীর বাহাদুর এমপি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যানগণ হচ্ছেন খাগড়াছড়ির সমীরণ দেওয়ান, রাঙামাটির চিং কিউ রোয়াজা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার থোয়াই চ প্রু মাস্টার।

**সংবাদ**

৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৭

## বান্দরবান ঃ অবস্থান নিয়েছে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন 'বাহিনী'

**সুনীল কান্তি দে ॥** সম্প্রতি বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি থানা সদরের বাজার এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন মানুষকে নাড়া দিয়েছে। পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সময়ে এই সশস্ত্র হামলা কেন হচ্ছে–কারা করছে এবং এদের পেছনে কারা রয়েছে একথা



জানার আগ্রহ এখন প্রতিটি সচেতন পার্বত্যবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বান্দরবানের গভীর অরণ্যে অবস্থানরত বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনীর অস্তিত্বের কথা শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এদের মধ্যে যেমন বিদেশী বিভিন্ন বাহিনী রয়েছে তেমনিভাবে রয়েছে দেশীয় বাহিনীও। শোনা যাচ্ছে বিগত সরকারের আমলে এ বাহিনীর অনেকগুলোকেই সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসা হয়েছে। যে কারণে এ গ্রুপগুলোর অনেকের কাছেই বান্দরবান জেলার পথঘাট অতি পরিচিত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বান্দরবানের অনেকের সাথেই এদের ছিল লেনদেন, উঠাবসা।

এমন অভিযোগও রয়েছে যে, এ সমস্ত গ্রুপের বেশিরভাগ লোকই কয়েকটি অস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোকাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। যে সমস্ত গ্রুপ বান্দরবানের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আরাকান আর্মি, আরাকান লিবারেশন পার্টি, আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট, চায়না ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট, ক্যায়াং আর্মি, খেয়াং পার্টি, মারমা পার্টি, সুইপ চিং পার্টি, ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ আরাকান, মারমা ইন্ডিপেনডেন্স ফ্রন্ট অফ আর্মি ও লাল বাহিনী (নুরুং বাহিনী)। বান্দরবানের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরি করছেন এমন একজন সরকারি কর্মকর্তার মতে বিগত সরকারের আমলে এ সমস্ত সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপকে যে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে একথা বান্দরবানের অনেকের জানা আছে। তার মতে বর্তমান সরকারের আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অফিসিয়ালি বন্ধ হয়ে গেলেও পৃষ্ঠপোষক সংস্থাগুলোর অনেকের সাথেই সশস্ত্র গ্রুপগুলোর যোগাযোগ রয়ে গেছে। বান্দরবান শহরের কিছু সংখ্যক লোকের সাথে কথাবার্তা বলে জানা গেছে, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী একটি প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যদের বেশিরভাগই বান্দরবানের এ সমস্ত সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে জড়িত রয়েছে। তাদের মতে, স্থানীয় প্রশাসনের অনেকেই সবকিছু জেনেশুনেও এ পরিবারকে ঘাটাতে সাহস পান না। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলি থানা সদর থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার ও সেকেন্ড অফিসার অপহরণের পর তাদের আত্মীয়স্বজনরা বান্দরবানের ওই প্রভাবশালী পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও লেনদেন চালিয়েছিল বলেই শেষ পর্যন্ত ব্যাংক ম্যানেজারকে জীবিত ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। আরো জানা গেছে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের সদস্য প্রসন্ন তঞ্চঙ্গ্যাকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে যে আক্রমণ চালানো হয়েছিল তাতেও ওই প্রভাবশালী পরিবারের পরোক্ষ হাত ছিল।

তাই অবিলম্বে বান্দরবান জেলায় অবস্থানরত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে স্থানীয় অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এজন্য সরকারের উর্ধ্বতন মহলকে নতুনভাবে ভাবা দরকার রয়েছে। এ কথাতো সবারই জানা আছে যে, বান্দরবানের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত বর্মি নাগরিক রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বান্দরবান ও কক্সবাজারে শুরু হয়েছে। তার সাথে বান্দরবানের বিভিন্ন অঞ্চলের গভীর অরণ্যে ওঁৎ পেতে থাকা এ সমস্ত সন্ত্রাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে যদি কোন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত গর্জে উঠে তাহলে শুধুমাত্র পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, গোটা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

**সংবাদ**

**১১ই অক্টোবর ১৯৯৭**

**কংগ্রেসে চাপ : শান্তি চুক্তি হতে পারে ১০ই নভেম্বর**

॥ **সাগর সরওয়ার** ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মাঠ পর্যায়ের নেতারা আগামী ১০ই নভেম্বর শান্তিচুক্তি সই করার জন্য সমিতির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের প্রতি চাপ দিচ্ছে। পার্বত্যাঞ্চলে শান্তিচুক্তির খসড়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনসংহতি সমিতির প্রায় ২শ' সদস্যের কংগ্রেস এখন খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী বুধবার শান্তিচুক্তির খসড়া অনুমোদনের ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। দুদুকছড়া থেকে ১ মাইল পশ্চিমে রইস্যাবাড়ি নামক স্থানে এ কংগ্রেস হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বুধবার শুরু হওয়া এ কংগ্রেসে গত সেপ্টেম্বরে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির যে খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছিল, সেই খসড়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছেন। আগামী মঙ্গলবার এ অধিবেশন শেষ হবে। এতে সভাপতিত্ব করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। তার সঙ্গে সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের সকল নেতা রয়েছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রটি উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের সকল গোয়েন্দা বিভাগ এ কংগ্রেসকে ফলো করছে। সূত্র জানায়, প্রথম দিন সন্তু লারমা আগত পাহাড়ি নেতাদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বর্তমান সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির এ পর্যন্ত যেসব বিষয় আলাপ আলোচনা হয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে তিনি জানিয়েছেন।



রইস্যাবাড়ির পাশের গ্রাম বটতলায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে নিহত হয়েছিলেন বলে সেই স্থানকে জনসংহতি সমিতির নেতারা পবিত্র বলে মনে করেন। বটতলায় স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে রইস্যাবাড়িতে এ কংগ্রেস করছেন।

সূত্র জানান, এ সভায় যেসব মাঠ পর্যায়ের নেতারা যোগ দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই চান যতো শিগ্‌গির সম্ভব পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। তবে সংখ্যায় নগণ্য এমন কিছু উগ্রপন্থী নেতা সরকারের সঙ্গে চুক্তি না করার বিষয়ে মত রেখেছেন।

এই সভায় আগামী মাসের ১০ই নভেম্বর শান্তিচুক্তি সই করার জন্য নেতৃবৃন্দকে মাঠ পর্যায়ের নেতারা চাপ দিচ্ছেন বলে সূত্র জানান। উল্লেখ্য, ঐ দিন পাহাড়ের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী।

চলমান এ সভায় শান্তিচুক্তির পর পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অধিকাংশই মত রাখছেন। শান্তিবাহিনীর নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে, আগামী বুধবার শীর্ষ পর্যায়ের ১৫ জন নেতা মিলে শান্তিচুক্তি অনুমোদন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

**সংবাদ**

**১২ই অক্টোবর ১৯৯৭**

**পার্বত্য নেতারা সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন**

॥ **সুনীল কান্তি দে** ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির সপক্ষে তিন পার্বত্য জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ব্যাপক জনসংযোগ শুরু করেছে। সংগঠনের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর নেতা-কর্মীরা জনসংযোগ উপলক্ষে আয়োজিত সভাসমূহে বক্তব্য রাখছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, শান্তিবাহিনীর উর্ধ্বতন নেতাদের বেশিরভাগই এ সমস্ত জনসংযোগমূলক সফরে অংশ নিচ্ছেন। এসব সভায় জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফার কোন্ কোন্ দাবি আদায় হবে এবং হবে না সে সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। রাঙামাটি জেলার এক উপজাতীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির বক্তব্য হলো, শান্তিবাহিনী নেতারা শান্তি চুক্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথাই বলছেন যে, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনীতির রূঢ় বাস্তবতা ও বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কারণেই জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে চুক্তি করতে যাচ্ছে। তিনি আরো জানান, শান্তিবাহিনী নেতারা নাকি একথাও

বলেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় যা পাওয়া যায় তা নিয়ে ভবিষ্যতের পথে চলতে হবে। তবে পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার মতো কোন চুক্তিতে নেতারা সই করতে যাচ্ছেন না। অন্যদিকে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (চুক্তির পক্ষে অবস্থানকারী) নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগই শান্তি চুক্তির সমর্থনে ঘরোয়া আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা প্রতিদিনই কোন না কোন পাড়ায় সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

**সংবাদ**
**১৩ই অক্টোবর ১৯৯৭**

## চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবর্তন শুরু ২১শে নভেম্বর

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রিত প্রায় ৪৪ হাজার চাকমা শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি হয়েছে। ২১শে নভেম্বর থেকে চতুর্থ দফার এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হবে। খবর পিটিআই ও বিবিসি'র।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৬টি শরণার্থী শিবিরে আশ্রিতদের সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি গতকাল রোববার প্রত্যাবাসনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা আগরতলায় বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্প্রতি ঢাকায় যে বৈঠক হয়েছে তার ফলশ্রুতিস্বরূপই শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

উপেন্দ্রলাল চাকমা সতর্ক করে দেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়া শরণার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে এবং প্রতিশ্রুতি মত পুনর্বাসন না দেয়া হলে প্রত্যাবর্তন বন্ধ হয়ে যাবে।

শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপের ফলেই তারা তাদের দৃঢ় মনোভাব থেকে অনেকটা সরে এসেছেন।

উপেন্দ্রলাল চাকমা বলেন, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবসহ বেশ ক'টি দাবি বাংলাদেশ মেনে না নিলেও তারা স্বদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছেন মূলত দু'টি কারণে। এর একটি হলো প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আবেদন। দ্বিতীয়টি হলো জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।



**সংবাদ**
**১৫ই অক্টোবর ১৯৯৭**
বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

## পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করতে তৎপর স্বার্থান্বেষী মহল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে।

বাসস জানায়, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগতকারী শক্তি এখনো আমাদের দেশকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়। তারা তাদের অভিসন্ধি হাসিলের জন্য পার্বত্য জেলাগুলোয় সহিংস পরিস্থিতি কায়েম রাখারও তৎপরতা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীকে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রতিনিধিদলটি গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তার দফতরে গিয়েছিল। সে সময় প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়ার সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমরা সমাধানে পৌঁছেছি। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে সেখানে শান্তি ফিরে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য জেলার উপজাতীয়রা আমাদের জাতীয় সম্পদ ও গর্ব। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিচিতি রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের সকল ধর্মাবলম্বীর নিজস্ব সত্তা রয়েছে। একে তিনি জাতির অলংকার হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এই মূল্যবান সম্পদ আমাদের রক্ষা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্প্রসারণে তার সরকার সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আগ্রহী। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। পাশাপাশি অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বেশ আকর্ষণীয়, যা বিদেশী পর্যটক ও প্রকৃতি-প্রেমিকদের মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু এসব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার আগে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের জনগণ দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হবে, এ ধরনের পরিস্থিতি আমরা সৃষ্টি করতে দেব না। আমাদের সন্তানদের

বিদেশের মাটিতে রেখে ঐ কতিপয় মহল কি ফায়দা লুটতে চায়, তা আমার জানা নেই।

শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে পার্বত্য জেলাগুলোয় বসবাস করতে পারে।

বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের অনুভূতির অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা অ-সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সেখানে সব ধর্মের লোকজন সমান অধিকার ছাড়াও সমান সুবিধা সব সময়ই পাবে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাদের আশ্বাস দেন যে, ঐ সব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপিতে এই দাবি-দাওয়ার কথা উত্থাপন করেন।

সংবাদ

১৭ই অক্টোবর ১৯৯৭

**জনসংহতি সমিতি**

**চুক্তির খসড়া চেয়েছে**

**সাগর সরওয়ার ও মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭ম বৈঠকের তারিখ আগামী মাসের ১৬ তারিখে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হলেও সংহতি সমিতি জানিয়েছে, চুক্তির খসড়া তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি এখনও। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চুক্তির খসড়া পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে জনসংহতি সমিতি।

পার্বত্য যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাকে লেখা এক চিঠিতে বলা হয়, পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বৈঠক হলেও এখনও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। তবুও এই বৈঠকের পর কমবেশি চুক্তি প্রণীত হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতির সহকর্মীদের সাথে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি সাধিত হতে যাচ্ছে।

উষাতন তালুকদার সইকৃত এ চিঠিতে বলা হয়, ৬ষ্ঠ বৈঠকে জাতীয় কমিটি বলেছিল অমীমাংসিত বিষয়াদির উপর সরকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রস্তাবাবলি গ্রহণযোগ্য হলে বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি করা যেতে পারে।

চিঠিতে জানানো হয়, এখন খসড়া চুক্তি প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরি। সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছেন, জনসংহতি সমিতির কাছে খসড়া তৈরি করে তা পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।



সংবাদ

১৭ই অক্টোবর ১৯৯৭

**খাগড়াছড়িতে কাল**

**শান্তি সমাবেশ ও**

**পদযাত্রা**

**খাগড়াছড়ি, ১৬ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।**–আগামী শনিবার ১৮ই অক্টোবর খাগড়াছড়ি পৌর শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিতব্য শান্তি সমাবেশ ও পদযাত্রাকে পাহাড়ি বাঙালী মিলে সকল শ্রেণীর লোককে সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবে আজ সন্ধ্যায় পাহাড়ি পেশাজীবী কমিটি ও নাগরিক কমিটি আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পাহাড়ি পেশাজীবী কমিটির সদস্য সচিব সৌখিন চাকমা।

ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দুপুর ১টায় খাগড়াছড়ি কলেজ চত্বর থেকে শান্তির পদযাত্রা। পদযাত্রাশেষে পৌর শাপলা চত্বরে সমাবেশ।

সংবাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৯৭

<u>প্রথম ধলেশ্বরী সেতু উদ্বোধন</u>

**পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কখনো সৈন্য**

**প্রত্যাহার করা হবে না : প্রধানমন্ত্রী**

**আবদুল্লাহপুর (মুন্সীগঞ্জ), ১৭ই অক্টোবর (বাসস)।**–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন যে, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তি সই হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী কখনো প্রত্যাহার করা হবে না।

প্রধানমন্ত্রী আজ শুক্রবার এখানে প্রথম ধলেশ্বরী সেতুর উদ্বোধন করেন। সে সময় আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেয়া হবে বলে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করা হয়েছে। চুক্তিটি সই হওয়ার পর বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকরা দেশে ফিরে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য তার সরকার যখন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করছে, ঠিক তখনই বিরোধীদল

সমস্যার সৃষ্টি করছে। তিনি আরো বলেন, বিরোধীদল চায় আমাদের নাগরিকরা বিদেশেই অবস্থান করুক। কোন কারণ ছাড়াই আমাদের নাগরিকরা বিদেশে অবস্থান করবে, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশেই আলোচনা করেছে। কিন্তু আগের সরকার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে নয়, ভারতে আলোচনা করেছিল। শরণার্থীরা দেশে ফিরে এলে দেশের স্বাধীনতা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে বিরোধীদল যে মন্তব্য করছে, প্রধানমন্ত্রী তার নিন্দা করেন। তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন রাখেন, দেশের নাগরিকরা মাতৃভূমিতে ফিরে এলে দেশের স্বাধীনতা কিভাবে বিপন্ন হতে পারে?

বিরোধীদলীয় নেত্রী যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তিনি একবারও ভারতের সমালোচনা করেননি বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, যখন ক্ষমতায় থাকবেন, তখন আপনি ভারতের পক্ষে থাকবেন, আর বিরোধীদলে থাকলে ভারতের সমালোচনা করবেন, এটা রীতি হতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, বিরোধীদলীয় নেত্রী জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা আবারো রক্ত দেবো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা আদৌ আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায় কিনা, তা ভাবতেই আমার বিস্ময় লাগে।

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার কোন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে না। তিনি আরো বলেন, আমাদের সামনে মনোযোগ দেয়ার মত অনেক সমস্যা রয়েছে বলে আমরা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে চায়, তারা যে দলেরই হোক না কেন। তিনি এ প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলেন, পুলিশ অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করলেই বিরোধীদল তাদেরকে সব সময়ই নিজের দলের সদস্য বলে দাবি করে। তিনি জানতে চান, সব সন্ত্রাসীই যদি বিএনপি'র কর্মী হয় তাহলে আমরা সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করবো কিভাবে? জনসাধারণ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে সেজন্য সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা না করতে শেখ হাসিনা বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান জানান।



**সংবাদ**

**১৯শে অক্টোবর ১৯৯৭**

খাগড়াছড়িতে বিশাল শান্তি সমাবেশ

## স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিইয়ে রেখে রক্ত নিয়ে খেলতে চায়

**সাগর সরওয়ার ও মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** পাহাড়ে শান্তি চুক্তির সপক্ষে পাহাড়ি ও পার্বত্য বাঙালিদের সর্ববৃহৎ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল শনিবার খাগড়াছড়ির পৌর শাপলা চত্বরে। প্রায় ২০ হাজার পাহাড়ি-বাঙালির সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। সমাবেশের আগে একটি বিশাল শান্তি শোভাযাত্রা হয়। খাগড়াছড়ি জেলার ৮টি থানার ৩৪টি ইউনিয়ন থেকে আসা পাহাড়ি-বাঙালিরা এ সমাবেশে ও শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পাহাড়ি পেশাজীবী ঐক্য কমিটি এবং নাগরিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে এ সমাবেশ ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নবীন কুমার ত্রিপুরা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মতিয়া চৌধুরী বলেন, পার্বত্যাঞ্চল থেকে সকল প্রকার হানাহানি, বিশৃংখলা রোধ করতে হবে। যতদিন না এ অঞ্চল থেকে রক্তপাত বন্ধ করা যাবে ততদিন এখানে শান্তি ফিরে আসবে না। তাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সুস্থ সমাধান দিতে। আর তাই পাহাড়ি-বাঙালিদের যৌথ স্বার্থে যেন কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। যে চুক্তি প্রণীত হচ্ছে তাতেও এদের স্বার্থহানি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মতিয়া চৌধুরী বলেন, যারা শান্তি চুক্তি নিয়ে বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে, তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে দেবে না পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ। পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, আমরা বাঙালিরা খুদ-কুড়ো যা পাই পাহাড়িদের নিয়ে এক সঙ্গে খাব, বিভাজন করব না। পার্বত্যাঞ্চলে আর কেউ যেন ছেলেহারা, ভাইহারা, বোনহারা না হয়; কারো সিঁথির সিঁদুর যেন মুছে না যায়।

মতিয়া চৌধুরী আরো বলেন, চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক শক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তি জিইয়ে রেখে রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়। তিনি বলেন, বিএনপি সরকারের সময়ে তারা ভারতের মাটিতে শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনা করেছে। আমরা নিজ দেশে বসে এ সমস্যার সমাধান করছি। আসলে বিএনপিই দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করেছে। তিনি বলেন, 'সরকার পার্বত্য এলাকায় যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি করছে। তেমনি পাহাড়ি শরণার্থীদেরও ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।'

মহাসমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান।

হাজার হাজার নারী-পুরুষ রংবেরঙের পোশাক পরিচ্ছদ পরে ঢোল বাজনাসহ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এ সময় তাদের হাতে ছিল রংবেরঙের ফেস্টুন। প্লেকার্ডগুলোতে লেখা ছিল আর রক্ত নয়/আমরা শান্তি চাই, বাঙালি পাহাড়ি ভাই ভাই ইত্যাদি।

উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান এমপি কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, ১৯০০ সাল থেকে এখানে পাহাড়ি-বাঙালি সহাবস্থান করছে। যা আজো বজায় রয়েছে। তিনি বলেন, পাহাড়ি-বাঙালি কাউকে বাদ দিয়ে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে না। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে পার্বত্যাঞ্চলে পাহাড়ি-বাঙালি সকলেই নির্যাতিত হয়েছিল।

আজ যখন শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে তখনই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এখানে পাহাড়ি-বাঙালি বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা লোটার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার জন্য '৭১ সালের রাজাকাররা আবারও মাঠে নেমেছে। তারা এখানে এসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

তিনি সমাবেশে পাহাড়ি-বাঙালি জনতাকে আশ্বস্ত করে বলেন, তারা বলছে বাঙালি ও সেনাবাহিনী চলে যেতে হবে। আমি জনসংহতি সমিতির সাথে যে বৈঠক হয় তার একজন জাতীয় কমিটির সদস্য। তাই বলছি এখান থেকে বাঙালি ও সেনাবাহিনী কাউকে যেতে হবে না।

চট্টগ্রামের সিটি মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী বলেন, আমরা পাহাড়ে শান্তি চুক্তি করতে যাচ্ছি। যুদ্ধ নয়।

এমপি দীপংকর তালুকদার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, এখান থেকে বাঙালি ও সেনাবাহিনী কোনটাই প্রত্যাহার করা হবে না। সেনাবাহিনী স্থায়ী সেনানিবাসে থাকবে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির প্রয়োজনে আবার কাজে লাগবে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি পেশাজীবী কমিটির সদস্য সচিব সৌখিন চাকমা, যুগ্ম আহ্বায়ক উলাপ্রু চৌধুরী, প্রবীণ চাকমা, স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুন্নবী চৌধুরী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হাজী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা। নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন।



**সংবাদ**

**২১শে অক্টোবর ১৯৯৭**

**শান্তি চুক্তির আগে প্রয়োজন দু'টি বিষয়ে দু'পক্ষের ঐকমত্য**

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে দুটো বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আগামী ১৬ই নভেম্বরে শুরু হওয়া বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই হবে। এ দুটো বিষয় হলোঃ জেলা প্রশাসকের উপর আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা এবং ভূমি অধিকার। একাধিক সূত্র জানিয়েছেন, গত বৈঠকে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের উদ্দেশে চুক্তির খসড়া প্রণীত হয়েছে বললেও উপরোক্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্যে না পৌঁছার কারণে তখন খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়নি। সন্তু লারমা এ ঘোষণাটা দিয়েছিলেন 'জেন্টেলম্যান এগ্রিমেন্ট' হিসেবে। কথা ছিল বৈঠক শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই সরকার খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করে তা জনসংহতি সমিতিকে পাঠাবে; কিন্তু এখনো পাঠানো হয়নি। আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চুক্তির খসড়া জনসংহতির কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে না বলেও সূত্র জানিয়েছেন।

সূত্র জানান, জাতীয় কমিটির প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এখন বরিশালে রয়েছেন। দু'একদিনের মধ্যে তিনি ঢাকায় এসে খসড়া চূড়ান্ত করতে সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সারের সঙ্গে বসবেন। তারা দু'জনই এখন ঢাকায় রয়েছেন। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে সরকার পক্ষ যদি খসড়া চূড়ান্ত করে না পাঠাতে পারে তাহলে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তা পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্র জানিয়েছেন, জনসংহতি সমিতি চায় জেলা প্রশাসকের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকুক। কিন্তু সরকার পক্ষ এ ব্যাপারটিতে ছাড় দিতে রাজি নন। তারা চান, জেলা প্রশাসক এখন যেভাবে আছে, শান্তি চুক্তির পর সেভাবেই থাকবে। গত বৈঠকে একথা জানানো হলে জনসংহতি সমিতি তাদের পূর্বের অবস্থানে অটল থাকে। পরে সরকার পক্ষ ভেবে দেখার কথা বলে। ভূমির অধিকার সম্পর্কে জনসংহতি সমিতি চায় ভূমির সর্বময় ক্ষমতা, বন্দোবস্তি, নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার তাদের হাতেই থাকুক। সেনাবাহিনী প্রসঙ্গেও পুরোপুরি ঐকমত্যে পৌঁছেনি সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতি। জনসংহতি সমিতি চায় ৩ জেলায় মাত্র তিনটি ক্যান্টনমেন্ট থাকুক। কিন্তু সরকার চায় জোনাল হেড কোয়ার্টারগুলোসহ ৯টি

ক্যাম্প আগের অবস্থায়ই থাকুক। এ বিষয়েও গত বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকার পক্ষ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনসংহতির এ দাবি মানতে রাজি আছে বলে সূত্র জানিয়েছেন। ভূমি ও জেলা প্রশাসক প্রশ্নে সে খসড়া প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতে সরকার নমনীয় ভাব দেখাবে বলেও জানা গেছে। সূত্র জানান, সরকার পক্ষ খসড়া যদি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাঠাতে পারে তাহলে পরবর্তী বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হওয়ার পর চুক্তি সই হবে। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন। তবে এর আগে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে আলোচনা করবেন। চুক্তি প্রণয়নের ২০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে অস্ত্রধারী শান্তি বাহিনীর সকল সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দেবেন। এ অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান খাগড়াছড়িতে নবনির্মিত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

সরকারের সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছেন, বিএনপি ও অন্য বিরোধীদলগুলোর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত বাঙালিদের সেখান থেকে সরিয়ে নেয়ার যে ধুয়া এসব দল তুলছে, তার কোন ভিত্তি নেই বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এখান থেকে কোন বাঙালিকে প্রত্যাহার করা হবে না। তবে গুচ্ছগ্রাম থেকে বাঙালিদের সরিয়ে তাদের নিজ নিজ জায়গায় ফেরত পাঠানো হবে। চুক্তির পর গুচ্ছগ্রাম অধিবাসীদের আর রেশন দেয়া হবে না। আর যারা সে অঞ্চল থেকে সরে যেতে চায় তাদেরকে সরকার অন্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনে সাহায্য করবে।

অন্য একটি সূত্র জানিয়েছেন, জনসংহতি সমিতির নেতারা চান পার্বত্যাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালিরা সেখানেই থেকে যাক। তবে তারা এও চান, এ অঞ্চলে প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। সরকার এ ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছার কথা ইতোমধ্যেই জানিয়েছে জনসংহতি সমিতিকে।

**সংবাদ**

**১লা নভেম্বর ১৯৯৭**

## ওরা পাহাড়ি বাঙালি কারো বন্ধু নয় ঃ মহিউদ্দিন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহ-আহ্বায়ক গত ৩০শে অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বিএনপি এবং এদেশের কতিপয়



সাম্প্রদায়িক শক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সমাবেশও বন্ধ ডেকেছে এবং এসব সমাবেশে অযৌক্তিক, উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাদের আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা চায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

পূর্ববর্তী সরকারসমূহও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে বেশ কয়েক দফা বৈঠক এবং অন্যান্যভাবে যোগাযোগ করেছিল। বিএনপি সরকারের আমলে এমনকি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও আন্তরিকতার অভাবে এসব বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিধায় পাহাড়ি জনগণের মধ্যে আস্থার মনোভাব ফিরে এসেছে এবং পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে সেখানকার স্থানীয় লোকজন শান্তির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। আল্লাহর রহমতে শিগ্‌গিরই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি চুক্তি হবে বলে আশা করা যায়।

গোটা জাতি যখন শান্তির হাতছানিতে উন্মুখ, সে সময়ে নিজেদের ব্যর্থতার জ্বালা মেটানোর জন্য বিএনপি কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দলকে সাথে নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার জন্য বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত কমিটিতে বিএনপি'র দু'জন সংসদ সদস্যকেও রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা একটি বৈঠকেও যোগ দেয়নি। কোন বিকল্প প্রস্তাবও হাজির করেননি। তাদের এক নেতা হুমকি দিচ্ছেন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির প্রক্রিয়া ঠেকাতে অশান্তি বাহিনী গঠন করবেন, আরেক নেতা বলেছেন, চুক্তি করলে ভারতের সাথে করা হবে, আর বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নাকি বিপন্ন হবে।

তিনি বলেন, এ মুহূর্তে সেখানে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত উত্তেজনার বিষ ছড়িয়ে যারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে তারা পাহাড়ি-বাঙালি কারুরই বন্ধু নয়। এদের চেহারা আমরা পাকিস্তান আমল থেকে চিনি।

তিনি আরও বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, কারো বাড়া ভাতে ছাই দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু অতীতে রোপণ করা বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলে এমন এক মধুর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই যাতে পাহাড়ি-

বাঙালি নির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষ নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায় এবং সমমর্যাদার অধিকারী হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে। আজ শান্তির যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, তা নস্যাতের যে কোন অপচেষ্টা জনগণ অবশ্যই প্রতিহত করবে।

সংবাদ

২রা নভেম্বর ১৯৯৭

রাঙ্গামাটিতে মতবিনিময়

**শান্তি প্রক্রিয়ায় কারো**
**স্বার্থই ক্ষুণ্ন হবে না**

**॥ সুনীল কান্তি দে ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সদস্য ও সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার বলেছেন–পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে যে চুক্তি করতে যাচ্ছে তার ফলে কোন সম্প্রদায়েরই অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পার্বত্য সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান শান্তি সংলাপ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য গতকাল রাঙ্গামাটিতে আহূত এক সভায় সাংসদ তালুকদার এ মন্তব্য করেন।

রাঙ্গামাটি শহরের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠকরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শান্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে সাংসদ তালুকদারকে প্রশ্ন করেন অধ্যাপক মাহমুদ উন-নবী দুলাল, অধ্যক্ষ এম জি মিঞা, জেলা স্কাউট সম্পাদক নুরুল আবসার, জেলা যুব ইউনিয়ন সভাপতি দিলীপ দেব, রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান, আওয়ামী লীগ নেতা বদরুদ্দোজা মঞ্জু, মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, রাঙ্গামাটি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাজী নজরুল ইসলাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান।

সংবাদ

৭ই নভেম্বর ১৯৯৭

**প্রত্যাবাসনেচ্ছু শরণার্থীদের**
**তালিকা এখনও পৌছেনি**

**সাগর সরওয়ার, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ঃ** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থীদের নামের তালিকা গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌছায়নি।



এই তালিকা না পাওয়ার কারণে সরকার এবারে প্রত্যাগত শরণার্থীদের বিভিন্ন সুবিধা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এক সূত্র বলছেন ঃ এর ফলে আগামী ২১শে নভেম্বর শরণার্থী প্রত্যাবাসনের দিন বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে।

সরকারের সর্বশেষ কি করণীয় এ ব্যাপারে আগামীকাল ৮ই নভেম্বর শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের এক সভা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এতে সভাপতিত্ব করবেন।

ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্পে এখন ৮১৭৩টি পরিবারের ৪৪ হাজার ৫০ জন পাহাড়ি শরণার্থী বসবাস করছে। আগামী ২১শে নভেম্বর থেকে এসব শরণার্থীর দেশে ফিরে আসার কথা। প্রশাসন এ জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েও এগুতে পারছে না।

কারণ কত শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে তা না জানা পর্যন্ত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না। সূত্র জানান, সরকার আশা করেছিল সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে ফিরতে ইচ্ছুক শরণার্থীদের তালিকা পাহাড়ি শরণার্থী কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে পাওয়া যাবে। একথাই বলেছিলেন শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা।

খাগড়াছড়ির ডিসি মোহাম্মদ ইসমাইল গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত রামগড় সীমান্তে অপেক্ষা করেছিলেন শরণার্থী নেতাদের চিঠির জন্য। কিন্তু উপেন্দ্র লালের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়নি।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাগত শরণার্থীদের ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধাবলির বাইরেও আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সে সময় উপেন্দ্র লাল বলেছিলেন, খুব শিগগিরই সমস্ত শরণার্থী পরিবারের দেশে ফিরে আসার ঘোষণা ও তালিকা দেয়া হবে। কিন্তু প্রত্যাবাসনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর গতকাল অবধি এ তালিকা সরকারের হাতে এসে পৌছায়নি।

সংবাদ

৮ই নভেম্বর ১৯৯৭

**'আমি শান্তি চাই, বাবা'**
**-আতিউর রহমান**

পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসুক এই আকঙ্ক্ষা এখন খুবই তীব্র? সারা বিশ্ব যখন শান্তির পক্ষে আমরা তখন যে শান্তির বিপক্ষে যেতে পারি না সেই অনুভূতি পোক্ত হচ্ছে। শান্তি মানব-উন্নয়নের জন্যেও খুবই জরুরি।

পরিবর্তিত এই বিশ্বে উন্নয়নের জন্যে চাই আস্থার পরিবেশ। শান্তির পরিবেশ। বিনিয়োগের পরিবেশ। অবশ্য, গত পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু ভৌত উন্নয়নের নামে যে কর্মকাণ্ড হয়েছে তাতেও শান্তি কম বিঘ্নিত হয়নি। যদি বলি স্থানীয় পরিবেশ, সংস্কৃতি ও স্বশাসন বিনাশী বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়নের তাণ্ডবের কারণেই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে তাদের বিচ্যুত করা হয়েছে তবে কী ভুল বলা হবে? চমক দেখানো ঐ উন্নয়ন কৌশলের পুরো সুবিধে নিয়েছে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল। ঐতিহ্যবাহী সামাজিক মালিকানার চৌহদ্দি ভেঙে পার্বত্য এলাকায় মহল বিশেষ জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে। পাহাড়ি কাঠে তাদের শহরের বাড়িঘর আরো সুন্দর হয়েছে। লেকের শোভা বেড়েছে। চোরাচালানী ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের দাপট বেড়েছে। আর বেড়েছে উন্মুল মানুষগুলোর দীর্ঘশ্বাস। বেড়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশের দুঃখ। বেড়েছে মানুষের অশান্তি। কী পাহাড়ি, কী বাঙালি সকলেরই শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। এমনকি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা খুব শান্তিতে ছিলেন বলে মনে হয়না। এ জন্যেই শান্তির পক্ষে এখন জোরালো জনমত গড়ে উঠেছে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি চুক্তির অগ্রগতিতে তাই শুধু পাহাড়িরা নয়, শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষের মনেই স্বস্তি আসতে শুরু করেছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্প্রতি বলেছেন এই চুক্তির বাস্তবায়নের পর পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি ও পাহাড়িদের নব যুগের সূচনা হবে। হালে পত্র-পত্রিকাতেও শান্তির পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। ৩১ অক্টোবরের 'ভোরের কাগজে' কলাম লেখক আনিসুল হক এমন এক মানবিক আবেদন করেছেন যা হৃদয়কে স্পর্শ করে। শান্তির জন্য মনের গহীনে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। মনে হয় এসবই আমারও মনের কথা। প্রাণের কথা।

"সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে গেছে অনেক রক্ত। বাঙালি রমণী হারিয়েছে তার বাঙালি স্বামীটিকে। পাহাড়ি রমণী হরিয়েছে তার পাহাড়ি স্বামীটি। কে আছে এ পৃথিবীতে, শান্তি চায় না। জিজ্ঞেস করুন আপনার বৃদ্ধা মাকে, তার ধবধবে সাদা চুল, চোখ কোটরাগত, চোখের চশমা খুলে আপনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি বললেন, শান্তিই তো চাই বাবা। জিজ্ঞেস করুন আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে, সে শান্তি চায় কিনা। মাথায় দুটো বেনি, সাদা ফিতা, আঙুলের ডগায় জামার কোনা পেঁচাতে পেঁচাতে সে বলবে, হ্যাঁ, আমি শান্তি চাই বাবা।

চিন্তা করতে পারেন, আপনার ছেলের লাশ কবরে নামাতে হচ্ছে আপনাকে, চিন্তা করতে পারেন রেপ্‌ড হচ্ছে আপনার স্ত্রী! বোন! কন্যা।



পিঁপড়ের কান্না মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না, কিন্তু মানুষের কান্নাও কি পৌঁছবে না মানুষের কানে। হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন/কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার। বাঙালি না পাহাড়ি কে ঐ প্রশ্ন তোলে? মানুষ, তুমি বলো, আমার মায়ের সন্তান মারা গেলে আমি কাঁদি।" (আনিসুল হক, 'জুলুম থেকে বাঁচাও! শান্তি দাও।', ভো. কা. ৩১-১০-৯৭)।

ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর এই বিশ্বে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়ার কোনো কোনো অংশে অশান্তির যে ছায়া পড়েছে, আফ্রিকার অনেক দেশেই সাধারণ মানুষের কপালে যে দুঃখ, অশান্তি ও বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে তারই আলোকে বিশ্ব জনমত মানবাধিকার ও শান্তির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।

নিজের সংস্কৃতি ও চাওয়া পাওয়ার আলোকে স্থানীয় পর্যায়ের স্বশাসনের পক্ষে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, দুর্বলের সবলায়নের পক্ষে, সাধারণের অংশগ্রহণের পক্ষে, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বর্তমানে প্রবল জনমত তৈরি হয়েছে। এই বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশেও শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে সুবিচার ও সুশাসনের পক্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি চুক্তির বিষয়টি এই প্রেক্ষাপটেই দেখা উচিত।

এই সমস্যাটির একটি অতীত রয়েছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে গণতন্ত্র বিনাশী শক্তির গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার আদলে গড়ে তোলা উন্নয়ন কৌশলের কাহিনী। হাজার হাজার পরিবারকে মুহূর্তে উদ্বাস্তু করে মেগাপ্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের এক ঝলসানো অথচ অমানবিক কাহিনী। কাপ্তাই লেকের পানির সাথে মিশে আছে উন্নয়নের নামে বিপর্যয়ের শিকার অগুনতি মানুষের বোবা কান্না। এটি ছিল প্রতিবেশ বিপর্যয়ের এক বড়ো ট্রাজেডি।

প্রতিটি জাতি বা উপজাতিরই থাকে নিজস্ব ভূমিনীতি বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, থাকে জাতীয় গর্ববোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশগ্রহণের অধিকার। উন্নয়নের নামে, কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে অগণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী বরাবরই ঐ সব ঐতিহ্যবাহী আইন ও প্রথাকে পায়ে দলে নিজেদের পছন্দ মতো নয়া আইন, নীতি ও ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আফ্রিকার অনেক দেশেই পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পত্তি (common property) সম্পর্কিত আইনকে অবজ্ঞা করে ব্যক্তি মালিকানা আইন চাপিয়ে দিয়ে লাভ ও লোভের অর্থনীতি চালু করে অনেক মানুষের দীর্ঘ

দিনের পরিবেশসম্মত বাঁচার উপায়গুলো ভুণ্ডুল করে দেয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডেও তেমনটি দেখা গেছে। এভাবেই বাইরের ক্ষমতাবানরা বনভূমি উজাড় করেছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে গরু চরানোর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রকৃতির তালে তালে গড়ে জুম চাষ বিপন্ন হয়েছে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া রাবার বা অন্যান্য বাণিজ্যিক চাষের চাপে মার খেয়েছে স্থানীয় মানুষের বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বাঁচার রসদ সংগ্রহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। আরো ক্ষুণ্ন হয়েছে তাদের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য-নির্ভর গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন। এই প্রক্রিয়াটিই কার্যত সক্রিয় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামেও। আমরা নিজেরা পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছিলাম। একাত্তরে সারা বিশ্বের সমবেদনা ও সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম।

আমরা নিজেরাও বসনিয়ার জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। তাহলে পার্বত্য অঞ্চলে অনুরূপ ভূমিকা আমরা কেন পালন করতে পারছি না? শুধুই কী 'ইণ্ডিয়া ফ্যাক্টর' এই হীনম্মন্যতার জন্য দায়ী? আমাদের নিজেদের ঐচিত্য বোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার কী কোনো অবশিষ্টই আর নেই?

তবে বর্তমান সরকার এই প্রক্রিয়ার খানিকটা ব্যত্যয় ঘটাতে চাইছে। বাইরের ও নিজেদের ভেতরকার কায়েমি স্বার্থবাদীদের চাপকে উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাপী দ্রুত গড়ে ওঠা শান্তির প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রক্রিয়া চালু করার যে সৎ সাহস বর্তমান সরকার দেখিয়েছে তার প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক সমর্থন দেয়া উচিত। বিরোধীদলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সদস্যদেরও এর প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেয়া উচিত।

শান্তির এই প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এটি ভণ্ডুল যাতে না হয় তার জন্য আমাদের যা যা করা প্রয়োজন, তা সবই করতে হবে। বিশেষ করে সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশীয় মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হক বাংলাদেশের গতিশীল সিভিল সমাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন এই দেশটি শুধু একারণেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে উন্নয়নের সম্ভাবনার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে। তেমন একটি সম্ভাবনাময় দেশ গড়ার তাগিদেই আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতেই হবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আরো অনেকগুলো কাজ সরকার ও সিভিল সমাজকে করতে হবে।



**এক.**

কী প্রতিকূলতার মধ্যে সরকার ও পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ শান্তির এই দুর্গম পথে এতোটা অগ্রসর হতে পেরেছেন সে কথা পুরো দেশবাসীকে জানাতে হবে। এজন্য গণমাধ্যম, জাতীয় সংসদ এবং সভা সমিতি সকল মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে। বিরোধীদল, সিভিল সমাজের নানা সংগঠনকে শান্তির পথে অগ্রযাত্রার এই কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে। ভয় নেই শান্তির পথে এ যাত্রায় জাতির বড়ো অংশই যোগ দেবে। তার প্রমাণ সাম্প্রতিককালে পরিচালিত একটি বেসরকারি জরিপের ফলাফল থেকেই অনুমান করা যায়। ঐ জরিপে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই শান্তির পক্ষে। পাহাড়ি বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শান্তি চুক্তির পক্ষে। উত্তরদাতারা আরো বলেছেন যে কোনো সুস্থ প্রকৃতির মানুষই এ চুক্তির বিপক্ষে যেতে পারে না।

**দুই.**

পাহাড়িদের আনুষ্ঠানিক শাসক না হলেও পার্বত্য অঞ্চলের একটি অংশের নৈতিক সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজা দেবাশীষ রায় সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়িদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে" (ভো. কা. ৩১-১০-৯৭)। তিনি আরো বলেছেন যে সমকালীন বাস্তবতার আলোকে তৈরি এই চুক্তি পাহাড়ি সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ তথা পার্বত্য অঞ্চলের সাংসদ থেকে শুরু করে হেডম্যান, বিভিন্ন পেশাজীবী, যুবক, ছাত্র বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়াকে জোরদারভাবে সমর্থন করছে।

এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলে শান্তি টেকসই করতে হলে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন ঐ সাক্ষাৎকারে সেগুলো প্রণিধানযোগ্য।

ক. পার্বত্য অঞ্চলের এবং পাহাড়ি জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া উচিত। রাতারাতি না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এ সমস্যাটির সমাধান হওয়া উচিত। সারা বিশ্বেই বিশেষ বিশেষ এলাকা ও মানুষদের জন্য এমন সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে। আমাদের সংবিধানের মূল স্পিরিটও এমন স্বীকৃতির বিপক্ষে নয়। সুতরাং এ বিষয়টি সরকার ও সুধীজনের বিবেচনায় রাখতে দোষ কোথায়?

খ. পাহাড়ি সমাজে রাজার সম্মান ও নৈতিক অবস্থা সুদৃঢ়। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে রাজার ভূমিকা বদলালেও, স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপারে রাজাদের উপদেশ গ্রহণের শাসনবিধি (Hilltracts Manaual 1900) রয়েছে। বর্তমান শান্তি চুক্তিতেও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হতে পারে সেই ভূমিকা পুনসংজ্ঞায়িত হবে। তবে এটি থাকলে ভাল হয়।

গ. পাহাড়িদের ভূমি সমস্যাটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভূমি অধিকারসমূহের স্বীকৃতি দিয়ে বর্তমান সময়ের আলোকে ন্যায়নিষ্ঠ সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তবে "বর্তমানে প্রচলিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণ সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার্য ও ব্যবস্থিত বনভূমি, জুম ভূমি, পশুচারণভূমি, শ্মশানভূমি ইত্যাদি ব্যক্তিমালিকানায় যাতে না যায় তার জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন" (রাজা দেবাশীষ রায়)। বর্তমানের পরিবেশসম্মত টেকসই উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে এই চাওয়া মোটেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ঘ. শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর প্রস্তাবিত স্থানীয় প্রশাসন কাঠামো শক্তিশালী হতে পারছে কীনা, পাহাড়ি ও বাঙালিদের অধিকার রক্ষা করা যাচ্ছে কীনা, শান্তি চুক্তির অন্যান্য ধারা মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কীনা–সেগুলো নিরন্তর অবলোকন করা দরকার। এজন্য নিরপেক্ষ একটি অবলোকন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এতে সকল পক্ষের প্রতিনিধি থাকতে পারেন। তৃতীয় নিরপেক্ষ একদল পর্যবেক্ষক থাকতে পারেন। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনও একাজটি করতে পারে। তবে যেভাবেই হোক না কেন একটি গ্রহণযোগ্য পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে। শান্তি চুক্তি চালু হবার পর সেখানে কী ঘটছে সেদিকে দেশের সিভিল সমাজ, পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমকে দায়িত্বপূর্ণভাবে নিজ নিজ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটিও সক্রিয় থাকতে পারে এক্ষেত্রে। আসলে, চুক্তি সম্পাদনই যথেষ্ট নয়। এর বাস্তবায়ন কেমন হচ্ছে যে বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে দিকটার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখা উচিত।

সবশেষে বলতে চাই আজকের দিনে জোর করে দেশ শাসন বা সরকার পতনের পক্ষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনমত খুবই দুর্বল। একই সঙ্গে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষের শক্তি খুবই প্রবল। সেসব কথা মনে রেখেই আমাদের পার্বত্য সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে সুবর্ণ সুযোগ সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় তৈরি হয়েছে তা গুটি কয়েক স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টায় ভন্ডুল হতে দেওয়া উচিত হবে না। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থায়ী হলে সেখানটিতেই দেখা দেবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উজ্জ্বল সৃজনশীল এক প্রক্রিয়া। শাক্তিশালী স্থানীয় পরিষদের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা ও বাজেট দিতে পারলে ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠবে উন্নয়নের সুদৃঢ় ভিত্তি। স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও প্রতিবেশিক পর্যটনের পূণ্যভূমি হবে এই অঞ্চল। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে ঘটবে অভাবনীয় উন্নতি। দলে দলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পরিভ্রমণে ধন্য হবে শান্তির প্রতীক পার্বত্য অঞ্চল। প্রচুর বিদেশী মুদ্রার



আমদানি ঘটছে দেশে। এর একাংশ এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মানবিক সেবায় ব্যয় করা গেলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনের মান উন্নত হবে। এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা গেলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিই শুধু উজ্জ্বল হবে তাই নয়, এই সময়ের আকাঙ্ক্ষিত মানব-উন্নয়নের শক্ত ভিত্তি তৈরি হবে। ফলে সুস্থ গণতান্ত্রিক শান্তির দেশ বাংলাদেশের উন্নতির পথে তার আজকের কঠিন অভিযাত্রা অনেক সহজ ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে। নিরাপদ ও শান্তির পরিবেশে প্রতিটি মানুষের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই স্বপ্নেরও ঘটবে সফল বাস্তবায়ন। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি অর্জনের যে সংগ্রামে আমরা এখন অবতীর্ণ এর আদল কিন্তু একাত্তরের মতোই। এর পক্ষে বিপক্ষে মুখগুলো একাত্তরের পক্ষে বিপক্ষের মুখগুলোর মতোই। তাই শান্তি অর্জনে আমরা যদি সাফল্য অর্জন করতে পারি তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রূপায়নের পক্ষে আরেকটি মাইলফলক যোগ করতে পারবো বলে মনে হয়। শান্তি ও উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার কোনো নৈতিক অধিকার আমাদের কারোরই নেই।

শুধু পার্বত্য অঞ্চলে কেন আমরা সর্বত্রই শান্তি চাই। ঘরে-বাইরে শান্তি চাই। রাস্তাঘাটে শান্তি চাই। কলে-কারখানায় শান্তি চাই। সংসদে শান্তি চাই, সংসদের বাইরেও শান্তি চাই। কেননা শান্তিই উন্নয়নের জন্য এখন সবচেয়ে বেশি দরকারি এক উপকরণ। শান্তিবিহীন বাংলাদেশে বিনিয়োগ আসবে না। শান্তির লভ্যাংশ পুরো জাতিই পাবে। তাই আমরা সকলেই শান্তি চাই।

**সংবাদ**
**৮ই নভেম্বর ১৯৯৭**
**পার্বত্য শান্তি চুক্তি : পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ভাবনা**

সবাই চায়। বর্তমানে সরকারের সাথে জিএসএসআর যে চুক্তি হচ্ছে তা কি ধরনের তা আগে দেখতে হবে। পত্রিকা থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি তা থেকে মনে হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ভূমি সমস্যাটির তেমন কোন সমাধান হবে না। এছাড়া বাঙালি এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহারও করা হবে না। তাই মনে হচ্ছে শান্তি চুক্তি কোন সমস্যার সমাধান করবে না। অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অশোক চাকমা বললেন, আমরা মানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জম্মু জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ লাঞ্ছিত, অবহেলিত। তাই এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে কিছুটা হলেও শান্তি ফিরে আসবে বলে আমি মনে করি, যদি শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

চারুকলার ছাত্র নাখান বম্ জানালেন তার মত। বললেন, আগে শান্তি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। এই শান্তি চুক্তি হলো পাহাড়ি জনগণের শান্তির প্রথম ধাপ, এটি ধরেই এগিয়ে যাবে জনগণ আরও শান্তির খোঁজে। কারণ পার্বত্য এলাকার পাহাড়িরা সবাই এখন সংগ্রাম করতে শিখে গেছে।

পালি ও সংস্কৃত প্রথম বর্ষের ছাত্রী নীরা চাকমা জানালেন তার ভাবনার কথা। বললেন, শান্তি চুক্তি কি আসলেই শান্তি ফিরিয়ে আনবে? আমার তো সেটা মনে হয় না।

বিনোদন ত্রিপুরা জানালেন, এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এক ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি হবে যা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করবে।

মার্কেটিং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সুজিতা চাকমা। তার বক্তব্য হলো, ভূমি সমস্যার সমাধান, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং সাংবিধানিক গ্যারান্টি না হলে এই শান্তি চুক্তি আমাদের কোন উপকারে আসবে না বলে আমি মনে করি।

রুইসাঅং মারমা গণিত প্রথম বর্ষের ছাত্র। শান্তি চুক্তিকে ঘিরে তার স্বপ্ন হলো, এই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পর পার্বত্য এলাকার জনগণ শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা আরও ভালভাবে পাবে।

আলাপ হলো পালির শেষ বর্ষের ছাত্রী চীনা চাকমার সঙ্গে। বললেন, আমার কাছে মনে হয় প্রথমে শান্তি চুক্তি হোক। তবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা যেন না থাকে। এতদিনের শান্তিহীন পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছুটা হলেও শান্তি ফিরে আসবে এই চুক্তির মাধ্যমে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্টার্সের ছাত্র উজ্জ্বলস্মৃতি চাকমা আলাপকালে জানালেন, এই শান্তি চুক্তিতে আসল বঞ্চিত পাহাড়িদের ভাগ্যের কোন ধরনের পরিবর্তন হবে না। সমস্যা সমস্যাই হয়ে থাকবে। নামেমাত্র শান্তি আসবে।

**প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়**

বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র স্বপন চাকমা। শান্তি চুক্তি নিয়ে বেশ আশান্বিত। তার ভাবনা, কিছুটা হলেও এতে উপকৃত হবে পাহাড়িরা, এতদিন যারা বঞ্চিত ছিল।

কম্পিউটারের ছাত্রী লিতা চাকমার ভাবনাও অনেকটা সে রকম। আগে তো শান্তি চুক্তি হোক, তারপর দেখা যাবে অন্য সব–লিতার চাওয়া এরকম।

ইলেকট্রিক্যাল-এর ছাত্র ভুঅং মার্মা জানালেন, শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তো আমাদের জনগণের দাবির বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তাহলে এই শান্তি চুক্তি হলেই বা কি হবে।

একই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জ্যোতিকর খীসা বললেন, এই শান্তি চুক্তিকে ঘিরে তার কোন ভাবনা নেই, কারণ এই চুক্তি সাধারণ পাহাড়িদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে না।



**জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**

নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র পূর্ণালক্ষ চাকমা বললেন, আগে শান্তি চুক্তি হোক, কারণ কোন সরকারই আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক ছিল না। এবার যখন সুযোগ হয়েছে দেখা যাক কি হয়।

পত্রপত্রিকায় যা পড়েছি তাতে মনে হয় না পার্বত্য এলাকার সত্যিকারের মূল সমস্যাগুলোর কোন সমাধান হবে।

উৎপল চাকমা পড়ছেন শেষবর্ষে। ফার্মেসি বিভাগে। উৎপল অন্য কোন কিছু ভাবতে চান না। চান শান্তি। তার মতে শান্তি চুক্তি হওয়াটা জরুরি এবং চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে।

**চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়**

আলাপ হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রথম বর্ষের ছাত্র অসীম চাকমার সঙ্গে। বেশ উচ্ছল, হাসিখুশিভাবে অসীম শান্তি চুক্তির ব্যাপারে তার মত জানালেন। তার ভাষ্য খুব ভাল লাগছে। এতদিন পর জনগণ তাদের শান্তি ফিরে পাবে। অনেকদিনের স্বপ্ন, কল্পনা, প্রতীক্ষা–সবকিছুর অবসান ঘটাবে এই চুক্তি, সত্যিই অবিশ্বাস্য লাগছে। এ এক অন্যরকম অনুভূতি।

গণিত শেষ বর্ষের ছাত্র উৎপল চাকমা, অন্য রকম কথা জানালেন। বললেন, শান্তি চুক্তি হলে তাতে সত্যিই কি জনগণের উপকার হবে? এই প্রশ্নটিই প্রধান।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন ঘটবে–এই আমাদের চাওয়া।

**সংবাদ**

**৯ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**রাঙামাটিতে আজ**
**শান্তি সমাবেশ**

**সুনীল কান্তি দে, রাঙামাটি থেকে ঃ** আজ রোববার রাঙামাটিতে পার্বত্য শান্তির প্রক্রিয়াকে জোরদার করার লক্ষ্যে নাগরিক কমিটির উদ্যোগে এক শান্তি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এ সমাবেশে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন। দুপুর ১টায় রাঙামাটি, পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে এ সমাবেশ শুরু হবে। সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকবেন ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

রাঙামাটি নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ানের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান খান কায়ছার, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, জাতীয় পার্টির নেতা এডভোকেট ফজলে রাব্বি।

**সংবাদ**

১১ই নভেম্বর ১৯৯৭

**ফিরে আসা শরণার্থীদের বাড়তি সুবিধা দিতে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি**

**সাগর সরওয়ার ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২১শে নভেম্বর থেকে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক পাহাড়ি শরণার্থীদের ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধাবলির বাইরের নতুন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। এ ব্যাপারে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। নতুন সুযোগ-সুবিধার অনেকাংশ ’৯৪ সালে ফিরে আসা শরণার্থীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন। গত রোববার প্রধানমন্ত্রী এ সব সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে লিখিত সম্মতি জানান। আগামী ২১শে নভেম্বরের শরণার্থী প্রত্যাবাসনের সামগ্রিক বিষয়াদি ঠিক করতে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ১৩ই নভেম্বর ত্রিপুরার উদয়পুর যাচ্ছেন। সেখানে তিনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর পাহাড়ি শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের নতুন কিছু সুবিধা দেয়ার দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সে সব দাবি ভেবে দেখার কথা বলেছিলেন। সূত্র জানান, ঘোষিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে প্রত্যাবাসনেচ্ছু পাহাড়ি শরণার্থীদের ১০ মাসের রেশন দেয়ার স্থলে ১২ মাসের রেশন দেয়া হবে। পার্বত্য এলাকার শরণার্থী নেতৃবৃন্দের দেয়া তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরিবারের নিহত সদস্যদের শেষকৃত্য পালনের জন্য প্রতি পরিবারে ১০ হাজার টাকা দেয়া হবে। এই সুবিধা ১৯৯৪ সালে ফিরে আসা শরণার্থীদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। ঐ সময় আসা পরিবারকে আরো ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হবে।

নতুন ঘোষিত সুবিধাবলির আওতায় ’৯৪ সালে ফিরে আসা প্রতি শরণার্থী ভূমিহীন পরিবারকে গাভী কেনা বাবদ ৩ হাজার টাকা দেয়া হবে। নতুন আসা শরণার্থীদেরকে ঘর নির্মাণের জন্য কাঠের বদলে পরিবারপ্রতি



আরো ৩ হাজার টাকা দেয়া হবে। প্রতিটি পাহাড়ি গ্রামের ধর্মীয় ‘কেয়াং’ সংস্করণ করার জন্য ১০ হাজার টাকা দেয়া হবে বলে সূত্র জানিয়েছেন। এসব সুবিধা ছাড়াও সরকার ও পাহাড়ি শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ‘২০ দফা প্যাকেজ’ সুবিধাবলির পুরোটাই প্রত্যাগত শরণার্থীরা ভোগ করবে বলে একই সূত্র জানিয়েছেন।

**সংবাদ**

১১ই নভেম্বর ১৯৯৭

চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে প্রধানমন্ত্রী

**পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি চুক্তি হবে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই**

**চট্টগ্রাম, ১০ই নভেম্বর (বাসস) ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, খুব শিগগিরই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, “ইনশাল্লাহ, খুব তাড়াতাড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।” প্রধানমন্ত্রী এখানে আজ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের (ইবিআরসি) সম্মেলন কেন্দ্রে রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসারদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ওই অঞ্চলে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন একটি চিহ্নিত মহল তা নস্যাতের চেষ্টা করছে। ‘‘তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে ও শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে।”

শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটা চুক্তি করার জন্য আগের সরকার ভারতে উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে ১৩ বার বৈঠক করেছিল। তিনি বলেন, কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তারা এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কমিটিতে বিরোধীদলের দু’জন সদস্য আছেন এবং বিরোধীদলের নেতারা তাদের দলের সদস্যদের কাছ থেকে চুক্তি সম্বন্ধে জানতে পারেন।

শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেন, উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে কিভাবে দেশের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব হুমকির মধ্যে পড়বে? তিনি বলেন, তার অর্থ কি এই যে, গোলযোগ, সংঘাত আর সংঘর্ষ চলতে থাকলে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তি সই হবার আগে পর্যন্ত শান্তি চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ সাধারণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। তিনি বলেন, চুক্তির বিরোধিতা করা যুদ্ধ পরিস্থিতিকে স্বাগত জানানোর সামিল। তিনি বলেন, জনগণ শান্তি চায়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘর্ষ ও আত্মঘাতী যুদ্ধের

অবসান দেখতে চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি কোন ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হোক আমরা তা চাই না। তিনি বলেন, আমরা চাই পাহাড়ি-অপাহাড়ি-উপজাতীয়-অউপজাতীয় সবাই একসাথে বসবাস করুক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তি চুক্তির বিষয়ে অপপ্রচারে কান না দেয়ার জন্য কমান্ডিং অফিসারদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য সৈন্যদের আত্মত্যাগ অতুলনীয় এবং জাতি কোনদিনও তা ভুলবে না।

শেখ হাসিনা জোর দিয়ে বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতা রক্ষা করে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে শান্তি চুক্তি সই করা হবে। তিনি আবারো বলেন, ওই এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না।

ওই অঞ্চলের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যই এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, দেশে বিদেশী কোম্পানি কাজ করছে এবং এরকম আরো কোম্পানি আসবে ও কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

তিনি বলেন, চুক্তির পরই রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মতো বিশাল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হবে। এসব ছাড়াও কৃষি ও শিল্পখাতে গৃহীত কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে চায়। আমরা দক্ষ, সুশৃংখল ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী চাই। তিনি বলেন, তার সরকার সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।

উচ্চাভিলাষী লোকদের দ্বারা প্রভাবিত না হবার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্যই অতীতে অনেক তরুণ অফিসারকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তিনি বলেন, "অনেক অফিসারকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল এবং অনেককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল; কিন্তু তারা জানতেন না তাদের অপরাধ কি?"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবনের বিনিময়ে কারো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আমরা পূরণ করতে দেব না। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সতর্ক থাকার জন্য তিনি অফিসারদের প্রতি আহ্বান জানান।

জনগণকে সাক্ষাৎ দান করার কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক বিধবা তার স্বামীর লাশ শনাক্ত করার জন্য আমার কাছে



অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার স্বামী ১৯৭৭ সালের ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, বহু মেধাবী অফিসারকে তখন হত্যা করা হয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ইতোমধ্যেই বিরাট ক্ষতি হয়েছে। "আমরা আর রক্তক্ষয় চাই না।" এর অবসানের জন্য আমাদের দল ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের পক্ষে আন্দোলন করেছে।

অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কমান্ডার মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, এডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মতিউর রহমান এবং ইবিআরসি কমান্ডান্ট ব্রিগেডিয়ার জাহাঙ্গীর কবির উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ একুশ এবং ডিয়ারিং টাইগার্স নামের দু'ব্যাটেলিয়নকে ন্যাশনাল স্টান্ডার্স প্রদান করেন। তিনি সুসজ্জিত চৌকস দলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতার জন্য চার অফিসারসহ সেনাবাহিনীর ১৪ জনের কাছে বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক পদক হস্তান্তর করেন। পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে আছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোজাফফর বীর বিক্রম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন বীর বিক্রম, মেজর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান বীর প্রতীক ও মেজর মিজানুর রহমান শামীম বীর প্রতীক।

অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাহসী যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

তিনি বলেন, সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সময়ের প্রয়োজনে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ একাডেমিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেন, আধুনিক, শক্তিশালী, সুশৃংখল ও দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কুচকাওয়াজশেষে প্রধানমন্ত্রী ইবিআরসি'র কোয়ার্টার গার্ড ও অজানা শহীদ স্মৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মোনাজাত করেন।

এরপর মেজর কে এ খালেক গ্রাউন্ডে তার সম্মানে আয়োজিত প্রীতিভোজে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন।

**সংবাদ**
**১১ই নভেম্বর ১৯৯৭**
## বান্দরবানে
## শান্তি সমাবেশ বুধবার

**বান্দরবান, ১০ই নভেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।**–আগামী বুধবার দুপুরে বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বরে মহাশান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়াকে স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত 'পার্বত্য শান্তি চুক্তির' সমর্থনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে বলে সমাবেশ প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক বীর বাহাদুর এমপি জানিয়েছেন।

মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি থাকবেন টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

**সংবাদ**
**১২ই নভেম্বর ১৯৯৭**
## যেদিন শান্তি চুক্তি হবে সেদিনই
## সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঃ খালেদা

**জসীম চৌধুরী সবুজ, চট্টগ্রাম থেকে ঃ** বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বর্তমান সরকার শান্তি বাহিনীর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছে তা সংবিধানবিরোধী। এই চুক্তি হলে দেশের এক-দশমাংশ আর আমাদের হাতে থাকবে না। চট্টগ্রাম বন্দর, কাপ্তাই ও রাউজান বিদ্যুৎ কেন্দ্র সব আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই যেকোন মূল্যে এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। বেগম জিয়া এই চুক্তি যেদিন সম্পাদিত হবে, সেদিনই সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেছেন, এরপরে আরো কঠোর কর্মসূচি দেব। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রতিহত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত বিরোধীদল আয়োজিত মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শোনা যাচ্ছে ১৬ই নভেম্বর চুক্তি হবে। যদি ঐদিন চুক্তি হয় সেদিনই হরতাল, না হয় অন্য যেদিনে চুক্তি হবে সেদিনই হরতাল পালিত হবে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা মাত্র চারবার হরতাল করেছি। আওয়ামী লীগ আমাদের সময়ে ১৩৭ বার হরতাল করেছিল। আমরা তাদের মতো অকারণে বোমা-ককটেল ফাটিয়ে হরতাল করে দেশের ক্ষতি করছি



না। আমাদের হরতাল দেশের মানুষের স্বার্থে, দেশ রক্ষার স্বার্থে। তিনি বলেন, জিয়া এই চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধও এখান থেকে শুরু হয়েছিল। দেশকে বর্তমানে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার যে যড়যন্ত্র চলছে, তা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এই চট্টগ্রাম থেকেই সংগ্রামের ডাক দিতে আমি এসেছি। বেগম জিয়া পার্বত্য শান্তি চুক্তি প্রতিরোধে প্রয়োজনে রক্ত দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই চুক্তি শান্তি ও মানবতাবিরোধী। পার্বত্য অঞ্চলে বর্তমানে যে ১২টি ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী শান্তিতে বসবাস করছে, চুক্তি হলে তা আর করা যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পার্বত্যাঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, তারা প্রত্যাহার করবে না বললেও ইতোমধ্যে অনেকগুলো ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি এই সরকারের কোন দরদ নেই। সুযোগ পেলেই এরা দেশবিরোধী চুক্তি করে। স্বাধীনতার পর তারা ২৫ বছরের গোলামি চুক্তি করেছিল। জনগণের চাপে তা তারা আর নবায়ন করতে পারেনি। ফারাক্কার পানি চুক্তি করেছে বলে তারা দাবি করে। কিন্তু চুক্তির বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ এতে সালিশি ব্যবস্থা ও গ্যারান্টি ক্লজ নেই। তিনি বলেন, গত ১৬ মাসে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের ক্ষতি ছাড়া দেশ ও মানুষের জন্য কোন্ কাজটি করতে পেরেছে! তারা অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। শেয়ার বাজারের কোটি কোটি টাকা বিদেশীদের পাচার করার সুযোগ করে দিয়েছে। পাটশিল্প ধ্বংস করে পাটের বাজার ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে চলছে নানা বিশৃংখলা। এই শিল্পকেও তারা ভারতের হাতে তুলে দিতে চায়। চিংড়ি শিল্প ধ্বংস হতে চলেছে। বাংলাদেশের চিংড়ি ভারতে পাচার হয়ে যাবার পর তারা তা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। চামড়া শিল্পে বিএনপি আমলে ৩/৪শ' কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছিল; কিন্তু এ সরকার গত ঈদের পূর্বে মাত্র ২৯ কোটি টাকা ঋণ দেয়, যার কারণে চামড়া শিল্পে বিপর্যয় দেখা দেয়। এটিও ভারতের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র। শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্যই তারা ভারতের হাতে এদেশের অর্থনীতিকে তুলে দিচ্ছে–এই অভিযোগ করে বেগম জিয়া বলেন, তারা নির্বাচনের আগে ওয়াদা করেছিল এদেশকে ভারতের প্রদেশে পরিণত করবে। এই সরকার বাংলাদেশের জনগণের সরকার নয়। তারা ভারতের তাঁবেদার সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন করার জন্য রক্ত দিয়েছি, এখন আবার তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে রক্ত দেবে মানুষ। তাই এখন সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেয়ার, আমরা পরাধীনতার শৃংখল পরব কি না।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া অভিযোগ করেন যে, বর্তমান সরকার পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার করছে, যেজন্য তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। তিনি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সরকারের অন্যায় আদেশ-নির্দেশ পালন না করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে যদি আপনাদের চাকরিও চলে যায় আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা ক্ষমতায় গেলে আপনাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনর্বাসন করা হবে। মহানগরী বিএনপি সভাপতি মীর নাসিরউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জাপার (জা-মো) কো-চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ, আবদুল্লাহ আল নোমান, এম মোরশেদ খান এমপি, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি, সালাহ উদ্দিন আহমদ এমপি, মির্জা আব্বাস, মশিউর রহমান এমপি, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি, আমীর খসরু, মাহমুদ চৌধুরী এমপি, এনডিএ'র এএসএম সোলায়মান, জাগপার শফিউল আলম প্রধান, পিএনপি'র শেখ শওকত হোসেন নীলু, ডেমোক্রেটিক লীগের সাইফুদ্দিন মনি ও মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত, গিয়াসুদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি, জয়নাল আবেদীন ফারুক এমপি, ম্যামা চিং, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি, সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি, বরকতউল্লাহ ভুলু এমপি, গাজী শাহজাহান জুয়েল এমপি, একরামুল করিম, শাহজাহান সিরাজ, নাজিমুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, জামাতের মওলানা আবু তাহের, শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন দস্তগীর চৌধুরী।

**সংবাদ**

**১৩ই নভেম্বর ১৯৯৭**

সংসদে আলোচনা ■ সরকার দুর্বল নয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

## বিএনপি পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার স্বার্থেই পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি চায় না

**সংসদ বার্তা পরিবেশক ॥** গতকাল বুধবার সংসদে সরকারিদলের সদস্যরা চট্টগ্রামের সহিংস ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বলেছেন, বিএনপি পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চায় না। এজন্যেই তারা শান্তি প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ সরকার দুর্বল নয়। চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরো বলেছেন, একটি নতুন ইস্যু সৃষ্টি করার জন্য বিএনপিসহ



কয়েকটি দল পূর্বপরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রামের সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে। চট্টগ্রামের সহিংস ঘটনার উপর গতকাল সরকারিদলের সাংসদ শেখ ফজলুল করিম সেলিমের আনা নোটিশের উপর আলোচনায় এসব কথা বলা হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৭ বিধিতে দেয়া এ নোটিশের উপর ২ ঘণ্টারও বেশি আলোচনা হয়। এসময় অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন না।

আলোচনা শুরু করে শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, চট্টগ্রামে মঙ্গলবারের ঘটনা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা গত ৭ই নভেম্বর এধরনের ঘটনার ইঙ্গিত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যেকোন মূল্যে সরকারকে উৎখাত করতে হবে। এধরনের বক্তব্য অসাংবিধানিক।

শেখ সেলিম আরো বলেন, চট্টগ্রামে বিএনপি'র ক্যাডার বাহিনী জনসভার চারপাশে দণ্ডায়মান পুলিশ বাহিনীকে অস্ত্র নিয়ে হামলা করে পুলিশ সিপাহী মান্নানসহ ৪ জনকে হত্যা করে, সাংসদ রফিকুল আনোয়ারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে হামলা করে। চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকাতেও গাড়ি ভাঙচুর করেছে। তিনি বলেন, রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করাই গণতান্ত্রিক রীতি। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে সহনশীলতা। অথচ বিএনপি আজ আবার ৭ই নভেম্বর সৃষ্টির ডাক দিচ্ছে, যে ৭ই নভেম্বরে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারদের হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল। শেখ সেলিম আরো বলেন, বিএনপি নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী আবারো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বড়যন্ত্রের জন্য তার বিচার করতে হবে।

তিনি বলেন, বিএনপি এসব করার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা। বিএনপি আমলে তখনকার মন্ত্রী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ১২ দফা আলোচনা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এখন বর্তমান সরকার যখন শান্তি চুক্তি করতে সফল হতে যাচ্ছে, তখন বিএনপি'র গাত্রদাহ হচ্ছে বলেই এর বিরোধিতা করছে।

সংসদ উপনেতা জিল্লুর রহমান বলেন, যদি বিএনপি'র সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে আগের দিন থেকেই এবং সভা শুরুর আগেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হতো। তা করা হয়নি বলেই শান্তিপূর্ণভাবে শুরু এবং শেষ হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি'র এ নৈরাজ্য সৃষ্টি ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ত্রাস, ভাঙচুর, বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে সারাদেশকে অচল করে দেয়া, যাতে করে বর্তমান সরকার অচল হয়ে পড়ে। বিএনপি এখন এই বিশৃংখলা ও ধ্বংসের রাজনীতি শুরু করেছে।

তিনি বলেন, ক্ষমতা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে বেগম খালেদা জিয়ার সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিটুকু আছে কি না তা নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাদের রাজনীতির অর্থ হচ্ছে মন্ত্রী হতে হবে, ক্ষমতায় থাকতে হবে, জনগণের টাকা-পয়সা লুটপাট করতে হবে। তাদের রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন চিন্তা নেই। এ কারণেই তারা দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে হলেও ক্ষমতায় যেতে চায়। এজন্যই তারা দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকের দিন হরতাল ডেকেছিল, যাতে বিদেশীরা সাহায্য না দেয়।

তিনি আরো বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে কোন দেশপ্রেম নেই। কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, ক্ষমতার জন্য মানুষ খুন করা বিএনপি'র জন্য নতুন কিছু নয়। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর বহু সদস্যকে হত্যা করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। গত বিএনপি সরকার সখিপুরে আনসার হত্যা করেছিল। তিনি বলেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চান না। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য খালেদা জিয়া মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

মতিয়া চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। অথচ বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমদ বলেছেন, সেখানকার শান্তির জন্য চুক্তি করতে হবে ভারতের সঙ্গে। তাহলে কি দেশের সার্বভৌমত্ব যায় না?

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল মানুষ শান্তি চায়। যে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা কিছুতেই ষড়যন্ত্রের হাতে বন্ধ হতে দেয়া হবে না। তিনি আরো বলেন, যেকোন কিছুতে গোপন চুক্তি খোঁজা বিএনপি'র স্বভাব। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোন গোপনীয়তায় বিশ্বাস করে না। আওয়ামী লীগ যা করবে দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে করবে। বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে জোট করে জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোন্ লাইনের মানুষ। সরকারিদলকে আর কষ্ট করে তা বোঝাতে হবে না।

টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, চট্টগ্রামের ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। কারণ সেখানে অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসীরা জনসভায় অংশ নিয়েছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সোনার বাংলার সোনার খনি। সেখানে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম হংকং-সিঙ্গাপুরে পরিণত হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অর্জিত সম্পদ দিয়ে আজ সারাদেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে যদি হানাহানি থাকে তাহলে কোন উন্নতি হবে না, পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্ধকারে থাকবে।

তিনি বলেন, উন্নয়নের জন্যই বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া যা করছেন তা



দেশপ্রেমিকের পরিচয় নয়। দেশের উন্নয়নবিরোধীরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। যারা বিরোধিতা করে তারা পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের হাতকেই শক্তিশালী করতে চায়। কারণ পাকিস্তানি গোয়েন্দারা সেখানে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র-অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে চায়।

মোহাম্মদ নাসিম বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে বলেন, নিজামী-সোলায়মানরা পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছিল। আজ তারা খালেদা জিয়ার সঙ্গে এক হয়েছে। তারা খালেদা জিয়াকেও ধ্বংস করার আগে থামবে না। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, যে চুক্তি এখনো হয়নি তা নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া অপপ্রচার চালাচ্ছেন। চুক্তি হলেই তা দেখে বলা সম্ভব এর কোথায় অসঙ্গতি আছে, কোথায় দেশ বিক্রির কথা আছে। অথচ হাস্যকরভাবে খালেদা জিয়া বলে চলেছেন দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত খালেদা জিয়ার প্রতি নীতি-আচরণ বদলানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, পৃথিবী আজ বদলে গেছে। এখন আর '৭৫ সালের অবস্থা নেই। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার হানাহানি শুরু হলে বিএনপি এর জন্য দায়ী থাকবে।

জাতীয় পার্টির ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী বলেন, আজ সকল বিরোধিতাই আওয়ামী লীগ আর বিএনপি'র মধ্যে। তাদের মধ্যেই সন্ত্রাসী রয়েছে। তাদেরকে চিহ্নিত করা না গেলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতারের দাবি জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম চট্টগ্রামের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এসব দুঃখজনক অনভিপ্রেত অথচ সুপরিকল্পিত সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে শুধু যে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে তা নয়, জাতীয় অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি এগুলো এক মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। পুলিশের উপরে সুপরিকল্পিত এ হামলা এবং নিরীহ জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণের ঘটনা চট্টগ্রামে সশস্ত্র ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিএনপি'র একজন নেতা জনসভার দিন সকালে তাকে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে) জানিয়েছিলেন যে, চট্টগ্রামে বিএনপি'র দু'টি গ্রুপ রয়েছে। তাদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত ঘটতে পারে। তিনি আরো বলেন, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চায় না তারাই এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কটের জন্য শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও এই সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন সরকারিদলের শামিম ওসমান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, তাজুল ইসলাম, আ স ম ফিরোজ, আখতারুজ্জামান ও জাতীয় পার্টির নূর মোহাম্মদ মন্ডল।

গতকাল সংসদ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট পরে ডেপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে ৪টায়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় আবার সংসদ বসবে।

**১টি বিল পাস ঃ** গতকাল সংসদে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল' পাস করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়া বিলটি উত্থাপন করার পর এর উপর আনীত জনমত যাচাই প্রস্তাব ও সংশোধনী কণ্ঠভোটে নাকচ করা হয়। এরপর বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।

**সংবাদ**
১৪ই নভেম্বর ১৯৯৭

### শান্তি সমাবেশ ■ বান্দরবান উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল

**॥ বান্দরবান থেকে ফিরে সুনীল কান্দি দে ॥** গত বুধবার বান্দরবান শহর ছিল উৎসবের শহর। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়াকে জোরদার করার সমর্থনে আয়োজিত শান্তি মহাসমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত ১১টি পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও বাঙালি নারী-পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং হাসিমাখা মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন মেলায় যোগ দিতে এসেছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বান্দরবান জেলা শাখা আয়োজিত শান্তি সমাবেশে বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বর, বাজার এলাকা, বালাঘাট বনরূপা পাড়া সড়ক, সার্কিট হাউস রোড ও ফেরি সড়ক ছিল লোকে লোকারণ্য। দুপুর ১টার আগেই প্রেসক্লাব চত্বরের আসন ব্যবস্থাপনায় টান। শহরে বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি জেলার ৭টি থানার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পাহাড়ি-বাঙালি নারী-পুরুষ ব্যানার হাতে নিয়ে মিছিল সহকারে প্রেসক্লাব চত্বরে এসে সমতে হন। এ সময়ে "পাহাড়ি বাঙালি ভাই এক সাথে থাকতে চাই" এই শ্লোগানটির মাধ্যমে মিছিলকারীরা সমগ্র বান্দরবান শহরকে মাতিয়ে তুলে। ১১টি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মহিলাদের পরনে ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা রাজপুন্যায় এসেছেন। পাশাপাশি বাঙালি নারীরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান–সকলেই সমাবেশে এসেছে অনেকটা সেজেগুজে। এ দৃশ্য দেখে বান্দরবানের প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ইউকে চিং-বীর বিক্রম–যিনি দীর্ঘদিন ধরে বান্দরবান শহরে বসবাস করছেন তিনি এ প্রতিবেদককে জানালেন, আমরা আজ খুবই আনন্দিত। তিনি বলেন '৯১-এর নির্বাচনী জনসভায় শেখ হাসিনা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে হলেও পার্বত্য



চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের যে ওয়াদা করেছিলেন তার বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত। তিনি আরো বলেন শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি বান্দরবানবাসীরা যে ঐক্যের পরিচয় দিলেন তা অটুট রাখতে পারলে কোন অপশক্তিই পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না। বালাঘাটার রহিমা খাতুন বললেন বাবা আমরা তো শান্তি চাই। কিন্তু শিক্ষিত লোকেরাইতো আমাদের ভুল বুঝিয়ে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। বান্দরবান শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ব্যবসা করছেন এমন একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তির মন্তব্য হচ্ছে কয়েকদিন আগে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদের সমাবেশে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী শান্তি চুক্তির বিপক্ষে যা বলে গেছেন তা ডাহা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

শান্তি সমাবেশ যখন শুরু হচ্ছিল, তখন বাজারের মধ্যবর্তী স্থানের একটি মসজিদ চত্বরে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামে নিহতদের জন্য গায়েবানা জানাজার আয়োজন চলছিল। এটা দেখে ওই এলাকার অনেকেই বলাবলি করছিলেন যে–এখনই বোধহয় কোন অঘটন ঘটে যাবে। সবকিছু মিলিয়ে গতকালের শান্তি মহাসমাবেশের উপস্থিতি দেখে যেমন সেখানকার সাধারণ মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে উঠছেন তেমনিভাবে কোন না কোন ছোটখাট ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির ভয়ও করছেন অনেকে।

**সংবাদ**
১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭

### পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি সংলাপ ২৫শে নভেম্বর : চুক্তি হবে এ বৈঠকেই

**সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি সংলাপের ৭ম বৈঠক পিছিয়ে গেছে। বৈঠকের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২৫শে নভেম্বর। জনসংহতি সমিতির এ প্রস্তাব সংবলিত একটি চিঠি গতকাল শুক্রবার রাতে সরকারি পক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা।

একটি সূত্র জানিয়েছে, জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) অসুস্থ থাকার কারণে বৈঠক পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির সবগুলো সূত্র জানিয়েছেন, আসন্ন বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই হবে।

সূত্র জানিয়েছেন, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়কের একজন প্রতিনিধি গতকাল শুক্রবার দুদুকছড়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান সন্তু লারমা গুরুতর অসুস্থ। যোগাযোগ কমিটির ঐ প্রতিনিধির হাতে একটি চিঠি দেয়া হয়। সেখানে এ বৈঠক ১৬ তারিখের পরিবর্তে ২৫ তারিখ করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এর ভিত্তিতেই হংসধ্বজ চাকমা সরকার পক্ষকে বৈঠকের নতুন তারিখ নির্ধারণের প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি পাঠিয়েছেন। সরকারি সূত্র বলেছেন, তারা এ প্রস্তাব মেনে নেবেন।

এবারের বৈঠকে চুক্তি সই হওয়ার পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত জেলা প্রশাসকদের উপর আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং চুক্তি সম্পাদনের পর শান্তি বাহিনীর ফিরে আসা সদস্যদের পুনর্বাসনের বিষয় দুটো প্রাধান্য পাবে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, জনসংহতি সমিতি নেতারা চুক্তি সাইয়ের আগেই এ দুটো বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে চান। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ৭ম বৈঠকে উভয়পক্ষ এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সবকিছুতে সমঝোতা হয়ে গেলেই শান্তি চুক্তি সই হবে।

বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২১ ও ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে জনসংহতি সমিতির সাথে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এই কমিটির শান্তি সংলাপ শুরু হয়। '৯৭ সালের ২৫শে জানুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ষষ্ঠ বৈঠক হয় একই স্থানে। ৭ম বৈঠকও পদ্মাতেই হবে। বাংলাদেশ মুজিবনগর কর্মচারী কল্যাণ সংসদের নির্বাহী কমিটির সভায় দেশের সকল অঞ্চলের সমান উন্নয়নের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে অবিলম্বে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

গত বুধবার সংগঠনের চেয়ারম্যান এ লতিফ খানের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন, ব্যারিস্টার এ হাসিব খান, আবদুল আজিজ, আপেল মাহমুদ, এস এম জাহাঙ্গীর, শামসুজ্জোহা চৌধুরী, এম আলমগীর প্রমুখ। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করে বিএনপি স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জনসভার নামে গত ১০ই নভেম্বর চট্টগ্রামে যে নারকীয় ঘটনা ঘটায় বক্তারা তার নিন্দা করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।



**সংবাদ**
**১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭**

## শান্তি সংলাপ আরো পেছাতে পারে
## চুক্তি হবে দুই পর্যায়ে

**সুনীল কান্তি দে/সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ৭ম দফা শান্তি সংলাপের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র সন্তু লারমার অসুস্থতা নয়। সম্মেলন পেছানোর জন্য প্রায় একই সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ও ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলনও অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। তবে এই বৈঠক আরও পেছাতে পারে। সরকারের উচ্চপদস্থ একটি সূত্র গতকাল জানান, বৈঠক পিছিয়ে যাবে এমন খবরটি আগেই সরকার আঁচ করতে পেরেছিল। দু'পক্ষের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করা হয়। তবে সূত্র বলছেন, আগামীতে যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সে বৈঠকেই শান্তির ব্যাপারে প্রথমে সমঝোতা স্মারক ও পরে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে শান্তি চুক্তি সই হবে।

সূত্র জানিয়েছেন, সরকার ২৫শে নভেম্বরের ঢাকা বৈঠকটি আরও একটু পেছাতে চায়। এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতিকে জানানো হয়েছে। তারা এখনো কোন সিদ্ধান্ত সরকারকে জানায়নি।

জনসংহতি সমিতির উচ্চপদস্থ নেতারা এখন দুদুকছড়ায় অবস্থান করছেন। তারা আগামী বৈঠকটি পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে। তবে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ও অন্যতম নেতা সুধাসিন্ধু খীসা সেখানে অবস্থান করছেন না।

শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, ১৯শে নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ও ২৩শে নভেম্বর ঢাকায় ত্রিদেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে দেশে কোন হরতাল বা এই ধরনের কর্মসূচি পালিত হোক সরকার চায় না। সূত্রমতে, জনসংহতি সমিতি ২৫শে নভেম্বরকে ৭ম বৈঠকের তারিখ হিসেবে প্রস্তাব করে সরকারের কাছে যে অনুরোধ পাঠিয়েছে তারও কিছুটা হেরফের হতে পারে। তার মতে, সরকারের পক্ষ ৭ম বৈঠকের তারিখটি ২৭শে নভেম্বর করার জন্য যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির কাছে অনুরোধ করেছে।

যোগাযোগ কমিটির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছেন, যে সমস্ত বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতি এখনও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি সেগুলো এবারের বৈঠকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অবশ্যই সমাধা করা হবে। তার মতে, চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি দু'ভাবে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে উভয় পক্ষের নেতারা একটি সমঝোতা স্মারকে সই করবেন এবং

পরে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে চুক্তি সই করা হবে। এই দু'টি অনুষ্ঠানের স্থল কোথায় হতে পারে জিজ্ঞাসা করা হলে সূত্র জানান, সমঝোতা স্মারক সইয়ের বিষয়টি বৈঠকস্থলে এবং চুক্তি সইয়ের বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি আগ্রহী। সূত্র জানান, চুক্তি সইয়ের সময়ে সরকারপ্রধান ছাড়াও মন্ত্রীবর্গ, কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ, দেশের রাজনীতিকবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিও আশা করছেন জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ ৭ম বৈঠকে।

খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহুরুল আলম জানিয়েছেন, গতকাল সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, সদস্য ক্যশৈ অং এবং নকুল ত্রিপুরা দুদুকছড়ায় গিয়ে সেখানে অবস্থানরত জনসংহতি নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা রূপায়ণ দেওয়ান ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা ছাড়াও তাদের সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদার গত তিনদিন ধরে দুদুকছড়ায় এসে অবস্থান নিয়েছেন। যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ৭ম বৈঠকের দিনক্ষণ পুনর্নির্ধারণ এবং বৈঠকে যোগদান ও নেতাদের ঢাকা থেকে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত শান্তি বাহিনী সদস্যরা দুদুকছড়ায় অবস্থান করবেন। এ সময়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যাহৃত ও নিষ্ক্রিয় ক্যাম্পগুলো আগের অবস্থায়ই থাকবে।

গতকাল খাগড়াছড়ির স্থানীয় সাংবাদিকরা দুদুকছড়ায় গিয়ে জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর নেতাদের সাথে দেখা করতে চাইলে আপাতত দেখা করা যাবে না বলে জানানো হয়। সাংবাদিকদের জানানো হয় যে, বৈঠকের তারিখ পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারি সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা সাংবাদিকদের সাথে কোন কথা বলতে পারবেন না। ইতোমধ্যে দুদুকছড়া উৎসবের স্থানে পরিণত হয়েছে। জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীতে অবস্থানরত নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার পাহাড়ি নরনারীরা গত কয়েকদিন যাবৎ দুদুকছড়ায় অবস্থান করছেন। এখানে জনসংহতি সমিতি নেতারা তাদের ইস্যু করা স্লিপের ক্রমানুসারে দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করে কথাবার্তা বলছেন।

যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন, জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী নেতারা যতদিন দুদুকছড়ায় অবস্থান করবেন ততদিন যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরালাল চাকমা ও মোহাম্মদ বাকি তাদের সাথে থাকবেন।



বান্দরবান থেকে এনামুল হক কাশেমী জানান ঃ আসন্ন পার্বত্য শান্তি চুক্তির সপক্ষীয় পাহাড়ি বাঙালিরা অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষায় আছেন। শুক্রবার ও শনিবার বান্দরবান জেলার বেশক'জন পাহাড়ি বাঙালি নেতা শান্তি চুক্তি সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দীর্ঘদিনের লালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পার্বত্য শান্তি চুক্তি সই হওয়া প্রয়োজন। নেতৃবৃন্দ জানান, বান্দরবান জেলার প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ (পাহাড়ি-বাঙালি মিলে) আসন্ন শান্তি চুক্তির পক্ষে। তারা আশা করছেন যে, শান্তি চুক্তির পরে পার্বত্য জেলাগুলোতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, দূর হবে সকল ধরনের অশান্তি ও হিংসা-বিদ্বেষ। তারা মনে করেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিচক্ষণতায় পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির নীড় পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হবে।

গত ১২ই নভেম্বর বান্দরবান জেলা সদরে অনুষ্ঠিত মহাশান্তি সমাবেশে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী তার বক্তৃতায় ঘোষণা দেন যে, শান্তি চুক্তির পরে পার্বত্য জেলাগুলোতে কৃষি উন্নয়নে ১শ' কোটি টাকা খরচ করা হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী নাসিম বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসার পর এই অঞ্চলকে দেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরকার গত অর্থবছর থেকে বিশেষ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩টি পার্বত্য জেলায় ১৫শ' ভূমিহীন মহিলা পরিবারকে স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হবে। আগামী ডিসেম্বর '৯৭ থেকেই উক্ত কর্মসূচির কাজ শুরু হবার কথা।

**সংবাদ**

**১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**পাহাড়ে শান্তি আসছে**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শান্তির প্রতীক্ষায় পার্বত্য জেলার অধিবাসীরা দিন গুনছে। 'পাহাড়ে শান্তি আসুক'–এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সরকারি পদক্ষেপগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শরণার্থীরা ফিরে আসছে, যারা ফিরে এসেছে তারা সম্প্রীতির ধারায় আবার ফিরে যাচ্ছে জীবনের স্বাভাবিক ধারায়।

সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক পাহাড়ি শরণার্থীদের সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত

করতে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এরই মধ্যে এ পর্যায়ে ৬ হাজার ৬৩ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়া চতুর্থ দফার উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হতে যাচ্ছে ২১শে নভেম্বর। প্রথম দিনেই একশ' পরিবারের ৫শ' শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে।

গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে আছে, শরণার্থীদের জন্য ঢেউটিন কেনা, নগদ অর্থের জন্য ফান্ড সংগ্রহ, ফিরে আসতে ইচ্ছুকদের জন্য ১২ মাসের রেশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ খবর দিয়েছে। আগামী ২১শে নভেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার তবলছড়ি সীমান্ত এলাকা দিয়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসবে।

বর্তমান সরকারের সময় গত ২৮শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ১২শ' ৪৮টি পরিবারের ৬ হাজার ৭শ' ৩ জন শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছিল।

সরকারের সূত্র জানিয়েছেন, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ত্রিপুরায় তিনদিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন। তিনি শিগগিরই শরণার্থী বিষয়ে টাস্ক ফোর্সকে সমস্ত ব্যাপার জানাবেন।

এর আগে কথা ছিল ত্রিপুরা থেকে একনাগাড়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসবে কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তারা দফায় দফায় দেশে আসবে বলে জানা গেছে। আগামী ৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ত্রিপুরায় শরণার্থী বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকের পর ২১শে নভেম্বর থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পর নতুন শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে তারিখ নির্ধারণ করা হতে পারে বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন।

গত ২৮শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ফিরে আসা শরণার্থীদের সকল সুযোগসুবিধা সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত দু'একটি অসুবিধে ছাড়া তেমন কোন সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন একটি সূত্র। তবে শরণার্থী নেতা অক্ষয় মণি চাকমা বলেছেন, শরণার্থীদের পুনর্বাসন কাজে আমরা সন্তুষ্ট। তিনি জানান, স্বদেশের জীবনই সবচেয়ে ভালো। মাতৃভূমিতে বাস করার মতো সুখের ব্যাপার আর কি আছে। তিনি বলেছেন, শরণার্থী জীবন হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টের জীবন।

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালায় অবস্থিত একটি পাহাড়ি গ্রামে ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসা লাকি চাকমার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা দেশেই সবচেয়ে ভালো আছেন। এখানে তারা পড়ালেখার সুন্দর সুযোগ পাচ্ছে।

প্রত্যাগত শরণার্থীরা এখন বিভিন্ন ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কেউ কেউ ফিরে গেছেন জুম চাষের জন্য পাহাড়ে। তারা এখন ভুলে থাকতে চান শরণার্থী জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা। এখন তারা অপেক্ষা করছেন আরো যারা খুব দ্রুত দেশে ফিরে আসছে তাদের জন্য।



**সংবাদ**

**১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭**

## 'যেদিন শান্তিচুক্তি সেদিন থেকেই কর্মসূচি' নিয়ে তৎপর বিএনপি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তিচুক্তিকে ইস্যু করে হরতালসহ নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছে। মাঠে সঙ্গী হিসেবে থাকবে জামাতে ইসলামীসহ সমমনারাও। আজ ১৬ই নভেম্বর ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির নেতাদের বৈঠক ও শান্তিচুক্তি সইয়ের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে গতকাল শনিবার বিএনপি নিজেরা বৈঠকে মিলিত হন। সকালে স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পর সন্ধ্যায় আবার জামাতসহ সমমনাদের নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠকও করা হয়। তবে সরকার ও জনসংহতির বৈঠক পিছিয়ে যাবার কারণে বিএনপি ও সমমনাদের বৈঠক শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কোন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়নি।

গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় মিন্টো রোডস্থ বিরোধীদলীয় নেত্রী সরকারি বাসভবনে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্যদের এক বৈঠক হয়। উত্তরাঞ্চলে গণসংযোগ সফরে থাকায় দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, দলীয় মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার, ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মতিন চৌধুরী, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী ও ডাঃ আর এ গনি।

সন্ধ্যায় মিন্টো রোডে জামাতে ইসলামীসহ সমমনাদের সাথে আরেকটি বৈঠক করেন বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া। বৈঠকে জামাতের মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, ডিএল-এর অলি আহাদ, জাগপা'র শফিউল আলম প্রধান ও রেহানা প্রধান, কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন জাপার শামীম আল মামুন ও মঈনুদ্দিন ভূঁইয়া, পিএনপি'র শেখ শওকত হোসেন নীলু, এনডিএ'র নূরুল হক মজুমদার প্রমুখ। পরে এস এম সোলায়মান সেখানে আসেন এবং মান্নান ভূঁইয়ার সাথে কথা বলে চলে যান।

বৈঠকশেষে সন্ধ্যায় বিএনপি মহাসচিব জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তিচুক্তির দিকে আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছি। চুক্তিতে কি হয় তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মসূচি আসবে। তিনি বলেন, স্বার্থবিরোধী কোন চুক্তি

হলে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আসবে। গত ১১ই নভেম্বর চট্টগ্রামের মহাসমাবেশ থেকে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার 'যেদিন চুক্তি সেদিনই হরতাল' ঘোষণার কথাও তিনি জানান।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ রোববার জনসংহতি সমিতির নেতাদের সাথে সরকারের বৈঠক হবার কথা ছিল। বৈঠকে শান্তিচুক্তি সই হবারও সম্ভাবনা ছিল। সে কারণেই গতকাল বিএনপি ও সমমনারা বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। বৈঠকশেষে কর্মসূচি দেয়ারও প্রস্তুতি ছিল; বৈঠক ও শান্তিচুক্তির তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার কারণে শুধু পরিস্থিতি ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠক সম্পর্কে দলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১১ই নভেম্বর চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত করে কাজী জাফর, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও শফিউল আলম প্রধানসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সভার প্রস্তাবে এ ব্যাপারে আরো বলা হয় যে, সরকার রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য এই মামলা করেছে।

**সংবাদ**

**১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**শরণার্থী প্রত্যাবর্তন শুরু হচ্ছে ২১শে নভেম্বর থেকে**

**মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রিত পাহাড়ি শরণার্থীদের ৪র্থ পর্যায়ের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া আগামী ২১শে নভেম্বর থেকে শুরু হবে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি সরকারি প্রতিনিধিদলের তিন দিনব্যাপী আগরতলা সফরের পর প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত এলাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসা শরণার্থীদের স্বাগত জানাবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও কমিটির অন্য সদস্যরা।

১৫ই নভেম্বর রাত ৯টায় রামগড় সীমান্ত দিয়ে ফিরে আসা খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক 'সংবাদ'কে জানান ঃ এবারের প্রত্যাবর্তনের প্রথমদিনে ১শ'টি



পাহাড়ি শরণার্থী পরিবারের ৫শ' সদস্য দেশে ফিরবে মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত এলাকা দিয়ে। তিনি আরো জানান, ত্রিপুরায় ৬টি আশ্রয় শিবিরের ৮ হাজার ১শ' ৫১টি পরিবারে ৪৪ হাজার ৩শ' ৫৯ জনের তালিকা তিনি নিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে এবারের চতুর্থ দফার ১ম পর্যায়ে বাংলাদেশের মাটিরাঙ্গা ও রামগড় থানার সীমান্ত এলাকা দিয়ে ১ হাজার ২শ' ১৬টি পরিবারের ৬ হাজার ৬শ' ৮৪ জন শরণার্থী দেশে ফিরবে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে ত্রিপুরা সফরকারী এই প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেহাজ উদ্দীন চৌধুরী, রামগড়ের টিএনও জামাল আবু নাসের ও মাটিরাঙ্গার টিএনও মীর আহমেদ। ৩ দিনের এ সফরকালে প্রতিনিধিদলটি ত্রিপুরার যতনবাড়ি সরকারি রেস্ট হাউজে ট্রাইবেল রিফিউজি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছে। এখানে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ছাড়াও এসোসিয়েশনের ঊর্ধ্বতন নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দলটি টাকুমবাড়ি ও কাঁঠালছড়িসহ অন্যান্য পাহাড়ি শরণার্থী আশ্রয় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে। চতুর্থ দফার প্রত্যাবর্তনে যে সমস্ত পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরবেন তারা খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও দীঘিনালা থানার অধিবাসী।

**সংবাদ**

**১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭**

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি

**৭ম বৈঠক বসছে ২৬শে নভেম্বর**

**মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির ৭ম বৈঠকটি আগামী ২৬শে নভেম্বর চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে গতকাল সোমবার বিশেষ দূতের মাধ্যমে ২৬শে নভেম্বর বৈঠকের তারিখ চূড়ান্ত করে একটি চিঠি জনসংহতি সমিতির কাছে পানছড়ির দুদুকছড়ায় পৌঁছানো হয়।

জনসংহতি সমিতিও ২৬শে নভেম্বর ৭ম বৈঠকে বসতে তাদের সম্মতি জানিয়েছে। বৈঠক হবে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায়।

যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এ প্রতিবেদককে জানান, সরকারের চিঠি জনসংহতি সমিতির কাছে গতকালই পৌঁছে গেছে। যে দূত চিঠিটি নিয়ে গেছে, তার মাধ্যমেই জনসংহতি সমিতি ২৬শে নভেম্বর

বৈঠকে বসতে সম্মতির কথা জানিয়ে দেন। তবে সরকারের কাছে একটি চিঠিও সমিতির প্যাডে আজ মঙ্গলবার ঢাকায় পৌঁছানো হবে।

পানছড়ির দুদুকছড়ায় জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতা ঊষাতন তালুকদার, রূপায়ণ দেওয়ান, রক্তোৎপল ত্রিপুরাসহ শান্তি বাহিনীর আর্মস ক্যাডাররা গত বুধবার থেকেই অবস্থান করছেন। পার্বত্য শান্তি চুক্তি এ বৈঠকেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক জানান, বৈঠক অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত পানছড়ির দুদুকছড়ায় ১৩টি নিরাপত্তা ক্যাম্পের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় থাকবে।

পার্বত্য অঞ্চলে অনেক ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী প্রতিদিনই দুদুকছড়ায় গিয়ে জনসংহতি সমিতির সমর্থন পাওয়ার আশায় ভিড় করছে। এদিকে আগামী ২১শে নভেম্বর চতুর্থ দফা উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতিকাজ অব্যাহত রয়েছে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল প্রত্যেকটি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে প্রত্যাবর্তনের সকল প্রস্তুতিকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করা নিয়ে কতিপয় পত্রিকা যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। জেলা প্রশাসক বলেন, খাগড়াছড়ি ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বোর্ড পরীক্ষার কারণে শুধুমাত্র ঐ এলাকায় পরীক্ষা চলাকালীন সময়ের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, যা পুরো জেলার জন্য নয়। তিনি ১৪৪ ধারা সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

**সংবাদ**

**১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭**

## অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করতে গণতন্ত্রী পার্টির আহ্বান

গণতন্ত্রী পার্টির সম্পাদকদের সভায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় গণতন্ত্রী পার্টির সম্পাদকবৃন্দের এই সভা পার্টির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন ফকির আবদুর রশিদ, প্রদ্যুত রায়, শরাফত আলী হীরা, জাহানারা তাহের, এডভোকেট আবদুল গফুর প্রমুখ।



সভায় পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম লেবু ও সম্পাদক জেড, এ ওয়াহেদের শ্বশুরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় গণতন্ত্রী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সৈয়দ আলতাফ হোসেনের মৃত্যুবার্ষিকী পালনে আগামী ২১শে নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য স্মরণসভা সর্বতোভাবে সফল করার ব্যাপারে আলোচনা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

**সংবাদ**

**২১শে নভেম্বর ১৯৯৭**

## শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হচ্ছে আজ

**॥ সাগর সরওয়ার ও মোহাম্মদ জহুরুল আলম ॥** আজ থেকে শুরু হচ্ছে ৪র্থ দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসন। এ দফায় ১২শ' ১৬ পরিবারের ৬ হাজার ৬শ' ৮৪ জন শরণার্থী ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে দেশে ফিরে আসবে। খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাংগা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে এ প্রত্যাবাসন কাজ শুরু হচ্ছে।

আজ প্রথম দিনে ১শ' শরণার্থী পরিবারের ৫শ' জন সদস্য দেশে ফিরবে। দেশে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের স্বাগত জানাবেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীদের বিদায় জানাবেন, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী কেশব মজুমদার।

দু'দেশের সীমান্তের দু'প্রান্তে শরণার্থী প্রত্যাবাসনকে স্বাগত ও বিদায় জানাতে দু'টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৯টায় ত্রিপুরার শীলাছড়িতে এবং ১০টায় তবলছড়িতে হবে এ দু'টি অনুষ্ঠান।

ত্রিপুরার পক্ষে উপস্থিত থাকবেন বিদ্যুৎমন্ত্রী কেশব মজুমদার ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী জিতেন চৌধুরী, ত্রিপুরার অধিপতি রতন ভৌমিক, তুলশী দাস, ডিএম লোকরঞ্জন। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, খাগড়াছড়ির ডিসি মোহাম্মদ ইসমাইল ও স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজি গোলাম রহমান।

সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে পা রেখেই একটি শরণার্থী পরিবার নূন্যতম ২১ হাজার টাকা হাতে পাবে। কোন কোন পরিবার পরে আরো ৭ হাজার টাকা পাবে। এছাড়া ১ বছরের রেশন ও অন্যান্য সুবিধা শরণার্থীরা ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা সীমান্তবর্তী তবলছড়ি পয়েন্টে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি দেখে এসে 'সংবাদ'কে বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে আর যুদ্ধ সংঘাত কেউ চায় না। সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে চায়। শান্তি চুক্তির প্রাক্কালেই বিদেশের মাটিতে অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাচ্ছে। তবে তিনি সরকারকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের যথাযথ পুনর্বাসন করার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভারতে ছিলেন তারা। ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য সকল কিছু নিয়েই ফিরে আসছে। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শরণার্থী নেতা যুগান্ত চাকমা, উজ্জ্বল চাকমা, ভাগ্যমণি চাকমা ও প্রফুল্ল কুমার চাকমা।

মাটিরাংগার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে প্রথম দফা প্রত্যাবাসন ৫ দিন একনাগাড়ে চলবে। ঢাকায় জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটির বৈঠকের জন্য দু'দিন প্রত্যাবাসন কাজ স্থগিত থেকে ২৯ তারিখ শুরু হবে রামগড় সীমান্ত এলাকা দিয়ে।

৩০শে নভেম্বরে এ পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শেষ হবে। ত্রিপুরার ৫টি ক্যাম্পে এখন ৮ হাজার ১শ' ৫১টি শরণার্থী পরিবারের ৪৪ হাজার ৩শ' ৫৯ জন শরণার্থী অবস্থান করছে। বাংলাদেশ সরকার আশা করছে ধারাবাহিকভাবে পাহাড়ি শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসবে। এ লক্ষ্যে ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে শরণার্থীদের ফিরে আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, এ বৈঠকের সময় আরো এগিয়ে আনা হতে পারে।

**সংবাদ**

**২১শে নভেম্বর ১৯৯৭**

**শান্তিচুক্তি : ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ নয়**

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জের এক জনসভায় তার 'চুক্তির দিনেই হরতাল পালিত হবে'—এই কর্মসূচি পরিবর্তন করে বলেন, কি চুক্তি করা হয় তা দেখে পরে 'হরতালসহ কঠিন কর্মসূচি' দেয়া হবে। এর অর্থ হতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি



বেগম খালেদা জিয়ার মতে, 'দেশ বিক্রি' না হলে হরতাল ডাকা নাও হতে পারে। তার বক্তব্যে তিনি আসন্ন শান্তিচুক্তির সর্বাত্মক বিরোধিতা থেকে একধাপ সরে এসেছেন। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি এবং শান্তিচুক্তির সপক্ষে, তারা এই নতুন অবস্থানকে স্বাগত জানাবেন। দেশের মানুষ হরতাল, অবরোধ ও বিশৃংখলা থেকে রেহাই পেতে চান।

বেগম খালেদা জিয়া মুন্সিগঞ্জের জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, আমরা পার্বত্য এলাকায় শান্তি চাই, সমস্যার সমাধান চাই। এটাও আশ্বস্ত হওয়ার মতো ঘোষণা। তবে তিনি চান শান্তিচুক্তি হোক তার দেয়া কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে, যা তিনি তার আমলে করতে পারেননি। বর্তমান উদ্যোগ দেশের স্বার্থ কিভাবে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন সে কথা খালেদা জিয়া বলছেন না। বেগম জিয়ার আমলে কর্নেল অলি আহমেদের নেতৃত্বে যেভাবে আলোচনা চলতো এখনও প্রায় সেভাবেই চলেছে। চূড়ান্ত চুক্তিই বলে দেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ফলে দেশের 'স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন' হবে কি না। আগেভাগেই হাওয়ায় তরবারি ঘুরিয়ে কোন লাভ নেই।

বিরোধীদলীয় নেত্রী চাচ্ছেন, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের আগে তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হোক। যতক্ষণ কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিটি থাকে খসড়া চুক্তি। কোন দেশে এমন নজির নেই যে, খসড়া চুক্তি জাতীয় সংসদে আলোচিত হয়েছে। তা চুক্তি সম্পাদনের কার্যকর পদ্ধতি নয়। প্রধান বিরোধীদলের অন্তত এটুকু জানা থাকার কথা। অতএব 'চুক্তির পরে সংসদে উপস্থাপন করা হলে তার বৈধতা দিতে আমরা রাজি নই'—বেগম খালেদা জিয়ার এই ঘোষণার হালে পানি পাবে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় যে, শান্তিচুক্তির খসড়া সংসদে উপস্থাপন করা হবে; কিন্তু সংসদ অধিবেশনে তো বিএনপি যাচ্ছে না। তাদের দু'জন সংসদ সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে আছেন। তারা কমিটির কাজকর্মে অংশ নেন না, খসড়া চুক্তি জানার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই এবং কমিটির সঙ্গে কোন সংশ্রব তারা রাখেননি। এগুলো তো নেত্রীর হুকুমেই হচ্ছে। জানার চেষ্টা না করে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই তারা পছন্দ করে আসছেন। মনগড়া অভিযোগ করছেন। নয়কে ছয় করার চেষ্টা করছেন। জাতীয় সংসদের বদলে মাঠ গরম করার সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা দেখে কর্মসূচি নির্ধারণের ঘোষণা বিএনপি'র অবস্থান পরিবর্তনের সূচনা হলে দেশে স্বস্তির বাতাস বইবে। আমরা এটাও আশা করবো, চূড়ান্ত চুক্তির মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে দেশকে অশান্ত করে তোলা হবে না। প্রধান বিরোধীদলে সম্প্রতি ডালপালা

গজিয়েছে। ৬টি 'রিফ-র‍্যাফ' দল বিএনপি'র সঙ্গে ভিড়েছে। দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়। চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক খুনোখুনি তার প্রমাণ। তাই বেগম জিয়ার 'কঠিন কর্মসূচি' সম্পর্কে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত।

**সংবাদ**

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

**শরণার্থী প্রত্যাবাসন**
**প্রথম দিনেই**
**৫৭৮ জন ফিরেছেন**

**মোহাম্মদ জহুরুল আলম, তবলছড়ি সীমান্ত থেকে ফিরে ঃ** চতুর্থ দফা পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসন গতকাল শুক্রবার থেকে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই তালিকাভুক্ত ১০০ পরিবারের ৫৭৮ জন দেশে ফিরেছে। তালিকাভুক্ত ৫৭৪ জন থাকলেও এর সাথে আরও ৪ জন নবজাতক শিশু অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শরণার্থী নেতা সুকোমল চাকমা তার স্ত্রী-পরিজন নিয়ে ৫ সদস্যের দলটি প্রথম দেশের মাটিতে পা রাখেন। তাদেরকে দেশে অভ্যর্থনা জানান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। ত্রিপুরা থেকে তাদের বিদায় জানান ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী কেশব মজুমদার।

গতকালের প্রত্যাবর্তন শুরু হয় জুমার নামাজের পর। প্রত্যাবর্তন শুরু হওয়ার আগে দুপুর ১২টায় (ভারতীয়) শিলাছড়ি পয়েন্টে এক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী কেশব মজুমদার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীরা আজ নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। এতে আমরা খুবই আনন্দিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, যেসব পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরে যাচ্ছে তারা আমাদেরই ভাই-বোন। শেখ হাসিনার সরকার গঠিত হওয়ার পর এ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের জন্য সৎ ইচ্ছা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে ৬বার বৈঠক করেছে। বৈঠকে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'শিগগিরই শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে।'

সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার সভা অধিপতি রতন ভৌমিক। সভায় শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা বলেন, বর্তমান সরকার শরণার্থীদের ব্যাপারে সৎ ইচ্ছা ও আন্তরিকতা দেখাচ্ছে বলেই আজ চতুর্থ দফায় শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাচ্ছে। সভায় তিনি ঘোষণা দেন, '৫ম পর্যায়েও



আরও ৬ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরে যাবে। পরে ক্রমান্বয়ে সকল শরণার্থী নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবে।'

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী জিতেন চৌধুরী, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান এমপি কল্পরঞ্জন চাকমা।

ওপারের সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত আতাউর রহমান খান কায়সার, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি (জাপা), ফজলে রাব্বি এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর, খাগড়াছড়ির স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরন দেওয়ান, রাঙ্গামাটির চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল, পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম।

**সংবাদ**

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

**শান্তি চুক্তি বিরোধী**
**তৎপরতায় উদ্বেগ**

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি ও '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীরা অশান্তির আন্দোলন শুরু করায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। গতকাল শুক্রবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভায় এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। শামীম আখতারের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর বাসভবনে।

সভায় বলা হয়, পাকিস্তান আমল থেকে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রশমিত হয়নি।

**সংবাদ**

২৩শে নভেম্বর ১৯৯৭

**যাতে দেশের স্বার্থ শান্তি**
**স্বস্তি বিপন্ন না হয়**
**-সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন**

বিরোধীদল তো বিরোধিতা করবেই। নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিজয়ী ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে কোলাকুলি করবে এমন আশা এবং আবদার নিতান্তই অলীক ও

অবাস্তব। পরাজয়ের জ্বালা থাকবেই এবং সে জ্বালার কারণে অধৈর্য, অস্থিরতা, অশান্তি ও অসহিষ্ণুতাও থাকবে, নির্বাচন বৈধতা নিয়ে কিছুটা সত্য কিছুটা অসত্য এবং অসংলগ্ন বাক্য বর্ষণও চলবে। হুমকি ধামকিও চলবে, পাশ্চাত্যের শক্ত ভিতে দাঁড়ানো পুরোনো গণতন্ত্রে না হলেও আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের নতুন এবং দুর্বল গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এসব বাস্তবতা অবাঞ্ছিত হলেও অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই অসহিষ্ণুতা-অস্থিরতা, অসত্য এবং অসংলগ্ন বক্তব্য বক্তৃতা কতোদিন চলবে, কতদূর পর্যন্ত তা চালানো যাবে? একই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন–নির্বাচনে জয়লাভ করে যারা বা যে দল সরকার গঠন করলেন তারা কতোখানি এই অশান্ত, অস্থির এবং অসহিষ্ণু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলবেন? বিরোধীদলকে শান্ত এবং সন্তুষ্ট রাখার জন্য কতখানি ছাড় দিতে পারবেন, সমঝোতার পথে কতদূর এগিয়ে যাবেন, নিজেদের দলীয় মতাদর্শ, নীতি, লক্ষ্য এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার কতোখানি অক্ষত রেখে বা কতোখানি বিসর্জন দিয়ে? অন্য কোথাও নয়, আমাদের নিজেদের দেশের প্রেক্ষিতেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। অবশ্য, এ ধরনের আলোচনায় বিপদ আছে, অন্তত আমাদের এই দেশে। আপনি যদি একান্তভাবে নিজের বিবেচনায় যা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তা-ই বলেন, তাহলে দেখবেন, কেউ আপনাকে ক্ষমতাসীনের সমর্থক, কেউবা সরকারবিরোধী বলে চিহ্নিত করবে। কেউ বলবে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, কেউ বলবে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী। এ দুই ছাড়া, আপনার যেন আর কোন পরিচয় বা অবস্থান যেন থাকতে পারে না। অথচ আপনি হয়তো কোন রাজনৈতিক দলেই নেই, তবে দেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে আপনার সেই চিন্তাভাবনাগুলো প্রকাশ করেন। তবুও বলা দরকার কারণ আজ অসহিষ্ণুতা প্রতিহিংসায় পরিণত হতে যাচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘাতে।

দেশের দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক এমন সংঘাতময়, যুদ্ধভাব হয়ে উঠেছে, দেশকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, দেশবাসীকে এমন শংকিত, উদ্বিগ্ন রাখছে যে রাষ্ট্রপতি, রাজনৈতিকভাবে একটি দলের মনোনয়ন পেয়ে রাষ্ট্রের এই সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও নিরপেক্ষতা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে যাঁর দেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, কোন উপলক্ষে বাণী দেয়ার মতো করে দু'একটা সাধারণ মন্তব্য দেয়া ছাড়া বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে কিছু বলার কথা নয়, তিনিও বাধ্য হয়ে আজ তার প্রায় ভাষণ ও বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে, সংঘাতময় জাতীয় রাজনীতি এবং



সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বলছেন। তার কথাগুলো সব মহলেই প্রশংসিত, অভিনন্দিত হচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণ তার উচ্চারিত উপদেশ সময়োচিত এবং অতিমূল্যবান মনে করছে। কিন্তু রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দলগুলোর উপর রাষ্ট্রপতির উপদেশ বা মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। ঢাকায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা পর্যন্ত সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে তাদের সীমারেখার মধ্যে চেষ্টা করছেন। তাদের এই চেষ্টা করাটাই তো আমাদের জন্য পরম লজ্জার বিষয় এবং মর্যাদাহানিকর। গ্লানির এখানেই শেষ নয়, আমরা নিজদের খুব ভাগ্যবান মনে করেছিলাম, গর্বও বোধ করেছিলাম এই কারণে যে এবার দাতাগোষ্ঠী ঢাকায় বৈঠক করতে সম্মত হয়েছেন। সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাদের দেশে আমাদের দৌড়াতে হবে না। দাতাগোষ্ঠী নিজেরাই আমাদের মাঝে আসবেন, কি পরিমাণ সাহায্য দেয়া যায় তা নির্ধারণ করতে। তারা এলেন। কিন্তু তাঁদের কিভাবে সংবর্ধনা জানালাম? হরতাল দিয়ে। দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অনুরোধ জানালেন, কিন্তু 'আপোসহীন নেত্রী' আখ্যাত হয়ে কি আপোস করা যায়? কারও অনুরোধ রাখা যায়, এমন কি দাতাগোষ্ঠীরও অনুরোধ যাদের এদেশ সম্পর্কে মূল্যায়নের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এদেশের উন্নতি অগ্রগতি এবং এমনকি অনেকাংশে এদেশের পুরো অর্থনীতিই? এদেশের দারিদ্র্য না ঘুচুক, জনজীবনে বেঁচে থাকার মতো স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে না আসুক, দেশের উন্নয়ন না হোক, জেদ তো বজায় থাকবে, নির্বাচনে পরাজয়ের জ্বালাতো কিছুটা উপশম হবে, যদি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীনরা বিদেশী সাহায্যের অভাবে বা অল্পতায় কোন উন্নয়ন কাজে হাত দিতে না পারে, যদি প্রতিদ্বন্দ্বীর অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। পরাজয়ের বদলা নেবার এই তো সুযোগ। সুতরাং দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকের প্রথম দিনেই হরতাল হলো। দাতারা রুষ্ট হলেন। তাতে কি? দাতাদের তো বুঝাতে হবে এই সরকার জনপ্রিয় নয়। কিন্তু দাতারা যা বুঝলেন তা সরকারীদল, বিরোধীদল কারও জন্য আনন্দে নেচে উঠার মতো নয় বরং সরকারিদল, বিরোধীদল, সবদলের জন্য, দেশের জন্য পরম ক্ষতিকর। ভবিষ্যতে ঠিকমতো বিদেশী সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা তা আজ দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য যারা সত্যিই দেশের মঙ্গল চান, দেশের মানুষকে উন্নততর জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চান। দাতা গোষ্ঠী এতো ক্ষুব্ধ, এতো রুষ্ট হয়েছেন যে তারা কোন রাখঢাক করেননি। তারা একটি বিবৃতি নিয়ে বসলেন এবং তাতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে, ভবিষ্যতে এরূপ পরিস্থিতি চলতে থাকলে ঋণদানের উপর তার প্রভাব পড়বে

এই কঠোর হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করলেন। একই সঙ্গে সরকারি দলকে সমঝোতার পথে যেতে, বিরোধীদলকে সহিষ্ণু হতে উপদেশ দিলেন। এই হুঁশিয়ারি বা উপদেশ কোনটাই আমাদের জন্য সুখের নয় বরং স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদাহানিকর। যে পরিমাণ ঋণ বা সাহায্য আশা করা গিয়েছিলো তা পাওয়া যায়নি বলে যারা আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছেন এই ভেবে 'হরতালের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে', তারা কি বুঝতে পারছেন হরতালের কারণে দাতাগোষ্ঠীর এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি কতোখানি ক্ষুণ্ন হলো? একটা স্বল্পোন্নত দেশ, যাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় বিদেশী সাহায্যের উপর হেঁটে নয় এখনও হামাগুড়ি দিয়ে, তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির এমন মন্তব্য কতোখানি ক্ষতিকর?

আগেই প্রশ্ন করেছিলাম, বিরোধীদল বিরোধিতা করবে কিন্তু কি ধরনের বিরোধিতা? এই বিরোধিতার একটা সীমারেখা কি থাকবে না? অবশ্যই থাকবে এবং তা হবে, বিরোধিতা যেন কোন মতেই, কোন দিক দিয়েই দেশ এবং জনগণের মঙ্গল পরিপন্থী না হয়, জাতির মর্যাদায় আঘাত না হানে, ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন না করে। স্বীকার করি, প্রতিবাদের রাজনীতি, বিরোধিতার রাজনীতি অনেক সময় সাধারণ যুক্তি, বিবেকবুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু এক সময় এক জায়গায় এসে থামতে হয়, নিজদেরকেই জিজ্ঞাসা করতে হয় আর কতদূর বিরোধিতাকে নিয়ে যাওয়া যায়? বিবেচনা করতে হয় বিরোধিতায় দেশ ও দেশের মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল হচ্ছে কিনা। ক্ষমতায় যাওয়ার তাড়নায় অন্ধ চোখ খুলে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে হয়, দেশের পরিস্থিতি কি রকম, জনগণ কি চায়। সকল নেতৃত্বের জন্য এই প্রজ্ঞা একান্ত আবশ্যক। প্রজ্ঞাহীন নেতৃত্ব কারও জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না, দেশের জন্য নয়, দলের জন্যও নয়।

বিরোধিতা যে একটা সর্বনাশা সংঘাতে রূপ নেবে তা আমরা সম্পূর্ণভাবে না হলেও কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলাম একেবারে শুরুতেই বর্তমান সরকার গঠনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই। এই সরকার ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার কি করবে কতটুকু করবে তা বুঝে উঠার সময়টুকুও আমরা পেলাম না। নতুন স্পিকার তখনও নির্বাচিত হননি, বিরোধিদলের নির্বাচিত স্পিকার তখনও জাতীয় সংসদ প্রধানের আসনে, বিরোধীদল 'ওয়াক আউট' করল, মনে হলো যেন বিরোধীদলের আসনে কারা অসংখ্য পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়ে গেছে যেন যে আসনগুলোতে তারা পাঁচ বছর ধরে বসেছেন এবং আরও বিশ পঁচিশ বছর বসবার বাসনা ঘোষণাও করেছেন সে আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বসা দেখে



তাঁরা যন্ত্রণায় এমনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে নতুন স্পিকার নির্বাচিত হয়ে আসনে উপবেশন করা পর্যন্ত তারা সংসদ অধিবেশন কক্ষে তিষ্ঠিতে পারলেন না, জাতীয় সংসদ তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো, অথচ সেখানে থেকে জনগণের হয়ে কথা বলার জন্যই জনগণ তাদের ভোট দিয়েছিলো। জানিনা, ওয়াক আউট করে তারা কোন্ স্বার্থ এবং কার স্বার্থ রক্ষা করলেন। এই ওয়াক আউট আগের বিরোধীদলও প্রায়ই করেছে। কেন করেছিল এবং তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোন স্বার্থ রক্ষিত হয়েছিলো এ প্রশ্ন তাদেরও করা যায়। যা হোক, এই প্রথম দিনের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করে আসছি আজকের বিরোধীদল কিভাবে এগিয়ে গেছে প্রতিহিংসার রাজনীতির দিকে। সংঘাতের রাজনীতির দিকে। গঙ্গার পানির হিস্যা, রাজপথে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি, যেকোন ইস্যুই ধরি না কেন, দেখবো বর্তমান বিরোধীদল সরকারে থাকাকালে সব ইস্যুর ক্ষেত্রেই আলাপ-আলোচনা করেছেন, কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন, তবে সম্পূর্ণ সমাধান দিতে পারেননি, সফল হতে পারেননি। বর্তমান সরকার যখন তাদের পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা এই ইস্যুগুলো সমাধানের কাজে হাত দিয়েছেন তখন তুমুল প্রতিবাদ, নানা ধরনের প্রচার অপপ্রচার, বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ, বন্দুক ও বোমাবাজি সরকার উৎখাতের, দেশ অচল করে দেয়ার হুমকি। বিরোধীদলের কাছে আমাদের প্রশ্ন, গঙ্গার পানিতে আমাদের মালিকানা স্বীকৃত হওয়াতে কি দেশের কোন ক্ষতি সাধন হয়েছে? রাজপথে সভাসমাবেশ না হলে, যানজটের সৃষ্টি না হয়ে পথযাত্রীদের দুর্ভোগের নিরসন হলে কি দেশের কোন সর্বনাশ হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি নেমে আসলে উপজাতি এবং বাঙালিরা একত্রে শান্তিতে বসবাস করলে অথবা সেই সীমান্তে সংঘর্ষ, যুদ্ধাবস্থা বজায় থাকলে কোনটাতে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে? যুদ্ধাবস্থা চলতে থাকলে কি প্রতিবেশী দেশকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়া হয় না? সেই সুযোগে পরবর্তীতে কি পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে না? বিরোধীদল কি তাই চায়? শান্তি না যুদ্ধ, কোন্‌টায় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। বিরোধীদল কি বোঝাতে চাচ্ছে দেশবাসীকে? তারা কি এতোই নির্বোধ?

সরকারিদলকে আন্তরিকভাবে সমঝোতার সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে, এ বিষয়ে সত্যিকার অর্থে সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ তাদের দায় এবং দায়িত্ব সবচাইতে বেশি। দেশে কোন অঘটন ঘটলে, অশান্তি থাকলে তারাই নিন্দিত সমালোচিত হবেন। সবাই সরকারি দলকে ছাড় দিতে বলছেন, এ ব্যাপারে উপদেশ দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। উপদেশ দেয়ার যথার্থতা

রয়েছে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এই সঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্নও রাখছি। ছাড় দিতে গিয়ে, কি সরকারিদলকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া থেকে, বিরোধীদলকে খুশি করার জন্য? গঙ্গার পানির যে মালিকানা পাওয়া গেছে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে? প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধুত্বের হাত না বাড়িয়ে বন্দুক কামানের নল নিশানা করতে হবে বিরোধীদলের অপপ্রচারিত 'দেশ বিক্রির' অভিযোগ থেকে রেহাই পাবার জন্য? যে দল নেতৃত্ব দিয়ে দেশ স্বাধীন করছে সেদলকে কি স্বাধীনতা শত্রু একাত্তরের রাজাকার আলবদরদের যে চক্র শক্তিশালী হয়ে উঠেছে নতুন নেতৃত্বে তার কাছে মাথা নত করতে হবে? স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক শিখা অনির্বাণ কি নিভিয়ে ফেলতে হবে বিরোধীদলের সন্তুষ্টি ও সহযোগিতা অর্জনের জন্য? তাই বলছিলাম বিরোধিতার যেমন সীমারেখা আছে, যারা একটা সরকার গঠনের পনের মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সরকার উৎখাতের আন্দোলনে মেতে উঠে তাদের সঙ্গে সমঝোতা কতোখানি সম্ভব? মানিয়ে নেবার শত চেষ্টা করলেও যারা মানবে না, সরকারের উৎখাত ছাড়া যারা থামবে না, তাদের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ নয় কি?

তবুও আমরা আশাবাদী, রাজনীতির ক্ষেত্রে সব পক্ষেরই সুমতির উদয় হোক। আবারো বলছি গণতন্ত্রে বিরোধীদল থাকবে, বিরোধিতাও থাকবে কিন্তু তা দেশের স্বার্থ, জনগণের শান্তি, স্বস্তি বিপন্ন করে নয়।

**সংবাদ**

২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭

## আসন্ন বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই নিয়ে অনিশ্চয়তা

**॥ সাগর সরওয়ার/সুনীল কান্তি দে ॥** ভূমি অধিকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর আঞ্চলিক পরিষদ প্রধানের নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশ সম্পর্কিত দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি শান্তি চুক্তি সই করতে আগ্রহী নয়। ফলে আগামী ২৬শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে শান্তি চুক্তি সই হবে কিনা এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সরকারের জাতীয় কমিটির সংশ্লিষ্ট এক সূত্র বলছেন, এ বৈঠকে শান্তি চুক্তি সই না হলে পরবর্তী বৈঠকে অবশ্যই চুক্তি সই হবে। সূত্র বলেন, এ বৈঠকের মেয়াদকাল হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। এক কিংবা দু'দিন। অন্য একটি সূত্র বলছেন, সরকার জনসংহতির উপরোক্ত দাবিগুলো পূরণ করলে এ বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই হবে।



আগামী ২৬শে নভেম্বরের বৈঠকের কারণে জনসংহতি সমিতির উচ্চ পর্যায়ের নেতারা এখন খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ায় অবস্থান করছেন। দুদুকছড়া থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা এবং ভূমি বিষয়ে চলমান সংলাপ প্রক্রিয়ায় এখনো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ঢাকার সূত্র বলছেন, জনসংহতি সমিতি খসড়া চুক্তি মেরামত করে শেষ করতে পারেনি। এ জন্য তাদের আরো সময়ের প্রয়োজন আছে বলে সরকারকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বৈঠকে এ বিষয়গুলো নিয়ে চূড়ান্ত কথা হবে দু'পক্ষের মধ্যে। এবং বৈঠকশেষে চুক্তি সইয়ের তারিখ ও স্থান ঘোষণা করা হতে পারে।

জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পার্বত্য সমস্যা সমাধান হবে–এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আস্থাশীল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বর্তমান জাতীয় কমিটির কাছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা শীর্ষক যে বইটি দিয়েছিল তার ৩০ নম্বর ধারায় পরিষদের কার্যাবলি শীর্ষক দাবিতে বলা হয়–নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ (১) পার্বত্য জেলা সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃংখলা, (২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, পুলিশের ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে, (৪) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্ত এবং দলিলপত্র রেজিস্ট্রেশন, ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কথা এতে উল্লেখ করা আছে।

জাতীয় কমিটির সূত্র বলছেন, এ সমস্ত বিষয় সরকার বিশ্লেষণ করে চুক্তির খসড়ায় লিপিবদ্ধ করে জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। জনসংহতি সমিতি এখন তাদের মতামত জানিয়ে চুক্তিতে উপনীত হবে বলে তিনি আশা করেন।

**সংবাদ**

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭

## শান্তি সংলাপ কাল জনসংহতি নেতারা দুদুকছড়ায় এসেছেন

**মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** আগামীকাল বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পার্বত্য শান্তি সংলাপে যোগ দিতে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু) এখন খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ায় অবস্থান করছেন। যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, তিনি গতকাল সোমবার বিকেলে দুদুকছড়ায় এসে পৌঁছেছেন।

সন্তু লারমার সঙ্গে দেখা করতে পাহাড়ি জনগণ সেখানে যাচ্ছেন বলেও জানা গেছে। পাহাড়ি জনগণ এবার শান্তি চুক্তি সই হবে কিনা এ ব্যাপারে জানতে চাইবে তাদের নেতার কাছে।

গোটা পার্বত্যাঞ্চলের মানুষের মধ্যে শান্তি চুক্তি সই নিয়ে নানামুখী জল্পনা কল্পনা চলছে।

জনসংহতি সমিতির নেতারা আগামীকাল সকাল সোয়া ১০টায় ঢাকার উদ্দেশে হেলিকপ্টারে রওনা করবেন। হেলিকপ্টারে তাদের ঢাকায় নিয়ে আসবেন আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন।

আরো শরণার্থী ফিরছে ঃ চলমান ৪র্থ দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনে আরো **১** হাজার **৩**শ' **৬১** পরিবারের **৬** হাজার **৩**শ' **৮৮** জন ত্রিপুরার বিভিন্ন শিবির থেকে দেশে ফিরে আসছে। গতকাল জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এক চিঠিতে এ তথ্য সরকারকে জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, চলতি দফায় তবলছড়ি ও রামগর সীমান্ত দিয়ে **১২**শ' **১৬** পরিবারের **৬** হাজার **৬**শ' **৮৪** জন শরণার্থীর দেশে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল পাঠানো চিঠিতে যে সংখ্যা দেয়া হয়েছে তার ফলে এবার মোট **২৫**শ' **৭৭**টি পরিবারের **১৩** হাজার **৭২** জন দেশে ফিরছে।

গতকাল **১**শ' **৪৮**টি পরিবারের **৮**শ' **৭১** জন শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। এ নিয়ে **৪** দিনে **৫**শ' **৪৭**টি পরিবারের **৩** হাজার **২**শ' **১৭** জন শরণার্থী দেশে ফিরে এলো। তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে এ প্রত্যাবাসন অব্যাহত রয়েছে।

**সংবাদ**

**২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭**

<u>সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ</u>

**যারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে তারা দেশের বন্ধু নয়**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ বলেছেন, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে তারা দেশের বন্ধু নয়। দলীয় স্বার্থের কারণে দেশের মানুষের স্বার্থকে তারা বড় করে দেখতে পারছে না। তিনি বলেন, দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে বিএনপি প্রতিনিয়ত চিৎকার করছে; কিন্তু কিভাবে বিক্রি হচ্ছে এর কোন জবাব দিচ্ছে না। গতকাল সোমবার বিকেলে



এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। এরশাদের বারিধারাস্থ কার্যালয়ে এ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এরশাদ বলেন, এখন মনে হচ্ছে জিয়াউর রহমানের অউপজাতিদের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন নীতি সঠিক ছিল না। সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির খসড়া জাতীয় সংসদে পেশ করার জন্যে সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠের পর এরশাদ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

**প্রশ্ন ঃ** প্রধান বিরোধী দলের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

**এরশাদ ঃ** বিএনপি হয়তো মনে করছে এই চুক্তি করে ফেললে আওয়ামী লীগ সরকারের একটি প্লাস পয়েন্ট হবে। তাই তারা বিরোধিতা করছে। এখানে তারা দেশের মানুষের স্বার্থকে বড় করে দেখছে না।

**প্রশ্ন ঃ** শান্তি চুক্তি হবার পর পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা ছাউনি তুলে নেয়া সম্পর্কে আপনার মত কি?

**এরশাদ ঃ** শান্তি চুক্তি হবার পর অস্থায়ী সেনা ছাউনিগুলো সরিয়ে আনা যেতে পারে, কারণ তখন কোন যুদ্ধাবস্থা থাকবে না। তবে ক্যান্টনমেন্টগুলো সরানো উচিত হবে না।

**প্রশ্ন ঃ** আপনি কি বর্তমান সরকারের শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করবেন?

**এরশাদ ঃ** যদি সংবিধানের আলোকে এই চুক্তি হয় এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন না হয় তা অবশ্যই সমর্থন করবো।

**প্রশ্ন ঃ** আপনার **৯** বছরের শাসনামলে এবং বিএনপি'র সময় এই চুক্তি সফলতা অর্জন করেনি?

**এরশাদ ঃ** উপজাতিরা সবসময় স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আসছিল এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব করেছিল। তাই চুক্তি সফল হয়নি। এখন মনে হচ্ছে তারা তাদের দাবি থেকে অনেক সরে এসেছে। তাদের বোধোদয় হয়েছে যে তাদের ওই দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া সংগ্রাম আর কতোদিন করা যায়। তবে আমি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিলাম, যাত্রাও শুরু করেছিলাম। স্থানীয় সরকার পরিষদ করে ওদের হাতে ক্ষমতা দেয়ার প্রক্রিয়া চালিয়েছি। যুদ্ধ বিরতির একটি সমঝোতা স্বাক্ষরও করেছিলাম। সময়ের জন্যে শেষ করতে পারিনি।

**প্রশ্ন ঃ** জিয়া সরকারের সময় বাংলাদেশে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো বলে অভিযোগ করে কেউ কেউ। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন?

**এরশাদ ঃ** হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। তবে আমি জানতাম না। সেনাবাহিনীর বাইরে অনেক কাজ হতে পারে। সেটা আমার জানার কথা নয়। জানলেও অনেক কিছু বলতে পারবো না।

**প্রশ্ন ঃ** গত শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আপনি পাশাপাশি বসেছিলেন। কি কথা হয়েছে তখন আপনাদের মধ্যে।

**এরশাদ ঃ** জাতীয় সংসদে আমারা পাশাপাশি বসতে পারি না। সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসতে পারি। এতে কি বুঝা যায়। আমরা কি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেনাবাহিনীর ঐ অনুষ্ঠানে তেমন কোন কথাই হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যখন এলেন, আমি দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করেছি; কিন্তু বেগম খালেদা জিয়াকে দাঁড়াতে দেখিনি। তথা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা সম্মান পেতে পারেন। কথাবার্তা তেমন কিছু হয়নি হাসিনা ও খালেদার মধ্যে।

**প্রশ্ন ঃ** আপনি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বেগম জিয়াকে একটি বাড়ি দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় তার সাথে আপনার ভালো সম্পর্কই ছিল। কি কারণে সেই সম্পর্কে ছেদ ঘটলো?

**এরশাদ ঃ** নারীর মন বুঝা বড় কঠিন। তবে তাকে বাড়ি দেয়ার সময় সব জেনারেলই বিরোধিতা করেছিল তখন, তবুও আমি দিয়েছিলাম।

**প্রশ্ন ঃ** বর্তমান বিএনপি নেতা তৎকালীন জেনারেল মীর শওকত আলীও কি বিরোধিতা করেছিলেন?

**এরশাদ ঃ** হ্যাঁ, তিনিও তখন বিরোধিতা করেছিলেন।

সংবাদ

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭

**আজ শান্তি**

**মিছিল**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামীকাল ২৬শে নভেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে সামনে রেখে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং তিন পার্বত্য জেলায় একযোগে শান্তি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। বিকেল ৩টায় এ মিছিল শুরু হবে। জাতীয় কমিটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।



ঢাকায় আওয়ামী ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং তিন পার্বত্য জেলায় নাগরিক কমিটি এ শান্তি মিছিলের আয়োজন করেছে।

সংবাদ

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশ

**শান্তি চুক্তিবিরোধী শক্তিকে**

**রুখে দাঁড়ানোর ডাক**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সমাবেশে বক্তারা শান্তিচুক্তিবিরোধী শক্তিকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারীদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, কোন অবস্থাতেই এই চুক্তির বিরোধিতা সাংস্কৃতিক সমাজ মেনে নেবে না। বক্তারা বলেন, "স্বাধীনতাবিরোধীচক্রের সাথে হাত মিলিয়ে বর্তমান বিরোধীদল বিএনপি'র এই বাড়াবাড়ির উচিত জবাব দেয়া হবে।"

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন গোলাম কুদ্দুস, আতাউর রহমান, আয়েশা খানম, মোনায়েম সরকার, সৈয়দ হাসান ইমাম, আবদুল মান্নান চৌধুরী, কামাল পাশা চৌধুরী, মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

সংবাদ

২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি : এবারের**

**বৈঠকে সমঝোতা স্মারক সই**

**আনুষ্ঠানিক চুক্তি পরে**

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজ বুধবার জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটির মধ্যে ৭ম দফা বৈঠক রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হচ্ছে। এবারের বৈঠকে শান্তির প্রশ্নে দু'পক্ষ একটি সমঝোতা স্মারকে সই করবে এবং পরবর্তী কোন বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি চুক্তি সই হবে বলে জাতীয় কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

আজ দুপুর আড়াইটায় এ বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকের মেয়াদ ৪ থেকে ৬ দিন হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত এ সংলাপে দু'পক্ষের নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকার অসুস্থ্য থাকায় এবারের ঢাকা বৈঠকে যোগ দিতে পারছেন না। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন, তিনি বৈঠকে আসছেন না। তবে এ বৈঠকে যদি কোন চুক্তি সই হয়–তাহলে তার অনুপস্থিতিতেই সম্পাদন করার জন্য তিনি সন্তু লারমাকে অনুরোধ করেছেন। গতকাল তিনি সন্তু লারমা ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে দুদুকছড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যোগাযোগ কমিটির একটি সূত্র জানিয়েছেন, এবারের বৈঠকে শান্তির জন্য সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা নব্বই ভাগ। একই সূত্র বলেছে ঃ বৈঠকের মেয়াদকাল হতে পারে এক সপ্তাহ। সূত্র বলেছেন, জেলা প্রশাসকের উপর আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্ব, ভূমি, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন এবং পুলিশ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর সমাধান হলেই এবারের বৈঠকেই সমঝোতা স্মারক সই হবে। পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে হবে চুক্তি সই। চুক্তি সই অনুষ্ঠান হবে খাগড়াছড়িতে। জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র জানিয়েছেন, চুক্তির ব্যাপারটি এখন সরকারের উপর নির্ভর করছে। অন্যদিকে সরকারের জাতীয় কমিটির উচ্চপদস্থ একটি সূত্র বলেছেন, সরকার এ বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই করতে চায়। সেজন্য যে সমস্ত সমস্যা আছে তা মিটিয়ে ফেলা হবে। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় এখনো যেসব বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে তার তালিকা নিয়ে জাতীয় কমিটির মধ্যে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। সরকারের ঐ সূত্র বলেছেন, জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির কাছে চুক্তির খসড়া পাঠালেও তা এখনো কমিটির হাতে এসে পৌঁছায়নি। সরকার মনে করছেন এ বৈঠকে খসড়া পাবার পর আলোচনা করে এবারেই চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হবে। সূত্র বলছেন, সে ক্ষেত্রে বৈঠক দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং বৈঠকের শেষ দিন দেয়া হবে চূড়ান্ত ঘোষণা। যদি এই বৈঠকে শান্তি চুক্তির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে আগামী মাসের প্রথমার্ধে পরবর্তী বৈঠক ডাকা হতে পারে।

খাগড়াছড়ি থেকে আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ জহুরুল আলম জানিয়েছেন, আজ সকাল সোয়া ১০টায় জনসংহতি সমিতির নেতারা দুদুকছড়ি থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন। সন্তু লারমা ছাড়াও আরো যারা এ বৈঠকে যোগ দেবেন তারা হলেন গৌতম চাকমা, রক্ত



উৎপল ত্রিপুরা, রূপায়ন দেওয়ান এবং ডাঃ বাবুল চাকমা। এছাড়া যোগাযোগ কমিটির কেশৈ অং মার্মা ও বিশ্বজিৎ চাকমা এবং স্বেচ্ছাসেবক কমিটির শক্তিপদ রোয়াজা এবং আশিষ চাকমা জনসংহতি নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় আসবেন। হেলিকপ্টারে তাদেরকে ঢাকা নিয়ে আসবেন আতাউর রহমান খান কায়ছার এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

আজকের বৈঠকে দু'দলের দলনেতা ছাড়াও অংশ নেবেন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, আতাউর রহমান খান কায়ছার, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন, সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর, এডভোকেট ফজলে রাব্বি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ির ডিসি ইসমাইল হোসেন।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় কমিটির সঙ্গে এটি ৭ম দফা বৈঠক। প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১শে ডিসেম্বর '৯৬। এছাড়া জনসংহতি সমিতির সঙ্গে এরশাদ সরকারের ৬ দফা এবং খালেদা জিয়া সরকারের কমিটির সঙ্গে ১৩ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৪র্থ দফা বৈঠকশেষে বর্তমান সরকারের জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন, 'খুব শীঘ্রই শান্তি চুক্তি সই হচ্ছে।' এরপর ৬ষ্ঠ দফা বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা ঘোষণা করেছিলেন, 'আগামী বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই হতে যাচ্ছে। এ ঘোষণার ফলে দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদ দৃঢ় হয়ে ওঠে। আজকের বৈঠক শুরু হবে দুপুর আড়াইটায়। দুপুর সাড়ে ১২টায় জনসংহতি সমিতির নেতারা ঢাকার পুরানো বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানাবেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ।

**সংবাদ**
**২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭**
<u>প্রথম দিনের বৈঠকেই খোলামেলা আলোচনা</u>

**পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায়**
**এই বৈঠকেই সমঝোতা**

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে গতকাল বুধবার ঢাকায় জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে ৭ম দফা বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছেন, এবারের বৈঠকেই একটি সমঝোতায় পৌঁছার ব্যাপারে উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। গতকাল দু'পর্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে উভয়পক্ষের

নেতৃবৃন্দ খোলামেলা আলোচনায় বসেন। দ্বিতীয় পর্বে উভয়পক্ষের তিনজন করে ৬ জন একান্ত বৈঠকে বসেন। জাতীয় কমিটির সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছেন, এ বৈঠকে ভূমি ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতার ব্যাপারে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সোয়া তিনটায় প্রথম পর্বের বৈঠক শুরু হয়। দু'পক্ষের নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধপ্রিয় লারমা (সন্তু) এবং জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। এ বৈঠকে মূলত দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপট, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি নিয়ে খোলামেলা আলাপ আলোচনা হয়। দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল, বিএনপি'র বর্তমান ভূমিকা নিয়েও দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছেন। সূত্র জানান, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম অবনতি হওয়ার আগেই শান্তি চুক্তি করা প্রয়োজন বলে দু'পক্ষ মনে করে। দু'পক্ষই পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে বিএনপি ও জামাতের বর্তমান ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এ বৈঠকে। এ বৈঠকেই এ ব্যাপারে তারা একমত হয়েছেন যে, এই বৈঠকেই একটি সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। এ বৈঠকের স্থায়িত্ব ছিল ৪৫ মিনিট। ৪টায় বৈঠকের এ পর্ব শেষ হয়ে গেলে আধ ঘন্টা বাদে পরবর্তী পর্বের বৈঠক শুরু হয়। এ পর্বে দু'পক্ষের ৬ জন একান্তে বৈঠকে বসেন। জাতীয় কমিটির পক্ষে ছিলেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আতাউর রহমান খান কায়ছার। জনসংহতি সমিতির পক্ষে ছিলেন সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান এবং গৌতম চাকমা।

সূত্র জানিয়েছেন, মূলত ভূমি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে যে মতপার্থক্যগুলো রয়েছে সেগুলো দূর করার জন্য দু'পক্ষ আলোচনায় বসে। আলোচনায় ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়গুলোও স্থান পায়। ভূমি বিষয়ের পর আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা প্রসঙ্গও আলোচিত হয় এ বৈঠকে।

সূত্র বলছেন, এবারের বৈঠকের স্থায়িত্ব কত দিন হবে তা বলা যাচ্ছে না। দু'পক্ষের নেতৃবৃন্দ মনে করছেন এবারের বৈঠকে সমঝোতার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করা দরকার। সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলও একই আশাবাদ ব্যক্ত করছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন। সূত্র জানান, সরকার চায় এই বৈঠকেই চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছতে। এতে তারা তাদের রাজনৈতিক সফলতার ব্যাপারে জনগণকে জানাতে পারবে। গতকাল উভয়পক্ষের 'তিন দিনের' এ বৈঠক চলে সোয়া ৬টা পর্যন্ত। এবারের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু), রূপায়ন দেওয়ান, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা ও গৌতম চাকমা এবং সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ বাবুল চাকমা। একটি সূত্র জানিয়েছেন, সন্তু লারমা



শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার স্ত্রীও অসুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেছে। খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহরুল আলম জানান, গতকাল সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে দুদুকছড়া থেকে জনসংহতি সমিতির নেতারা হেলিকপ্টারে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়ছার এবং সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন। জনসংহতি সমিতির নেতারা ঢাকায় পৌঁছেন দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে। তেজগাঁওস্থ পুরাতন বিমান বন্দরে তাদের স্বাগত জানান জাতীয় কমিটি প্রধান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ।

জাতীয় কমিটির অন্যান্যের মধ্যে এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর, সাংসদ ফজলে রাব্বি, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, এস, এস চাকমা ও বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান। যোগাযোগ কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কৈ শৈ অংমার্মা, বিশ্বজিৎ চাকমা। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শক্তিপদ রোয়াজা এবং আশিষ চাকমা।

**সংবাদ**

২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

শান্তি সমাবেশে বক্তব্য

**শান্তি চুক্তির বিরোধীরা দেশের মঙ্গল চায় না**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত নাগরিক সমাবেশে বলা হয়েছে, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে তারা বাংলাদেশের জনগণের মঙ্গল চায় না। এরা পার্বত্য সমস্যা জিইয়ে রেখে রাজনীতি করতে চায়। সমাবেশে বর্তমান সরকারের শান্তি চুক্তির উদ্যোগের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমর্থনে নাগরিকদের এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় গতকাল বিকেলে। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবীরা এই সমাবেশে উপস্থিত হন। অধ্যাপক কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বিচারপতি কে, এম সোবহান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমির উল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, প্রকৃচি'র মহাসচিব ডঃ আবদুর রাজ্জাক, ভাষা সৈনিক

এডভোকেট গাজীউল হক, সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সৈয়দ হাসান ইমাম, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাজাহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ মোঃ হোসেন মনসুর, ডঃ স. ম. ইনামুল হক, নারী নেত্রী শামসুন্নাহার সিদ্দিক, এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, ডঃ মোঃ শাহাদত আলী, আলী আকসাদ, কবি মহাদেব সাহা, ডাক্তার জামালউদ্দিন চৌধুরী, ডঃ মাহবুব উদ্দিন আহমদ, সালাউদ্দিন বাদল প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন, ডঃ হারুন-অর-রশীদ।

বক্তারা বলেন, আজ যারা স্বাধীনতার জন্যে মায়াকান্না কাঁদছে তারাই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল '৭১ সালে। শত শত মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছিল। তারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে আজ, কবে কোন শান্তির প্রক্রিয়ায় তাদের জনগণের পক্ষে পাওয়া গেছে? সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিএনপি জামাতে ইসলামীর দল যত বিরোধিতাই করুক আমরা শান্তি চুক্তির পক্ষে আছি এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করবো। অধ্যাপক কবির চৌধুরী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যেদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি হবে সেদিন বিরোধিতাকারীরা সেখানে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে একটি ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাবে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে অশান্তি চলার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এই অবস্থা চলতে পারে না। তিনি বলেন, অশান্তি দূর করার জন্যে উপজাতিদের ন্যায্য দাবি মেনে নিলে মাথানত করা হয় না।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে ও বাইরে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। একটি গোষ্ঠী যারা অস্ত্র ব্যবসার সাথে জড়িত তারাও এই চুক্তির বিরোধিতা করছে। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী বলেন, আমরা বর্তমান সরকারের শান্তির উদ্যোগকে সমর্থন করি সেই সাথে শান্তি বিঘ্নিতকারীদের প্রতিবাদ জানাই।

ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম বলেন, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এমন চুক্তি হলে আমরাইতো এর বিরোধিতা করবো। বেগম খালেদা জিয়া চুক্তি না দেখে বিরোধিতা করছেন কার স্বার্থে?

অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলায় ১০ লাখ মানুষ অশান্তিতে আছে, সেখানে জামাত শিবিরের প্রশিক্ষণ চলে, অস্ত্র বেচাকেনা ও মাদক দ্রব্যের কারবার চলে। এসব কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তারাই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে।



**সংবাদ**

২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

**বান্দরবানে শান্তি মিছিল**

**বান্দরবান, ২৬শে নভেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশ ফোন)।**–আজ বুধবার সন্ধ্যায় বান্দরবান শহরে পার্বত্য শান্তি চুক্তির সমর্থনে জেলা আওয়ামী লীগ শান্তি মিছিল করেছে। মিছিলশেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশ থেকে যেকোন মূল্যের বিনিময়ে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

**সংবাদ**

২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭

**শিগগিরই শান্তি চুক্তি : সন্তু লারমা**

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে 'শিগ্‌গিরই শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে' বলে গতকাল যৌথ প্রেস ব্রিফিং-এ জানিয়েছেন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির লক্ষ্যে ঢাকায় জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটির মধ্যে ৭ম দফা বৈঠকের গতকাল ছিল ২য় দিন। গতকাল সকাল সোয়া ১১টায় দু'পক্ষের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়। দুপুরের খাবারের বিরতি দিয়ে বৈঠক আবার শুরু হয় বিকেল সোয়া ৫টায়। শেষ হয় সন্ধ্যা সাতটায়। যথারীতি গতকালও দু'পক্ষের ৬ জন চূড়ান্ত আলোচনায় বসেন। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এক যৌথ প্রেস ব্রিফিং-এ সন্তু লারমা বলেন, 'খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। শিগ্‌গিরই চুক্তি করতে যাচ্ছি।'

জাতীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। গতকালের বৈঠকে মূলত চুক্তির খসড়া নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের শেষদিনে সন্তু লারমা বলেছিলেন, 'খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি।' সূত্র জানায়, গতকাল সন্তু লারমার দেয়া ঘোষণার ফলে পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে সামান্য প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গত ৬ষ্ঠ বৈঠকে তিনি যে ঘোষণা দেন তার সঙ্গে এবারের ঘোষণা খানিক মতপার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। গতকালের বৈঠকে আঞ্চলিক

পরিষদ ও ভূমি ছাড়াও শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন ও পুলিশ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছেন, এ বৈঠকে শান্তির জন্য 'সমঝোতা স্মারক' সই হবে। তবে সমঝোতা স্মারক সংসদে উপস্থাপন করার জন্য সংসদের কোন জরুরি অধিবেশন ডাকা হবে না বলেও জানা গেছে। বৈঠকের স্থায়িত্ব রোববার পর্যন্ত হতে পারে বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন। আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং সন্তু লারমা ছাড়াও আরো যারা এ বৈঠকে যোগ দেন তারা হলেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, আতাউর রহমান খান কায়ছার, গৌতম চাকমা এবং রূপায়ন দেওয়ান। আজ বিকেল ৩টায় এ বৈঠক আবার শুরু হচ্ছে।

**সংবাদ**

২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭

## রাঙ্গামাটিতে আওয়ামী লীগের শান্তি মিছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

**রাঙ্গামাটি, ২৭শে নভেম্বর।**–পার্বত্য শান্তি চুক্তির সমর্থনে জেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের উদ্যোগে আজ রাঙ্গামাটিতে এক শান্তি মিছিল বের হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজার নেতৃত্বে এই শান্তি মিছিল পৌর চত্বর থেকে শুরু হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও যুব, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ এবং শহরের গণ্যমান্য পাহাড়ি ও বাঙালি ব্যক্তিত্বরাও এই মিছিলে অংশ নেন। মিছিলশেষে শান্তি চুক্তি বিরোধী শক্তিগুলোর প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়ে শান্তি চুক্তির পূর্বাপর সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান রোয়াজা।

**সংবাদ**

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

## শান্তিচুক্তি : দু'পক্ষই সবকিছু খতিয়ে দেখছে শেষ মুহূর্তে

**সাগর সরওয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে গতকাল শুক্রবার ছিল ৭ম দফা বৈঠকের ৩য় দিন। গতকাল জনসংহতি



সমিতি এবং পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোন বৈঠক হয়নি। দু'পক্ষই ব্যস্ত ছিলেন শেষ মুহূর্তে সব বিষয়ে খতিয়ে দেখতে। গত দু'দিনের বৈঠকের ফলাফল নিয়ে সার্বিক আলোচনা করেছেন নিজেদের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য জানিয়েছেন।

সূত্র জানান, দু'একদিনের মধ্যে শান্তির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক অথবা চুক্তি সই হতে পারে।

জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সৌমেন্দ্র নারায়ণ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) সহ অন্য নেতৃবৃন্দ গতকাল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। সরকার পক্ষ গত দু'দিনের বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে এ বৈঠকেই শান্তি চুক্তি অথবা সমঝোতা স্মারক সই করার জন্য জনসংহতির যাবতীয় দাবির প্রতি সরকারের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবগুলো নিয়ে গতকাল জনসংহতি সমিতি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। সরকারের জাতীয় কমিটি খসড়া চুক্তির যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতে গতকাল সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে। সংবিধানের বাইরে চুক্তি করা হবে না। এ ব্যাপারটি আগেই দেশবাসীকে তারা জানিয়ে দিয়েছে। জাতীয় কমিটির উচ্চপর্যায়ের সদস্য এবং সরকারের নীতি-নির্ধারণী ব্যক্তিরা গতকাল প্রণীত চুক্তিতে আইনবিরোধী কোন কিছু যেন না থাকে এ ব্যাপারটি বিশদভাবে খতিয়ে দেখেছেন। জাতীয় কমিটির প্রধান চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ গতকাল বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় যান। সেখানে তিনি জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছেন, এ সময় সন্তু লারমা এবং চিফ হুইপকে খুবই হাস্যোজ্জ্বল মনে হচ্ছিল।

সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছেন, সরকার বিএনপিকে পার্বত্য বিষয়ে আর কোন সুযোগ দিতে চায় না। এটাকে ইস্যু করে বিএনপি দেশে বড় ধরনের ঝামেলা বাধাতে চাইলে রাজনৈতিকভাবেই তা মোকাবেলা করবে সরকার বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে অন্য একটি সূত্র বলছেন, এখন জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটি নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদে কে চেয়ারম্যান হবে, এর মেয়াদ কতদিন হবে, চুক্তি বাস্তবায়ন কিভাবে শুরু হবে ইত্যাদি বিষয়ে। এছাড়া ফিরে আসা শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ কিভাবে হবে, কবে হবে, অন্তর্বর্তীকালে ভূমি প্রশাসন কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, শান্তিবাহিনী সদস্যদের কি করে পুনর্বাসন করা হবে ইত্যাদি বিষয়েও দু'পক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন বলে সূত্রগুলো জানিয়েছেন।

সূত্র বলছেন, গতকালের স্ব-স্ব পক্ষের আলোচনার ফলাফল চূড়ান্তভাবে দু'পক্ষ আজ শনিবার আলোচনা করবেন। আজকের বৈঠকের উপরই চূড়ান্ত সবকিছু নির্ভর করছে।

**সংবাদ**
**১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭**
**পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি**
**বৈঠক চলছে**
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠক গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আবার শুরু হয়েছে। গতকাল রাত সাড়ে ১০টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বৈঠক চলছিল।

বৈঠকে জাতীয় কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন চিফ হুইফ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। আর জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সন্তু লারমা। গতকালের বৈঠকে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীরের আলোচনায় অংশগ্রহণ। তিনি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আলোচনায় যোগ দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক সই করার লক্ষ্যে দু'পক্ষের মধ্যে ৭ম দফায় গতকাল পঞ্চম দিনের মতো বৈঠক হয়। অবশ্য চতুর্থ দিনে কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, গতকালের বৈঠকে সমঝোতা স্মারকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সমঝোতা চুক্তির আইনগত বিভিন্ন দিক নিয়ে এটর্নি জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলেও জানা যায়।

এ বৈঠকেই চূড়ান্ত কিছু হয়ে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। বৈঠক আজ সোমবারও চলবে।

বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, আতাউর রহমান খান কায়সার অংশগ্রহণ করছেন। আর জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা অংশ নিচ্ছেন।



**সংবাদ**
**২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭**
**পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি**
**সমঝোতা স্মারক**
**সই হতে পারে আজ**

**॥ সাগর সরওয়ার ও সুনীল কান্তি দে ॥** সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির লক্ষ্যে আজ সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ এ সম্পর্কিত একটি ঘোষণা দিতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছেন। সূত্রগুলো বলছেন, গত রোববার দীর্ঘ ১০ ঘণ্টা বৈঠকের ফলে পার্বত্য সমস্যার জট ছাড়িয়েছে দু'পক্ষ।

গতকাল রাত ১০টা ৪০ মিনিটে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার গেটে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদেরকে বৈঠকশেষে চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে বলেন, 'আশা নিয়েই বেঁচে আছি। যথাসময়ে আপনাদের জানানো হবে। আপনাদের না জানিয়ে কিছু করা হবে না।' এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে গতকাল ছিল ৭ম দফা বৈঠকের ষষ্ঠ দিন। গতকাল সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ বৈঠক শুরু হয় তিনজনের মধ্যে। এরা তিনজন হলেন পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সৌমেন্দ্র নারায়ণ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর। তিনজনের এ বৈঠকে চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গতকাল জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হেসেন, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, আলী হায়দার ও এসএস চাকমা যোগ দেন। তবে তারা অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বেশিক্ষণ অবস্থান করেননি। তাদেরকে আজ সকাল ৮টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসতে বলা হয়েছে। জাতীয় পার্টির সাংসদ ফজলে রাব্বি এখন ঢাকার বাইরে রয়েছেন। তাকেও জরুরি ভিত্তিতে আজ সকালের মধ্যে ঢাকায় আসতে অনুরোধ করা হয়েছে।

চলমান বৈঠকে বেসরকারি বিমান চলাচল পর্যটন এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় যোগ দেয়ার পর পুরো প্রক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়। গত রোববার রাত দেড়টা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে বৈঠক হয় এবং দু'পক্ষই অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে। সূত্র বলছেন, শান্তি চুক্তি সইয়ের ব্যাপারটি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ভূমি অধিকার, সাধারণ প্রশাসন ও শান্তিবাহিনী সদস্যদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির দাবিগুলোর ব্যাপারে সরকার একটি সুপারিশ দিয়েছে। জনসংহতি সমিতি এসব সুপারিশ মেনে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানান, পার্বত্যাঞ্চলে ভূমি অধিকার, সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির প্রণীত আঞ্চলিক পরিষদ সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখার যে দাবি করা হয়েছিল সেগুলো সরকার পুরোপুরি মেনে না নিলেও সরকার কিছু কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে রাজি হয়েছে। ভূমি অধিকার সম্পর্কে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে ভূমি বন্দোবস্ত বিষয়ক ধারায় তিন পরিষদকে যে ক্ষমতা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে তা আরো পাকাপোক্ত করতে সরকার রাজি হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছেন।

জানা গেছে, সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যে দাবি জনসংহতি সমিতি করেছিল তার পরিবর্তে এসব বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকবে। সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতির দাবি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা বিষয়ে যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল সেগুলোও সরকার মেনে নিয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভের পর জনসংহতি সমিতির নেতারা পার্বত্য সমস্যা সমাধানের বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে আরো বেশি নিশ্চিত হয়েছে।

সূত্র বলছেন, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদগুলোতে জনসংহতি সমিতির নেতাদের স্থলাভিষিক্ত করার দাবি সরকার মেনে নেয়নি। তবে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনে সরকারি সম্মতির কথা জনসংহতি সমিতির নেতাদের জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

গতকালের বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে কমিটির প্রধান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা এবং রক্ত উৎপল ত্রিপুরা।

চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ জানিয়েছেন আজও বৈঠক চলবে।



## সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি : ঐতিহাসিক চুক্তি সই

২২ বছরের সহিংসতার অবসান

**॥ কাশেম হুমায়ূন ও সাগর সরওয়ার ॥** অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসছে। পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিচুক্তি সই করেছে পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দু'নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। প্রায় ২২ বছরের জমে থাকা পার্বত্য সমস্যার সমাধান হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে এ চুক্তি সইয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সেনা ও নৌপ্রধান এবং বিমান বাহিনীর উপ-প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদিত চুক্তি গতকাল থেকে কার্যকর শুরু হয়েছে। চুক্তি অনুসারে পার্বত্য এলাকার অস্থায়ী সেনাক্যাম্পগুলো পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। স্থায়ী সেনাক্যাম্প পার্বত্যাঞ্চলে থাকবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তালিকা আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে পাঠিয়ে গঠন করা হবে একটি আঞ্চলিক পরিষদ। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর নাম হবে জেলা পরিষদ। পার্বত্য এলাকার সব ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ থাকবে পাহাড়ি-অপাহাড়ি সমন্বয়ে গড়া পার্বত্য পরিষদের হাতে। সেখানে বসবাসকারী বাঙালিদের জায়গাজমি ফেরত নেয়া হবে না বলে চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত একজন সদস্যের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের একটি বাস্তবায়ন কমিটি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে বলে জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় কমিটি এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবেন একজন উপজাতীয় মন্ত্রী।

দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংগ্রামের যবনিকাপাত হচ্ছে এখন থেকে। সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্যরা খুব শিগগিরই ঘরে ফিরে আসছে।

এটি ছিল বর্তমান সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৭ম দফা বৈঠক। সরকার গঠনের মাত্র ১০০ দিনের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এর আগে বর্তমান সরকারের

সময় প্রথম বৈঠক হয় ১৯৯৬-এর ২১শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে। পরবর্তীকালে ২৫শে জানুয়ারি/৯৭ থেকে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পরবর্তী বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির লক্ষ্যে এরশাদ সরকারের সময় ৬ দফা এবং খালেদা জিয়া সরকারের সময় ১৩ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল মঙ্গলবার থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি কার্যকর হচ্ছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা এখন আর গোপনে থাকবেন না। তারা প্রকাশ্যে চলে আসবেন বলে জানা গেছে।

১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এ চুক্তিটি করা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায়। চুক্তিটির রয়েছে ৪টি অধ্যায়। সাধারণ, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলি এ ৪ পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

চুক্তিমতে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যকে আহ্বায়ক করে মোট ৩ সদস্যবিশিষ্ট এক চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে। এদের একজন হবেন চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি।

এখন থেকে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ-এর নাম সংশোধন করে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' নামে অভিহিত হবে। ১৯৮৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন-এর বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়েছেন।

ভূমি সম্পর্কে এ চুক্তিতে বলা হয়েছে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গাজমি জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। সেই সঙ্গে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও এর সম্মতি ছাড়া সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না। জেলা পরিষদের আওতাধীন থাকবে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পুলিশ, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ইত্যাদি।

পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করবার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা



এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ। তিনি অবশ্যই হবেন একজন উপজাতীয় ব্যক্তি। চেয়ারম্যানসহ ২২ জন সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। পরিষদের মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। জায়গাজমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

গতকাল চুক্তি সইয়ের অনুষ্ঠানে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও কালো মুজিব কোট পরিহিত আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল। জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান পরেছিলেন গাঢ় রঙের সাফারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন সব সময় হাসিমুখে। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করছিলেন তিনি। সকাল সাড়ে দশটায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লবিতে সবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সই করেন চুক্তিপত্রে। এ সময় সবাই একযোগে হাততালি দিয়ে ওঠেন। সাংবাদিকরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন ছবি ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের কাজে। পরে আপ্যায়নপর্বে সবাই সবার সঙ্গে কথা বলেন। সেনাবাহিনী প্রধান মাহবুবুর রহমান হাত মেলান সন্তু লারমার সঙ্গে। এ ছিল একটি বিরল মুহূর্ত।

শান্তি চুক্তি সইয়ে সরকারের পক্ষে জড়িত বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলেন, এ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে স্বৈরশাসক কর্তৃক সৃষ্ট ৩টি প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। প্রথমত বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর স্বৈরশাসকরা গোষ্ঠীগত স্বার্থে উপজাতীয়দের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল। এ কারণে বহু উপজাতি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ চুক্তির আওতায় সকল বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে উপজাতীয়দের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে সাধারণ নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত স্বৈরশাসকরা তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বল্প ও বিত্তহীনদের পার্বত্য এলাকায় বসতি দিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছিল। সরকার এই চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। তৃতীয়ত স্বৈরশাসকরা গত ২২ বছরে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নকে অবহেলা করেছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'সংবিধানের আওতায় এই চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিতে কোন পক্ষই নয়, জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ।'

**সংবাদ**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**শান্তি আলোচনায় যারা ছিলেন**

সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য তালিকা

১। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ চীফ হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, কনভেনার
২। এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সদস্য
৩। কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য
৪। প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন এমপি আওয়ামী লীগ সদস্য
৫। আতাউর রহমান খান কায়সার শিল্পপতি আওয়ামী লীগ সদস্য
৬। দিপঙ্কর তালুকদার এম, পি, আওয়ামী লীগ সদস্য
৭। আমির খসরু মোঃ চৌধুরী এমপি বিএনপি সদস্য (অনুপস্থিত)
৮। সৈয়দ ওয়াহিদুল খান এমপি বিএনপি সদস্য (অনুপস্থিত)
৯। এডভোকেট ফজলে রাব্বি এমপি জাপা সদস্য
১০। এ, কে খন্দকার সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান, প্রাক্তন কনভেনার, প্রাক্তন চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
১১। আলী হায়দার খান, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ
১২। এস, এস, চাকমা, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব

**যোগাযোগ কমিটি**

১। হংসধ্বজ চাকমা, কনভেনর
২। নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা সদস্য
৩। কৈ শৈ অং মারমা সদস্য
৪। মথুরা লাল চাকমা সদস্য
৫। মোঃ সাফি সদস্য
৬। বিশ্বজিৎ চাকমা সদস্য

**পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির পক্ষে**

১। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)
২। গৌতম কুমার চাকমা
৩। রূপায়ন দেওয়ান
৪। সুধাসিন্ধু খিসা
৫। রক্তউৎপল ত্রিপুরা



**সংবাদ**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির**
**পূর্ণ বিবরণ**

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

**ক) সাধারণ**

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরিকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ঃ আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ঃ সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঃ সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

**খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ**

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত ''উপজাতি'' শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। ''পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ'' এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ ''পার্বত্য জেলা পরিষদ'' নামে অভিহিত হইবে।

৩। ''অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা'' বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪–মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ''ডেপুটি কমিশনার'' এবং ''ডেপুটি কমিশনারের'' শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে ''সার্কেল চীফ'' এবং ''সার্কেল চীফের'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে–''কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না''।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন–অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।



৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর' শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় ''নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ'' শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"-এর পরিবর্তে ''মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবেঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১)-এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত, এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে



পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবেন। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পূনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ"–এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ



কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। (ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
(খ) পুলিশ (স্থানীয়);
(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
(ঘ) যুব কল্যাণ;
(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(চ) স্থানীয় পর্যটন;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
(ট) মহাজনী কারবার;
(ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;
(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;
(চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;
(জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;
(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;
(ঞ) ব্যবসার উপর কর;
(ট) লটারীর উপর কর;
(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

**(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদঃ**

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।
পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবেঃ

| | | |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | - | ১ জন |
| সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) | - | ১২ জন |
| সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) | - | ২ জন |
| সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) | - | ৬ জন |
| সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) | - | ১ জন |

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।



অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

(খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

**(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী**

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে



উভয়পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপকাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভ ল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

(খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;
(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।
৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।
(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।
৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।
৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।
৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।
১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।
১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।
১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।



১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।
১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।
১৫। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।
১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।
(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হইবে।
(খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।
(গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।
(ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।
(ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের

যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

(চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগসুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইনশৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি করা হইবে।



(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
(২) চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
(৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
(৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
(৮) সাংসদ, বান্দরবান
(৯) চাকমা রাজা
(১০) বোমাং রাজা
(১১) মং রাজা
(১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে | পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে |
|---|---|
| (আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)<br>আহ্বায়ক<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি<br>বাংলাদেশ সরকার | (জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)<br>সভাপতি<br>পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি |

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**কূটনৈতিক**

**মহলে সন্তোষ**

**॥ মোস্তফা কামাল ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকার চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, এ চুক্তি শান্তি ও উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে চুক্তি সইয়ের পর বিকেলেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বিদেশী কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, চীন, জাপান, সৌদি আরব, ভারত, পাকিস্তানসহ প্রায় ৪৬টি দেশের ঢাকাস্থ মিশন প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, পররাষ্ট্র সচিব মুস্তাফিজুর রহমান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে তারা চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তি চুক্তির বিবরণ কূটনীতিকদের কাছে তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘ ২২ বছরের সংকট সমাধান এবং পাহাড়ি বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে।

তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার উল্লেখ করে বলেন, শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে। সামরিক বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো তুলে আনা হবে এবং জমির প্রকৃত মালিকদের জমি ফেরত দেয়া হবে। পার্বত্যবাসীদের তদারকির জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এ সময় ঢাকাস্থ পাকিস্তানি হাই কমিশনার করম এলাহী সরকারকে চুক্তি সইয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ চুক্তি শান্তি এবং উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন, 'আমরা খুবই খুশি।' চুক্তিটি সংসদে উত্থাপন করা হবে কিনা ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার ডেভিড ওয়াকারের এ প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অবশ্যই সংসদে পেশ করা হবে। কারণ সংসদই হলো আমাদের মূল কর্তৃপক্ষ। গঙ্গার পানি চুক্তি সইয়ের পরও আমরা সংসদে উত্থাপন করেছি। তিনি অপর এক



রাষ্ট্রদূতের প্রশ্নের জবাবে বলেন, জাতীয় কমিটিতে বিএনপি'র দু'জন সাংসদকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারা আলোচনায় অংশ নেননি। শান্তি চুক্তিতে সংবিধান পরিপন্থী কিছু আছে কিনা জনৈক রাষ্ট্রদূতের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংবিধান পরিপন্থী কোন কিছুই চুক্তিতে নেই। অপর একজন রাষ্ট্রদূত জানতে চান-চুক্তিটি বিরোধীদল সমর্থন করবে কিনা এবং সমর্থন না করলে সরকার কি করবে? এর জবাবে তিনি বলেন, বিরোধীদলের সমর্থন না করার কিছু নেই। আমরা মনে করি, বিরোধীদল চুক্তিটি ভালভাবেই গ্রহণ করবে এবং সমর্থন দেবে। তিনি বলেন, শান্তি চুক্তির জন্য বিএনপি সরকারের আমলে যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটি প্রথম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। আমরা কেবল ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**বিশেষ সম্পাদকীয়**

**স্বাগত ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি**

সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার বহু প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির মধ্যে সম্পাদিত এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির ফলে দু'দশকের উপর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতের অধ্যায় শেষ হয়ে শান্তির নবযুগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি রক্তক্ষয়ী হানাহানির ফলে সেখানে উপজাতি ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই শুধু ব্যাহত হয়নি, সেখানকার উন্নয়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অফুরন্ত খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণও সম্ভব হয়নি। সংঘাত ও রক্তপাতের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনই সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় এবং সর্বোত্তম পন্থা।

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালি কারও কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি এবং রক্তাক্ত পথে কারও কল্যাণ সাধন সম্ভবও নয়। এই উপলব্ধি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া এরশাদ সরকার আমলে শুরু হলেও ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার শান্তিস্থাপনে নতুন উদ্যম শুরু করে। শান্তি আলোচনার সেই প্রচেষ্টা সফল না

হলেও পার্বত্য এলাকায় ১৯৯২ সাল থেকেই সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতি যুদ্ধবিরতি শান্তি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত বজায় রেখে আসছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সেই শান্তি আলোচনার ধারাবাহিকতাকে নতুন করে গতিশীল করে তোলে। পূর্ববর্তী সরকারের সময় এ উপলক্ষে গঠিত জাতীয় কমিটিতে সংসদের সকল দলের প্রতিনিধি থাকলেও, এবারের আলোচনায় সরকার গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিতে বিএনপি অংশগ্রহণ করেনি, যদিও তাদের দু'জন সাংসদকে উক্ত কমিটিতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারা শান্তি আলোচনায় কোন ভূমিকা রাখতে রাজি হন নি।

শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে উপরন্তু এ যাবৎকাল যে সব অপপ্রচার চালানো হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

এই শান্তিচুক্তির ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক হল, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি এবং তাদের সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে এসেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে তারা সীমাবদ্ধ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং শান্তিবাহিনী অস্ত্র ত্যাগ করবে। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য এলাকা থেকে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের প্রত্যাহারের দাবিও তারা ছেড়ে দিয়েছে। পাহাড়ি ও বাঙালি পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বাস করবে। তৃতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তারা ত্যাগ করেছে।

দেখা গেল, বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে না, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর ইত্যাদি–শান্তিচুক্তি বিরোধীদের এ ধরনের অপপ্রচারের কোন ভিত্তি ছিল না। উত্তেজনা জিইয়ে রাখা এবং হানাহানি বজায় রাখা যাদের লক্ষ্য তারা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নের ধুয়া তুলে দেশে অশান্তির আগুন জ্বালাতে উঠেপড়ে লেগেছে। শান্তিচুক্তিতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার সম্পর্কে একটি কথাও নেই।

শান্তিচুক্তি হলে সেখানে পাহাড়ি-বাঙালি আতঙ্কমুক্ত হয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। সকলের জীবনযাত্রা নির্বিঘ্ন হবে। শুধু থাকবে না রক্তপাত। হিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও রক্তপাত যাদের রাজনীতির মূলধন একমাত্র তারাই হতাশ হবেন। বাংলাদেশের মানুষ শান্তি চায়, রক্ত চায় না।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই শান্তিচুক্তি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে এই পদক্ষেপকে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিই অভিনন্দন জানাবে। রক্তপিপাসু, নরমুণ্ড শিকারী অসৎ রাজনীতিকদের বর্বর মুখবিকারকে সকলে ধিক্কার দেবে।



মহান বিজয়ের মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি আমাদের জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বিজয়ের মাসে আমরা হিংসা-দ্বেষের শক্তিকে পরাজিত করে শান্তি অর্জনে জয়ী হয়েছি। এক নতুন বিজয়–গৌরবে জাতি ধন্য।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**শান্তি চুক্তির মূল কথা**

- চুক্তি কার্যকর হবে সইয়ের দিন থেকে।
- স্থায়ী সেনাক্যাম্প থাকবে। অস্থায়ীগুলো উঠবে পর্যায়ক্রমে।
- ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ও গোলাবারুদের তালিকা দেবে জনসংহতি সমিতি।
- শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের দিন নির্ধারণ হবে ৪৫ দিনের মধ্যে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় হবে। এর দায়িত্বে একজন উপজাতীয় মন্ত্রী থাকবেন।
- সব ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ উপজাতি-অউপজাতি সমন্বয়ে পার্বত্য পরিষদের হাতে থাকবে।
- শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করলে সাধারণ ক্ষমা, নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা।
- জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন হবে।
- বাঙালিদের জায়গা জমি ফেরত নেয়া হবে না।
- চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত একজন সদস্যের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের একটি বাস্তবায়ন কমিটি।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

চুক্তি সংসদে যাবে কিনা রাষ্ট্রপতি বলবেন

**জাতির জন্য এই চুক্তি ছিল অপরিহার্য : প্রধানমন্ত্রী**

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** শান্তি চুক্তি সইয়ের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে বলেন, দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শান্তি প্রয়োজন। তাই এ চুক্তি দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ছিল।

তিনি বলেন, যাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তারা আমাদের দেশেরই সন্তান। এদেশেরই নাগরিক। একই পরিবারের ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া হয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়, আবার পরে মিলেমিশে থাকে। প্রধানমন্ত্রী শান্তি চুক্তিকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্ব শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের সীমারেখায় অশান্তি থাকবে এটা কাম্য হতে পারে না। সে কারণেই বিভিন্ন সময় যেসব সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। আমরাও চেষ্টা করেছি, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা সমঝোতায় আসতে পেরেছি। এটাই বড় কথা। আমাদের সদিচ্ছা ছিল, তাই আমরা সফল হয়েছি।

শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিরোধীদল বিশেষ করে বিএনপি'র বিরোধিতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপিও শান্তি চুক্তির জন্য কমিটি করেছিল। আগরতলায় গিয়ে সে কমিটি ১৩ বার বৈঠকও করেছে। আমরা ক্ষমতায় গিয়ে কমিটি গঠন করে সে আলোচনা অব্যাহত রেখেছি। বিএনপি বৈঠকের পর বৈঠক করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। এখন তারা নানাভাবে নানা ধরনের কথা বলছে, উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঢাকায় বসে অন্য দেশের পতাকা বানিয়ে সে পতাকা উড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে দেশদ্রোহিতা।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি কোন রকম উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করে ধৈর্য ও সহ্যের সঙ্গে শান্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বিএনপি'র প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য বিএনপিসহ সকল বিরোধীদলের সহযোগিতা চাই।

এ চুক্তি সংসদে উত্থাপন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে উঠাতে হয়। কিন্তু এটি নিজেদের মধ্যকার চুক্তি। তবুও এটা রাষ্ট্রপতির কাছে দেয়া হবে, এটা সংসদে তোলা হবে কিনা সে বিবেচনা রাষ্ট্রপতিই করবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি ছিল এর অবসান ঘটবে। শান্তি স্থাপন হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও শুরু হবে। পাহাড়ি-বাঙালি সকলে মিলে-মিশে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী এ চুক্তি সম্পাদনের জন্য রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দসহ চুক্তির



সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**সমস্যার রাজনৈতিক**
**সমাধানে সেনাবাহিনী**
**আনন্দিত : মাহবুব**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, বছরের পর বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যা। এর রাজনৈতিক সমাধানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আনন্দিত। তিনি বলেনঃ শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে বলে দেশবাসী আশা করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা শান্তি রক্ষায় জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করবে।

গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শান্তিচুক্তি সইয়ের পর সংবাদসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

**বিডিআর প্রধান**

বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান (বীর উত্তম) শান্তিচুক্তির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন ঃ শান্তিচুক্তি সইয়ের আগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। প্রায় সাড়ে ৪ বছর পার্বত্য অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেছি। শান্তিচুক্তি কার্যকরের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সমাধান হবে। আমরা আনন্দিত।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা**
**যেভাবে সৃষ্টি, যে পথে**
**সমাধান**

**১৯৭২ ঃ ২৯ জানুয়ারি ঃ** চারুবিশাক চাকমার নেতৃত্বে একটি পাহাড়ি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে আরেকটি পাহাড়ি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে কতকগুলো দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিসহ। এতে নিম্নলিখিত দাবিগুলোর উল্লেখ ছিল ঃ (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নিজস্ব আইনবিধিসহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, (২) ১৯০০ রেগুলেশন বলবৎ রাখা, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সার্কেল কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল রাখা (৪) ১৯০০ ধারা পরিবর্তন না করার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ও (৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে অপাহাড়িদের প্রবেশনিয়ন্ত্রণ।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসব দাবি নাকচ করে দেন। প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য উপেন্দ্রলাল চাকমার ভাষায়, শেখ মুজিব বলেছিলেন, "আমরা সবাই বাঙালি। দুই ধরনের সরকার ব্যবস্থা রাখা অসম্ভব। নিজেদের জাতিগত পরিচয় ভুলে গিয়ে আপনারা বাঙালি হয়ে যান।" (সূত্রঃ লাইফ ইজ নট আওয়ারর্স; ১৯৯১, পৃ. ১৪) একইদিন পার্বত্য জনসংহতি সমিতি নাম বদলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নাম রাখা হয়।

১৯৭৩ ঃ ৭ জানুয়ারি ঃ জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়।

১৯৭৬ ঃ শান্তিবাহিনীর সামরিক গেরিলা অভিযান শুরু।

১৯৭৬-৮০ ঃ শান্তিবাহিনী ও সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে লড়াই।

১৯৭৬ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর ঃ জিয়া সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন। যার সভাপতি এখনও পর্যন্ত এলাকার সামরিক বাহিনীর জিওসি।

১৯৭৯ ঃ এক লক্ষেরও বেশি দরিদ্র বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন।

১৯৭৯-৮১ ঃ বাঙালিদের অব্যাহত পুনর্বাসন।

১৯৮০ ঃ নিরাপত্তা বাহিনী ও পুনর্বাসিত বাঙালি জনগোষ্ঠী কর্তৃক পাহাড়ি গণহত্যা শুরু। শান্তিবাহিনীর বিচ্ছিন্ন গেরিলা আক্রমণে বাঙালিদের মৃত্যু।

১৯৮১ ঃ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভারতে আশ্রয় নেয়া শুরু। জুন থেকে সেপ্টেম্বর। ডিসেম্বর মাসে সরকারি উদ্যোগে তাদের ফেরত আনা হয়।

১৯৮৩ ঃ ১০ নভেম্বর ঃ এম, এন, লারমা নিহত।

১৯৮৪ ঃ ১লা জুনে বরকল গণহত্যায় পাহাড়িদের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ। দুই সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তারা দেশে ফিরতে বাধ্য হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হলে আবারও তারা ভারতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে ভারত সরকার সেনা ও পুলিশের সহায়তায় তাদেরকে সীমান্তের এপারে ঠেলে দেয়।



১৯৮৫ ঃ ২০ অক্টোবর ঃ সেনাবাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীর আলোচনা শুরু।

১৯৮৬ ঃ মাটিরাঙা ও পানছড়ি পুনর্বাসিত বাঙালি বসতির ওপর শান্তিবাহিনীর হামলার জবাবে নিরাপত্তা বাহিনী ও বাঙালিদের পাহাড়িদের ওপর মিলিত আক্রমণ–পানছড়ি গণহত্যা, মাটিরাঙা গণহত্যা, কুমিল্লা টিলার তাইনডং গণহত্যা সংঘটিত। ফলে হাজার হাজার শরণার্থীর ভারতে পলায়ন। ভারতের হিসেবে ৪৯ হাজার। বাংলাদেশ সরকারের দাবি ২৯ হাজার ৯শ' ২৯ জন।

১৯৮৯ ঃ এরশাদ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের উদ্যোগ। ৪ মে ঃ লংগদু হত্যাকাণ্ড। হাজার হাজার পাহাড়ির ভারতে প্রবেশ।

১৯৯২ ঃ ১০ এপ্রিল ঃ লোগাং হত্যাকাণ্ড। খাগড়াছড়ি পানছড়ির লোগাং-এ নিরাপত্তা বাহিনী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত আক্রমণে প্রায় দেড়শ পাহাড়ি নিহত হন। মে ঃ বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়ে একমত হন। জুলাই ঃ অলি আহমদের নেতৃত্বে সংসদ সদস্যদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক রাজনৈতিক কমিটি গঠন করে।

১৯৯৩ ঃ অলি আহমদের নেতৃত্বে ২ মে থেকে ৯ মে রাজনৈতিক কমিটির ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন। ৮ জুন প্রত্যাবাসনের দিন ধার্য। কিন্তু শরণার্থীদের ১৩ দফা দাবি সরকার মেনে না নেওয়ায় প্রত্যাবাসন স্থগিত হয়। ১৭ নভেম্বর ঃ নানিয়ার চর গণহত্যা। ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট পাহাড়িদের একটি দল খাগড়াছড়ির পাঁচটি থানা পরিদর্শন করে।

১৯৯৪ ঃ উপেন্দ্রলাল চাকমার ঘোষণা ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রত্যাবাসন শুরু হবে। প্রথমাবস্থায় ৪০৫ পরিবার দেশে ফিরবে। ১৫-২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪০৫ পরিবারের ১৯২৭ জন সদস্য দেশে ফিরে আসে। পাঁচ মাস পর দ্বিতীয় দফায় ৬৪৮ পরিবারের তিন হাজার ৩২৭ জন ফিরে আসে। সরকার শরণার্থীদের দাবি মানছে না বলে প্রত্যাবাসন বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৬ ঃ ১১ জুন ঃ গভীর রাতে হিল উইমেন ফেডারেশন সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা অপহৃত হন। কল্পনা চাকমার পরিবার অপহরণকারী হিসেবে নিকটবর্তী সেনাক্যাম্পে অবস্থানকারী লেঃ ফেরদৌস ও অপর ৩ জন বাঙালি ভিডিপি সদস্যকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করে। ১০ সেপ্টেম্বর ঃ লংগদু থানার পাকুয়াখালী এলাকার গভীর বনে ২৮ জন বাঙালি কাঠুরিয়া নিহত হয়। স্থানীয় বাঙালিরা এ ঘটনার জন্য শান্তিবাহিনীকে অভিযুক্ত করে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর

নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। প্রথম বৈঠক খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয় দু'দফায়। প্রথম দফায় ২১শে ডিসেম্বর, ২য় দফা ২৪ ডিসেম্বর।

১৯৯৭ ঃ জনসংহতি সমিতির সাথে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বৈঠক সম্পন্ন। ২রা ডিসেম্বর দু'পক্ষের মধ্যে ৭ম দফা বৈঠকে পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি সই।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

খাগড়াছড়ি ফিরে সন্তু লারমা

**চুক্তিতে পাহাড়ি জনগণের দাবি আদায় হয়েছে**

**মোহাম্মদ জহুরুল আলম, খাগড়াছড়ি থেকে ঃ** গতকাল পানছড়ির দুদুকছড়ায় ফিরে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা জনসভায় বলেন, চুক্তি সই করেছি। চুক্তিতে পাহাড়ি জনগণের দাবি যথেষ্ট আদায় হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের কারণেই এ দাবি আদায় সম্ভব হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় শান্তিচুক্তি সই করে পানছড়ির দুদুকছড়ায় ফিরে বেলা সোয়া একটায় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে এ বক্তব্য রাখেন।

দীর্ঘ পৌনে এক ঘন্টা ধরে সন্তু লারমা পৃথক পৃথক দু'টি জনসভায় বক্তব্য রাখেন। দুপুর সোয়া বারটায় দুদুকছড়ায় চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী, জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার হেলিকপ্টারযোগে জে, এম, এম নেতাদের পৌঁছে দেন।

হেলিকপ্টার থেকে জে, এম, এম নেতৃবৃন্দ মাটিতে পা রাখার পরপরই শত শত জনতা ফুলের মালা দিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাদের বরণ করে নেয়। ছোট শিশুরা ফুলের মালা সন্তু লারমার গলায় পরিয়ে দেয়। বিজয় উল্লাসে জনতা দুদুকছড়ায় জনসভায় যোগ দেয়।

জনসভায় সন্তু লারমা বলেন, দেশ ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার নিরিখেই আমরা চুক্তি সই করেছি। আজ যারা চুক্তির বিরোধিতা করছে তারা জাতির জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছে?

সন্তু লারমা বলেন, আমরা দীর্ঘজীবন অনেক আন্দোলন করে আজ জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা শক্ত স্তম্ভ রচনা করতে চাই। শান্তিচুক্তি হয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।



জনসভায় জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা, কেন্দ্রীয় নেতা যদুনাথ চাকমা, সুধী সিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমাসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল চুক্তি সইয়ের পর সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এ কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, চুক্তির বাস্তবায়ন এখন থেকেই শুরু হয়েছে। তিনি পার্বত্য এলাকার উন্নতির জন্য সরকার ও দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, আমরা শান্তিতে সকলেই এক সঙ্গে বসবাস করতে চাই। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পার্বত্য শান্তির পথের বাধাগুলো দূর করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, খুব শিগগিরই আমরা সাংবাদিকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সব জানাব।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**প্রতিক্রিয়া : চুক্তি প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত যারা**

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শান্তি চুক্তি সই হওয়ার পর সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ এবং জাতীয় কমিটির সদস্যরা সংবাদ প্রতিনিধির কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ঃ

**আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ঃ** আমি খুবই আনন্দিত। দীর্ঘদিনের সমস্যাটা আমার মত একজন সমাধান করতে পেরেছি বলে। সেজন্য আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি। চুক্তির কথামত 'তিনজন সদস্য' চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি দেখবে। সকলের সহযোগিতা পেয়েই এ চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।

**ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর ঃ** দেশে শান্তি স্থাপনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য, সকল নাগরিকের সম-উন্নয়নের জন্য এ চুক্তির দরকার ছিল। সাময়িকভাবে যে বিবাদরত ছিলাম সে বিবাদের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে আমরা বাংলাদেশের সকল নাগরিক একসঙ্গে এগিয়ে যাব।

**কল্পরঞ্জন চাকমা ঃ** আমরা শান্তি চাই। শান্তির পক্ষে যতো বাধা ছিল তা কাটিয়ে উঠতে পারা গেছে বলে দেশবাসীকে ধন্যবাদ। তিনি বলেন, এবার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে।

**দীপঙ্কর তালুকদার ঃ** খুবই আনন্দ লাগছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম পার্বত্য এলাকায় শান্তি

ফিরিয়ে আনা হবে। আমরা সে লক্ষ্যে সরকারের দেড় বছর বয়সের আগেই একটি চুক্তি করেছি।

**বীর বাহাদুর ঃ** খুবই আনন্দ লাগছে এ চুক্তি সই হওয়ার কারণে। আমরা শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার পর যে 'শান্তি চুক্তি' করেছি সে জন্য পার্বত্যবাসী অত্যন্ত আনন্দিত। আশাকরি এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে।

**চাকমা রাজা দেবাশীস রায় ঃ** চুক্তি হওয়ায় আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এ শান্তি প্রক্রিয়া সমর্থন করেছি। যেহেতু আমি চাকমা সার্কেলের উপদেষ্টা, তাই আমি আমার মতামত সরকারকে জানিয়েছি। আমার সমর্থনের কথাও জানিয়েছি।

**চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ও পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য সাখাওয়াত হোসেন ঃ** আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, চুক্তি সম্পাদনের পর আমি খুবই সন্তুষ্ট। আমার চাকরি জীবনের এটা সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। এতটাই আনন্দ যে, এর জন্য আমি রাতে ঘুমুতে পর্যন্ত পারিনি, এই ভেবে যে কি হবে, কেমন হবে। এটা যেনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়। পাহাড়ি-বাঙালি যেনো এক সাথে মিশে দেশকে গড়ে তুলতে পারি।

**মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী ঃ** দীর্ঘদিনের একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে। এখানে যে অশান্তি বিরাজ করছিল, তা এখন শান্ত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি খুব খুশি। এ সবই হয়েছে আল্লাহর রহমত ও জনগণের দোয়ার কারণে।

**আতাউর রহমান খান কায়সার ঃ** কাজ করতে পেরেছি বলে খুব ভালো লাগছে। চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি বলেন, কিছু বাধা বিপত্তিতো হতেই পারে, এগুলোকে পদাঘাত করেই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## তিন পার্বত্য জেলায় মিছিল সমাবেশ, মিষ্টি বিতরণ

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥** তিন পার্বত্য জেলায় এখন বইছে শান্তির বাতাস। শান্তি চুক্তি সইয়ের পর পরই খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে শান্তি মিছিল বের করা হয়। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো বিবরণ ঃ

খাগড়াছড়ি থেকে মোহাম্মদ জহুরুল আলম জানান ঃ খাগড়াছড়িতে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সইয়ের খবর প্রচারিত হওয়ার পর পরই পাহাড়ি-বাঙালি



সকলেই আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। দোকানে দোকানে মিষ্টি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

পাহাড়ি দূর পল্লীতে উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ দু'যুগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর পার্বত্যবাসীদের মধ্যে স্বস্তির নিশ্বাস এনে দেয়। দুর্গম পাহাড়ি এলাকাগুলোতে পাহাড়িরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও আর্মস ক্যাডারগণও শান্তি চুক্তির স্বাক্ষর হওয়ায় আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠে। রাঙ্গামাটি থেকে সুনীল কান্তি দে জানান ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক সইয়ের বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। বেশির ভাগ লোকই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে, কয়েকজন অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

বান্দরবান থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানান ঃ ঢাকায় সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের খবর বান্দরবানে ছড়িয়ে পড়লে গতকাল দুপুরেই জেলা আওয়ামী লীগ শহরে এক বিশাল শান্তি মিছিল বের করে।

সন্ধ্যার পরে জেলা পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল করেছে। জেলা আওয়ামী লীগ আবারো সন্ধ্যায় শহরে একটি শান্তি মিছিল করে। ফলে উভয়ের মাঝেই বাজার এলাকায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয় প্রায় ১৫ মিনিট ধরে। এ সময় পুলিশের এ এস আই হাবিব, কনস্টেবল সালাম এবং উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়। তবে নেতৃবৃন্দ এবং পুলিশের কড়া নিরাপত্তার কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সন্ধ্যার পর পরই শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শহর কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়েছে। শান্তি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষের মিছিল বিক্ষোভ মিছিলে পাহাড়িদের কাউকেই অংশ নিতে দেখা যায়নি।

**সংবাদ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## দেশজুড়ে আনন্দ মিছিল শান্তি সমাবেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শান্তিচুক্তি সই হওয়ায় গতকাল মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোথাও মিষ্টি বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠনসহ ন্যাপ,

সিপিবি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে।

সিলেট, সুনামগঞ্জ, ফেনী, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জ থেকে আনন্দ মিছিল ও শান্তি সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছেন। সংবাদ প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর ঃ

**সিলেট ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ গতকাল বিকেলে শহরে একটি মিছিল বের করে। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ আবু নছর সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

সন্ধ্যার পর আদালত মোড়ে শ্রমিক লীগের এক সমাবেশে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানানো হয়।

ন্যাপ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এডভোকেট দিতীশ্বর পাল ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল ওদুদ এক যুক্ত বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

**নীলফামারী ঃ** জেলা বার্তা পরিবেশক জানান ঃ পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় নীলফামারী শহরে একটি বিরাট আনন্দ মিছিলের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এই মিছিলের আয়োজন করে। এর আগে বাজার মোড়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদিন।

এছাড়া এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন জেলা সিপিবি সভাপতি শ্রীদাম দাস, জেলা মহিলা সংস্থার সভানেত্রী রাবেয়া আলিম ও রেডক্রিসেন্ট ইউনিটের সহসভাপতি রাহাত হোসেন।

**মাদারীপুর ঃ** মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদ মাদারীপুরে পৌঁছার পর আজ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শহরে এক আনন্দ মিছিল বের করা হয়েছে।

**কিশোরগঞ্জ ঃ** আবু বকর সিদ্দিক হিরো জানান ঃ পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় আজ সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জ শহরে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল, বিজয় সমাবেশ ও মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়। আনন্দ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছোট ভাই সৈয়দ ওয়াহিদুল ইসলাম।



**জামালপুর ঃ** শান্তিচুক্তির খবর জেলায় পৌঁছানোর পরই গতকাল সন্ধ্যায় জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে একটি শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বকুলতলা মোড় হয়ে রেল গেটে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল্লাহ।

**যশোর ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের উদ্যোগে যশোর শহরে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। চুক্তি সই হওয়ার খবর প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন স্তরের মানুষ উল্লাস প্রকাশ করে।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঃ** পার্বত্য অঞ্চলের শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে শান্তি মিছিল ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা ছাত্রলীগ শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে সন্ধ্যায় একটি শান্তি মিছিল বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণশেষে স্থানীয় পুরাতন কাচারি প্রাঙ্গণে এক শান্তি সমাবেশে মিলিত হয়।

খুলনা, লালমনিরহাট ও গাজীপুরে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**চট্টগ্রাম ঃ** শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ায় গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টায় চট্টগ্রাম উত্তর, দক্ষিণ জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সমাবেশ দারুল ফজল মার্কেট চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডাঃ ছৈয়দুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়র আলহাজ এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন এ, কে, এম বেলায়েত হোসেন, মোঃ গিয়াসউদ্দিন, এম, এ রশিদ, এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন বাবুল, খোরশেদ আলম সুজন ও এম, এ জাফর।

এছাড়া চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অঞ্জন কুমার সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট চন্দন দাশ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি সরদার সিরাজুল ইসলাম পৃথক বিবৃতিতে পার্বত্য এলাকার শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানান।

**সংবাদ**

**৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭**

**বিশেষ ক্রোড়পত্র**

পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস

## শেষ হলো বঞ্চনার ইতিহাস

**-এস এস চাকমা**

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট হতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের ইতিহাস হলো বঞ্চনার ইতিহাস কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জন্য ঐ সময়টা হলো বঞ্চনার ইতিহাস এবং নির্যাতনের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পরেই তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কয়েক হাজার ভারত হতে আগত শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। ঐসব শরণার্থীদের কয়েক'শকে রাঙ্গামাটির কাছে পুনর্বাসন করা হয়। ঐ স্থানের নাম দেয়া হয় কাশিম বাজার, তাছাড়া কয়েক হাজার শরণার্থীকে কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত নানিয়াচড়ে (বর্তমান নানিয়াচর থানা) এবং বাকি অংশকে লংগদু থানায় পুনর্বাসন করা হয়। অথচ ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনকার্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল অনুসরণ করা হতো। এবং ঐ ম্যানুয়েলের ৩৪ ধারা অনুযায়ী অ-উপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া যেত না। এমনকি ঐ ম্যানুয়েলের ৫২ ধারা অনুযায়ী অ-উপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবেশ করতেই ডেপুটি কমিশনারের কাছ হতে একটি পাশ সংগ্রহ করতে হতো। ডেপুটি কমিশনার সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য পাশ দিতে পারতেন এবং কোন অবাঞ্ছিতকে ঐ ম্যানুয়ালের ৫১ ধারা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বের করে দিতে পারতেন। পরবর্তীতে এই ম্যানুয়েল না মানাই বিধানে পরিণত হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৬১ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৩ লাখ। বাঁধ নির্মাণের ফলে ১ লাখ উপজাতি উদ্বাস্তু হয়, ৫৪,০০০ একর কৃষি জমি ডুবে যায় এবং প্রায় ৩শ' ৫০ বর্গমাইল এলাকায় একটি বিরাট কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। যে পরিমাণ কৃষি জমি ডুবে যায় সেটা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট কৃষি জমির প্রায় ৪০%। ১ লাখ উদ্বাস্তুদের মধ্যে সরকার মাত্র ৬০,০০০ জনকে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। কৃষি জমির অভাবে বাকি ৪০,০০০ লোক পুনর্বাসিত হতে না পেরে এবং ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানে দাঙ্গার কারণে বহু উপজাতি



ভারতে চলে যায়, যাদের ভারত সরকার বর্তমান অরুনাচল প্রদেশে পুনর্বাসিত করে। কিন্তু ঐসব উপজাতি এখনো ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯০০ সাল হতে কৃষি জমির স্বল্পতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের ৩৪ ধারা অনুসারে কাউকেও ২৫ একরের বেশি কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া যেত না। এবং কর্ণফুলী প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক লোককে পুনর্বাসনের জন্য পরে ঐ ধারাটি সংরক্ষণ করে ১০ একরে আনা হয়। ফলে কোন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ১০ একরের বেশি জমি বন্দোবস্ত দেয়া যায়নি।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতিদের খুবই সামান্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি তুলে ধরা হলোঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণী | জমি | একর | প্রতি | ৬০০ টাকা |
| দ্বিতীয় শ্রেণী | " | " | " | ৪০০ টাকা |
| তৃতীয় শ্রেণী | " | " | " | ২০০ টাকা |
| বসতবাড়ি গড়ে | " | " | " | ৪০০ টাকা |
| একটি অফলবান বৃক্ষ | " | " | " | ৫ টাকা |
| কলাগাছ প্রতিটি | " | " | " | ২৫ পয়সা |
| আনারস গাছ | " | " | " | ৬ পয়সা |

১৯৮০ সালে Far Eastern Economic Review তাদের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, কাপ্তাই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার ৫১ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার রেখেছিল। কিন্তু মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়।

পুনর্বাসিত হতে না পেরে, যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পেয়ে এবং ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার সময় উৎপীড়িত হয়ে যখন হাজার হাজার উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ভারতে চলে যেতে থাকে তখন উপজাতিদের ভারতে যাওয়া ঠেকানোর জন্য আমাকে রংপুরের গাইবান্ধা হতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে রাঙ্গামাটিতে বদলি করা হয়। এবং রাঙ্গামাটিতে যোগ দেয়ার সাথে সাথে আমাকে সবচেয়ে উপদ্রুত অঞ্চল বাঘাইছড়িতে পাঠানো হয়। আমি বাঘাইছড়িতে যেয়েই গণসংযোগে নেমে পড়ি এবং উপজাতি জনগণকে ভারতে না যাওয়ার জন্য বুঝাতে চেষ্টা করি। ফলে উপজাতিদের ভারতে যাওয়া বন্ধ হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক উপজাতি অর্ধেক পথ থেকে ফিরেও আসে। ঐ সময় পকিস্তান সরকার ভারতের বিদ্রোহী নাগা ও মিজোদের নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করছিল এবং এ কারণে নাগা ও মিজো বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা জায়গায় ঘাঁটি বানিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের

জানুয়ারি মাসে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় একদল সশস্ত্র মিজো সাজেক এলাকায় একটি চাকমা গ্রামে আক্রমণ করে গ্রামের প্রায় সব পুরুষ সদস্যকে (আনুমানিক ৬০ জন) হত্যা করে। ফলে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষত রাঙ্গামাটিতে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদস্বরূপ রাঙ্গামাটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা রাঙ্গামাটিতে মৌন মিছিল বের করে। এতে সরকারের বোধোদয় হলে প্রায় ৩০/৪০ জন মিজোকে বন্দি করে রাঙ্গামাটি জেলে আটক করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয়। ঐসব ধৃত আসামিদের আমি T.I. Parade করি। নিহতদের আত্মীয়স্বজন আসামিদের শনাক্ত করে। কিন্তু এর বেশ কিছুদিন পরে একবার মহকুমা প্রশাসকের বাসায় গিয়ে এস, ডি সাহেবের সাথে ঐ আসামিদের আলাপ করতে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে যাই। পরে খবর নিয়ে জানলাম যে, সব আসামিকে বিচারে খালাস দেওয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি আইনসভাসহ স্বায়ত্তশাসন এবং আরো ৩টি দাবী পেশ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু লারমার কোন দাবী না মানায় বিক্ষুব্ধ লারমা শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি গঠন করেন।

পাকিস্তান হতে ফিরে আসার পরই বঙ্গবন্ধু রাজা ত্রিদিব রায়কে ফিরিয়ে আনার জন্য তার মা বিনীতা রায়কে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। ঐ সময় রাজা ত্রিদিব রায় নিউয়র্কে জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু ত্রিদিব রায় বাংলাদেশে ফিরে না আসায় বঙ্গবন্ধু তার ওপর খুবই নাখোশ হন এবং ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের সফরে রাঙ্গামাটিতে এক জনসভায় রাজা ত্রিদিব রায়কে তিরস্কার করেন। এরকম অবস্থায় তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জিন্নাত আলী পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অধিবাসী নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সংখ্যালঘু করার জন্য সুপারিশ করেন। উপজাতিদের জন্য সুভাগ্য যে, জনাব আলী পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসক হিসাবে বেশিদিন ছিলেন না। তার পরেই জেলা প্রশাসক হয়ে আসেন আব্দুল কাদের। জেলা প্রশাসক হওয়ার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে উপ-সচিব ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। আব্দুল কাদের একজন সত্যিকার মানবদরদী ছিলেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সরলতা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বর্তমানে প্রয়াত এ, কে, এম ফজলুল হক মিঞা বঙ্গবন্ধুকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, উপজাতিরা আসলে অত্যন্ত সহজ-সরল। স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধুমাত্র ত্রিদিব রায় এবং অংশপ্রু চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করায়



তাদের সকলকে বাংলাদেশ বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী মনে করার কোন যুক্তি নেই। বঙ্গবন্ধু তাদের এই যুক্তি মেনে নেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অধিবাসী প্রেরণের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উপজাতিদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। পরে তিনি যখন রাঙ্গামাটিতে যান তখন উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য "বঙ্গবন্ধু স্টাইপেন্ড" দেয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার ঘোষিত স্টাইপেন্ডের আর কোন খবর হয়নি। বঙ্গবন্ধুর আমলে বহু উপজাতি ছাত্রছাত্রী বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। এছাড়া তিনি উপজাতি যুবকদের পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীতে নিয়োগের জন্য বিশেষ আদেশ দিয়েছিলেন। ত্রিদিব রায় পাকিস্তানিদের সাথে সহযোগিতা করলেও এবং পরবর্তীতে তাকে ফেরত আনার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও বঙ্গবন্ধু ত্রিদিব রায়ের ছোটভাই সমিত রায়কে রাঙ্গামাটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের আদেশ দেন এবং রাঙ্গামাটির এক সভায় বাঙালিরা উপজাতিদের জায়গাজমি জোর করে দখল করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন।

বাকশাল গঠনের পরে বঙ্গবন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বাকশালে যোগদান করার আহ্বান জানান। কিন্তু লারমা বাকশালে যোগদান করেননি। ঘটনাক্রমে আমি ঐ সময় সাতক্ষীরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় আসি এবং এম,পি হোস্টেলে লারমার সাথে দেখা করি। ঐ সময় বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য আমি লারমাকে অনুরোধ করি এবং শেষ পর্যন্ত লারমা বাকশালে যোগদান করেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আমি, লারমা এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদের এককালীন উপদেষ্টা এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থানকারী জুম্মু রিফিউজি এসোসিয়েশনের সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমা কাপ্তাই লেক হওয়ার আগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বুড়িঘাট মৌজার পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের পরে মানিকছড়ির মংচিফ মং প্রু সাইনকে খাগড়াছড়ি জেলার গভর্নর, বান্দরবানের বোমাং চিফ মংশু প্রু চৌধুরীকে বান্দরবান জেলার গভর্নর এবং জেলা প্রশাসক আর উপজাতীয়দের খুবই আস্থাভাজন আবদুল কাদেরকে রাঙ্গামাটি জেলার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিন জেলায়ই তিনজন উপজাতিকে বাকশালের জেলা সেক্রেটারি নিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে এবং পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ পারমা আত্মগোপন করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৭৬ সাল হতে নিরাপত্তা বাহিনী এবং শান্তি বাহিনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হতে থাকে।

এই অবস্থায় জেনারেল জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বাড়াতে থাকেন। এবং সেই সাথে তাদের স্থাপনাও দ্রুত বাড়তে শুরু করে। এমন অবস্থায় ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে তদানীন্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এবং অন্যদের উপস্থিতিতে এক সভা হয় এবং ঐ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা হতে ৩০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নগদ টাকা এবং সাপ্তাহিক রেশন ছাড়াও তাদের পরিবার পিছু ৫ একর পাহাড়ি জমি, ৪ একর মিশ্র জমি এবং ২.৫ একর ধানি জমি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনে বাংলাদেশে ১/১০ হলেও এখানে কৃষি জমির পরিমাণ খুবই কম। তাই ১৯০০ সালের রেগুলেশনেই কোন পরিবারকে ২৫ একরের বেশি জমির মালিকানা দেয়া হয়নি।

১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার "Forestal Forestry and Engineering International Ltd" নামে একটি কানাডিয়ান কোম্পানিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি ও ভূমির ব্যবহার জরিপের জন্য নিয়োগ করে। ২ বছর জরিপ করে কোম্পানিটি ৯ খণ্ডে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। ঐ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ঃ

| | | |
|---|---|---|
| চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ | = | ৭৭,০০০ একর ২% |
| ফলের বাগানের জন্য উপযুক্ত | = | ৬,৭০,০০ একর ২১% |
| বন করার জন্য উপযুক্ত | = | ১,৬,০০,০০০ একর ৫১% |
| সংরক্ষিত বন | = | ৮,০০,০০০ একর ২৬% |

পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি জমির এত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জেনারেল জিয়া তিন কিস্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রায় ৮০ হাজার পরিবার অর্থাৎ ৪ লাখ লোককে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। এই ৮০ হাজার পরিবারকে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমি দিতে হলে মোট জমির প্রয়োজনীয়তা দাঁড়ায় ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| পাহাড়ী জমি | ৫×৮০,০০০ | = | ৪,০০,০০০ একর |
| মিশ্র জমি | ৪×৮০,০০০ | = | ৩,২০,০০০ একর |
| ধানি জমি | ২.৫×৮০,০০০ | = | ২,০০,০০০ একর |

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কর্ণফুলী বাঁধে উদ্বাস্তু হয়ে পড়া সর্বোচ্চ সংখ্যক লোককে পুনর্বাসন করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার নতুন একটি



আদেশ জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন পরিবারকে ১০ একরের বেশি জমি বন্দোবস্ত না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর এই দশ একর কমিয়ে পাঁচ একর করা হয়। তাই এখন প্রশ্ন জাগে যে, জেনারেল জিয়া ৪ লাখ বাঙালিকে পুনর্বাসনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসলেন, তাদেরকে দেয়ার মতো এত জমি তিনি পেলেন কোথায়?

শান্তিবাহিনী প্রথমদিকে বাঙালি পুনর্বাসনে বাধা দেয়নি, কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখা গেল যে, পাহাড়িদের বাগান, কৃষি জমি এবং তাদের উৎপাদিত ফসল পর্যন্ত সদ্য আগত বাঙালিরা কেটে নিচ্ছে, দখল করেছে, তখন শান্তিবাহিনী বাঙালি বসতকারীদের আক্রমণ করতে থাকে। এই আক্রমণ সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য আর্শিবাদ হয়ে দেখা দেয়। তারা এই উছিলায় নতুন বসতিকারীদের সহযোগিতায় উপজাতিদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। সেই সাথে হত্যা, অপহরণ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং আরো অনেক লোমহর্ষক নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে থাকে। ফলে উপজাতিরা যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করে। কেবলমাত্র ১৯৮০-৮১ সালে প্রায় ২০ হাজার উপজাতি লোক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়। পরে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনার পরে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ১৯৮৪ সালে ভূষণছড়া ও ছোট হরিণার গণহত্যার পর আরো প্রায় ৮ হাজার চাকমা উপজাতি লোক ভারতের মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কয়েক মাস পরে ভারত সরকার তাদের জোর করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ১৯৮৬ সালে ৬০ হাজারের বেশি উপজাতি লোক পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরেও ৫০ হাজারের বেশি উপজাতি লোক তাদের জায়গা জমি সহায়-সম্বল হারিয়ে রাঙ্গামাটি শহরসহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। ১৯৯১ সালের ৯ই মার্চে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের অফিস পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব জমি জমার রেকর্ডসহ অফিসে রাখা সব রেকর্ড পুড়ে যায়। কিন্তু এই অপরাধের কোন সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি এবং কাউকে দেয়া হয়নি। ফলে সব দলিলপত্র হারিয়ে বহু উপজাতি লোক তাদের জমিজমা হারায় এবং অনেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত তাদের জমির ক্ষতিপূরণ হতে বঞ্চিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাসহ প্রায় ৬০ হাজারের বেশি উপজাতির ভারতে আশ্রয় গ্রহণ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এরকম অবস্থায় জেনারেল এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হন এবং পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খোন্দকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি

গঠন করেন। কিন্তু এ কমিটিতে এরশাদের উপজাতীয় উপদেষ্টা এবং সাংসদ বিনয় কুমার দেওয়ানকে রাখা হয়নি। বরং খন্দকার কমিটি তৎকালীন চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক কর্তৃক মনোনীত তিনটি পার্বত্য জেলার তথাকথিত নেতাদের সাথে কয়েক দফা বৈঠকের পরে তিনটি জেলায় জেলা পরিষদ পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে একমত হন এবং তথাকথিত নেতাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে সরকারের চুক্তি হয়। এইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা পরিষদ চালু করা হয় এবং সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উপেন্দ্র লাল চাকমা এবং আরো অনেকে আমার কাছে স্বীকার করেন যে, ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে। চুক্তিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী রামগড় সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনন্ত বিহারী খীসাও আমার কাছে স্বীকার করেন যে, তাকেও ভয় দেখানো হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে জেলা পরিষদগুলো নির্বাচনের আগেই উপেনবাবু নিরাপত্তার অভাবে ভারতে পালিয়ে যান। উল্লেখ্য, এর কয়েক বছর আগে সন্তু লারমা তার মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সমবেত জনতাসহ লাঞ্ছিত হওয়ায় ভারতে চলে যান। এই প্রথম জেলা পরিষদের নির্বাচনে নিরাপত্তা বাহিনীর মনোনীত সদস্যদেরই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। বিনয় কুমার দেওয়ান আমার কাছে স্বীকার করেন যে, মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তিনিও জড়িত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি জেলার চেয়ারম্যান ছিলেন তার আপন ভাইপো, খাগড়াছড়ি জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান হচ্ছেন বিনয় বাবুর আপন চাচতো ভাইয়ের ছেলে এবং বান্দরবানের চেয়ারম্যান সাচিং প্রু জেনারেল জিয়ার প্রতিমন্ত্রী অংশু প্রুর ছেলে। বিনয় বাবু আমাকে আরো বলেছিলেন যে, জেনারেল এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক কাউন্সিল দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা হবে বলে তাকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আঞ্চলিক কাউন্সিল না দিয়ে কেন জেলা কাউন্সিল দেয়া হলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জেনারেল এরশাদ তাকে নাকি বলেছিলেন যে, যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ জিওসির দেয়া জেলা কাউন্সিল মেনে নিয়েছে সেই কারণে আঞ্চলিক কাউন্সিল দেয়া হয়নি।

ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ৬০ হাজারের বেশি উপজাতিকে নিয়ে আসার জন্য সরকার বিনয় কুমার দেওয়ানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। তিনি দাবি করেন যে, আগে ৫০ হাজার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তাদের নিজস্ব জায়গায় পুনর্বাসন করা হোক। তাহলে ভারতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুরা নিজেরাই চলে আসবে,



কারণ এর ফলে তারা নিজস্ব জমিতে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পাবে। বিনয় বাবু ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায় তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয় এবং তিনি পদত্যাগ করে রাঙ্গামাটি চলে যান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং উপজাতীরা কেউ এই জেলা কাউন্সিল মেনে নেয়নি। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে একটি সরকারি কমিটি গঠন করে। এই সরকারি কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৭ দফা বৈঠক হয়। কিন্তু বিএনপি সরকার এরশাদ সরকারের দেয়া অতিরিক্ত কোন ছাড় দিতে রাজি হয়নি। ৭ দফা বৈঠক হয় ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৪-এ। এরপর আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর বিশেষ কার্যাদি বিভাগ হতে আমাকে ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব করার প্রস্তাব করা হয়েছিল যাতে আমার সার্ভিসকে শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার সময় কাজে লাগানো যায়। কিন্তু বিএনপি সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কারণ তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ছিল না।

খালেদা জিয়া সরকারের আমলে ভারত সরকারের চাপে এবং বাংলাদেশ সরকার উদ্বাস্তুদের অনেক দাবি মেনে নেয়াতে ১০২৭ পরিবারের ৫১৮৬ জন উদ্বাস্তু বাংলাদেশে ফিরে আসে। কিন্তু অনেকেই তাদের জায়গা-জমি অথবা বসতবাড়ি ফিরে পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ১১-১২-৯৪ তারিখে প্রত্যাগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে যে, উদ্বাস্তুদের যেসব দাবি পূরণ করবে বলে সরকার ওয়াদা করেছিল, সেসব দাবির অনেকাংশই পূরণ করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে গণ আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া সরকারের পতন হলে সেই বছরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করবে। ক্ষমতায় আসার পরেই জননেত্রী শেখ হাসিনা চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে এ যাবৎ ৬ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষ বৈঠকে উভয়পক্ষ হতে ঘোষণা দেয়া হয় যে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমাধানের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষর হবে। ২৬-১১-৯৭ইং তারিখে এই বৈঠক এবং চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ এই চুক্তি স্বাক্ষরের দিন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এ কারণে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তিনি দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে সমাধান করে তার কথা রেখেছেন। ক্ষমতায় আসার ১৫ মাসের মধ্যে বিগত ২৫ বছরের সমস্যাটি সমাধান করা এত সহজ ছিল না। কিন্তু তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এর একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হচ্ছে। এজন্য দেশের ১২ কোটি মানুষ, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০ লাখ উপজাতি অ-উপজাতি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকল। বিগত সংঘাতপূর্ণ বছরগুলোতে যে ২০ হাজার উপজাতি নিহত বা আহত, বা অসংখ্য অ-উপজাতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হতাহত হয়েছেন, তাদের সবার প্রতি সম্মান রেখে, নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি, আমরা সবাই যেন নতুন ভবিষ্যতের দিকে এগোতে পারি। জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলাদেশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

## দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
### পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়ায় সংশয়

**তরুণ কুমার ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হইতে আর মাত্র ৪ দিন বাকী। কিন্তু অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি লইয়া সরকার ও জনসংহতি সমিতি কোন পক্ষের কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নূতন করিয়া সংকট সৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়াছে। অস্ত্রবিরতি চুক্তির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান স্থিতিশীল পরিবেশের ভবিষ্যৎ লইয়াও অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়াছে। সরকার ও শান্তিবাহিনীর হাইকমাণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি মোতাবেক চলমান অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হইবে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর। সমিতি গত ২৮শে জুলাই লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে সর্বশেষ প্রেরিত এক পত্রে এই মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি জানাইয়াছিল। তবে সমিতি ইহার সঙ্গে কতিপয় শর্ত জুড়িয়া দিয়াছিল। এসব শর্তের মধ্যে ছিল পার্বত্য সংকট নিরসন প্রশ্নে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা, যথাশীর্ঘ সমিতির সঙ্গে উক্ত কমিটির শান্তি আলোচনা শুরু করা এবং অস্ত্রবিরতি চলাকালীন শান্তিবাহিনীর আটক সকল সদস্যকে মুক্তি প্রদান করা। সমিতির সর্বশেষ পত্রে দাবী করা হইয়াছিল সরকার সমিতির দাবীগুলির ব্যাপারে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাব দিবে অথবা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

জানা যায়, এইসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার নিষ্ক্রিয়তার কারণে পদ্ধতিগত কোন অগ্রগতি হয় নাই। এ ব্যাপারে সরকারী উর্ধ্বতন একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পর পার্বত্য সমস্যা নিরসন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট রাখা ও চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার স্বার্থে এবং পার্বত্য সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার সময় পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি চুক্তি পালনের অনুরোধ জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ হইতে একটি পত্র দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সরকারের এই উদ্যোগ সত্ত্বেও সমিতির সশস্ত্র সংগঠন 'শান্তি বাহিনী' পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালী অপহরণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপর চোরাগোপ্তা হামলাসহ সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করিতে থাকায় কথিত অস্ত্রবিরতি চুক্তির কার্যকারিতা লইয়া সন্দেহ দেখা দিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি গঠন ও আটক শান্তি বাহিনী সদস্যদের মুক্তি প্রদান প্রসংগে সরকারী উক্ত কর্মকর্তা জানান, সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে এবং এ পর্যন্ত আটক ২২ জন শান্তিবাহিনী সদস্যদের মধ্যে ১৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং অপর ৮ জনকে মুক্তিদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীনে আছে।



## দৈনিক ইত্তেফাক
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
### ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত 'শান্তিবাহিনী'র একতরফা অস্ত্রবিরতি ঘোষণা

**খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥** শান্তিবাহিনীর হাইকমাণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফাভাবে আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি পালনের কথা ঘোষণা করিয়াছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সর্বশেষ দফায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর শেষ হইবে। সমিতির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয়, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিবার পর পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সমিতির পক্ষ হইতে ৫টি প্রস্তাব সরকারেরর নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ হইতে ইহার কোন প্রত্যুত্তর অদ্যাবধি প্রদান করা হয় নাই। ইহাছাড়া অস্ত্র বিরতির মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকারের পক্ষ হইতে কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই।

## দৈনিক ইত্তেফাক
১লা অক্টোবর ১৯৯৬
### পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কমিটি গঠন

**শাহজাহাল সরদার ॥** সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এ লক্ষ্যে গতকাল (সোমবার) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্বের আওতায় সমস্যার রাজনৈতিক উপায় নির্ধারণে সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়া একটি

জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত এ কমিটিতে চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ দলীয় তিন এমপি দীপংকর তালুকদার, কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর, চট্টগ্রামের বিএনপি দলীয় দুই এমপি আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, জাতীয় পার্টির এডভোকেট ফজলে রাব্বী এবং আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক আতাউর রহমান কায়সার রহিয়াছেন। জাতীয় কমিটিতে সহায়তা করার জন্য একটি কারিগরি কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। এ কমিটিতে মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুস সালাম এমপি, ফারুক হোসেন এমপি, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ আছেন। গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি কর্তৃক আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রিসভার নিয়মিত এ বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বিষয়ে নির্ধারিত আলোচ্যসূচী ছিল না। সম্পূরক কর্মসূচী হিসাবে বিষয়টি আনিয়া এ সম্পর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির গতকাল আসা একটি চিঠি মন্ত্রিসভার বৈঠকে তুলিয়া ধরা হয়। সূত্র জানায় জনসংহতি তাহাদের চিঠিতে এইমর্মে আশা প্রকাশ করে যে, বর্তমান জাতীয় ঐকমত্যের সরকার পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়া আগাইয়া আসিবে। ইতিমধ্যেই সরকার গৃহীত কার্যক্রমকে জনসংহতি পরিষদ ইতিবাচক হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তাহাদের পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় বলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে হইবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৭ই অক্টোবর ১৯৯৬

**খাগড়াছড়িতে জাতীয় কমিটির মতবিনিময়**
**শান্তিবাহিনীর সঙ্গে শীঘ্রই**
**আলোচনা শুরুর সম্ভাবনা**

**তরুণ কুমার ভট্টাচার্য ॥** শান্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে পার্বত্য সমস্যা নিরসন প্রশ্নে খুব শীঘ্রই সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি তাহাদের সংগে শান্তি বৈঠকে বসিবে। এ ব্যাপারে সরকারের আগ্রহ ও মতামত সম্বলিত একটি পত্র আজ (সোমবার) পার্বত্য চট্টগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি



সমিতির নিকট পাঠানো হইবে। সংশ্লিষ্ট একটি সরকারী সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে জবাব পাওয়া গেলে সংলাপের দিন, তারিখ, স্থান, নিরাপত্তা এবং আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করা হইবে। এইজন্য কমপক্ষে দুই হইতে তিন সপ্তাহ সময় লাগিতে পারে। এদিকে শান্তি প্রক্রিয়ার কর্মপদ্ধতি ও ফর্মুলা নির্ধারণের লক্ষ্যে লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহিত জাতীয় কমিটি গতকাল (রবিবার) খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে দীর্ঘক্ষণ সময় মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি বলেন, যে-কোন সময় যে-কোন অবস্থায় ও যেকোন স্থানে, জাতীয় কমিটি আলোচনায় প্রস্তুত। লিয়াজোঁ কমিটির সিনিয়র সদস্য নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ২৫ বছরে বহু সরকার ক্ষমতায় আসিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক বহু দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। কোন সরকারই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান দিতে চেষ্টা করে নাই। তাই উপজাতি জনগণ আশাবাদী, বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়া পার্বত্য সমস্যার সমাধান করিবেন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আতাউর রহমান খান কায়সার, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শওকত হোসেন, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আলী মোহাম্মদ ইকবাল, খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কাজী আশফাক আহমেদ, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের ডিজি মোঃ মহসিন, খাগড়াছড়ির ডিসি মোহাম্মদ ইসমাইল, পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন খান, লিয়াজোঁ কমিটির অপর দুই সদস্য মথুরা লাল চাকমা ও মোঃ শফি উপস্থিত ছিলেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

**আজ জাতীয় কমিটির**
**সহিত জনসংহতির বৈঠক**

**সালাহউদ্দিন রেজা ও তরুণ চক্রবর্তী ॥** আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি আজ (শনিবার) সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সংহতি

সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সহিত বৈঠকে মিলিত হইবেন। বৈঠকের স্থলে এবং জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতাদের অবস্থান স্থল তথা সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এদিকে দুদুকছড়া এলাকায় গত ১৭ তারিখ হইতে জনসংহতি সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মোট ১৩টি নিরাপত্তা ক্যাম্প ও আউট পোষ্ট প্রত্যাহার ও নিষ্ক্রিয় রাখা হইয়াছে। বৈঠকের পরবর্তী ৩ দিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে জাতীয় কমিটির নিকট আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি ৫ দফা দাবীনামার উপর আলোচনা করিবেন বলিয়া তাহাদের সর্বশেষ পত্রে জানাইয়া দিয়াছে। অপরদিকে সরকারের পক্ষ হইতে আলোচনার বিষয়বস্তু দেওয়া না হইলেও আজকের বৈঠকে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বহুমুখী আলোচনা হইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষ জানাইয়াছেন। সরকারী পক্ষের কয়েকজন সদস্য জানান, পার্বত্য সমস্যার সমাধানের একটি উপায় উদ্ভাবন না করা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে লাগাতার আলোচনা চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে আজকের বৈঠকে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বৈঠকে চলমান অস্ত্রবিরতির সময়সীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক নৃশংস সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ব্যাপারে আলোচনার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির ১১ সদস্যের নেতৃত্ব দিবেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। সদস্য হইতেছেন ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, এডভোকেট ফজলে রাব্বী এম,পি (জাপা), কল্পরঞ্জন চাকমা এম,পি, বীর বাহাদুর এম,পি, দীপংকর তালুকদার এমপি, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি (বিএনপি), সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি (বিএনপি), আতাউর রহমান খান কায়সার ও আলী হায়দার। জাতীয় কমিটিতে বিএনপি'র দুই সংসদ সদস্য আজকের বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন না বলিয়া জানা যায়। অসুস্থতার জন্য অপর সদস্য আলী হায়দার উপস্থিত থাকিবেন না।

জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দিবেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু। অন্যান্য সদস্য হইতেছেন রূপায়ণ দেওয়ান, সুধা সিন্ধু খীসা, গৌতম এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা।

বৈঠকে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাসহ অন্যান্য সদস্য উপস্থিত থাকিবেন।

জাতীয় কমিটির ৩ জন ছাড়া বাকী সদস্যরা গতকাল শুক্রবার খাগড়াছড়ি সদরে পৌঁছিয়াছেন। আজ সকালে দুদুকছড়া হইতে হেলিকপ্টারযোগে জনসংহতি সমিতির নেতাদের বৈঠকস্থলে নিয়া আসা হইবে।



গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ স্থানীয় রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহিত মতবিনিময়কালে চীফ হুইপ হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, এ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর। এ বৈঠকের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানে নূতন দ্বার উন্মোচিত হইবে।

উল্লেখ্য ১৯৮৫ সনের ২১শে অক্টোবর হইতে বিগত সরকারের সর্বশেষ বৈঠক পর্যন্ত কমিটি ও সাবকমিটির ১৯ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২২শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

৩১শে মার্চ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি

**পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে**

**জনসংহতি সমিতির সহিত**

**গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু**

**তরুণ কুমার ভট্টাচার্য ॥** গতকাল (শনিবার) সকালে খাগড়াছড়িতে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে জনসংহতি সমিতির ৫-দফা দাবীর প্রশ্নে আলোচনা ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলতবী রাখা হয়। সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সদরে সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সরকারের পার্বত্যবিষয়ক জাতীয় কমিটির নেতৃত্ব দেন হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা ওরফে শন্তু। বৈঠক সকাল ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সকাল ১০টা নাগাদ পার্বত্য বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির প্রধান হংসধ্বস চাকমা জনসংহতির নেতৃবৃন্দকে সীমান্তবর্তী দুদকছড়া এলাকা হইতে হেলিকপ্টারে করিয়া খাগড়াছড়িতে নিয়া আসে। চীফ হুইপের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির সদস্যরা খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের হেলিপ্যাডে ফুলের তোড়া দিয়া জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান। বৈঠকে জাতীয় কমিটি, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বে যোগাযোগ কমিটির সদস্য এবং উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে যৌথ প্রেস ব্রিফিং-এ জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রেস ব্রিফিং-এ জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান যতীরিদ্র বোধিপ্রিয় লার্মা বলেন, আমরা নূতন সরকারের এই আলোচনার উদ্যোগে নূতনত্ব দেখিতে পাইতেছি। নূতন অনুভূতিও পাইতেছি। বৈঠকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাহারা জানান, খুবই আন্তরিকতার সহিত সর্বসম্মতভাবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈঠক মূলতবী করা হয়। এদিকে বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন সদস্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তিন পার্বত্য জেলার চলমান অস্ত্র বিরতি লংঘনের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী অভিযোগ আনা হয়। জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবীর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন হেতু দফাওয়ারী আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে সম্প্রতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অপহরণসহ ইত্যাদি ঘটনাবলী সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনাকালে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে এসব ঘটনার সহিত তাহাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলা হয়, পার্বত্য অঞ্চলে বহু বাহিনী কাজ করিতেছে। পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর আলোচনাকালে জনসংহতি সমিতি এ ব্যবস্থাকে উপজাতীয়দের উপর চাপাইয়া দেওয়া সিদ্ধান্ত হিসাবে অভিহিত করেন এবং বলেন, ইহার দ্বারা উপজাতীয় নাগরিকের কোন মৌলিক স্বার্থ সংরক্ষিত হইতেছে না।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২৪ তারিখে দফা-ওয়ারী বৈঠকের অগ্রগতির উপর নির্ভর করিয়া এ বৈঠক ঢাকার উচ্চপর্যায় পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা রহিয়াছে। গতকালের বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেলিফোনে বৈঠক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন বলিয়া জানা যায়। বৈঠক চলাকালে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫-দফা দাবীনামা এবং আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা সরকারের জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের কাছে হস্তান্তর করা হয়। উত্থপিত এ দাবীনামার ব্যাপারে সমিতির পক্ষ হইতে বলা হয় যে, আমরা দাবী জানাইয়াছি ইহা কিভাবে গ্রহণ করা হইবে তাহা সরকারের বিবেচনার বিষয়।

জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান শন্তু লারমা আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া বলেন, জনসংহতি সমিতি চায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধীনে পার্বত্য সমস্যার দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান। যাহাতে পার্বত্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি তথা সার্বিক স্বার্থ রক্ষা হয়।

বৈঠক ২৪ ডিসেম্বর আবার শুরু হইবে বিধায় দুদুকছড়া এলাকায় ১৩টি নিরাপত্তা ক্যাম্প ও আউট পোষ্ট প্রত্যাহার ও নিষ্ক্রিয়তার সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলিবে বলিয়া জানা যায়।



গতকালের বৈঠকে সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি, এডভোকেট ফজলে রাব্বী এমপি (জাপা), কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার। জনসংহতি সমিতির পক্ষে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা। বৈঠকে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা ৬ সদস্যের কমিটির নেতৃত্ব দেন। বৈঠকে উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের মহাপরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ইসমাইল এবং বিশেষ কর্মকর্তা বিভাগের পরিচালক প্রশাসন মতিউর রহমান মৃধা।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

**আজ জাতীয় কমিটি**
**ও জনসংহতি**
**সমিতির মধ্যে বৈঠক**

**চট্টগ্রাম অফিস ও খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে গত ২১শে ডিসেম্বর সরকারের জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকের মুলতবী সভা আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আজকের বৈঠকে জাতীয় কমিটির ৭ সদস্যবিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দিবেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতির নেতৃত্ব দিবেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। উল্লেখ্য, ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটির ২ জন বিএনপি সাংসদ গত সভায়ও অনুপস্থিত ছিলেন। আজকের বৈঠকে জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী এবং প্রাক্তন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান পারিবারিক কারণে উপস্থিত থাকিতেছেন না ।

গত ২১শে ডিসেম্বরের বৈঠক ৫ দফা দাবীনামার উপর আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময়ের অভাবে এবং দফাওয়ারীভাবে আলোচনার লক্ষ্যে মূলতবী

ঘোষণা করা হইয়াছিল। আজকের বৈঠকটি হইবে প্রথমবারের মত দফাওয়ারী আলোচনা বৈঠক।

দফাওয়ারী এই বৈঠককে ঘিরিয়া উহার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্ভাবনা নিয়া এলাকার শান্তিকামী মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

এদিকে আজকের আলোচনা বৈঠককে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর একজন বিশেষ দূত খাগড়াছড়ি এলাকা হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা লিয়াজোঁ কমিটির তত্ত্বাবধানে গতকাল সন্ধ্যায় সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ায় অবস্থানরত জনসংহতির নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে উক্ত স্থানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আজ সকালে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের সহিত হেলিকপ্টারযোগে ফিরিয়া বৈঠকে যোগ দিবেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

পরবর্তী বৈঠক ২৫শে জানুয়ারি

**পাবর্ত্য সমস্যা সমাধানে**

**উভয় পক্ষ আশাবাদী**

**তরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য ॥** আগামী ২৫শে জানুয়ারি পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠান এবং উক্ত বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়া সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা বৈঠকের মুলতবী সভা গতকাল (মঙ্গলবার) শেষ হইয়াছে। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজের সম্মেলনকক্ষে প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী এই সভায় জনসংহতি সমিতির উপস্থাপিত ৫ দফা দাবীর উপর দফাওয়ারী আলোচনার প্রেক্ষাপটে মূলতঃ উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করিয়া সীমান্তবর্তী দুদুকছড়া হইতে জনসংহতি সমিতির নেতাদের বৈঠকস্থলে নিয়া আসা হইলে জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তাহাদের অভ্যর্থনা জানান। সকাল ১১টায় উভয়পক্ষ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক একটানা পৌনে দুইটা পর্যন্ত চলে। বৈঠক চলাকালে উভয়পক্ষের সম্মতিতে সার্কিট হাউজের ২নং ভিআইপি কক্ষে সীমিত পর্যায়ে দেড় ঘণ্টাব্যাপী পৃথক এক অনানুষ্ঠানিক রুদ্ধদ্বার আলোচনাও চলে। এই আলোচনায় জাতীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও বিশিষ্ট শিল্পপতি আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান ও অশোক চাকমা। আনুষ্ঠানিক



ও অনানুষ্ঠানিক দুই দফা বৈঠকশেষে এক যৌথ প্রেস ব্রিফিং-এ চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, খুবই আন্তরিক পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছি। তিনি বলেন, পরবর্তী বৈঠক হইবে আগামী ২৫শে জানুয়ারী। আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন, আগামী বৈঠকে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানকল্পে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা জাতিকে দিতে পারিব, ইনশাল্লাহ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা চীফ হুইপের বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করিয়া বলেন, আমরা সন্তুষ্টি লইয়া বৈঠকে আসিতেছি এবং যাইতেছি। পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন, আমরা ইহাতে খুবই আশাবাদী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁহার সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছাও আমরা অনুভব করিতেছি। তিনি বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, এবারের আলোচনা অর্থবহ হইতেছে।

বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত অন্যান্য সদস্য হইলেন যথাক্রমে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি, দীপংকর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি। জনসংহতি সমিতির পক্ষে উপস্থিত অন্যরা হইলেন সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। ইহাছাড়াও বৈঠকে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাসহ কমিটির ৫ জন সদস্য এবং স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজী গোলাম রহমান, ডিজি চৌধুরী মোহাম্মদ মহসিন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াৎ হোসেন, খাগড়াছড়ির ডিসি মোহাম্মদ ইসমাইল ও স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের পরিচালক (প্রশাসন) মশিউর রহমান প্রমুখ।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

**পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয়**

**পরিষদের মহাসচিব সুবিনয় চাকমা**

**গুলীতে নিহত**

**রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ॥** রাঙ্গামাটি শহরের বনরূপাস্থ চম্পকনগরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের মহাসচিব সুবিনয় চাকমা গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। ঐসময় তিনি বাজার হইতে ফিরিতেছিলেন। তাহার বাসার সম্মুখে পিছন দিক হইতে মাথায় গুলী করিলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। এই খবর শুনিবার পর সর্বস্তরের জনগণ সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যান।

রাঙ্গামাটির সাংসদ দীপংকর তালুকদার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত হওয়ার মুহূর্তে সুবিনয় চাকমাকে হত্যার মাধ্যমে এক জঘন্য কাজ সম্পাদন করিয়াছে ষড়যন্ত্রকারীরা। অতীতেও যখনই পার্বত্য সমস্যা সমাধানে কোন শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে তখনই এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল এই ধরনের ঘটনা ঘটাইয়া পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্রলাল চাকমা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, পৌর চেয়ারম্যান মনি স্বপন দেওয়ান, পার্বত্য নাগরিক পরিষদ সভাপতি ও চেয়ারম্যান সমিতির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান আজিজ, রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাব, জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় ও জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাইয়াছেন।

ঘটনার পর তাহার স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদ এই বর্বরতম হত্যার প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলায় আজ হইতে ৪ দিনের শোক কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। কর্মসূচীর মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি থানায় শোকসভা এবং সর্বস্তরে কাল পতাকা উত্তোলন করা হইবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## ঢাকায় ‘শান্তিবাহিনী’র সহিত আলোচনা শুরু ॥ উভয় পক্ষ আশাবাদী

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার লক্ষ্যে সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যেকার আলোচনায় অগ্রগতি হইয়াছে। গতকাল ‘মেঘনা’য় অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের আলোচনা শেষে সরকার পক্ষের নেতৃত্বদানকারী চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং শান্তি বাহিনীর পক্ষে নেতৃত্বদানকারী জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের আলোচনা আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমরা সমঝোতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন ‘মেঘনা’য় নজিরবিহীন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে গতকাল (শনিবার) দুপুর দেড়টা হইতে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চারঘন্টা



আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আজ (রবিবার) সকাল ১০টায় পুনরায় আলোচনা শুরু হইবে। কতদিন আলোচনা চলিবে জানিতে চাওয়া হইলে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ সহাস্যে বলেন, দেখি আগামীকালই (রবিবার) চূড়ান্ত সাংবাদিক সম্মেলন করা যায় কিনা।

আলোচনায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ ছাড়া অংশ নিয়াছেন চট্টগ্রামের মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, মোশাররফ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কারসার, চট্টগ্রামের সাবেক কমিশনার আলী হায়দার, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিবসহ কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা এবং ‘জনসংহতি সমিতি’র পক্ষে সন্তু লারমা ছাড়াও রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, রক্ত উৎপল ত্রিপুরা। আলোচনায় বিএনপি’র পক্ষে দুইজন সংসদ সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও ওয়াহিদুল আলমকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান হইলেও তাহারা অংশ নেন নাই বলিয়া সাংবাদিকদের জানান হয়। জাতীয় পার্টির এমপি ফজলে রাব্বী অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সন্তু লারমা বলেন, আমরা আলোচনায় সন্তুষ্ট। তবে কতদিন সময় লাগিবে ইহা নির্ভর করিতেছে বাস্তবতার উপর। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের সন্তুষ্ট তো থাকিতেই হইবে। তিনি বলেন, আমরা সন্তোষজনক ফলাফলের ব্যাপারে আশাবাদী। কারণ মানুষ মাত্রই তো আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, তাতো বলিতে পারি না। প্রয়োজন হইলে দেখা করিব। প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসার জন্য আপনাকে ঢাকায় থাকার জন্য বলিয়াছিলেন? উত্তর-না, আমার চিকিৎসার এখন প্রয়োজন নাই।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, কত সময় লাগিবে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে, তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে। তবে আমরা সবকিছুই আলোচনা করিতেছি।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## শান্তিবাহিনী’র সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত

**আমীর খসরু ॥** শান্তি বাহিনীর সহিত সরকারের আলোচনা অব্যাহত রহিয়াছে। গতকাল (রবিবার) ঢাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গতকালের আলোচনায় উভয় পক্ষ পার্বত্য এলাকায়

শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হইবার ব্যাপারে কাজ করেন। চুক্তি প্রণয়নের কাজ চলিতেছে এবং চুক্তির খুঁটিনাটি দেখা হইতেছে।

আজ (সোমবার) একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে পারে। সরকার পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ এবং শান্তি বাহিনীর পক্ষে জনসংহতি সমিতি'র জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা'র (সন্তু লারমা) নেতৃত্বে নেতৃবৃন্দ গতকাল (রবিবার) দ্বিতীয় দিনের মত আলোচনা করেন। তবে দুই নেতার কেহই সাংবাদিকদের সহিত কথা বলেন নাই। আলোচনায় সরকার পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী চট্টগ্রামের মেয়র এ, বি, এম, মহিউদ্দিন চৌধুরী আলোচনার ফলাফল জানাইতে সাংবাদিকদের অনুরোধে জানান, 'আজও (সোমবার) আলোচনা চলিবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে যাহাতে সমঝোতায় পৌঁছাইতে পারি উহার লক্ষ্যেই এই প্রচেষ্টা। একটি চুক্তি যাহাতে করা যায় তাহার লক্ষ্যে 'লেখাপড়ার কাজ চলিতেছে।' তিনি বলেন, চূড়ান্ত বলিতে চুক্তি স্বাক্ষরকেই বুঝাইতেছি। তিনি জানান, সরকার পক্ষ হইতে প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। ৫ দফা নিয়াই কি আলোচনা হইতেছে জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, সমগ্র বিষয় নিয়াই আলোচনা হইতেছে। চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হইবে? উত্তরে তিনি বলেন, অবশ্যই ঢাকায়, আর এ জন্যেই তো ওখান থেকে এখানে আসিয়াছি। প্রধানমন্ত্রীর সহিত শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ দেখা করিবেন কিনা জানিতে চাওয়া হইলে চট্টগ্রামের মেয়র বলেন এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। এলাকা হইতে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং পুনর্বাসিত অউপজাতীয়দের ফিরাইয়া আনা নিয়া আলোচনায় কোন মতানৈক্য হইয়াছে কিনা জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আগাম কিছু বলা ঠিক হইবে না।

সরকার কি প্রস্তাব দিয়াছে সে ব্যাপারে কোন কিছুই তিনি বলেন নাই। শান্তি বাহিনীর নেতৃবৃন্দ আগামীকাল (সোমবার) ফিরিয়া যাইবেন কিনা জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, কালও আলোচনা চলিবে। তাহার পরে সিদ্ধান্ত হইবে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টা হইতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে শান্তি বাহিনীর পক্ষে তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের আলোচনা শুরু হয়। দুপুর এবং বিকালে দুই দফায় বিরতি দিয়া আলোচনা রাত পর্যন্ত চলে। আলোচনার কি অগ্রগতি হইয়াছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের কতটুকু সম্পন্ন হইয়াছে সেব্যাপারে গতকাল সারাদিনই কেহ মুখ খোলেন নাই। সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের পীড়াপীড়িতে চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং



আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন মেঘনার বাহিরে আসিয়া সাংবাদিকদের সহিত স্বল্প সময় কথা বলেন। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারেই এখন সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে।

আজ (সোমবার) সকাল ১০টায় বৈঠক আবার বসিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৭

**চুক্তি হয় নাই ॥ শান্তি বাহিনীর সহিত**
**পরবর্তী বৈঠক ১২ই মার্চ**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যকার আলোচনা গতকাল (সোমবার) শেষ হইয়াছে। একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সর্বাত্মক উদ্যোগ থাকিলেও ইহা সম্ভব হয় নাই। তিন দিনের আলোচনা শেষে উভয় পক্ষ আগামী ১২ই মার্চ পুনরায় আলোচনায় বসিবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিকে, শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক শাখা জনসংহতি সমিতি'র নেতৃবৃন্দ গতকাল দুপুরে হেলিকপ্টার যোগে ফিরিয়া গিয়াছেন। আলোচনায় বাংলাদেশ পক্ষে নেতৃত্বদানকারী চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ সন্তু লারমাসহ নেতৃবৃন্দকে বিদায় জানান।

শান্তি বাহিনী নেতৃবৃন্দের বিদায়ের সময়ে দুপুর ২-৪০ মিঃ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনার বাহিরে কয়েকজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ বলেন, গত তিনদিনের সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। অনেক বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছি। পরবর্তী আলোচনা কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন, আলাপ করিয়া ইহা ঠিক করা হইবে। ঐকমত্যের ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কেও তিনি কিছু বলেন নাই।

তিনদিনের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হইলেও পার্বত্য এলাকা হইতে বাঙালী পুনর্বাসিতদের প্রত্যাহার সংক্রান্ত শান্তি বাহিনীর দাবীর প্রশ্নে ঐকমত্য হয় নাই। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, এ কারণেই চূড়ান্ত কোন ঐকমত্য সম্ভব না হওয়ায় ১২ই মার্চ পুনরায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরে ইহা দ্বিতীয় দফা বৈঠক। প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বরের ২১ হইতে ২৪শে পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১২ই মার্চ ১৯৯৭**
**আজ ঢাকায় 'শান্তিবাহিনী'র সহিত বৈঠক**
**এবার কি বরফ গলিবে?**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হইতে চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হইবার দুই দিন পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগাকুল ও প্রতিবাদমুখর কয়েক লক্ষ অ-উপজাতীয় বাসিন্দার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের মুখে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলনরত শান্তি বাহিনীর নেতারা আজ (বুধবার) বর্তমান সরকারের সহিত তৃতীয়বারের মত বৈঠকে মিলিত হইতেছেন। বৈঠকটি ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় অনুষ্ঠিত হইবে। দ্বিতীয় বৈঠকটিও জানুয়ারী মাসের ২৫-২৭ তারিখে ঢাকায়ই অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে এরশাদ ও বিএনপি সরকারের আমলে শান্তিবাহিনীর নেতারা অনেকবার আলোচনায় মিলিত হইলেও রাজধানী ঢাকায় কোন বৈঠকে বসেন নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা এবং সারা দেশের দৃষ্টি এখন ঢাকার এই বৈঠকের উপর। পার্বত্য সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উদ্যোগ উপজাতীয়দের মধ্যে আশার আলো ছড়াইলেও তিন জেলার পাঁচ লক্ষাধিক অ-উপজাতীয় বাসিন্দা তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। শান্তিবাহিনীর দাবী মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী অ-উপজাতীয়দের অন্যত্র সরাইয়া নেওয়ার ব্যাপারে বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় অ-উপজাতীয়দের সংগঠন পার্বত্য ঐক্য পরিষদ, এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আজ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকিয়াছে।

ঢাকার আজকের আলোচনা বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এমপি। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন জাতীয় কমিটির সদস্যগণ। অপরদিকে, শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বা জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। জাতীয় কমিটির একজন সদস্য ও কর্মকর্তা সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি হইতে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করিয়া শান্তি বাহিনীর নেতাদের ঢাকা লইয়া যাইবেন। এই বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে



ইতিমধ্যেই সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা, ডাঃ বাবুল চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অস্থায়ী গোপন আস্তানা হইতে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার দুদুকছড়িতে আশিয়া পৌঁছিয়াছেন। শান্তিবাহিনীর দাবী মোতাবেক আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গত শনিবার হইতে দুদুকছড়ি এলাকার ১৩টি সীমান্ত চৌকি ও ফাঁড়ির মধ্যে আটটি গুটাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং অবশিষ্ট পাঁচটিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছে। বৈঠক সমাপ্তির তিনদিন পর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল থাকিবে।

এবারের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও উভয় পক্ষ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে কিনা সে সম্পর্কে বিভিন্ন মহল এখনও সন্দিহান। ইহার কারণ বিগত বৈঠকেও শান্তি বাহিনী পেশকৃত দফাভিত্তিক আলোচনায় কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও পার্বত্য উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার সংরক্ষণ ও দীর্ঘদিন যাবত তিন জেলায় বসতি স্থাপনকারী অ-উপজাতীয়দের ফিরাইয়া আনার প্রশ্নে উভয় পক্ষ কোন রকম সমঝোতায় উপনীত হইতে না পারায় কোন চুক্তি সম্পাদন ছাড়াই আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই এবারের বৈঠকেও এই দুইটি স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রাধান্য পাইবে।

কয়েকশত বছর যাবত বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তবে প্রথমদিকে তাহাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর হইতে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প, চন্দ্রঘোনা কাগজকল ও পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীদের বসতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পর এবং ১৯৭৯ হইতে ১৯৮২-৮৩ সালে ইহা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে, ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল এলাকার কয়েক হাজার পরিবার তথা এক লক্ষাধিক ছিন্নমূল বাঙ্গালীকে সরকারী উদ্যোগে মূলতঃ খাস জমিতে পুনর্বাসন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী সশস্ত্রভাবে ইহার বিরোধিতা করে। শান্তিবাহিনী ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ এবং ভবিষ্যত পুনর্বাসনে বিধি-নিষেধ আরোপের দাবী জানাইলে এরশাদ সরকার ১৯৮৪ হইতে নূতন করিয়া কোন বাঙ্গালী পরিবারকে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান বন্ধ করিয়া দেয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাঁচ লক্ষাধিক অ-উপজাতীয় নাগরিক বসবাস করিতেছে। অপরদিকে ১৩টি উপজাতির সদস্য সংখ্যা হইতেছে ছয় লক্ষাধিক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার পাঁচশত ২০ একর। ইহার মধ্যে ২৯ লক্ষ দুই হাজার সাতশত ৩৭ একর হইতেছে অরণ্য এবং ৯৩ হাজার দুই একর চাষযোগ্য। অবশ্য এই চাষযোগ্য ভূমির মধ্যে ৫৪ হাজার একর কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কারণে নিমজ্জিত হয়। ইহাছাড়া, চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ হইতেছে ৪৫ হাজার একর, মোটেই চাষাবাদযোগ্য নয় এক লক্ষ ৭০ হাজার ৮৯৯ একর ও পতিত জমি ১০ হাজার একর।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও পার্বত্য অঞ্চলে জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। কিন্তু অস্থানীয়দের জমি সংক্রান্ত বিরোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের মতে, কিছুটা স্বভাবদোষে চক্রান্তের শিকার হইয়া, প্রশাসনিক আনুকুল্য ও সহযোগিতা না পাইয়া উপজাতীয়দের অনেকেই সর্বস্বান্ত ভূমিহীন অবস্থায় দিনমজুর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। তাহারা বলেন, এই সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। উপজাতীয়রা শুধু দখল স্বত্বের মাধ্যমে ও খাজনা দিয়া বংশ পরম্পর হইতে জমির মালিক হিসাবে ভোগ করিয়া আসিতেছিল। অপরদিকে আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অ-উপজাতীয় বসতি স্থাপনকারীরা বিভিন্ন উপায়ে ও প্রশাসনিক সহায়তায় জমির মালিকানা লাভ করে। উপজাতীয়রা আইনসম্মত দলিল দেখাইতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি না পাওয়ায় পুরুষানুক্রমে ভোগদখলকৃত জমি হইতে বঞ্চিত হয়।

শান্তিবাহিনীর দাবী হইতেছে: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা দখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্তকৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করা এবং এ সমস্ত জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির নিকট বা কোন সংস্থাকে যেসব জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে লীজ বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সব জমির লীজ বা বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সকল জমি বা পাহাড় প্রস্তাবিত পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন ন্যস্ত করা।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, পাহাড়ীদের জীবন-যাপন মূলতঃ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল বিধায় তাহারা এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া চাষাবাদ করে। তাহাদের ভোগদখলকৃত জমিও অনেক স্থানে পাহাড়ী জোতদারের দখলে চলিয়া গিয়াছে। অনেকস্থানে উপজাতীয়দের নিকট হইতে অ-উপজাতীয় অনেকেই জমি ক্রয় করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বেআইনী দখলের অভিযোগও রহিয়াছে। ঠিক



তেমনি উপজাতীয়রা বৈধভাবে সরকারের নিকট হইতে খাস জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে। কোন কোন এলাকায় রাবার বাগান সৃজন ও বনায়নের উদ্দেশ্যেও খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। এইসব বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং বিক্রীত জমি আবারও উপজাতীয়দের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া আইনগতভাবে অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

শান্তিবাহিনী মূলত: পাঁচ দফা দাবী দিলেও উপধারা রহিয়াছে মোট ৪৭টি। সংবিধান সংশোধন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু বিরোধীদলের সমর্থন ছাড়া বর্তমান সরকার ইচ্ছা করিলে এই দাবী পূরণ করিতে পারিবে না। কারণ সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন, তাহা বর্তমান সরকারের নাই।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**১৩ই মার্চ ১৯৯৭**

**সরকার ও 'শান্তি বাহিনী'র**
**মধ্যে আলোচনা শুরু**

**হাসান শাহরিয়ার** ॥ দীর্ঘদিনের জটিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গতকাল (বুধবার) ঢাকায় সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর মধ্যে আবার আলোচনা শুরু হইয়াছে। গত জুন মাসে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দের সহিত আরও দুইবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বৈঠকটিও ঢাকায়ই অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে, শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ যখন সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া হইতে ঢাকায় আগমন করিয়া রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা' বৈঠকে বসেন, তখন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের কয়েক লক্ষ অ-উপ-জাতীয় বাসিন্দা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করেন।

আগের মত গতকালের বৈঠকেও সরকার পক্ষের নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। অপর পক্ষের নেতৃত্ব দেন জনসংহতি সমিতি প্রধান জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রির লারমা (সন্তু লারমা)।

আলোচনা উষ্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে গতকাল বিকালে শেষ হয় বলিয়া স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক মশিউর রহমান সাংবাদিকদের জানান। জানা গিয়াছে যে, প্রথমদফা আলোচনায় গতকাল বিতর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপিত

হয়, কিন্তু উভয় পক্ষ কোন সমঝোতায় উপনীত হইতে পারে নাই। একটি সূত্র জানায়, শান্তিবাহিনীর বহু আলোচিত পাঁচ দফার মোট ৪৭টি উপদফার বেশ কয়েকটির ব্যাপারে আগের মত গতকালও মতানৈক্য দেখা দেয়।

গতকালের বৈঠকে শান্তিবাহিনীর পক্ষ হইতে জেলা পরিষদ আইন পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি সংশোধনী দেওয়া হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। সরকার পক্ষ সেগুলি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করিয়া চলতি বৈঠকেই জবাব দিবে। ইহাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম আবাসিক পরিষদ গঠন সম্পর্কে ইতিপূর্বে শান্তিবাহিনী যে রূপরেখা দেয় উহার উপরও গতকাল আলোচনা চলে। একটি সূত্র জানায়, আলোচনায় যথেষ্ট আন্তরিকতা লক্ষ্য করা গিয়াছে।

শান্তিবাহিনী পার্বত্য সংখ্যালঘুদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, অ-উপজাতীয়দের বহিষ্কার, উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের উপর হইতে মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং গ্রেফতারকৃতদের চুক্তির দাবী করিতেছে।

সূত্রটি জানায়, অধিকাংশ দাবী পূরণের প্রশ্নে ইতিমধ্যেই জাতীয় কমিটির পক্ষ হইতে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাইলেও তাহাদের ভাষায় ‘মূল সমস্যা’র সমাধান না হইলে শান্তিবাহিনী কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে না। মূল সমস্যা বলিয়া তাহারা যাহা চিহ্নিত করিয়াছে তাহা হইল: ভূমির দখল ও অধিকার নিশ্চিতকরণ, অ-উপজাতীয়দের অন্যত্র পুনর্বাসন, সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রত্যাহার এবং তিন জেলার সমন্বয়ে স্ব-শাসিত আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন। সূত্রটি জানায় উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকেও এই সকল বিষয় আলোচিত হইতে পারে।

অপর একটি সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় অ-উপজাতীয়গণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া হরতাল পালনের পর তাহাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। শান্তিবাহিনী তাহাদের বহিষ্কারের প্রশ্নে অটল। অপরদিকে সরকার মাঝামাঝি কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতেছে।

আজ (বৃহস্পতিবার) আবার বৈঠক শুরু হইবে।



## দৈনিক ইত্তেফাক
## ১৪ই মার্চ ১৯৯৭
## চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই শান্তিবাহিনীর সহিত আলোচনা সমাপ্ত ॥ পরবর্তী বৈঠক ৩০শে এপ্রিল

**হাসান শাহরিয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে দুইদিনে তিনদফা বৈঠক অনুষ্ঠানের পরও সরকার ও জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী কোন সমঝোতায় পৌঁছিতে পারে নাই। ফলে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাতে ঢাকায় সমাপ্ত হইয়াছে। মূল সমস্যা সমাধানে এখনও পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলেও আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ব্যাপারে উভয়পক্ষ একমত হইয়াছে। ফলে তাঁহারা আগামী ৩০শে এপ্রিল পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য করিয়াছে। তবে বৈঠকটি কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে তাহা জানা যায় নাই।

শান্তি আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষ অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রশ্নেও একমত হয়। আগামী ৩১শে মার্চ ইহার বর্তমান মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা ছিল। শান্তিবাহিনীর নেতারা আজ সোমবার হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি রওনা হইবেন।

জানা গিয়াছে যে, এবারের বৈঠকের পূর্বে শান্তিবাহিনীর পক্ষ হইতে সরকারের নিকট একটি রূপরেখা পাঠান হয়। উহার উপরে দুইদিন আলোচনা চলে। ইহাছাড়া, যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবারের আলোচনায় প্রাধান্য পায় সেগুলি হইলঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বসতিস্থাপনকারী অ-উপজাতীয়দের বহিষ্কার। সরকার পক্ষ এই দুইটি প্রশ্নে সুস্পষ্ট জবাব দিয়াছে। দীর্ঘক্ষণ যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি প্রদর্শনের পর শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ জানান, আগামী বৈঠকে তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে সন্তু লারমাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, চীফ হুইপ যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত আমার কিছু বলার নাই ।

একটি সূত্র জানায়, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্বাস্তু শিবির হইতে চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে ব্যাপারে শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন। আগামী ২৮শে মার্চ

এই প্রক্রিয়া শুরু হইবে। প্রথমাবস্থায় পাঁচ হাজার শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবে। সরকার ও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের লইয়া যে টাস্কফোর্স গঠিত হইবে তাহা একমাসের মধ্যে সরেজমিনে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিবে।

সূত্রটি জানায়, গত বুধবার তাঁহারা একবেলা বৈঠকে মিলিত হয়, গতকাল আলোচনায় বসে দুইবার-সকালে ও বিকালে। বৈকালিক বৈঠক রাত প্রায় আটটায় সমাপ্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সরকার পক্ষের নেতৃত্ব দেন। তাঁহাকে সহায়তা করেন কমিটির সদস্যগণ। অবশ্য বিএনপির প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগদান করেন নাই। অপরদিকে, জনসংহতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) শান্তিবাহিনী দলের নেতৃত্ব দেন। তাঁহার তিনজন সহযোগীও বৈঠকে তাঁহাকে সহায়তা করেন।

শান্তিবাহিনীর সংশোধিত পাঁচ দফা ও ৪৭টি উপ-দফার মধ্যে রহিয়াছেঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন এবং তিন জেলার সমন্বয়ে স্বশাসিত আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ, অ-উপজাতীয়দের বহিষ্কার, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন ও তাঁহাদের উপর হইতে মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি।

জানা গিয়াছে যে, গতকালের বৈঠকে দফাভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিবাহিনী গত বুধবার যে প্রস্তাব এবং আঞ্চলিক কাউন্সিলের রূপরেখা দিয়াছিল সে সম্পর্কে সরকারপক্ষ গতকাল জবাব দিয়াছে। ইহার পর তাহারা পাল্টা প্রস্তাব পেশ করে। অবশেষে এ সকল প্রশ্নে তাহারা পরবর্তী বৈঠকে আরও আলোচনা করার ব্যাপারে একমত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা হইতে অ-উপজাতীয়দের বহিষ্কার করা হইবে না বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট ঘোষণাটি গতকালের আলোচনায় প্রাধান্য পায়। শান্তিবাহিনী তাহাদের বহিষ্কার চায়। এ প্রশ্নে গতকাল তাহারা কি বলিয়াছে তাহা অবশ্য জানা যায় নাই।

দীর্ঘদিনের এই জটিল সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের উদ্যোগের ফলাফল জানার জন্য সকল মহলের আগ্রহ থাকিলেও বাহ্যতঃ তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখা হইতেছে। গত দুই দিনের বৈঠকে দুইপক্ষ কোন্ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাতে কোন অগ্রগতি হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছুই অবহিত করা হয় নাই।

নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন 'মেঘনা'র বাহিরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিক বার বার তাগিদ দিয়া বৈঠকস্থলে



খবর পাঠাইবার পর জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, "আলোচনা অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় আমরা একমত হইয়াছি যে, ৩০শে জুন পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে। পরবর্তী বৈঠক ৩০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হইবে।" একথা বলার পর সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়া দ্রুতগতিতে তিনি ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। সাংবাদিকদের সহিত কথা বলার সময় তাহার পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন শান্তিবাহিনী নেতা জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ।

খাগড়াছড়ি হইতে তরুণ ভট্টাচার্য জানান, গতকাল এই পার্বত্য জেলা শহরে উত্তেজনা বিরাজ করে। বিএনপি শহরে রিক্সা মিছিল বাহির করে। রিক্সা চালকগণ ধর্মঘট পালন করে। তাহাদের অভিযোগঃ উপজাতীয় দুইজন রিক্সাচালককে অপহরণ ও একজনকে মারধর করিয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**২৩শে মার্চ ১৯৯৭**

**চাকমা প্রত্যাবাসন ॥ প্রথম পর্যায়ে**

**আসিবে ৬ হাজার ৭ শত জন**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্বাস্তু শিবির হইতে যে সকল চাকমা শরণার্থীকে বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনা হইবে, দুই দেশের কর্মকর্তারা তাহাদের একটি তালিকা চূড়ান্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি প্রাথমিকভাবে পাঁচ হাজার শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা দেখিয়া শরণার্থী নেতৃবৃন্দ আরও দেড় হাজারেরও বেশী চাকমা উপজাতীয়কে স্বদেশ পাঠাইতে সম্মত হইয়াছে। ইহার ফলে প্রথম পর্যায়ে এক হাজার দুইশত ৫২টি পরিবারের ছয় হাজার সাতশত শরণার্থী তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়া আসিবে।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৯শে মার্চ ত্রিপুরা গমন করে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কে, রাজেশ্বর রাও এবং শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সহিত প্রতিনিধিদল একাধিক বৈঠকে বসে এবং প্রত্যাবাসনের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ সাব্রুম ও উদয়পুরের জেলা ও মহকুমা

পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সহিতও মতবিনিময় করেন। ইহাছাড়া, তাহারা কাঁঠালছড়ি, টাকুনবাড়ি ও পঞ্চরামপাড়া শরণার্থী শিবির পরিদর্শন এবং নেতা ও উপজাতীয়দের সহিত কথাবার্তা বলেন। ভারতীয় রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের নিকট মোট নয় হাজার ২৬৭টি পরিবারের তালিকাভুক্ত ও তালিকা বহির্ভূত ৪৯ হাজার ৮৯২ জন শরণার্থীর একটি তালিকা হস্তান্তর করা হয়। এই তালিকার মধ্য হইতেই এক হাজার ২৫২টি পরিবারের ছয় হাজার সাত শত শরণার্থীকে বাছাই করা হয়।

খাগড়াছড়ির রামগড় ও তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আনা হইবে। আগামী ২৮শে মার্চ সকাল ১০টায় রামগড়ের মন্দির ঘাট সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হইবে। ইহা পরবর্তী দুইদিন অর্থাৎ ২৯ ও ৩০শে মার্চ চলিবে। এই তিনদিনে ২৬৮টি পরিবারের এক হাজার ১৮৫ জন শরণার্থী ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি শিবির হইতে দেশে ফিরিবে। আগামী ৩১শে মার্চ প্রত্যাবাসন কাজ বন্ধ থাকিবে। তবে ১লা এপ্রিল হইতে ৭ই এপ্রিল এই সাতদিনে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া ৪৮৪টি পরিবারের পাঁচ হাজার ৫১৫ জন শরণার্থীকে স্বদেশে আনা হইবে। তাহারা আসিবে মূলতঃ টাকুমবাড়ি, পঞ্চরামপাড়া কর্বুক, লেবাছড়া ও শিলাছড়ি শিবির হইতে।

এদিকে শরণার্থীদের কোথায় কিভাবে পুনর্বাসন করা হইবে তাহা প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসিবে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দও আগামীকাল রামগড় সফরে যাইতে পারেন।

শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানাইবার প্রস্তুতি পুরাদমে চলিতেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এ সম্পর্কিত কোন কমিটি গঠিত হয় নাই। তাহাদের পারাপারের জন্য ফেনী নদীতে একটি ব্রীজ নির্মাণের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে।

প্রত্যাবাসনের প্রথমদিনে রামগড়ে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হইবে। এই সভায় জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকিবেন। ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের নেতৃত্বে কয়েকজন রাজ্যমন্ত্রী ও কর্মকর্তারাও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল গতকাল (শনিবার) সাংবাদিকদের জানান যে, তাহার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটি সকল ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া গত শুক্রবার মধ্যরাতে স্বদেশ ফিরিয়াছে। তিনি বলেন, শরণার্থীদের প্রায় সকলেই দেশে ফিরিয়া আসার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।



বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশের পর শরণার্থীদের প্রথমে সীমান্তের খুব কাছাকাছি এলাকায় অভ্যর্থনা জানান হইবে। সরকারী পরিচয়পত্র প্রদানের পর তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। রেডক্রিসেন্ট ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস তাহাদের সাহায্য ও রেশনসামগ্রী প্রদান করিলে বাস ও জীপে করিয়া পুলিশী নিরাপত্তায় শরণার্থীদের স্ব স্ব থানায় পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। গৃহ নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদিগকে ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখা হইবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৪শে এপ্রিল ১৯৯৭

**প্রত্যাগত উপজাতীয়দের নিজ নিজ বাড়ী ও জমিতে পুনর্বাসন করা হইতেছে**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্বাস্তু শিবির হইতে প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনর্বাসন পার্বত্য চট্টগ্রামে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় শুরু হইয়াছে। ঢাকা ও খাগড়াছড়িতে কর্মকর্তারা জানাইয়াছেন, স্থানীয় উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটি দখলীকৃত বসতবাড়ী ও জমি-জমা উদ্ধার করিয়া ফেরত দেওয়ার প্রাথমিক কাজ চূড়ান্ত করিয়াছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় প্রশাসন অবৈধ দখলদারদের অন্যত্র সরাইয়া নেওয়ার কাজে হাত দিয়াছে। এমনকি অ-উপজাতীয়রাও প্রকৃত মালিকদের বাড়ীঘর ও জমি-জমা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের কেহ কেহ আত্নীয়-স্বজনের বাড়ীতে উঠিয়াছে। আবার কেহবা আপাততঃ উন্মুক্ত আকাশের নীচেই আশ্রয় নিয়াছে। উপজাতীয়দের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসারের পাঁচটি নিরাপত্তা চৌকি সরাইয়া নিয়াছে এবং স্থানীয় প্রশাসন উপজাতীয়দের জমির দখলস্বত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে। তবে পুনর্বাসিত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। প্রত্যাগত উপজাতীয়রা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের দাবী জানাইয়াছে।

দখলীকৃত জমি পুনরুদ্ধারে একটি সরকারী ঘোষণা অত্যন্ত কার্যকর হইয়াছে। স্থানীয় প্রশাসন ও উপজাতীয় পুনর্বাসন কমিটি অবৈধ দখলদারদের জানায় যে, স্বেচ্ছায় যাহারা দখলীকৃত ভিটা ও জমি ছাড়িয়া দিবে সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে পরিবার পিছু এককালীন দুই হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার দীঘিনালা থানার কবাখালী গ্রাম হইতে বেশ কয়েকটি বাঙালী পরিবার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক ইতিমধ্যে চার লক্ষ টাকার একটি

চেক দীঘিনালা টিএনও-এর নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরিত বাঙালী পরিবারের সদস্যগণ এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন, দুই হাজার টাকা দিয়া কিছুই করা সম্ভব নয়। জানা গিয়াছে যে, এই অর্থের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকায় বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

কবাখালীতে অবৈধ দখলদার মোহাম্মদ নূর হোসেন তাহার স্ত্রী জরিনা খাতুন, দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তান লইয়া জায়গা-জমি ত্যাগ করিয়াছেন। বসতবাড়ীটি ফেরত পাইয়াছে প্রকৃত মালিক কৃপা রঞ্জন চাকমা ও চিরঞ্জিব চাকমা। নূর হোসেন আপাততঃ তাহার নিকট আত্মীয় আলী আকজানের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছেন। ফজলুল হক, আব্দুর রশীদ, আবদুল খালেক, সাহেরা বিবি, আবদুস সালাম, নূরজাহান বেগম ও দুলাল মিয়াও একইভাবে জমি ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

দীঘিনালার বাঙ্গালী পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন লীডার জানান, দুই-তিন দিনের মধ্যে কবাখালী গ্রামের ১৩৪টি বাঙ্গালী পরিবারকে স্থানান্তর করা হইবে। বোয়ালখালী ও রসিকনগর হইতেও ৪০টি বাঙ্গালী পরিবারকে স্থানান্তরের কাজ চলিতেছে। স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন হইলে জমির প্রকৃত মালিকের কাছে উদ্ধারকৃত জমি বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

বর্তমানে দীঘিনালায় প্রায় দুই শত বাঙ্গালী পরিবার বসবাস করিতেছে। উপজাতীয় প্রকৃত মালিকগণ তাহাদের বাড়ীঘর ও জায়গা-জমি ফেরত দানের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও সদস্য সচিব জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল গত মঙ্গলবার শরণার্থী পুনর্বাসিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়া ভূমি পুনরুদ্ধার কাজ প্রত্যক্ষ করেন। রামগড়ের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করিয়া শরণার্থী নেতা অক্ষয়মনি চাকমা বলেন, সোনাইআগা, পরশুরামঘাট, নাকাপা, তৈচাংমাপাড়া, পাইলাভাঙ্গা, ছোট কালাপানি ও গুজাপাড়ায় প্রত্যাগত প্রায় ৯০টি পরিবার তাহাদের নিজ নিজ বসতভিটায় বাড়ীঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস শুরু করিয়াছে। এই এলাকায় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা নাই।

জানা গিয়াছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ শীঘ্রই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যাইবেন।



**দৈনিক ইত্তেফাক**

**১১ই মে ১৯৯৭**

## আজ ঢাকায় শান্তি বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক ॥ তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল আহ্বান

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা এই অশান্ত অঞ্চলটির পাহাড়ী ও বাঙালী জনগোষ্ঠীর জন্য একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার লক্ষ্যে সরকারের নেতৃবৃন্দ আজ (রবিবার) শান্তি বাহিনী নেতাদের সহিত ঢাকায় আবারও এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইতেছেন। অপরদিকে, শান্তিবাহিনীর সহিত চুক্তি সম্পাদনের বিরোধিতাকারী সংগঠন পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ সাত-দফা বাস্তবায়ন ও বৈঠকে বাঙালীদের প্রতিনিধিত্বের দাবীতে আজ রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করিয়াছে।

বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এমপি। তাহার সঙ্গে থাকিবেন জাতীয় কমিটির সদস্যগণ। অপরদিকে, শান্তি বাহিনী দলের নেতৃত্ব দিবেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। আজ সকালে একটি সরকারী হেলিকপ্টারে করিয়া শান্তিবাহিনীর নেতাদের ঢাকা আনা হইবে। মধ্যাহ্ন ভোজের পরই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় বৈঠক শুরু হইবে। ইহা লইয়া বর্তমান সরকারের সহিত জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী নেতারা চতুর্থবারের মত আলোচনায় মিলিত হইতেছেন। প্রথমে তাঁহারা খাগড়াছড়িতে মিলিত হইলেও পরবর্তী দুইটি বৈঠক ঢাকায়ই অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের আমলে প্রথম মুখোমুখি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২০শে অক্টোবর সীমান্তবর্তী পুজগাং-এ। দুই বছর পর দ্বিতীয় সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয় একই স্থানে ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। পুজগাং-এ আরও দুইটি বৈঠকের পর ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুন শান্তি বাহিনীর নেতারা আলোচনায় বসেন খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। ঐ বছরের ১৪-১৫ ডিসেম্বরের বৈঠকের পর এরশাদ সরকারের আমলে আর কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই সময়ে অত্যাচারের ভয়ে হাজার হাজার চাকমা উপজাতীয় সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। তাঁহার মন্ত্রী অলি

আহমদ এমপির নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত রাজনৈতিক কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর। এই কমিটি ১৯৯৪ সালের ৫ই মে শান্তিবাহিনী নেতাদের সহিত মোট সাতবার বৈঠকে বসে। অবশ্য বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন সাব-কমিটিও সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ায় সাতদফা আলোচনা চালায় । ইহার সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ২৫শে অক্টোবর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় কমিটির সহিত শান্তিবাহিনীর নেতাদের তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবী লইয়া তিনটি সরকার শান্তি বাহিনী নেতাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে নাই। শান্তিবাহিনীর দাবীর মধ্যে রহিয়াছে : সংবিধান সংশোধন করিয়া রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট গঠন, একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান, 'বহিরাগতদের' বহিষ্কার, জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের পুনর্বাসন এবং আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের নিঃশর্তে মুক্তিদান।

সরকারী এবং শান্তিবাহিনী সূত্র গুলির ধারণা, এবারের বৈঠকেও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। তবে জনসংহতি সমিতির দাবী মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পুনর্বাসিত বাঙালীদের বহিষ্কার, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের রূপরেখা নিয়া আলোচনা চলিবে। বাঙালীদের অন্যত্র সরাইয়া নেওয়ার প্রশ্নে গত বৈঠকেও শান্তিবাহিনী নেতারা যুক্তি খাড়া করেন; কিন্তু সরকার কোন অবস্থাতেই তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাঙালীদের উৎখাতের বিষয়টি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। একটি সূত্র জানায়, এ প্রশ্নে মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা এবারের বৈঠকে বিবেচিত হইতে পারে। শান্তিবাহিনী অনবরত চাপ প্রয়োগ করিলেও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্নেও সরকার রাজী হয় নাই। বর্তমান মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করিলে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া কর্মকর্তারা মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর পরিধি সংকোচনের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। সরকারের পক্ষে সংবিধান সংশোধন সম্ভব নয় বিধায় মূল দাবী হইতে সরিয়া গিয়া আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি যে নয়া প্রস্তাব দিয়াছে সে ব্যাপারেও এবারের বৈঠকে আলোচনা হইবে।



অস্ত্রবিরতি থাকা সত্ত্বেও গত ৩রা মে বান্দরবানের থানচীতে বিডিআর ও পুলিশের সহিত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধের বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পাইতে পারে। এই যুদ্ধে বিডিআর-এর একজন ল্যান্স নায়ক ও দুইজন সন্ত্রাসী নিহত হয়। জনসংহতি সমিতি অবশ্য এই ঘটনার সহিত উহার সংশ্রবের কথা অস্বীকার করিয়াছে। গত শুক্রবার রাতে সমিতির তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ের নেতা জগদীশ চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কারণে সমিতি সব সময় অস্ত্রবিরতি মানিয়া চলে। এই সময়ে শান্তি বাহিনী কর্তৃক সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণের প্রশ্নই উঠে না, এই মন্তব্য করিয়া তিনি দুইটি ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেই ঘটনা দুইটি হইতেছে; ১২ই এপ্রিল মাইকছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১০ই এপ্রিল পাকুয়াখালীতে লুটতরাজ । এই দুই ঘটনায় বহু পাহাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়া তিনি দাবী করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার নিকট লিখিত এক চিঠিতে শান্তিবাহিনী নেতা উষাতন তালুকদার (সমীরন) বলিয়াছেন, গত ১০ই মার্চ বান্দরবান জেলার তারাশা এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির তিনজন সদস্যসহ একজন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি অমর কৃষ্ণ চাকমা (ইনয়) দীপবয় চাকমা, উষা মং মারমা (কেও মং) ও অং প্রু মং-এর বিনা শর্তে মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন ।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১২ই মে ১৯৯৭**

## পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনায় অগ্রগতি

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টচার্য** ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চতুর্থ দফা আলোচনা গতকাল (রবিবার) কড়া নিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হইয়াছে। সরকারের একটি হেলিকপ্টার জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে সকালে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া হইতে ঢাকায় লইয়া আসে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বৈঠক শুরু হয়। প্রায় পাঁচ ঘন্টা আলোচনা চলে এবং রাত নয়টায় শেষ হয়। আজ সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় আবার বৈঠক শুরু হইবে। বৈঠকে সরকারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)।

গতকালের বৈঠকের পর উভয় পক্ষ মিলিয়া যৌথভাবে সাংবাদিকদের কোন ব্রিফিং না দিলেও সাংবাদিকগণ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে ঘিরিয়া ধরিলে তিনি জানান, আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে। তবে আলোচনার স্বার্থে তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন না। তিনি বলেন, আলোচনা ভালভাবেই চলিতেছে এবং তাহারা সকল বিষয়েই আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, এক বৈঠকেই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এমন আশা করা ঠিক নয়। গত সরকার ১৩ বার বৈঠক করিয়াছে কিন্তু কোন সমাধানে উপনীত হইতে পারে নাই।

গত সপ্তাহে বান্দরবানের থানচীতে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে একজন বিডিআর ল্যান্স নায়েক নিহত হইবার বিষয়টিও গতকাল আলোচনায় আসে। তিনি বলেন, শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ জানান যে, এ ঘটনার সহিত তাহারা জড়িত নন।

গতকাল তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, হরতাল কেন আহ্বান করা হইল তাহাই বুঝিতেছি না। প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে স্পষ্ট ভাষায় তাহার বক্তব্য তুলিয়া ধরার পর হরতালের প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত করার লক্ষ্যে এই হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি বলেন, তাহারা যে আলোচনা শুরু করিয়াছিল, উহার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াই আমরা আলোচনা চালাইতেছি। তিনি বলেন, বিএনপি প্রতিনিধি কেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেছেন না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

একটি সূত্র জানায়, বৈঠকের প্রথমদিকের এক ঘন্টায় থানচীর ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে হরতাল ও সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী আলোচনায় আসে।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, এ সকল ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হইলে এ সকল ঘটনা আর ঘটিবে না। ইহার জবাবে সমিতির পক্ষ হইতেও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাহাদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করা হয়। ইহার পর সীমিত পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষে ছিলেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার। জনসংহতি সমিতির পক্ষে ছিলেন সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম চাকমা (অশোক)। তাহারা মূলত: আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামো নিয়া আলোচনা করেন।

সূত্রটি জানায়, এবারের বৈঠকে চূড়ান্ত সমাধান হইবে না। তবে কাজ অনেকাংশে আগাইয়া থাকিবে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী প্রত্যাহার এবং জুমল্যাণ্ডের প্রশ্নে সরকার স্পষ্ট বক্তব্য দিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে উহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সংবিধানের বাহিরে কোন কিছুই করা হইবে না।



একজন বিশ্লেষক জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাপারে শান্তিবাহিনী এখন একটি সমাধান চাহিতেছে। তবে সরকার উহার তাস সঠিকভাবে খেলিলে অচিরেই সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং সকল কূলই রক্ষা পাইতে পারে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৩ই মে ১৯৯৭

সরকার-শান্তিবাহিনী বৈঠক

## পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কাঠামো লইয়া আলোচনা অব্যাহত

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনার দ্বিতীয় দিনে গতকালও (সোমবার) সরকার ও জনসংহতি সমিতি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ অবশ্য বলিয়াছেন যে, আলোচনার অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছে। তবে অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে, ভূমি অধিকার, বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ প্রশ্নে সীমিত পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহারা কোন সমঝোতায় পৌছিতে পারে নাই। চীফ হুইপ সাংবাদিকদের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, শীঘ্রই সমঝোতায় পৌছিবার ব্যাপারে তাহারা উভয়েই আশাবাদী। তিনি বলেন, আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রহিয়াছে এবং আজ (মঙ্গলবার) আবার তাহারা বৈঠকে বসিবেন। সাংবাদিকদের সহিত কথা বলার সময় জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত) পার্শ্বেই দন্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নের জবাব তাহারা কেহই দেন নাই। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টা হইতে দুপুর দুইটা এবং বিকাল পাঁচটা হইতে রাত আটটা পর্যন্ত বৈঠক চলে। সকল প্রতিনিধির সমন্বয়ে গতকালও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নাই গত রবিবারের ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতারাই বৈঠকে বসেন। জানা গিয়াছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার প্রশ্নে -জনসংহতি সমিতির পেশকৃত প্রস্তাব লইয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি দাবী করিয়াছে : (১) আঞ্চলিক পরিষদের এলাকাধীন পাহাড় ও সকল প্রকারের জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না; (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট পাহাড় ও কোন প্রকারের জমি দান, হস্তান্তর, বিক্রয় বা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, (৩) পরিষদের

এলাকাধীন কোন পাহাড়, বনাঞ্চল ও কোন প্রকারের জমি পরিষদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বা অধিগ্রহণ করা যাইবে না ; (৪) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বন্দোবস্ত করা দলিলপত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে; (৫) পরিষদের আওতাধীন পাহাড় ও সকল শ্রেণীর ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও যেকোন প্রকারের হস্তান্তর বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে; এবং (৬) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটি সূত্র জানায়, এ প্রশ্নে মতবিনিময় হয়। তবে তাহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে নাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙ্গালীদের অপসারণ দাবী করিয়া জনসংহতি প্রস্তাব করিয়াছে ঃ (১) ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইতে হইবে; (২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল নর-নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ এবং বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা। ইহাছাড়া, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিডিআর-এর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস প্রত্যাহার এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনানিবাস স্থাপন না করারও দাবী জানান হইয়াছে। সূত্রটি জানায়, এ প্রশ্নে সরকার পক্ষ স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাঙ্গালীদের বহিষ্কার এবং সেনানিবাস প্রত্যাহার সম্ভব নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামো নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষাপটে গত জানুয়ারী মাসে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে জাতীয় কমিটির নেতাদের কাছে যে সংশোধিত প্রস্তাবনা দেওয়া হইয়াছিল আলোচনায় তাহাই প্রাধান্য পাইতেছে। জাতীয় কমিটি অবশ্য গত ১২ মার্চের বৈঠকের প্রাক্কালে সমিতির পেশকৃত প্রস্তাবনার বিপরীতে যে পাল্টা প্রস্তাবনা দিয়াছিল তাহা লইয়াও উভয়পক্ষ যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি হাজির করিতেছে। বৈঠকের একটি সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত কাঠামো ও প্রশাসনিক বিন্যাস বিষয়ে জনসংহতি সমিতি এবারের বৈঠকে আরও একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করিয়াছে। গত ২ দিনের বৈঠকে এই প্রস্তাবনা লইয়া



আলোচনায় আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসকের ভূমিকা কি হইবে তাহা নির্ধারণ প্রশ্নে অধিক গুরুত্ব দিয়া আলোচনা করা হয়। সমিতির পেশকৃত প্রস্তাবনায় জেলা প্রশাসক বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধির সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। সমিতি উহার প্রস্তাবিত জেলা পরিষদ কাঠামোতে বাংগালী প্রতিনিধিত্বের হার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা রাখার ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত না দিয়া বলিয়াছে, জেলা পরিষদের আসনসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে। ৫ বছর মেয়াদী ঐ পরিষদের সদস্যগণ একক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের সভা আহবান ও পরিচালনা করিবেন।

**টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান**

এদিকে, পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা হইতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের জন্য সরকার ঘোষিত প্যাকেজ সুবিধা বাস্তবায়নে সহায়তা ও পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইয়াছে। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন বলিয়া এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হইয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৫ই মে ১৯৯৭

**শান্তিবাহিনীর সহিত সমঝোতা ॥**
**শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন**

**হাসান শাহরিয়ার ॥** অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘ ১২ বছর আলোচনার পর অবশেষে সরকার ও জনসংহতি সমিতি একটি সমঝোতায় উপনীত হইয়াছে। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষ একটি চুক্তি সম্পাদন করিবে। চুক্তি সম্পাদিত হইলে দুই যুগেরও বেশি সময়ের সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী গতকাল (বুধবার) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে। "আমরা সকল বিষয়ে একমত হইয়াছি", সাংবাদিকদের নিকট এই মন্তব্য করিয়া জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ গতরাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বলেন, "আমরা অতিশীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন করিতে

যাইতেছি।” কি কি বিষয়ে তাঁহারা ঐকমত্যে পৌছিয়াছেন উহার কোন বিশদ বিবরণ তিনি দেন নাই। তবে জানা গিয়াছে যে, আজ (বৃহস্পতিবার) বিদায়ের পূর্বে শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

গত রবিবার চতুর্থ বৈঠক শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় কমিটির সদস্যবর্গ এবং শান্তিবাহিনীর নেতারা একত্রে বৈঠকে বসেন। পরে দুই পক্ষের তিনজন করিয়া সীমিত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষ হইতে যোগ দেন আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার। অপরদিকে, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) শান্তিবাহিনী দলের নেতৃত্ব দেন। তাহাকে সহায়তা করেন সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাঙ্গালীদের বহিষ্কার, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং আঞ্চলিক পরিষদ গঠন লইয়া তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা চলে। জানা গিয়াছে যে, আগামী ৩০শে জুন অস্ত্র বিরতির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাহারা আবার বৈঠকে বসিতে পারেন। গতকাল আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের সহিত কথা বলিলেও শান্তিবাহিনী নেতা সন্তু লারমার আলাদা কোন মন্তব্য পাওয়া যায় নাই।

শান্তিবাহিনীর দাবীর মধ্যে রহিয়াছে : সংবিধান সংশোধন করিয়া রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট গঠন, একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন এবং আঞ্চলিক পরিষদকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান, ‘বহিরাগতদের’ বহিষ্কার, জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের পুনর্বাসন, ভূমির অধিকার সংরক্ষণ এবং আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের নিঃশর্তে মুক্তিদান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার প্রশ্নে জনসংহতি সমিতির পেশকৃত প্রস্তাব হইতেছে : (১) আঞ্চলিক পরিষদের এলাকাধীন পাহাড় ও সকল প্রকারের জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না ; (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট পাহাড় ও কোন প্রকারের জমি দান, হস্তান্তর, বিক্রয় বা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না; (৩) পরিষদের এলাকাধীন কোন পাহাড়, বনাঞ্চল ও কোন প্রকারের জমি পরিষদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বা অধিগ্রহণ করা যাইবে না ; (৪) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বন্দোবস্ত করা দলিলপত্র রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে; (৫) পরিষদের আওতাধীন পাহাড় ও সকল শ্রেণীর ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তির নিকট



বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও যেকোন প্রকারের হস্তান্তর বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং (৬) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙ্গালীদের অপসারণ দাবী করিয়া জনসংহতি প্রস্তাব করিয়াছে : (১) ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লইতে হইবে; (২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল নর-নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ এবং বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা। ইহাছাড়া, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিডিআর-এর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস প্রত্যাহার এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনানিবাস স্থাপন না করারও দাবী জানান হইয়াছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে শান্তিবাহিনীর সহিত প্রথম সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। অবশ্য তখন বৈঠক সীমাবদ্ধ ছিল সামরিক কর্মকর্তাদের সহিত। এরশাদ সরকারের সহিত সর্বমোট ছয়টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। বিএনপি সরকার মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক কমিটি গঠন করে তাহা শান্তিবাহিনীর সহিত মোট ১৪টি বৈঠকে মিলিত হয়, কিন্তু তাহারাও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে নাই। বর্তমান সরকার এই আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটি শান্তিবাহিনীর সহিত চারবার বৈঠকে বসিয়াছে। চতুর্থ বৈঠকে তাহারা সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৬ই মে ১৯৯৭

**অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে**
**শান্তির সুবর্ণরেখা**

**হাসান শাহরিয়ার, তরুণ ভট্টাচার্য** ॥ দীর্ঘ দুই দশক পর সরকার ও বিক্ষুব্ধ শান্তিবাহিনীর নেতারা অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিধ্বস্ত জনপদের জন্য একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। এক যুগ আগে সেনা

কর্মকর্তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রথমবার যে সংলাপের সূচনা করিয়াছিলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গত বুধবার উহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন রাজধানী ঢাকায়। তাহারা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, সশস্ত্র শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত হইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আগামী ৩০শে জুন অস্ত্র বিরতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। শেখ হাসিনার সরকারের জন্য ইহা এক বিরাট সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শান্তিবাহিনী নেতারা গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে একটি সরকারী হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া চলিয়া গিয়াছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) এখন এ ব্যাপারে তাহার দলের সকলের সহিত কথা বলিবেন। তিনি সরকারকে অনেক ছাড় দিয়া মূল দাবী আদায় করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন-বলিয়া ইতিমধ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে। একই ধরনের অভিযোগ তাঁহার দলের মধ্য হইতেও আনা হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ছয়টি সংগঠন-পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৭২), পাহাড়ী ছাত্র সমিতি (১৯৬৫-৭৪), ট্রাইবাল পিপলস পার্টি (১৯৭৭), ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (১৯৮৩), বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (১৯৮৯) ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম গণপরিষদ (১৯৮৯) এ যাবৎ তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। ১৯৮২ সালে জনসংহতি সমিতি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে একদল লারমা গ্রুপ ও অন্য দল প্রীতি গ্রুপে। ১৯৮৫ সালে প্রীতি গ্রুপ বিলুপ্ত হয়। লারমা গ্রুপের সভাপতি সন্তু লারমা এবং সাধারণ সম্পাদক গৌতম চাকমা। অন্য সংগঠনগুলির মধ্যে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম গণপরিষদ এখনও টিকিয়া আছে।

সংবিধান সংশোধন করিয়া জাতিসত্তার ভিত্তিতে উপজাতীয়দের স্বীকৃতি দানের দাবী সরকার না মানিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে সরকার সম্মত হইয়াছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার ব্যাপারেও তাঁহারা ঐকমত্যে পৌঁছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম ‘জুমল্যাণ্ড’ করার দাবী নাকচ করিয়া দিয়া সরকার বলিয়াছে, ইহার পিছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ও যুক্তি নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপনের দাবীও অগ্রাহ্য হইয়াছে। অবশ্য ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্নে তাহাদের মধ্যে সমঝোতা হইয়াছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাঙালী বিতারণের দাবীটি সরকার মানিয়া নেয় নাই। তাহাদের দাবী ছিল: ১৯৪৭ সালের পর যাহারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে



বহিষ্কার করিতে হইবে। সরকার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। যেখানে পাহাড়ী-বাঙালী একত্রে বসবাস করিবে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর কোন বাঙালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিতে লইয়া যাওয়া হইবে না বলিয়া সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে। সেনাবাহিনী গুটাইয়া নেওয়ার দাবীটিও সরকার মানে নাই। সেনানিবাসগুলি যেখানে আছে সেখানেই থাকিবে, তবে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলি তুলিয়া নেওয়া হইবে।

এই সুদীর্ঘ ১২ বছরে ক্ষমতার হাত বদল হইয়াছে তিনবার এবং শান্তি বাহিনীর বেপরোয়া ও অতর্কিত আক্রমণে বেশ কিছু প্রাণহানি যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লুটপাট ও ছিনতাই-এ অনেকেই সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে প্রাণের ভয়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া সীমান্তের ওপারে ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে হইয়াছে হাজার হাজার চাকমা উপজাতীয় শরণার্থীকে। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও তাহার সহকর্মীদের নিরলস চেষ্টায় শান্তিবাহিনীর সহিত সমঝোতায় আসা সম্ভব হইয়াছে। অপরদিকে, সন্তু লারমা ও তাহার সঙ্গীরাও বাস্তবকে অস্বীকার না করায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে সহজ হইয়াছে।

প্রথম সরাসরি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এরশাদ আমলে ১৯৮৫ সালের ২০শে অক্টোবর সীমান্তবর্তী পুজগাং-এ। দুই বছর পর দ্বিতীয় সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয় একই স্থানে ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। পুজগাং-এ আরও দুইটি বৈঠকের পর ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুন শান্তি বাহিনীর নেতারা আলোচনায় বসেন খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। ঐ বছরের ১৪-১৫ ডিসেম্বরের বৈঠকের পর এরশাদ সরকারের আমলে আর কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই সময়ে অত্যাচারের ভয়ে হাজার হাজার চাকমা উপজাতীয় সদস্যগণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। তাহার মন্ত্রী অলি আহমদ এমপি’র নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত রাজনৈতিক কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর। এই কমিটি ১৯৯৪ সালের ৫ই মে শান্তি বাহিনী নেতাদের সাথে মোট সাতবার বৈঠকে বসে। অবশ্য বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন সাব-কমিটিও সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ায় সাতদফা আলোচনা চালায় ইহার সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ২৫শে অক্টোবর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় কমিটির সহিত শান্তি বাহিনী নেতাদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে গত বছরের ২১শে ডিসেম্বর।

শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফা অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে ১৯৯২ সালের ১লা আগষ্ট। এপর্যন্ত দফায় দফায় ৩৩ বার ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্তমান অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হইবে আগামী ৩০শে জুন। অবশ্য অস্ত্র বিরতির চুক্তি যে সবসময় ফলদায়ক হইয়াছে তাহা নয়।

এই চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও শুরু হইতে পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহা লংঘনের অসংখ্য অভিযোগ আনা হইয়াছে। এ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যাহা ঘটিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হইল:

১৯৭২ : চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে ২৯শে জানুয়ারী উপজাতীয়দের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চার দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পার্বত্য জনসংহতি নামের পরিবর্তন করিয়া মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পুনর্গঠিত হয়,

১৯৭৩ : ৭ই জানুয়ারী সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গঠন করা হয়,

১৯৭৩-৭৪ : শান্তিবাহিনী সীমান্তের ওপারে এবং গহীন জংগলে গোপন ঘাঁটি গড়িয়া তোলে এবং সদস্য রিক্রুটিং চলে,

১৯৭৬ : শান্তিবাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু: থানা আক্রমণ, অস্ত্র লুণ্ঠন, ব্রীজ, কালভার্ট ও সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, বিত্তশালী ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাদের অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায়;

১৯৭৬-৮০: শান্তিবাহিনী ও সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে খণ্ড ও গেরিলা লড়াই, উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি এবং শান্তিবাহিনীর অনেক সদস্য গ্রেফতার;

১৯৭৬ : ২০শে সেপ্টেম্বর জিয়া সরকারের সামরিক অভিযানের পাশাপাশি উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন;

১৯৭৯ : এক লক্ষাধিক বাঙালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের পর সমস্যা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। উপজাতীয়রা তাহাদের ঐতিহ্য, সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং ভূমির অধিকার সংরক্ষণে সন্দিহান হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসে চিড় ধরে;

১৯৭৯-৮১ : বাঙালীদের পুনর্বাসন অব্যাহত থাকে;

১৯৮০-৮১ : পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বিভিন্ন স্থানে জাতিগত দাঙ্গা দেখা দেয় এবং হামলা ও পাল্টা হামলায় অসংখ্য উপজাতীয় ও বাঙালী প্রাণ হারায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

১৯৮১ : জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় দুই সহস্রাধিক ভীত-সন্ত্রস্ত উপজাতীয় পরিবার পালাইয়া গিয়া ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর মাসে সরকারী উদ্যোগে তাহাদের ফেরত আনা হয়;



১৯৮৪ : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে জুন মাসে রাঙামাটির ভূষণছড়া ও হরিণ হইতে ১০ সহস্রাধিক উপজাতীয় ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নেয়। দুই সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। তবে এই সময়ে উত্তেজনা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিলে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি হইতে আরও ৪/৫ হাজার উপজাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরায় গিয়া আশ্রয় নেয়। তখন প্রত্যাবাসনের প্রশ্ন উঠিলে প্রথমবারের মত শরণার্থীরা শর্ত আরোপ করে। তাহাদের দাবী ছিল : পুনর্বাসিত বাঙালীদের দখল হইতে উপজাতীয়দের ঘর-বাড়ী স্ব স্ব মালিকদের ফেরত এবং সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করিতে হইবে। সরকার এ সব দাবী পূরণ না করায় তাহারা দেশে ফিরিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারত সরকার সেনা ও পুলিশের সহায়তায় জোরপূর্বক তাহাদের সীমান্তের এপারে ঠেলিয়া দেয়;

১৯৮৫ : শান্তিবাহিনীর সহিত সেনাবাহিনীর শান্তি আলোচনা শুরু ২০ অক্টোবর;

১৯৮৬ : এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখ রাতে শান্তিবাহিনী খাগড়ছড়ির মাটিরাঙা ও পানছড়ি থানার একাধিক গ্রামে সশস্ত্র হামলা চালাইয়া শতাধিক বাঙ্গালীকে হতাহত করে এবং বাড়ী-ঘরে আগুন ধরাইয়া দিলে পুরো পার্বত্য এলাকায় বিভীষিকা সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পরপরই জেলার বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাহাদের পাল্টা হামলায় খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা ও মাটিরাঙায় বেশ কিছু উপজাতীয় প্রাণ হারায় এবং তাহাদের সহায়-সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন নিরাপত্তাহীনতায় হাজার হাজার উপজাতীয় রাতের অন্ধকারে ত্রিপুরায় গিয়া আশ্রয় নেয়। ভারত জানায়, ৪৯ হাজার শরণার্থী ত্রিপুরায় গিয়াছে। অপরদিকে বাংলাদেশের দাবী ছিল, মাত্র ২৯ হাজার ৯৯২ জন উপজাতীয় ভারতে আশ্রয় নিয়াছে।

১৯৮৭ : তাহাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া প্রত্যাবাসনের দিন ধার্য হয়। কিন্তু ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাতে শান্তিবাহিনী অতর্কিতে নিরাপত্তা বাহিনী ও বিডিআরের উপর হামলা চালায়। ইহার পর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আলাপ-আলোচনার পর ৫ই জুন প্রত্যাবাসনের দিন পুনরায় নির্ধারিত হয়; কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে গোলযোগ চলিতেছে এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ– করিতেছে এই অজুহাত দেখাইয়া শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে;

১৯৮৮ : ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ফারুক আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরায় গমন করিয়া চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। কিন্তু শরণার্থীরা তাহাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে;

**১৯৮৯ :** চার বৎসর যাবৎ (১৯৮৫-৮৮) শান্তি সংলাপে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় সরকার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয় এবং ২৫শে জুন তিনটি পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। কিন্তু এই নির্বাচনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র তৎপরতা চালাইলে সর্বত্র অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ফলে সরকার ব্যাপকভাবে সেনা মোতায়েন করে, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাইতে ব্যর্থ হয়। ঐ সময় আরও কয়েক হাজার উপজাতীয় ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

**১৯৯২ :** মে মাসে দিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও নরসীমা রাও-এর সহিত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পার্বত্য এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন। জুলাই মাসে যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক রাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দাবী পূরণ না হওয়ায় শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে নাই।

**১৯৯৩ :** অলি আহমদের নেতৃত্বে ২রা মে হইতে ৯ই মে পর্যন্ত রাজনৈতিক কমিটি ত্রিপুরা সফর করে। শরণার্থীদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ৮ই জুন প্রত্যাবাসনের দিন ধার্য হয়। কিন্তু তাহাদের ১৩ দফা দাবী বাংলাদেশ সরকার মানে নাই এই অজুহাতে প্রবল আপত্তির মুখে প্রত্যাবাসন স্থগিত হয়। সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখ উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ি জেলার পাঁচটি থানা পরিদর্শন করে।

**১৯৯৪ :** উপেন্দ্রলাল চাকমা ঘোষণা করেন যে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যাবাসন শুরু হইবে এবং প্রথমাবস্থায় ৪০৫ পরিবার দেশে ফিরিবে। ১৫-২২ ফেব্রুয়ারী ৪০৫ পরিবারের ১৯২৭ জন দেশে ফিরিয়া আসে। পাঁচ মাস পর আবার দ্বিতীয় দফায় ৬৪৮ পরিবারের তিন হাজার ৩২৭ জন ফিরিয়া আসে। দাবী অনুযায়ী সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে নাই, এই অজুহাতে আবার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

**১৯৯৬ :** আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে। ২১ ডিসেম্বর শান্তিবাহিনীর সাথে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়িতে।

**১৯৯৭ :** শান্তিবাহিনীর সহিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৈঠক ঢাকার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদল দুইবার ত্রিপুরা সফর করে এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্যে ২০-দফা প্যাকেজ প্রস্তাব দেয়। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রস্তাব মানিয়া নিলে ২৮ মার্চ হইতে প্রথমাবস্থায় ছয় হাজার সাত শত শরণার্থীর প্রত্যাবাসন শুরু হয়।



**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১৪ই জুলাই ১৯৯৭**

## আজ ঢাকায় শান্তিবাহিনীর সহিত সরকারের পঞ্চম বৈঠক

**হাসান শাহরিয়ার ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করার লক্ষ্যে সরকারের নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ শান্তিবাহিনী নেতাদের সহিত দীর্ঘ দুই মাস পর একটি চুক্তি সম্পাদনের আশা লইয়া পঞ্চমবারের মত আজ (সোমবার) ঢাকায় আবারও এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইতেছেন। বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এমপি। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন জাতীয় কমিটির সদস্যগণ। অপরদিকে, শান্তিবাহিনী দলের নেতৃত্ব দিবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। আজ সকালে জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী একটি সরকারী হেলিকপ্টারে করিয়া শান্তিবাহিনীর নেতাদের খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া হইতে ঢাকা লইয়া আসিবেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পরই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠক শুরু হইবে। আমাদের খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা তরুণ ভট্টাচার্য জানান, শান্তিবাহিনীর নেতারা গত তিনদিন যাবৎ দুদুকছড়ায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্বেই পাঁচটি নিরাপত্তা চৌকি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার এবং আটটি চৌকি নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছে। বৈঠকে সন্তু লারমাকে সহায়তা করিবেন গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রূপায়ণ দেওয়ান ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটির চারজন সদস্যও তাহাদের সঙ্গে আসিবেন।

বিগত চারটি বৈঠকের অগ্রগতির আলোকে সরকার পক্ষ এবারে একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা চালাইবেন বলিয়া মনে হইতেছে। তবে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হইলে জনসংহতি সমিতি চুক্তি স্বাক্ষরে রাজী হইবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে। এবারের বৈঠকে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহে অচলাবস্থা, সেনা প্রত্যাহার, বাঙালী বিতাড়ণ এবং ভূমির অধিকার ও সংরক্ষণ প্রশ্নে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, শান্তিবাহিনীর সংশোধিত পাঁচ দফার প্রথম ও দ্বিতীয় দফা আলোচনায় প্রাধান্য পাইবে।

শান্তিবাহিনীর দাবীর মধ্যে রহিয়াছে : সংবিধান সংশোধন করিয়া রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট গঠন, একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান, 'বহিরাগতদের' বহিষ্কার, জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের পুনর্বাসন এবং আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের নিঃশর্তে মুক্তিদান। বাঙালীদের অন্যত্র সরাইয়া নেওয়ার প্রশ্নে পূর্বের বৈঠকগুলিতেও শান্তিবাহিনী নেতারা যুক্তি খাড়া করেন; কিন্তু সরকার কোন অবস্থাতেই তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাঙালীদের উৎখাতের বিষয়টি বাতিল করিয়া দিয়াছেন। শান্তিবাহিনী অনবরত চাপ প্রয়োগ করিলেও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্নেও সরকার রাজী হয় নাই। বর্তমান মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করিলে পুনর্বাসিত বাঙালীদের বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া কর্মকর্তারা মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর পরিধি সংকোচনের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। সরকারের পক্ষে সংবিধান সংশোধন সম্ভব নয় বিধায় মূল দাবী হইতে সরিয়া গিয়া আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি যে নয়া প্রস্তাব দিয়াছে সে ব্যাপারে এবারের বৈঠকেও আলোচনা হইবে।

## দৈনিক ইত্তেফাক
## ১৫ই জুলাই ১৯৯৭
## শান্তিবাহিনীর সহিত সরকারের বৈঠক শুরু

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল (সোমবার) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। ইহা ছিল এই সরকারের সহিত জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর ৫ম বৈঠক। গতকাল রাতে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক মতিউর রহমান সাংবাদিকদের জানান, বৈঠক পাঁচ ঘন্টা চলে। উভয়পক্ষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় আজ (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় তাহারা আবার বৈঠকে বসিবেন।

বৈঠকে সরকারী দলের নেতৃত্বে দিতেছেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। তাহাকে সহায়তা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ,বি,এম, মহিউদ্দিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও জাতীয় পার্টির ফজলে রাব্বি এমপি প্রমুখ।



অপরদিকে, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। তাহাকে সহায়তা করেন গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রূপায়ণ দেওয়ান ও রাক্তোৎপল ত্রিপুরা। গতকালের প্রথম বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সদস্য ক্যশোয়ে অং মগ ও বিশ্বজিৎ চাকমাও উপস্থিত ছিলেন। সরকারী দলের পক্ষ হইতে কর্মকর্তাগণ প্রাথমিক পর্যায়ের বৈঠকে যোগদেন।

জানা গিয়াছে, প্রথম পর্যায়ের বৈঠকে শরণার্থী প্রত্যাবসন প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির সহযোগিতা কামনা করে। তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের বিরোধিতার প্রশ্নটিও বৈঠকে আলোচিত হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সীমিত সংখ্যক সদস্যের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন আতাউর রহমান খান কায়সার ও কল্পরঞ্জন চাকমা। অপরদিকে সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা ও রূপায়ন দেওয়ান শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

জানা গিয়াছে যে, তাহাদের আলোচনায় আঞ্চলিক পরিষদ ও ভূমি সমস্যা প্রাধান্য পায়। ইতিপূর্বে সরকার আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হইলেও ইহার কাঠামো এবং চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাদের ক্ষমতার বিষয়টি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। শান্তিবাহিনীর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন একজন উপজাতীয়। সরকার পক্ষ অবশ্য ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করিয়া তাহা অ-উপজাতীয়ের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ উহাতে রাজী হন নাই। এখন উভয়পক্ষকে নির্ধারণ করিতে হইবে আঞ্চলিক পরিষদে ক্ষমতা কাহার নিকট থাকিবে–চেয়ারম্যান না প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন, যেহেতু চেয়ারম্যান একজন নির্বাচিত ব্যক্তি হইবেন, সেহেতু ক্ষমতা তাহার উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। অপরদিকে সরকারের প্রতিনিধি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকেও কিছু ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতি সরকার পক্ষ। গতকাল এ প্রশ্নে কিছুটা আলোচনা হইয়াছে। তবে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। ভূমি সংক্রান্ত জটিল সমস্যাটিও গতকালের বৈঠকে আলোচিত হয়। তবে তাহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

স্থানীয় সরকার পরিষদের বর্তমান অচলাবস্থাও গতকালের আলোচনায় স্থান পায়।

## দৈনিক ইত্তেফাক
## ১৬ই জুলাই ১৯৯৭
## 'শান্তিবাহিনীর' সহিত
## বৈঠকে অগ্রগতি

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৫ম বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (মঙ্গলবার) কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছে। জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ গতরাতে রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের বলেন, তাহাদের মধ্যে "খসড়া চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলিতেছে।" ঐ সময় শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চীফ হুইপের বক্তব্যে তিনি কোন মন্তব্য না করিয়া মৃদু হাসেন।

বৈঠকে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে অথবা আজ (বুধবার) আবার আলোচনা চলিবে কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছুই জানান হয় নাই। তবে বিভিন্ন সূত্রের সহিত আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে, আজ সকালে তাহারা আরেক দফা বৈঠকে বসিবেন।

গতকালের বৈঠকও সীমিত পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে সহায়তা করেন কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার। হরতালের কারণে গত সোমবার তাহারা পদ্মায় রাত্রি যাপন করে। অপরদিকে আলোচনায় সন্তু লারমার সঙ্গে ছিলেন রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা । গতকাল সকাল ও সন্ধ্যায় দুই দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গিয়াছে যে, গতকালের বৈঠকে শান্তিবাহিনীর সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীর আলোকে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। যে বিষয়গুলি গতকাল আলোচিত হইয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে প্রস্তাবিত জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ, ভূমির অধিকার ভূমি রক্ষনাক্ষেণ, সংরক্ষণ ও ক্রয় বিক্রয়, আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদে কর্মকর্তা নিয়োগ এবং কর্মকর্তাদের গোপনীয় বার্ষিক প্রতিবেদন। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ সকল ক্ষমতা জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যস্ত করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অপরদিকে, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী পক্ষ ভিন্ন মত পোষণ করে। একটি সূত্র জানায়, পূর্ববর্তী বৈঠকগুলির তুলনায় শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ এবারে দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে অনেকটা অনঢ় মনোভাব পোষণ করিতেছেন। অবশ্য সরকার পক্ষ বাস্তবতার আলোকে পুরা বিষয়টি বিবেচনার জন্য তাহাদের প্রতি আহ্বান জানায়।



সূত্রটি জানায় শরণার্থী সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি চুক্তি সম্পাদনে একটি বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ধারণা করা হইতেছে যে, এই বৈঠকের পর শরণার্থীদের ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে সরকার কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

এদিকে, সন্তু লারমা একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তিনি একটু অসুস্থ। তবে তাহার নিজস্ব ডাক্তার সঙ্গে রহিয়াছে।

## দৈনিক ইত্তেফাক
## ১৭ই জুলাই ১৯৯৭
## সরকার ও 'শান্তিবাহিনীর' মধ্যে
## আলোচনার কয়েকটি
## বিষয়ে মতবিরোধ

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক শান্তি আলোচনা তৃতীয়দিনের মত গতকালও (বুধবার) অব্যাহত থাকে। আগের দিনের মত গতকালও সীমিত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সরকারী দলের নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। তাহাকে সহায়তা করেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। আলোচনায় তাহাকে সহায়তা করেন রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের সম্মুখে সাংবাদিকগণ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিলেও গতকাল তাহাদিগকে বৈঠকের কোন খবর জানান হয় নাই। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ব্যাপারে কোন প্রকারের প্রেসব্রিফিং না হওয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রহিয়াছে ।

অন্যান্য সূত্রের সহিত আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে, গতকাল দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গতকালও শান্তিবাহিনীর সংশোধিত পাঁচ দফা লইয়া আলোচনা চলে। দফাভিত্তিক এই আলোচনা চলাকালে উভয়পক্ষ কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন। খসড়া চুক্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দফাভিত্তিক আলোচনায় যে সকল বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সমঝোতা হইয়াছে, সেগুলি আপাততঃ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকার, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের প্রশ্নে তাহারা এখনও ঐকমত্যে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়া বিভিন্ন সূত্র হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে। শান্তিবাহিনীর দাবী হইতেছে : (১) প্রস্তাবিত জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন

কোন জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ছাড়া কাহাকেও দেওয়া যাইবে না, (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণ এমন কোন ব্যক্তি জমি বা পাহাড়ের মালিকানা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা বাতিল করা ও (৩) বনায়ন ও রাবার চাষের উদ্দেশ্যে যে সকল জমি লীজ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাতিল করা। সেই সঙ্গে ভূমি হস্তান্তরে তাহারা বাধানিষেধ দাবী করিয়াছে। সূত্রটি জানায়, এ প্রশ্নে সরকারের সহিত শান্তিবাহিনী নেতাদের মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। শান্তিবাহিনী ভূমির অধিকারের প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেছে এবং এ প্রশ্নে যথেষ্ট দরকষাকষি হইবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

শান্তি প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত একটি সূত্র জানায়, আলোচনায় অগ্রগতি হইতেছে। তবে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনে আরও সময় লাগিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৮ই জুলাই ১৯৯৭

সরকার ও শান্তিবাহিনীর বৈঠক

**চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের সহিত জনসংহতি সমিতির ৫ম বৈঠক চতুর্থ দিনের মত গতকালও (বৃহস্পতিবার) অব্যাহত থাকে। বৈঠকে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া ইতিপূর্বে বলা হইলেও বাহ্যতঃ বেশ কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্নে উভয় পক্ষ মতৈক্যে পৌঁছিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে গত দুইদিন যাবৎ আলোচনাকারিগণ সাংবাদিকদের এড়াইয়া চলার ফলে বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়াছে। সাংবাদিকগণ গতকালও রাত নয়টা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের ফটকে অপেক্ষা করেন। কিন্তু কোন প্রকারের ব্রিফিং হয় নাই।

জানা গিয়াছে যে, শান্তিবাহিনীর সংশোধিত পাঁচ দফা লইয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত হইলেও চুক্তি স্বাক্ষরের বেলায় চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করিয়াছেন যে, সরকার উহার ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে নাই। ফলে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অনেকেই তাহাদের জমি-জমা ও ভিটা ফেরত পায় নাই। এ প্রশ্নে উভয় পক্ষ একটি সমঝোতায় উপনীত হইবার চেষ্টা চালাইতেছে। গত মার্চ-এপ্রিল মাসে সাত হাজার শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ছয়টি ক্যাম্পে এখনও ৪৩ হাজারেরও



বেশী শরণার্থী প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করিয়া পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার কথা ৫৭ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছে। এই রিপোর্টটি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের নিকট পাঠান হইয়াছে। ছয়শতেরও বেশী পরিবার জমি-জমা ও বসতভিটা সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগিতেছে বলিয়া ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হয়, ১৫৭টি পরিবার হালের বলদ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ পায় নাই। ১৫ জনের চাকুরী ফেরত দেওয়া হয় নাই এবং পাঁচজন শরণার্থীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা এখনও প্রত্যাহার হয় নাই।

রিপোর্টে মোট ১৯টি অভিযোগ আনিয়া তাহা নিরসনের জন্য সরকারের কাছে পাঁচ দফা সুপারিশ নামা পেশ করা হয়। সুপারিশের মধ্যে রহিয়াছে : জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির তত্ত্বাবধানে শরণার্থী প্রত্যাবাসন করিতে হইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাগত শরণার্থীদের তৃতীয় পর্যায়ে শরণার্থীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং শরণার্থীদের সুষ্ঠু প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সহিত অর্থপূর্ণ আলোচনা করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

সরকারী পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলিয়াছে, এই দাবীগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যে পূরণ করা হইয়াছে। তবে অনেকের বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে ১১০টি পরিবার এখনও হালের বলদ ক্রয়ের জন্য অর্থ পায় নাই। জমি ও বসতভিটা সংক্রান্ত সমস্যার জবাবে কর্তৃপক্ষ বলিয়াছে, বর্তমানে এ সংক্রান্ত ৯৩টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রহিয়াছে। গতকালও সীমিত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী দলে ছিলেন চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার। অপরদিকে শান্তিবাহিনীর পক্ষে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, গৌতম চাকমা ও রূপায়ণ দেওয়ান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানান, আজ (শুক্রবার) শান্তিবাহিনীর নেতারা দুদুকছড়া ফিরিয়া যাইবেন।

## দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে জুলাই ১৯৯৭
শান্তি আলোচনা সমাপ্ত

**হাসনাতের মতে চুক্তি প্রণয়ন প্রক্রিয়া 'সন্তোষজনক' ॥ সন্তু লারমার কিছু বলার নাই**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিয়া সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত ছয় দিনব্যাপী শান্তি আলোচনা গতকাল (শনিবার) সমাপ্ত হইয়াছে। জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে "সন্তোষজনক" বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করিতে বিরত থাকেন। সন্তু লারমা এবং তাহার সঙ্গীরা গতকাল সকালে একটি সরকারী হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী পানছড়ি থানার দুদুকছড়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দীর্ঘস্থায়ী এই আলোচনার বিস্তারিত কোন তথ্য না দিয়া সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া সন্তোষজনক। এই বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারায় তাহারা আবার আলোচনায় বসিতে সম্মত হইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে সবকিছু ঠিক থাকিলে আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলেও এ মুহূর্তে তাহারা দিন তারিখ নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। এ প্রসঙ্গে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, পরবর্তী বৈঠকের তারিখ যোগাযোগের মাধ্যমে ঠিক করা হইবে। পূর্বাহ্নে বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের এড়াইয়া চলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, আমি জানি আপনারা আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট। ইহা ২১ বছরের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব ব্যাপারে সব সময় বলা যায় না। তবে যেহেতু আমাদের সরকার জবাবদিহিমূলক, সেহেতু অবশ্যই জনগণ এবং আপনাদের সময়মত সবকিছু জানান হবে। প্রেস ব্রিফিং-এ সন্তু লারমাও উপস্থিত ছিলেন। এবারের বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তাহার কোন বক্তব্য আছে কিনা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন,"আপাতত: আমার কিছু বলার নাই।" এ সময় তাহাকে অতন্ত্য মলিন দেখাইতেছিল। একজন সাংবাদিক জানিতে চাহেন এই আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট কিনা। এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া এবং আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর জন্য অপেক্ষা



না করিয়াই সাংবাদিকদের ঠেলিয়া তিনি অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠিয়া বসেন। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ীটি তাহাকে লইয়া বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করে। অবশ্য এই বৈঠকের পর জাতীয় কমিটি শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদী হইয়া উঠিয়াছে। ''এখন এক ঝলক আলোর ছটা দেখিতে পাইতেছি,'' এই মন্তব্য করিয়া কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, ''এক কথায় ধরিয়া নিতে পারেন, ষোলকলা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।''

গত ১৪ই জুলাই এই সরকারের সহিত শান্তিবাহিনীর ৫ম বৈঠক রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয়। প্রথমদিনের সূচনা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং শান্তিবাহিনী প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য বিএনপি দলীয় দুই সদস্য এবারেও বৈঠক বয়কট করেন। তবে পরবর্তী বৈঠকগুলি সীমিত পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে সহায়তা করেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। অপরদিকে শান্তিবাহিনী দলে ছিলেন সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা ও রূপায়ন দেওয়ান।

বিভিন্ন সূত্রের সহিত আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে, এবারের বৈঠকে শান্তিবাহিনীর সংশোধিত পাঁচ দফা লইয়া আলোচনা হয় এবং অধিকাংশ বিষয়ে উভয়পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছে। ইহার প্রেক্ষাপটে ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত অবশিষ্ট শরণার্থীর প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও বৈঠকে প্রাধান্য পায়। সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইনের আলোকে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামো এবং ক্ষমতা নির্ধারণের প্রশ্নে এবারের বৈঠকে বিশদ আলোচনা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা, জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত মোট ৩৬টি বিভাগের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অধিকার প্রসঙ্গে বৈঠকে চুলচেরা বিশ্লেষণের পর চুক্তির খসড়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে এই ৩৬টি বিভাগের মধ্যে ভূমি ও বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ধার্যকরণ প্রশ্নে উভয় পক্ষ এখনও ঐকমত্যে পৌঁছাইতে পারে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্পর্শকাতর ভূমি সমস্যার আশু সমাধানের লক্ষ্যে বিগত বৈঠকে একজন বিচারপতির নের্তৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করা হইলেও উহার ক্ষমতা ও পরিধি নির্ধারণের বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত করা হয় নাই। এই কমিশনের অন্য চারজন সদস্য হইলেন : চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলের তিনজন রাজা। মূলত: ত্রিপুরা হইতে চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের পর তাহাদের বেদখলকৃত জমি-জমা

পুনরুদ্ধার ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এই কমিশন গঠন করা হয়, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জটিল ভূমি সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য শান্তিবাহিনী এখন এই কমিশনের নিকট অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী।

স্থানীয় সরকার পরিষদের সাম্প্রতিক অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থায় সাংবিধানিক সংশোধনের বিষয়টি আলোচনাকালে শান্তিবাহিনী নেতারা তাহাদের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী ও নিয়ন্ত্রণ এই দুই পরিষদের উপর ন্যস্ত করার দাবীও তাহারা পুনরায় উত্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকসহ জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি লইয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২০শে জুলাই ১৯৯৭

**গভীর অরণ্যে**
**উধাও হইলেন**
**সন্তু লারমা**

**ইউএনবি ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা ঢাকায় ৬ দিন শান্তি আলোচনা শেষে দুদুকছড়িতে ফিরিয়া রবিন হুড সামরিক বিমানে করিয়া দুদুকছড়ি নেওয়া হয়।

সন্তু লারমা গভীর অরণ্যে হারাইয়া যাওয়ার পূর্বে বলেন, সরকারের সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকিবে। এ ব্যাপারে দুংশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। তিনি উপস্থিত উপজাতীয়দের বিভ্রান্ত না হওয়া এবং ধৈর্যধারণের জন্য বলেন। তিনি সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক।

সন্তু লারমাকে স্বাগত জানানোর জন্য দুদুকছড়ি হেলিপ্যাডে পার্বত্য চট্টগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির মথুরালাল চাকমা এবং মোহাম্মদ শরীফ উপস্থিত ছিলেন। তেজগাঁও বিমান বন্দর হইতে তাহার সহিত হেলিকপ্টারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলও সঙ্গী হন।

লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য বিশ্বজিত চাকমা জানান, আলোচনায় সামান্য অগ্রগতি হইয়াছে।



**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

**'শান্তিবাহিনী'র সহিত**
**আলোচনা শুরু**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সরকার ও শান্তিবাহিনীর নেতারা গতকাল (রবিবার) বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আলোচনা শুরু করিয়াছেন। গত বছর জুন মাসে ক্ষমতায় আসার পর ইহা হইতেছে এই সরকারের সহিত শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দের ৬ষ্ঠ বৈঠক। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্ সরকার পক্ষের নেতৃত্ব দেন। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) শান্তিবাহিনী দলের নেতৃত্ব দেন। ইতিপূর্বে গতকাল পৌনে একটায় একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করিয়া শান্তিবাহিনীর নেতারা ঢাকা পৌঁছেন।

উভয়পক্ষের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে গতকাল বৈঠক শুরু হয়। পরে সীমিত পর্যায় আলোচনা চলে। রাত পৌনে নয়টা পর্যন্ত সাংবাদিকগণ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের ফটকে অপেক্ষা করিলেও বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তাহাদিগকে কিছুই জানান হয় নাই।

বিভিন্ন সূত্রের সহিত আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে যে, প্রথমপর্বের আলোচনায় শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্, কল্পরঞ্জন চাকমা ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মুহম্মদ ইসমাইল শরণার্থী পুনর্বাসনে এযাবৎ গৃহীত সরকারী পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ দেন। অবশিষ্ট শরণার্থীদের ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করিয়া সরকার পক্ষ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানান হয় যে, সকল শরণার্থীই ২০-দফা প্যাকেজ সুবিধা ভোগ করিবে। এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির সহযোগিতা কামনা করা হইলে সন্তু লারমা বলেন, আমাদের তো সহযোগিতা আছেই। তবে তাহাদের সমস্যা আপনাদের দেখা উচিত।

গত শুক্রবার শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার আকস্মিক ঢাকা সফর এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত বৈঠকের প্রসঙ্গটিও আলোচনায় স্থান পায়। উপেন্দ্রলাল চাকমার সহিত আখাউড়ায় কল্পরঞ্জন চাকমার বৈঠকের বিবরণও বৈঠকে পেশ করা হয়। শীঘ্রই শরণার্থী প্রত্যাবাসন পুনরায় শুরু

হইবে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে বৈঠককে অবহিত করা হয়। শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে এখনও কোন দিন-তারিখ নির্ধারিত হয় নাই। তবে আগামী মাসের প্রথমদিকে এই প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হইতে পারে বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে। দুর্গাপূজার পূর্বে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা যায় কিনা তাহাও চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখা হইতেছে।

গতকাল জাতীয় কমিটির যে সকল সদস্য প্রথমপর্বের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাহারা হইলেন: কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এম, এস, চাকমা। বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মুহম্মদ ইসমাইলও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

দ্বিতীয়পর্বের সীমিত পর্যায়ের বৈঠকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে সহায়তা করেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আতাউর রহমান খান কায়সার। সন্তু লারমার সহায়তাকারীরা ছিলেন সুধাসিন্ধু খীসা ও রূপায়ণ দেওয়ান।

একটি সূত্র জানায়, অমীমাংসিত ইস্যুগুলি লইয়া তাহারা আলোচনা শুরু করিয়াছেন। আজ (সোমবার) সকালে আবার বৈঠক শুরু হইবে। বৈঠকে অগ্রগতি হইলে শান্তিবাহিনীর নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**
**শান্তিবাহিনীর সহিত বৈঠকে**
**ভূমি সমস্যা লইয়া আলোচনা**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামের সব চাইতে স্পর্শকাতর বিষয় অর্থাৎ ভূমি সমস্যা গতকাল (সোমবার) সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যকার বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। সরকারের পক্ষ হইতে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে গতকালও কোন তথ্য সরবরাহ করা হয় নাই।

তবে বিভিন্ন সূত্রের সহিত আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে যে, ভূমির অধিকার, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্ত প্রদানের প্রশ্নে গতকাল উভয় পক্ষ যুক্তি ও পাল্টা-যুক্তি প্রদর্শন করে। গতকাল সীমিত



পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ সরকারী দলের নেতৃত্ব দেন। তাহাকে সহায়তা করেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সকালে কিছু সময়ের জন্য বৈঠকে যোগদান করেন। অপরদিকে শান্তিবাহিনী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। তাঁহাকে সহায়তা করেন রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা। সূত্রগুলি জানায়, ভূমি ব্যবস্থাপনায় তিন পার্বত্য জেলা তথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ও ভূমি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হইবে সে বিষয়েও তাহারা মত বিনিময় করেন। শান্তিবাহিনী চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ মোট পাঁচ হাজার ৮৯ বর্গমাইল এলাকা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীনে রাখা। অপরদিকে, সরকার পক্ষ চায় ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত নিয়ম মানা হইবে। তবে উপজাতীয়গণ বংশ পরম্পরায় যাহাতে ভূমির অধিকার ভোগ করিয়া যাইতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শান্তি বাহিনী উত্থাপিত পার্বত্য এলাকায় বাঙ্গালীদের নিকট সকল প্রকারের জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, বাঙ্গালীদের নিকট উপজাতীয়দের কোন জমি বিক্রয় না করা, বাঙ্গালীদের অধীনস্থ ভূমি ও পাহাড়ের উপর মালিকানা বাতিল করা এবং স্থানীয় বাসিন্দা পরিচয়ে বসবাসরত বাঙ্গালীদের মালিকানাধীন সকল জমি ও পাহাড় অবমুক্ত করার দাবীগুলি সরকার মানিয়া নিতে অনীহা প্রকাশ করিয়াছে। কারণ, ইহা হইবে দেশের প্রচলিত বিধিবিধান বিরোধী। বাস্তবতার আলোকে এই দাবীগুলি হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে শান্তি বাহিনীকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। ভূমি বে-দখল সংক্রান্ত জটিলতার নিরসনের লক্ষ্যে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের প্রশ্নটিও গতকালের বৈঠকে আলোচিত হয়। আশির দশকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের নামে বন্দোবস্তকৃত জমির প্রশ্নটিও আলোচনায় স্থান পায়।

আজ (মঙ্গলবার) সকালে আবার উভয়পক্ষ বৈঠকে বসিবে।

## দৈনিক ইত্তেফাক
## ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
## দুই যুগের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পথে: খসড়া চুক্তি প্রণীত

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ তিনটি সরকারের সহিত ২৫টি বৈঠকের পর অবশেষে বিক্ষুব্ধ শান্তিবাহিনী অস্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ পরিহার করিয়া দুই দশকেরও বেশী সময়ের অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সম্মত হইয়াছে। বিদ্রোহে-বিধ্বস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান উদ্ভাবনের লক্ষ্যে শান্তিবাহিনী ও সরকার শেষ পর্যন্ত একটি শান্তি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করিয়াছে। সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের চতুর্থ দিনে গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যায় শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের বলেন, ''আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, এই বৈঠকে আমরা খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি।'' গাঢ় নীল রং-এর সাফারী পরিহিত এই বিদ্রোহী নেতা প্রথমবারের মত সাংবাদিকদের সহিত বৈঠকের ফলাফলের ব্যাপারে কথা বলিলেন। তিনি বলেন, "আমার সহকর্মীদের সহিত আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।" এই সময় তাহাকে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল দেখাইতেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ বরাবর সাংবাদিকদের 'ব্রিফ' করিলেও গতকাল হাসিমুখে সন্তু লারমার পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার নিরলস চেষ্টায় অবশেষে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান ঘটিতেছে। সন্তু লারমা বলেন, "অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।" চলতি মাসের ৩০ তারিখে বর্তমান মেয়াদ শেষ হইবার কথা।

এবারের বৈঠকে বিবদমান বিষয়গুলি কিভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে উহার বিস্তারিত জানা যায় নাই। তবে বাস্তবতার আলোকে শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ সকল সমস্যার সমাধান করিতে সম্মত হন বলিয়া জানা গিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, সরকার 'আঞ্চলিক পরিষদ' গঠনে রাজী হইলেও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও বাঙ্গালীদের বহিষ্কারের প্রশ্নটি নাকচ করিয়া দিয়াছে। তবে জাল দলিল করিয়া যাহারা অবৈধভাবে জমি দখল করিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। সেইসঙ্গে সংবিধান বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ গ্রহণেও সরকার সম্মত হয় নাই। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের নাম হইবে পার্বত্য পরিষদ। ইহার প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটিতে



স্থাপিত হইবে। এই পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন একজন উপজাতীয়। তিনি একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করিবেন। এই পরিষদের ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন হইবেন উপজাতীয়, ৬ জন বাঙ্গালী এবং অপর তিনজন মহিলা। ইহাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপনের ব্যাপারেও উভয়পক্ষ সম্মত হইয়াছে। তিনটি জেলা পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। তিনিই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকিবেন।

বিগত বৈঠকগুলিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন এবং পার্বত্য জেলার সরকারী বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, পুলিশসহ সরকারী বিভিন্ন বিভাগে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ, অবৈধ ও বেআইনীভাবে দখলীকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা, অপ্রয়োজনীয় সেনা ক্যাম্প ও ছাউনি গুটাইয়া নেওয়া, পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা, শরণার্থীদের ত্রিপুরা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা, জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যকে যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনার সার্বিক ক্ষমতা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা ইত্যাদি প্রশ্নে উভয়পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছার পরেই চুক্তির একটি খসড়া চূড়ান্ত হইয়াছে।

১৯৮৫ সালে সীমান্তবর্তী পুজগাং-এ সেনা কর্মকর্তাদের সহিত যে শান্তি সংলাপ শুরু হইয়াছিল, গতকালের বৈঠকের পর বাহ্যতঃ তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। বৈঠকের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, জটিল ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকী। স্বাভাবিক কারণেই খসড়া চুক্তিটি সন্তু লারমা তাহার জনসংহতি সমিতির কংগ্রেসে পেশ করিয়া অনুমোদন আদায় করিবেন। গতকাল সন্তু লারমার বক্তব্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় নাই। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ও দৃঢ়কণ্ঠে জানান যে, পরবর্তী বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইবে। এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইলে ইহা হইবে শেখ হাসিনার সরকারের জন্য এক বিরাট সাফল্য।

এ পর্যন্ত পৌঁছাইতে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই দুই দশকেরও বেশী সময়ে সেনা সদস্য ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র কর্মীরা যেমন হতাহত হইয়াছেন, তেমনি নির্যাতিত হইয়াছেন এবং প্রাণ দিয়াছেন সাধারণ উপজাতীয় ও অউপজাতীয় জনগণ। আশির দশকে তিনবার চাকমা উপজাতীয়গণ প্রাণের ভয়ে পালাইয়া ভারত চলিয়া যান। ১৯৮৬ ও '৮৯ সালে যাহারা গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এখনও ৪০ হাজারেরও বেশী শরণার্থী ত্রিপুরায় প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় প্রহর গণিতেছেন। গত শুক্রবারে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার বৈঠকের পর চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথও পরিষ্কার হইয়াছে। শীঘ্রই খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মুহম্মদ ইসমাইল এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য ত্রিপুরা যাইবেন। আশা করা হইতেছে আগামী মাসের প্রথমার্ধে পুনরায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হইতে পারে।

এরশাদ সরকারের আমলে সেনা কর্মকর্তাদের সহিত শান্তিবাহিনীর ছয়টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি সরকার মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন করিলে মূল কমিটি সাতবার বৈঠকে বসে। অবশ্য রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন উপ-কমিটি সংলাপ চালায় ছয়বার। অবশেষে গত বছর জুন মাসে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি গঠিত হইলে শান্তিবাহিনীর সহিত ইহার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ডিসেম্বর মাসে, খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। ইহার পর বৈঠকের স্থান পরিবর্তিত হইয়া যায়। সরকার প্রথমবারের মত শান্তিবাহিনী নেতাদের ঢাকায় লইয়া আসে।

একটানা চারদিন সরকারের জাতীয় কমিটির সহিত বৈঠক অনুষ্ঠানের পর শান্তিবাহিনীর নেতারা আজ সকালে দুদুকছড়ি সীমান্তে ফিরিয়া যাইবেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

**আগামী মাসেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য** ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি আগামী মাসে সম্পাদিত হইতে পারে বলিয়া আভাস পাওয়া গিয়াছে। আগামী মাসে জাতীয় সংসদের অধিবেশনের পূর্বেই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হইতে আগ্রহ ব্যক্ত করা হইয়াছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) দুই সপ্তাহের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সভা আহ্বান করিয়া খসড়া চুক্তির অনুমোদন আদায় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। চুক্তি সম্পাদিত হইবার পরই সরকার সংসদে পার্বত্য পরিষদ বিল উত্থাপন করিবে। বিলটি পাস হইলে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সামরিক ক্যাডার শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টিও চূড়ান্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন মহল হইতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাইতেছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে উপজাতীয়গণ খুশী। তিন জেলায় বসবাসরত বাঙ্গালীরা কিছুটা নিরাস।



পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সেনা প্রত্যাহার, বাঙ্গালী বহিষ্কার ও বৈষম্যমূলক পার্বত্য পরিষদ গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া খাগড়াছড়ি বিএনপি গতকাল জেলা সদরে প্রতিবাদ মিছিল বাহির করে। পরে এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দলের নেতারা বলেন, চুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবে বাঙ্গালীরা যাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয় সরকার সে ব্যবস্থাই করিয়াছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতারা খসড়া চুক্তির বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন, ইহা না হইলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতে পারে।

রাঙ্গামাটি হইতে এ,কে,এম মকছুদ আহমেদ জানান, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা বলিয়াছেন, দুই দশকের বেশী সময় যাবৎ স্থায়ী পার্বত্য সমস্যা সমাধানের এই খসড়া চুক্তি একটি মাইলফলক। অবশিষ্ট সমস্যাসমূহ ক্রমান্বয়ে সমাধান সম্ভব হইবে। পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ সভাপতি ও রাঙ্গামাটি জেলা জামায়াত আমীর এ,এস,এম শহীদুল্লাহ বলিয়াছেন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের উচ্ছেদের খবরে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সকল দাবী মানিয়া কোন আত্মঘাতী চুক্তি হইলে পার্বত্যবাসী কখনো মানিয়া লইবে না।

এদিকে শান্তিবাহিনী নেতা সন্তু লারমা ও তাহার সহকর্মিগণ গতকাল সকালে একটি সামরিক হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ী চলিয়া যান। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সময়মতই চুক্তি সম্পাদিত হইবে। ইউএনবি জানায়, এই চুক্তি তাহাদের ভূমির অধিকারের নিশ্চয়তা দিবে কিনা এ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন তাহাও সময়মত জানা যাইবে।

খাগড়াছড়ি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে, সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দুদুকছড়ায় পৌঁছিলে শত শত উপজাতীয় নারী-পুরুষ সন্তু লারমাকে স্বাগত জানায়। হেলিকপ্টার হইতে নামিয়া পাহাড়ীছড়া পার হইয়া গহীন জঙ্গলের দিকে শান্তিবাহিনীর অস্থায়ী আস্তানায় যখন তিনি যাইতেছিলেন, তখন উৎসুক জনগণ তাহার পিছনে পিছনে যাইতে থাকে। তিনি তাহাদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, পার্বত্য সমস্যা তথা উপজাতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের যে আন্তরিকতা দেখিয়াছি তাহার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা সরকারের সহিত একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিতে যাইতেছি। এজন্য আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিবদমান দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের সহিতও তিনি পৃথকভাবে মিলিত হন। তাহাদিগকেও তিনি একই কথা বলেন। চুক্তি

সম্পাদনের প্রাক্কালে যাহাতে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেজন্য সকলকে সতর্ক থাকিতেও তিনি আহ্বান জানান। আজ (শুক্রবার) সকালে বিভিন্ন স্তরের উপজাতীয় নেতাদের সহিত দুদুকছড়ায় তিনি এক বৈঠকে মিলিত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

**শান্তিচুক্তির জন্য নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়া হইবে**

**শাহজাহান সরদার ॥** দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন পিছাইয়া যাইতেছে। জনসংহতি সমিতির সংগে শান্তিচুক্তির অপেক্ষায় এ নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও পরিষদ-সমূহের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানদের এক বৈঠকে এ বিষয়ে সমঝোতা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গতকাল (শুক্রবার) বিকালে চীফ হুইপের সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র জানায় যে, ইহার মধ্যে পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে। চীপ হুইপ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করিয়া উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য চেয়ারম্যানদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই বেশ কিছু উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইতে পারে। গতকালের বৈঠকে পার্বত্য জেলাসমূহ হইতে নির্বাচিত এমপি দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরন দেওয়ান, চিং কু রেওজা ও খোয়াইন চু প্রু মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, গত ৫ই আগষ্ট রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়। সংসদে এ বিষয়ে আইন পাস করা হইলে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করিয়া রীট মোকদ্দমা করা হয়। হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ রীট পিটিশনটি খারিজ করিয়া দিয়া বলে যে, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন বৈধ। আদালতের রায় সরকারের অনুকূলে আসার সংগে সংগে তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির মেয়াদ আগামী ৫ই অক্টোবর শেষ হইবে। এ



তারিখের মধ্যে নির্বাচন করার কথা ছিল। কিন্তু শান্তি চুক্তির জন্য নির্বাচন পিছাইয়া দেওয়া হইবে। আদালতের রায়ে উল্লেখ ছিল যে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন দৈব দুর্বিপাকের কারণে নির্বাচন সম্ভব না হয় তাহা হইলে নির্বাচনের জন্য আরও ৬০ দিন সময় নেওয়া যাইবে। তবে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। সরকার সম্ভবতঃ ৫ই অক্টোবর পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছে। এ সময়ের মধ্যেই শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করা হইবে।

সূত্র জানায়, জাতীয় কমিটির প্রধানের সংগে স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যানদের বৈঠকে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, আগামী অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। তবে ইহার পূর্বে অক্টোবরের মাঝামাঝি জনসংহতি সমিতি বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হইবে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় শান্তিচুক্তির যে খসড়া তৈয়ারী করা হইয়াছে কাউন্সিলে তাহা অনুমোদন করানো হইবে। এ লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করিয়াছেন। গোপন আস্তানা হইতে লোকালয়ে আসিয়া খসড়া চুক্তির পক্ষে জনমত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হইয়াছেন শান্তি বাহিনীর নেতৃবৃন্দ। এদিকে ত্রিপুরায় অবস্থানকারী উপজাতীয় শরণার্থীরা কবে হইতে দেশে ফেরা শুরু করিবে তাহা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জানা যাইবে বলিয়া সভায় জানান হয়। উল্লেখ্য যে, প্রায় ৪০ হাজার উপজাতীয় শরণার্থী এখনও ত্রিপুরায় আছে। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমাও সম্প্রতি ঢাকা আসিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংগে সাক্ষাৎ করিয়া যান।

**রংপুর সংবাদদাতা ॥** হরতালবিরোধী মিছিল করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে জামায়াত শিবিরের হাতে গুরুতর আহত আওয়ামী লীগ কর্মী মহির উদ্দিন (৬০) গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০টায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। এব্যাপারে মহির উদ্দিনের ভাই বাদী হইয়া ৫ জনের নামে মিঠাপুকুর থানায় মামলা দায়ের করিয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

**আগামী মাসে পার্বত্য শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা**

**হাসান শাহরিয়ার ॥** আগামী মাসের প্রথমার্ধে পার্বত্য শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হইতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ভারতের ত্রিপুরা

রাজ্য সরকারকে একটি পত্র পাঠাইয়াছে। শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ত্রিপুরা সরকার পত্রের জবাব দিলেই বাংলাদেশ প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করিবে। অবশ্য সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা সফর করার পরই প্রত্যাবাসন শুরু হইবে।

গত বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে সাত হাজার শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ি সফর করে এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। ত্রিপুরা সরকারের নিকট পেশকৃত এক রিপোর্টে এই প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কয়েকটি দাবী জানায়। ইহাদের মধ্যে ছিল জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি কর্তৃক প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া তদারক।

শরণার্থীদের এই দাবী বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা সফর করে। কিন্তু শরণার্থীরা তাহাদের দাবীতে অটল থাকায় প্রতিনিধি দলের সফর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিধিদলটি শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিতে পারে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী যখন সরকারের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ঠিক তখন শরণার্থীদের এই নতুন দাবী বাহ্যতঃ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

এই প্রেক্ষাপটে জট খুলিবার জন্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার সহিত কলিকাতায় এক বৈঠকে মিলিত হন। এই সময় ভারত সরকারও শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে উপেন্দ্রলাল চাকমাকে চাপ দিতে থাকে। ইহার কয়েকদিন পর উপেন্দ্রলাল চাকমা ঢাকা আগমন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। তাহার ঢাকা সফর ও শেখ হাসিনার সহিত বৈঠকের পিছনে শান্তিবাহিনীর পরোক্ষ সমর্থন ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সহিত বৈঠকে উপেন্দ্রলাল চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিকে সম্পৃক্ত করার দাবী প্রত্যাহার করেন এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে



ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবশ্য তাহাকে আশ্বাস দেন যে, ২০ দফা প্যাকেজ সকল শরণার্থীর বেলায় প্রযোজ্য হইবে। যাহারা বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে দেশে ফিরিয়া তাসিয়াছে তাহারাও এই সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে বলিয়া তিনি জানান।

শান্তিবাহিনীর সহিত সরকারের বিগত বৈঠকে শরণার্থী বিষয়ক সমস্যাটি আলোচিত হয়। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এবং চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত গৃহীত সরকারী পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দেন। শান্তি বাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লরমা (শন্তু) তাহার জবাবে শরণার্থীদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ত্রিপুরার ছয়টি শিবিরে বর্তমানে ৪৩ হাজারেরও বেশী শরণার্থীর প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় প্রহর গণিতেছেন। জানা গিয়াছে যে, প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া শুরু হইলে তাহা একটানা চলিবে এবং মাসখানেকের মধ্যে সকল শরণার্থী স্বদেশ ফিরিয়া আসিবে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সরকার তাহাদের জায়গা-জমি ও বসতবাড়ী ফিরাইয়া দিবে। কেহ তাহা অবৈধভাবে দখল করিয়া রাখিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা হইবে। অবশ্য উচ্ছেদকৃত প্রতি পরিবারকে সরকার চার হাজার টাকা করিয়া প্রদান করিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৪ই নভেম্বর ১৯৯৭

গোল টেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ

## সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী এই শান্তি চুক্তি

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে গতকাল 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সমাধানের উপায়' শীর্ষক রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী-বিশেষজ্ঞদের এক গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক এবং বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উহার দলীয় দর্শন অনুযায়ীই রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথে সঠিকভাবে অগ্রসর হইয়াছেন এবং শান্তি চুক্তি সম্পাদনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। জাতি সেখানকার দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংকটের সমাধান চায়। অন্যতম আলোচক পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত

কমিটির অন্যতম সদস্য দীপংকর তালুকদার জানান, আগামী ১৬ই নভেম্বর কমিটির ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকিলে ঐ বৈঠক হইতেই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে আমরা জাতিকে শান্তির বাণী শুনাইতে পারিব। বিএনপি'র প্রতি ইংগিত করিয়া তিনি বলেন, যাহারা নানা অজুহাত তুলিয়া শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন কমিটিতে তাহাদের দলেরও দুইজন সদস্য রহিয়াছেন, তাহারাও ঐ বৈঠকে অংশ নিয়া জানিতে পারেন কি চুক্তি হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহারা কোন বৈঠকেই অংশ নেন নাই।

সংসদীয় গণতন্ত্র পরিষদ আয়োজিত ও পরিষদের চেয়ারম্যান ভাষা সৈনিক গাজীউল হকের সভাপতিত্বে এই গোলটেবিলে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হারুন অর রশীদ ও অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এ, কে, আজাদ চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস, এ, মালেক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ বোরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জাতীয় পার্টির এমপি ডঃ এ,টি,এম ফজলে রাব্বী, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শহীদুজ্জামান ও সাংবাদিক-লেখক শাহরিয়ার কবির। গোলটেবিলে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান।

মূল প্রবন্ধকারসহ আলোচকবৃন্দ প্রায় সকলেই অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান সরকার বাংলাদেশের নাগিরকদের একটি অংশের সহিত শান্তি চুক্তি করিতেছেন। তাহারা বলেন, সেখানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে রক্তক্ষয়ী অশান্তি এতদিন বিরাজমান ছিল এবং ভ্রান্ত সামরিক পথে সমস্যার সমাধানের যে নীতি অনুসরণ করা হয় উহাতে কোন লাভ হয় নাই, বরং এ পথে কয়েক হাজার পাহাড়ী-বাঙালীকে এবং কর্তব্যরত সামরিক বাহিনীর সদস্যকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। সংঘর্ষে এবং গভীর অরণ্যে মশার কামড়েও প্রাণ দিতে হইয়াছে। আলোচক মেজর জেনারেল (অবঃ) ফজলুর রহমান আল-মামুন বলেন, তিনি নিজে এক ঘটনায় তাঁহার সহকর্মী ৫ জন সদস্যের মৃতদেহ বহন করিয়াছেন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট তাহার চাকুরীর প্রথমদিনেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বদলি হন এবং মাত্র ৭ দিনের মাথায় ম্যালেরিয়ায় প্রাণ হারান। তিনি বলেন, সীমান্ত রক্ষায় সেনাবাহিনী থাকিবে, আবার সীমান্ত যদি পাহাড়ী অঞ্চল হয় তবে সেনাবাহিনীকেও সেখানে সীমান্ত রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ইহার যদি আভ্যন্তরীণ ইমার্জেন্সী থাকে তাহা আরও সংকট সৃষ্টি করে। তাই শান্তি চুক্তি হইলে



সেখানে ক্যান্টনমেন্টগুলিও প্রয়োজনে সীমান্তে যাইতে পারিবে। অস্থায়ী ক্যাম্প রাখার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন, আজকাল কেহ দেশ বিক্রয় করে না, দেশ বিক্রয়ের কথা এখন 'ফ্যাশন' হইয়াছে। মূল প্রবন্ধকারের তথ্য উদ্ধৃত করিয়া অর্থনীতিবিদ ডঃ খলীকুজ্জামান বলেন, শান্তি রক্ষার নামে এতদিন দিনে দেড় কোটি করিয়া বছরে ৫০০ কোটি টাকা খরচ হইলে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করিব কি দিয়া। বরং এই টাকা দিয়া আমরা মানবসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিতে পারিব।

মূল প্রবন্ধে প্রফেসর ডঃ হারুন-অর-রশীদ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উৎস ও বিস্তৃতির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাদান করেন। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান সামরিক পথে সমাধানের ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করিয়া একদিকে বাঙালীদের পুনর্বাসন, অন্যদিকে সমস্যার রাজনৈতিক দিক অবহেলা করায় সেখানকার চাকমাসহ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রোষের সৃষ্টি হয়, বস্তুতঃ রক্তক্ষয়ী সংকটের শুরু সেখান হইতেই। তিনি বলেন, বলা হয় স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাহাড়ীদের 'বাঙালী' বলিয়া সংকট সৃষ্টি করেন–এই বক্তব্য ঠিক নহে। বস্তুতঃ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হইলেও ইহার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী পতাকা উড়ানো হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু সেদিন বাঙালী বলিয়া পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে এক হইয়া বসবাসের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। দীপংকর তালুকদার বলেন, জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী-এর ফলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর যে নির্যাতন বঞ্চনা নামিয়া আসিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।

ভিসি প্রফেসর এ, কে, আজাদ চৌধুরী বলেন, জাতিগত সমস্যা নাই, বিশ্বে এমন সুন্দর উদাহরণ এই আমাদের বাংলাদেশে কেবল একটি জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান না করা নৈতিকতার প্রশ্নও বটে।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস, এ মালেক বলেন, বিশ্ব বাস্তবতার কারণই আমাদের শান্তির পথেই অগ্রসর হইতে পথ দেখাইয়াছে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, শান্তিচুক্তি হইলে বেগম খালেদা জিয়ার অশান্তি কেন তাহা বুঝি না। অশান্তি হইবে চোরাচালানী, অস্ত্র ব্যবসায়ী ও ড্রাগ ব্যবসায়ীদের। জামাতের গোলাম আজমের সহিত বৈঠক করিয়া খালেদা জিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার কথাও হাস্যকর। শাহরিয়ার কবির বলেন, জিয়া-এরশাদ দুই জেনারেল যে পথে সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, খালেদা জিয়াও একই পথ ধরিয়াছেন। তাহার সহিত আবার স্বাধীনতা বিরোধী জামাতও রহিয়াছে। শান্তি বাহিনীর এক সদস্য আমাকেই বলিয়াছে তাহারা জামাতের নিকট হইতে অস্ত্র কিনিয়াছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা

তাহার নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যেই শান্তি চুক্তি করিতে যাইতেছেন। জাতীয় পার্টির ডঃ এ, টি, এম ফজলে রাব্বী বলেন, শান্তিচুক্তি যাহাই হউক সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৪ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শরণার্থী প্রত্যাবাসন

**পাঁচ সদস্যের সরকারী প্রতিনিধিদলের ত্রিপুরা যাত্রা**

**হাসান শাহরিয়ার ॥** পার্বত্য উপজাতীয়দের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করার উদ্দেশ্যে পাঁচ সদস্যের একটি সরকারী প্রতিনিধি দল গতকাল (বৃহস্পতিবার) আগরতলা গমন করিয়াছে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতেছেন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ ইসমাইল।

আগামী ২১শে নভেম্বর হইতে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন শুরু হইবার কথা। এ ব্যাপারে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশকে অবহিত কয়িয়াছেন। সম্প্রতি তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শরণার্থীদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার কয়েকটি দাবী মানিয়া নেন এবং তাঁহার অনুরোধে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে সম্পৃক্ত করার দাবীটি তিনি প্রত্যাহার করেন।

আগরতলায় অবস্থানকালে সরকারী প্রতিনিধি দলটি ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তা এবং শরণার্থী নেতৃত্বৃন্দের সহিত মত বিনিময় করিবেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ দুইটি আশ্রয় শিবিরও পরিদর্শন করবেন।

শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে।

বর্তমানে ত্রিপুরার ছয়টি আশ্রয় শিবিরে ৪৪ হাজার ৪৯ জন বাংলাদেশী শরণার্থী প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় আছে। ইতিপূর্বে ১১ হাজার ৯২ জন শরণার্থীকে স্বদেশ ফিরাইয়া আনা হয়। ইহাছাড়া, দুই হাজার ৯২ জন শরণার্থী স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। গত মার্চ-এপ্রিলে বর্তমান সরকারের আমলে পুনরায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হইলে ছয় হাজার ৭০৩ জন শরণার্থী স্বদেশ ফিরিয়া আসেন।



সরকারের ২০-দফা প্যাকেজ সুবিধা মোতাবেক প্রত্যাবাসনের পর প্রত্যেক পরিবারকে নগদ ১৫ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যর্থনা কেন্দ্রেই তাহাদিগকে এই অর্থ দেওয়া হইবে। ইহাছাড়া, তাহাদিগকে নয় মাসের রেশনও প্রদান করা হইবে। নিজ নিজ গ্রামে পৌছিলে তাহারা পাইবে পরিবার প্রতি দুই বাণ্ডিল সি আই সীট ও হালের গরু ক্রয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা। যাহাদের চাষাবাদযোগ্য জমি নাই তাহারা পাইবে তিন হাজার টাকা।

সরকারী প্রতিনিধি দলটি উহার তিনদিনের সফরে শরণার্থীদের সহিতও বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনা করিবে।

প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যগণ হচ্ছেন ঃ খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম, খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেহাজউদ্দিন চৌধুরী, মাটিরাঙ্গার থানা নির্বাহী অফিসার মীর আহমদ ও রামগড়ের থানা নির্বাহী অফিসার জামাল নাসের চৌধুরী।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭

**২৫শে নভেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য পার্বত্য জনসংহতি সমিতির অনুরোধ**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** গতকাল (শুক্রবার) গভীর রাতে জানা গিয়াছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আগামীকালের (রবিবার) পরিবর্তে ২৫শে নভেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা গতরাতে সাংবাদিকদের টেলিফোনে একথা জানান। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য সরকারের কাহারও সহিত যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ববর্তী খবরে বলা হয়, পার্বত্য শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন পুনরায় শুরু করার প্রশ্নে বাংলাদেশের একটি সরকারী প্রতিনিধি দল আগরতলায় আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছে বলিয়া ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে। গতকাল পিটিআই-এর খবরে বলা হইয়াছে, ৬ হাজার ৬৩ জন শরণার্থীর প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২১শে নভেম্বর প্রত্যাবাসন শুরু হইবার কথা। এবারের প্রত্যাবাসন একটানা হইবে এবং সকল শরণার্থীই স্বদেশ ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ইতিপূর্বে ধারণা দেওয়া হইলেও এখন মনে হইতেছে এ যাত্রায় ফেরত আসিবে মাত্র ছয় হাজার ৬৩ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জানাইয়াছে, সরকারের সহিত ইতিপূর্বেকার ছয়টি বৈঠকে অধিকাংশ

বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও কয়েকটি বিষয় এখনও অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়গুলি হইতেছে ঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠন, অস্ত্র সমর্পণ এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনার শর্তাবলী। ইহাছাড়া, ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার প্রশ্নেও তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরার হিউম্যানিটি প্রটেকশন ফোরাম অমীমাংসিত উপরোক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত আলাপ করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরালের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতি প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের নিকট ভূমি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাইয়াছেন। সেইসঙ্গে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পার্বত্য অঞ্চলে কর্মরত সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরী উক্ত পরিষদের নিকট ন্যস্ত করারও দাবী জানান হইয়াছে। এ প্রশ্নে সরকার কি চিন্তা-ভাবনা করিতেছে তাহা জানা যায় নাই।

জনসংহতি সমিতি নেতা গৌতম চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান ও রক্তোৎপল ত্রিপুরাসহ কয়েকজন নেতা ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী এলাকা দুদুকছড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শীর্ষ নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও সুধাসিন্ধু খীসা আজ (শনিবার) সকালে দুদুকছড়া পৌঁছাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সরকার ইতিমধ্যেই আটটি সীমান্ত চৌকি নিষ্ক্রিয় এবং পাঁচটিকে সাময়িকভাবে অকেজো করিয়া রাখিয়াছে।

অপরদিকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখায় সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ইতিমধ্যেই পাঁচজন সহকারী সচিবকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়া পার্বত্য এলাকায় পাঠান হইয়াছে। আরও কর্মকর্তা পাঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭**
**পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও শান্তি চুক্তি**
**–শামসুজ্জামান খান**

বিগত আগষ্ট মাসে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেখার সুযোগ পাই। সেনাবাহিনীই এই সফরের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দলে ঢাকা থেকে ৬ জন বুদ্ধিজীবী অংশ নেন। এঁরা হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের



সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমান, প্রফেসর নাসিম আক্তার হোসেন, ভোরের কাগজের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, পেট্রোবাংলার আনোয়ারুজ্জামান পারভেজ ও আমি। সাংবাদিক এ. বি. এম মুসা ও মাহফুজউল্লাহর যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু ব্যক্তিগত কাজে আটকা পড়ায়/অসুস্থতার জন্য তাঁরা যেতে পারেননি। ঢাকা থেকে বিমানে আমরা চট্টগ্রাম পৌছি। আমাদের দেখ-ভালের জন্য সঙ্গে যান মেজর মুহম্মদ মুজিবুর রহমান।

চট্টগ্রাম সেনাসদর দফতরে পৌঁছার পর জি.ও.সি মেজর জেনারেল মুহম্মদ আবদুল মতিন এই সফর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম-পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেশ বিস্তৃত ও খোলামেলা আলাপ করেন। আমরা সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের এ ধরনের সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি বলেন, 'বিষয়টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ। সারা জাতির এ বিষয়ে জানার অধিকার রয়েছে। বর্তমান সরকারের জবাবদিহিতার নীতির সঙ্গেও এটি সঙ্গতিপূর্ণ। এ ধরনের সফরের ফলে অনেক বিভ্রান্তি দূর হবে। গুজব, অপপ্রচার, শঙ্কা দূর হবে। ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বিষয় সম্পর্কে ধারণায় স্বচ্ছতা আসবে।' তিনি আমাদের আরো জানালেন তাঁদের উদ্যোগ এবং সেনাপ্রধান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমেই বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন গ্রুপের এই নিয়মিত সফরের আয়োজন করা হয়েছে এবং বুদ্ধিজীবীদের বাছাইয়ের ব্যাপারেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন বিধিনিষেধ নেই। দলমত নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা এই সফরে আমন্ত্রিত হবেন। যেকোন বিষয়ে প্রশ্ন করে বা ঘুরে দেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, সেনাবাহিনীর ওই এলাকার কাজ-কর্ম এবং পাহাড়ী বা বাঙালীদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। আমাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন ঃ তিনটি পার্বত্য জেলায় তিনটি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়াও ৫৪৭টি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প রয়েছে। শান্তির স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয় আপনারা কি এগুলো গুটিয়ে নিতে রাজী আছেন? জি. ও. সি সাহেব বল্লেনঃ 'আমরা এখনই ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে রাজী আছি তবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে।'

এরপর একটি ফর্মাল ব্রিফিং সেশন হয় সেনাসদর দফতরেই। লেঃ কর্ণেল শামিম একটি সুলিখিত ব্রিফিং খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ থেকে জানা যায় ঃ সর্বমোট ৫৪৭টি অস্থায়ী সেনাছাউনি রয়েছে। এর মধ্যে ৭০টি হেলি সাপোর্টেড ক্যাম্প। দুর্গম অঞ্চলের ক্যাম্পসমূহে মাসে দুবার হেলিকপ্টারে করে রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহের বিন্যাসগত কারণেই যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ নয়।

হেলিকপ্টারের সাহায্য নিয়ে এসব ক্যাম্প চালাতে হয় বলে প্রতিদিন বিপুল খরচ করতে হয়। এই ক্যাম্পগুলোর ফলে এ অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা নেই। যুদ্ধ-বিরতি থাকায় সুব্যবস্থা নেই বটে তবে যে ব্যবস্থা বিরাজিত আছে তাকে 'বিশেষ অবস্থা' বলা যেতে পারে। শান্তিবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের বলা হয় ৫-৭ হাজার এর মতো হবে। শান্তিবাহিনীর জোন বিভাগ করা হয়েছে সমতল জেলাসমূহের নামে। যেমন– যশোর জোন, কুমিল্লা জোন, রংপুর জোন, ঢাকা জোন, বগুড়া জোন, সিলেট জোন ইত্যাদি। সেনাবাহিনীর 'একসেস' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সেনা কর্মকর্তারা বলেন, আগে কখনো কিছুটা 'একসেস' হয়ে থাকতে পারে তবে এখন আর হচ্ছে না। বিষয়টি এখন জাতীয়ভাবেই খুব স্পর্শকাতর এবং সকল পক্ষই খুব সচেতন। সামান্য অপরাধের জন্যও কয়েকজন সেনাসদস্যকে গুরুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আর এক প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় এ পর্যন্ত সেনা বিডিআর, এপি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি নিহত হয়েছেন ৩৪৩ জন। আহত হয়েছেন ৩৭৩ জন। অন্যদিকে ম্যালেরিয়ায় নিহতের সংখ্যা ১৬০ জন। সিভিলিয়ানদের মধ্যে নিহত হয়েছেন বাঙালী ১০৫৪ জন, পাহাড়ী ২৩৭ জন, আহত বাঙালী ৬৮৭ জন, পাহাড়ী ১৮১ জন, নিখোঁজ অপহরণ বাঙালী ৪৬১ জন, পাহাড়ী ২৭৯ জন।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানের সেনাপ্রধানগণ (ব্রিগেডিয়ার) পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তাঁদের স্মার্ট ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রাঞ্জল উপস্থাপনা পরিস্থিতি বুঝতে বিশেষ সহায়ক হয়। তারা এও বলেন যে, 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক। আমরা ভাড়াটে ও নিপীড়ক সেনাবাহিনী নই। আমরা এও স্বীকার করি পাহাড়ীদের অনেক দাবী জেনুইন। এসব সমস্যার রাজনৈতিক মিমাংসা প্রয়োজন।' বাংলাদেশের যে ভূখণ্ড তাতে বাঙালী ছাড়াও কিছু ক্ষুদ্র জাতি রয়েছে কিন্তু আমরা বাঙালী ছাড়া অন্য কোন ক্ষুদ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষভাবে তার ফয়সালা করিনি। তারই ফলে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উদ্ভব।

একথা ঠিক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা আগেও ছিলো বিশেষ করে ১৯৪৭-এ উপমহাদেশের বিভক্তির পর থেকেই এ সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এবং পাকিস্তানের মত ধর্মভিত্তিক স্বৈরতান্ত্রিক ও সামন্ত প্রভু শাসিত একটি উদ্ভট রাষ্ট্রে বাঙালী, সিন্ধি, বেলুচিদের মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা উপজাতিরা যে উপেক্ষিত-বঞ্চিত হবে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এই বঞ্চনা, নিপীড়ন ও উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পঁচিশ বছর জীবনপণ সংগ্রাম ও



মুক্তিযুদ্ধ করেও আমরা যে রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যাটির সমাধান করতে পারিনি বা এ বিষয়ে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটি আমাদের রাষ্ট্র গঠন প্রয়াসের দুর্বলতা।

**[দুই]**

এবার আমরা আরো পেছনের ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলিয়ে নিই। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা মংছুই বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে রামু, টেকনাফ ইত্যাদি অঞ্চলে আশ্রয় নেন। পরে মারমারা এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেন। ১৬৬৬ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মুঘলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে এবং বাংলায় মুঘল শাসকদের কাছে এ অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে। এই সময় থেকেই সমতল ভূমির বাঙালীরা চাকমা রাজা দেওয়ান বক্স খান ও তার পরবর্তী শাসক রানী কালিন্দির আমন্ত্রণে চাকমাদের জন্য এই অঞ্চলে আসেন। ১৭৬০-এর ১৫ অক্টোবর বাংলার নওয়াব মীর কাশেম খান পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দেন। তবে চাকমা, কুকি ও অন্যরা ইংরেজকেও খুব শান্তি-স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ ইংরেজ বড়লাটের কাছে গিয়ে শান্তি কামনা করে আনুগত্যের ঘোষণা দেন। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ সালের ১লা আগষ্ট চট্টগ্রাম জেলার মূল পার্বত্য অংশ নিয়ে বর্তমানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একজন সুপারিনটেনডেন্ট-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

[আগামীবারে সমাপ্য]

**দৈনিক ইত্তেফাক**

১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য সমস্যা সমাধানে**
**জাতীয় কনভেনশন**
**আহ্বান করা প্রয়োজন**

**–আ স ম রব**

গতকাল জাসদ কার্যালয়ে সংগঠক ও নেতাকর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে নভেম্বর বিকাল ৩টায় পল্টন ময়দানে জাসদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনসভা সফল করার প্রস্তুতি হিসাবেই গতকালের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি আ, স, ম আবদুর রব বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের

একার নহে। তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সকল বিভ্রান্তি অবসানের লক্ষ্যে সকল দল ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করা প্রয়োজন। তিনি বিষয়টি জাতীয় সংসদে খোলামেলা আলোচনার আহ্বান জানান।

আ, স, ম আবদুর রব বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজনৈতিক দলগুলিকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হইবে।

সৈয়দ জাফর সাজ্জাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন মইনউদ্দিন খান বাদল, নূর আলম জিকু। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি

**দৈনিক ইত্তেফাক**
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

## ‘যেদিন চুক্তি সেদিন হরতাল’–এই ঘোষণা দিয়া বিএনপি বিপাকে পড়িয়াছে

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়া যেদিনই চুক্তি হইবে সেদিনই হরতাল পালিত হইবে বলিয়া যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিয়া বিএনপিসহ ৭ দল বিপাকে পড়িয়াছে। কখন ঐ চুক্তি হইবে, সরকার গোপনে অথবা হঠাৎ করিয়া চুক্তি করিয়া ফেলিলে কি কৌশল গ্রহণ করা হইবে তাহা নিয়া ৭ দলীয় নেতারা চিন্তিত। আর ইহা লইয়া আলোচনার জন্য ৭ দল গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মিন্টো রোডে বৈঠকে মিলিত হইয়াছিল।

আজ ১৬ই নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে আগে হইতে এমনটি ধারণা করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতেছে না। আজ হরতাল হইবে কিনা ইহা লইয়া মানুষ উদ্বিগ্ন ছিল। অসংখ্য মানুষ সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করিয়া জানিতে চাহিয়াছে হরতাল হইবে কিনা?

গতকালের ৭ দলের বৈঠক সম্পর্কে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ব্যাপারে ৭ দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। তিনি বলেন, চুক্তি হইলে হরতালসহ অন্যান্য কর্মসূচী দেওয়া হইবে।

তবে কবে হরতাল দেওয়া হইবে তাহা এখনও নিশ্চিত নয়। ৭ দলের বৈঠকে বিএনপির পক্ষে আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, জাগপার শফিউল আলম প্রধান, ডিএল-এর অলি আহাদ, জামায়াতের মোঃ কামারুজ্জামানসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



**দৈনিক ইত্তেফাক**
১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭

## আপাতত: ৬৬৮৪ জন পার্বত্য শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন চূড়ান্ত

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে সরকারী প্রতিনিধি দল তিনদিনের সফর শেষে ত্রিপুরা হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

আগরতলা অবস্থানকালে প্রতিনিধি দলটি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কর্মকর্তা ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সহিত প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন ও সরকারের ২৪-দফা প্যাকেজ প্রস্তাব নিয়া আলোচনা করে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মুহম্মদ ইসমাইল পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ কাঁঠালছড়ি ও ঠাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবিরও পরিদর্শন করেন।

আগামী ২১ নভেম্বর হইতে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হইবে। এবারে এক হাজার ২১৬ পরিবারের ছয় হাজার ৬৮৪ জন শরণার্থী দেশে ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের মধ্যে মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়া আসিবে ৯৮৩ পরিবারের সদস্যগণ। ইহাদের ৮২৪ পরিবারের সদস্যগণই হইতেছে মাটিরাঙ্গা থানার অধিবাসী। অবশিষ্ট ২৩৩ পরিবারের সদস্যগণ ফেরত আসিবে রামগড় মন্দিরঘাট সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া।

এবারের প্রত্যাবাসন একটানা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে ইহা মাত্র ১০ দিন চলবে। প্রথম তবলছড়ি দিয়া শুরু হইবে। পরে রামগড় দিয়া। আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে এবারের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইবে।

এই প্রত্যাবাসনের পরও বহু শরণার্থী ত্রিপুরার শিবিরগুলিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রহর গুনিতে থাকিবে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের হিসাব মতে, বর্তমানে ছয়টি শিবিরে মোট আট হাজার ১৫১ পরিবারের ৪৪ হাজার ৩৯ জন সদস্য অবস্থান করিতেছে।

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য শরণার্থী নেতারা আগামী ৫ই ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক টাস্কফোর্সের সহিত একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছে। এ ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই।

ত্রিপুরায় ৩ দিনের সফর শেষে খাগড়াছড়ি প্রত্যাবর্তনের পর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল সাংবাদিকদের বলিয়াছেন, ত্রিপুরায় আশ্রিত অবশিষ্ট শরণার্থী দেশে ফিরিতে খুবই ব্যাকুল।

প্রত্যাবাসন একটানা হইতেছে না কেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শরণার্থী প্রত্যাবাসনের এই প্রক্রিয়া আলোচনার মাধ্যমে অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে।

গত মার্চ-এপ্রিলে এক হাজার ২৪৮ পরিবারের শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের পর অচলাবস্থা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে উহার নিরসন হয়।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যমান সমস্যার সমাধান ও কতিপয় সুবিধা পুনঃবিবেচনার দাবী জানাইলে প্রধানমন্ত্রী ঐসব দাবী মানিয়া নেন। ঐ সকল অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে ছিল ৯ মাসের স্থলে এক বৎসরের ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করা, শরণার্থীদের মৃত আত্মীয় স্বজনের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান করা, ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীনদের গাভী ক্রয়ের জন্য দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নগদ অর্থ প্রদান করা।

শরণার্থীদের জন্য সরকার ঘোষিত ২০ দফা সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, –দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গৃহনির্মাণের জন্য দুই বাণ্ডিল ঢেউটিন ও নগদ ১৫ হাজার টাকা প্রদান করা, জায়গা-জমি ও বসতভিটা এবং সরকারী চাকুরী ফেরৎ দেওয়া ইত্যাদি।

জেলা প্রশাসন সকল থানা প্রশাসনকে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন পরবর্তী দ্রুত পুনর্বাসনের কাজ সম্পাদনের জন্য জরুরী নির্দেশ দিয়াছে। প্রশাসন শরণার্থীদের যে সকল জায়গা-জমি নানাভাবে বেদখল হইয়া আছে তাহা পুনরুদ্ধারের বিষয়েও খোঁজ খবর নিতে শুরু করিয়াছে। পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনাকালে যাহাতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কোন রকম অবনতি না ঘটে সে জন্য একাধিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ আইনী সহায়তার জন্য খাগড়াছড়িতে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানো হইয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭**

দিনাজপুরে খালেদা জিয়া

**শান্তি চুক্তি হইলে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়াইয়া পড়িবে**

**দিনাজপুর হইতে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও মোঃ মতিউর রহমান ॥** বিএনপি'র চেয়ারপারসন ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়া সংবিধান পরিপন্থী চুক্তি করা হইলে ভবিষ্যতে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ ছড়াইয়া পড়িবে। বিএনপি'র একটি কর্মীও বাঁচিয়া থাকিতে এই অসাংবিধানিক চুক্তি করিতে দেওয়া হইবে না।



গতকাল রবিবার উত্তরাঞ্চলে সাংগঠনিক সফরের তৃতীয় দিনে দিনাজপুরের গোরা শহীদ বড় ময়দানে জেলা বিএনপি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বেগম জিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন।

তিনি বলেন, কেবল একটি উপজাতিকে লইয়া শান্তি চুক্তি না করিয়া বরং ১২টি উপজাতি ও বাংলাভাষীদের সহিত আলোচনা করিয়া সংবিধান মোতাবেক শান্তি চুক্তি করিতে হইবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতার ৩ বৎসরের মধ্যে ভারতের সহিত ২৫ বৎসরের গোলামী চুক্তি করিয়াছিল। কিন্তু সচেতন দেশবাসী তাহা বাস্তবায়িত করিতে দেয় নাই। আওয়ামী লীগ ২১ বৎসর পর আবারও দেশ বেচিবার ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে। ফারাক্কার পানি পাইবার চুক্তিতে আবারও ভারতের সহিত ৩০ বৎসরের গোলামী চুক্তি করিয়াছে।

এখন আবার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য "শান্তি চুক্তির নামে" গোলামীর চুক্তি করিতে যাইতেছে। বিএনপি আওয়ামী লীগের এই খায়েস পূরণ করিতে দিবে না। বর্তমান সরকার পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে দিতেছে না; বরং রাজনৈতিক সভাপণ্ড, বোমাবাজি ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়িয়া সন্ত্রাসীদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। দিনাজপুরের ইয়াসমিন হত্যা আন্দোলনের সময় পুলিশের বাড়ীঘর লুট ও কাস্টম গুদাম লুট করিয়া আওয়ামী লীগ নজির সৃষ্টি করিয়াছে। ভারত হইতে বিদ্যুৎ আনিবার জন্য দেশের বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটাইতেছে। তেমনিভাবে ভারত হইতে কয়লা আমদানীর জন্যই দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কাজ ষড়যন্ত্র করিয়া বন্ধ করিয়া দিতেছে। সরকারী দল কেবল প্রশাসনই দলীয়করণ করে নাই; বরং টি, এন, ও, ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রহার করিয়া নজির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সরকার সন্ত্রাসী সরকার। তাই ফেনীর গডফাদারদের গ্রেফতার না করিয়া বরং তাহাদের লালন করিতেছে। এই সরকার কৃষকদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কৃষিপণ্যের দর নাই। পাট এখন কৃষকদের গলার ফাঁস হইয়াছে।

জেলা বিএনপি'র সভানেত্রী বেগম খুর্শিদ জাহান হক এম,পি'র সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন, শাহজাহান সিরাজ, ফজলুল হক পটল, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু, কেন্দ্রীয় নেতা আলমগীর হোসেন, হাবিবুর রহমান, এম, এ, জলিল, স্থানীয় নেতা এ, এফ, এম, রিয়াজুল হক চৌধুরী, এডঃ ইউসুফ, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আশরাফুল প্রমুখ। অনুষ্ঠান প্রারম্ভে সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, সাবেক জাতীয় পার্টি নেতা ও সাংসদ এ,এফ,এম, রিয়াজুল হক চৌধুরী প্রায় শতাধিক নেতা-কর্মী লইয়া বিএনপিতে যোগদান করেন।

জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শান্তি চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানচিত্র বদলাইবার চেষ্টা করা হইলে আমরা তাহা মানিয়া লইতে পারি না। বিএনপি সরকারের ৫ বছরের গড়িয়া তোলা অর্থনীতি বর্তমান সরকার ধ্বংস করিতেছে। ১৭৩ দিন হরতাল অবরোধ করিয়া দেশের ক্ষতি করিয়া বর্তমান সরকার এখন হরতালের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে। আমরা সরকারের নিকট ১৭৩ দিনের হরতালের ক্ষতিপূরণ দাবী করিতেছি। বিএনপি যে-সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করিয়াছিল তাহার সমাপ্তিতে বর্তমান সরকার সেগুলি উদ্বোধন করিতেছে। দিনাজপুরের মেডিক্যাল কলেজের উল্লেখ করিয়া বেগম জিয়া বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইহা উদ্বোধন করার অধিকার রাখে না।

তিনি বলেন, বিএনপি আমলে গড়িয়া তোলা পোল্ট্রি ডেইরী ফার্মগুলি সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে ধ্বংস হইতেছে। সরকার বিনিয়োগের কথা বলিলেও দেশে কোন বিনিয়োগ হয় নাই। সংসদের ভিতরে ও বাহিরে সরকার শুধু মিথ্যা কথা বলিতেছে। বেগম জিয়া জয়পুরহাট হইতে দিনাজপুর আসার পথে বিরামপুর আমবাড়িয়ায় পথসভায় বক্তৃতা করেন।

জয়পুরহাট সংবাদদাতা জানান, জয়পুরহাট হইতে দিনাজপুর যাওয়ার পথে গতকাল দুপুরে পাঁচবিবি হাইস্কুল মাঠে এক সভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ভোট চুরি করিয়া ক্ষমতায় আসিয়া এই সরকার আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট চুরির পাঁয়তারা শুরু করিয়াছে। দলীয় সন্ত্রাসীদের লেলাইয়া দেওয়ায় সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা এলাকা ছাড়িয়া পালাইয়া বেড়াইতেছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন না হইলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হইতেই দেশব্যাপী কঠোর ও কঠিন আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হইবে। দিনাজপুর যাওয়ার পথে বেগম জিয়া পারজানা, হিলি, বিরামপুর ও ফুলবাড়ীতে পৃথক পৃথক সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭**
**পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির**
**সম্ভাবনায় সম্মিলিত**
**সাংস্কৃতিক জোটের সন্তোষ**

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতায় সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। গত শনিবার জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে



বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছে। বিপুল সম্পদের ক্ষতি হইয়াছে। উপরন্তু সরকারকে কোটি কোটি টাকা গচ্চা দিতে হইতেছে। এই পরিস্থিতির অবসানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন দেশের মানুষের একান্ত প্রত্যাশিত। কিন্তু বিশেষ একটি মহল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে সুরমিলাইয়া সম্ভাব্য এই শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে মাঠে নামায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। বিবৃতিতে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পথে যেকোন বাধা প্রতিরোধের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭**
**শান্তিবাহিনীর সহিত**
**বৈঠক ২৬শে নভেম্বর**

**খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥** সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে প্রস্তাবিত সপ্তম বৈঠক আগামী ২৬শে নভেম্বর ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উভয়পক্ষ ঐকমত্যে পৌছিয়াছে। এই বৈঠক গত ১৬ই নভেম্বর অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে বৈঠকের তারিখ পিছাইয়া ২৫শে নভেম্বর করার ব্যাপারে প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে সরকার পক্ষ হইতে ২৫শে নভেম্বরের পরিবর্তে ২৬শে নভেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান হয়। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ২৬শে নভেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সমিতির সম্মতির কথা স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭**
ঝিকরগাছার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী
**সংসদ বর্জন ও শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধিতা**
**করিয়া বিরোধী দল দেশকে অরাজকতার**
**দিকে ঠেলিয়া দিতেছে**

**আইয়ুব হোসেন ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, বিরোধী দল সংসদ বর্জন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করিয়া দেশকে বিশৃংখলার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। তিনি বিরোধী দলকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, সংসদ বর্জন ও মিথ্যার বেসাতি ছাড়িয়া দিন। জনগণ শান্তি চায়। দেশকে অরাজকতার দিকে ঠেলিয়া দিবেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল (সোমবার) ঝিকরগাছায় এক বিশাল জনসভায় একথা বলেন। ইউএনবি জানায়, প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শীঘ্রই উপজাতীয় নেতাদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হইবে। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা শান্তি চুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করার সাথে সাথেই বিরোধী দল উহার বিরোধিতা শুরু করে।' তিনি বলেন, ইহা দুর্ভাগ্য যে, তাহারা শান্তির বিরোধিতা করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যখনই তাঁহার সরকার স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করার চেষ্টা করে, যখনই দেশের উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়, তখনই বিরোধী দলের নেতারা বলে, দেশ ভারতের নিকট বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তাহারা মিথ্যা বলিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, যে দল রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে, সে কখনও দেশ বিক্রি করিতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দলের জন্ম হয় নাই, যে দল জনগণের অর্থ লুট করে দেশ বিক্রি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব। তিনি বলেন, তাহার দল যখন ক্ষমতা লাভ করে তখন দেশে শান্তি-শৃংখলা ছিল না। তিনি বলেন, 'আমরা শান্তি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রকৃত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করি।' তিনি বলেন, সরকার জনগণের কল্যাণে বেশকিছু উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলেন, যুবকদের কর্মসংস্থান প্রকল্প, পল্লী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৃদ্ধদের জন্য পেনশন স্কীমসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঝিকরগাছা হইতে প্রধানমন্ত্রী সড়ক পথে নাভারন গমন করেন। সড়কের দুই ধারে হাজার হাজার লোক প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাত নাড়িয়া জনগণকে শুভেচ্ছা জানান।

নাভারন জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী সেখানে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন। নাভারন জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে রবিউল ইসলাম, তবিবর রহমান সরদার এমপি। এই দুইটি জনসভায় বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, হুইপ রফিকুল ইসলাম, খান টিপু সুলতান এমপি, আলেয়া আফরোজ এমপি, পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য। খনিজ সম্পদমন্ত্রী নূরুদ্দীন খান, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক, হুইপ এস, এম, মোস্তফা রশিদী সুজাসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাঁহার সরকার নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। তিনি বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী।



তাহাদের নিরক্ষর ও অবহেলিত রাখিয়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নহে। দেশের নারী শিক্ষা এবং রাজনীতিতে তাঁহার মায়ের অবদানের কথা স্মরণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন শিক্ষিত নারী তাহার পরিবারকে বহুভাবে সাহায্য করিতে পারেন। তিনি সরাসরি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শীঘ্রই শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হইবে।

তিনি বলেন, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে পারিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জাতি মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার বৃহত্তর যশোর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিবে। সরকার দেশের প্রকৃত উন্নয়ন চায়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭**

বামফ্রন্টের জনসভায় মেনন

## পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিএনপি স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দিয়াছিল

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের জনসভায় ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক, সাবেক এমপি রাশেদ খান মেনন বিএনপি নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশে বলিয়াছেন, আজ অপনারা পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছেন, অথচ বিএনপি সরকারের আমলের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে শান্তি বাহিনীর সহিত আলোচনায় তাহাদের পুনর্বাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দিয়াছিল। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিএনপি সরকারের আমলে গঠিত সংসদীয় কমিটিতে আমিও সদস্য ছিলাম। সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চায়। শান্তি চুক্তি বানচালের যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা হইবে। নেতৃবৃন্দ চুক্তির পূর্বে জনসাধারণকে কি চুক্তি হইতেছে তাহা অবহিত করার দাবী জানান। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমন্বয়কারী মোর্শেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, আফম মাহবুবুল হক, দিলীপ বড়ুয়া, নির্মল সেন, আবদুল্লাহ সরকার, ইকবাল মজুমদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন মোর্শেদ আলী।

রাশেদ খান মেনন বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নূতন কিছু করে নাই। সবকিছুই পুরাতন মোড়কে করা হইতেছে। তিনি বলেন,

কৃষক ফসলের মূল্য পাইতেছে না। শিক্ষাঙ্গনে হল দখলের ঘটনা ঘটিতেছে। নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস বন্ধ হয় নাই। তিনি বলেন, আর সংঘাত, সংঘর্ষের রাজনীতি নয়। তিনি বামফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি হইলে সারা বাংলায় আগুন জ্বালানোর হুমকি দেওয়া হইতেছে। তিনি বিএনপি নেত্রীর নিকট প্রশ্ন করেন দেশের একটি অঞ্চলে শান্তি আসিলে ষড়যন্ত্র হইবে বলা হইতেছে, অশান্তি থাকিলে কি ষড়যন্ত্র বন্ধ হইবে? তিনি সংসদে সরকারের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, একটি দেশের গোয়েন্দাদের সহায়তায় বিএনপি চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে অথচ সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে লালগালিচা সম্বর্ধনার প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে কেন। তিনি বলেন, বিএনপি নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী, জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, কাজী জাফর দেশে আর একটি ১৫ই আগষ্ট ও ৭ই নভেম্বরের হুমকী দিতেছেন। ১৫ই আগষ্টের হুমকি মানে প্রেসিডেন্টকে স্বপরিবারে হত্যা এবং ৭ই নভেম্বরের হুমকি মানে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির হুমকি। তিনি বলেন, এতসব হুমকিতে সরকার কি করিতেছে? তিনি কৃষক পাটের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় এবং সারের দাম বৃদ্ধিতে সরকারকে ওয়াদাভঙ্গের সরকার বলিয়া উল্লেখ করেন।

আ ফ ম মাহবুবুল আলম বলেন, সরকার ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলিলেও বাস্তবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। কালোটাকার দাপট সর্বত্র। দিলীপ বড়ুয়া বলেন, সরকার ক্ষমতা লাভের পর শুধু বিদেশীদের স্বার্থরক্ষা করিতেছে। দেশের মানুষের কল্যাণ হয় নাই।

নির্মল সেন বলেন, সরকার আমলাসহ বড়লোকের বেতন বৃদ্ধি করিতেছে। গরীব মানুষের বেতন বাড়ে নাই। শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বাসন ছাড়াই শ্রমিক ছাটাইয়ের তিনি সমালোচনা করেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
২১শে নভেম্বর ১৯৯৭

**আজ হইতে পার্বত্য শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন**

**খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন আজ (শুক্রবার) হইতে শুরু হইবে। জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ প্রথম দলটিকে লইয়া সীমান্ত



অতিক্রম করিবেন। মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়া তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবে। আজ একশত পরিবারের ৫৭৪ জন শরণার্থী দেশে ফিরিবে।

এ উপলক্ষে ত্রিপুরার শিলাছড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। শরণার্থীরা বাংলাদেশে পৌছিলে পরিবার-পিছু ২১ হাজার টাকা ও তিন মাসের রেশনসামগ্রী প্রদান করা হইবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
২১শে নভেম্বর ১৯৯৭

**সমতা ও সংবিধানের ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি হইলে স্বাগত জানাইব**
—এরশাদ

**কুমিল্লা হইতে সংবাদদাতা ॥** জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন, সমতা ও সংবিধানের ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি হইলে তাহার দল সেই চুক্তিকে স্বাগত জানাইবে। কারণ জাতীয় পার্টি শান্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তবে সংবিধান পরিপন্থী কোন চুক্তি হইলে জাতীয় পার্টি ইহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে। তিনি বিএনপির 'যেদিন চুক্তি সেদিনই হরতাল' কর্মসূচীর সমালোচনা করিয়া বলেন, জাতীয় পার্টি এই ধরনের হঠকারী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তিনি কুমিল্লার লাকসাম ও বরুড়ার দুইটি জনসভায় ভাষণদানকালে একথা বলেন। স্থানীয় জাতীয় পার্টি নেতা দয়াল খালেক ও মাওলানা সৈয়দ মাহবুবুল হক জনসভা দুইটিতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাতীয় পার্টি নেতা মনিরুল হক চৌধুরী, বাহাদুরুজ্জামান বাহাদুর, এডভোকেট ফজলুর রহমান, সৈয়দ রেজাউল হক প্রমুখ।

এরশাদ বলেন, সেনাবাহিনী কোথায় থাকিবে, না থাকিবে ইহা সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। সেনাবাহিনীর ব্যাপারে অন্য কাহারও কিছু বলা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বিএনপির সমালোচনা করিয়া বলেন, সেনাবাহিনী কোথায় থাকিবে, না থাকিবে এব্যাপারে বিএনপি নেতারা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বলেন, বেগম জিয়া ক্ষমতায় থাকিতে ১৮২ বার হরতালের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। অথচ এখন একের পর এক হরতাল দিয়া চলিয়াছেন। শেখ হাসিনার হরতাল বিরোধী বক্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সেদিন

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলিতেন, হরতাল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। এ প্রসঙ্গে দুই নেত্রীকে সুবিধাবাদী আখ্যা দিয়া তিনি বলেন, তাহাদের কথা ও কাজে মিল নাই। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি কথায় কথায় হরতাল ডাকে না, কিংবা সমর্থন করে না। কারণ জাতীয় পার্টির কথা ও কাজে মিল রহিয়াছে। তিনি বলেন, ১৯৯০ সালে দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার কথা চিন্তা করিয়া আমরা ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু বিএনপির ৫ বছর নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। বাতিল করা হইয়াছিল উপজেলা কার্যক্রম, পল্লী রেশনিং, গুচ্ছগ্রাম, মসজিদের বিদ্যুৎ বিল মওকুফসহ সমস্ত ভাল ভাল কাজ ও সিদ্ধান্ত। একইভাবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের ১৬ মাসেও এদেশের মানুষ অভাব-অনটনে ভুগিতেছে। কৃষকরা ধান, পাট ও আলুর দাম পাইতেছে না। সর্বক্ষেত্রে চলিতেছে হতাশা। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মন্ত্রিত্ব প্রসঙ্গে এরশাদ বলেন, আওয়ামী লীগের যোগ্য কোন লোক না থাকায় মঞ্জুকে তাহারা নিয়াছে।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, সেদিন এরশাদের পদত্যাগ সত্ত্বেও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্থিতিশীলতা আসে নাই। অথচ বলা হইয়াছিল, শান্তি, গণতন্ত্র, সুষ্ঠু নির্বাচন ও দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য এরশাদের পদত্যাগ অনিবার্য। সেদিন আমাদেরকে একথা বলিয়াই ক্ষমতা হইতে নামানো হইয়াছিল। '৯৬ সালেও একটি সরকারকে একইভাবে নামানো হইয়াছে। বর্তমান সরকারকেও আগামীতে কিভাবে নামানো হইবে ইহা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, দুই নেত্রী এদেশকে সতীনের সংসারে পরিণত করিয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

<u>৭ দলের সিদ্ধান্ত</u>

**শান্তি চুক্তির**
**পরদিন**
**হরতাল**

গতকাল (শুক্রবার) বিরোধীদলীয় নেত্রীর মিন্টো রোডস্থ সরকারী বাসভবনে অনুষ্ঠিত বিএনপিসহ ৭টি রাজনৈতিক দলের এক সভায় দেশের অখণ্ডত্ব জাতীয় স্বার্থ ও সংবিধান বিরোধী কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে চুক্তির পরদিন হরতালসহ কঠিন-কঠোর কর্মসূচী ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিএনপি নেতা আবদুস সালাম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কাজী জাফর



আহমদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, শফিউল আলম প্রধান ও গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং চট্টগ্রামের ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বর্তমান আওয়ামী সরকার বিরোধী দলসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে এক নিষ্ঠুর দমননীতি চালাইয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামে গত ১১ই নভেম্বর সাতটি দলের মহাসমাবেশ দেখিয়া সরকার দিশাহারা ও বেসামাল হইয়া সমাবেশ পণ্ড করার অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়।

এই সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয়, ফ্যাসিষ্ট কায়দায় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলসমূহের উপর সারাদেশে নারকীয় হামলা চালাইতেছে। সম্প্রতি পাবনায় জামায়াতের অফিস পেট্রোল দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুর রহিমকে গ্রেফতার করিয়া নির্যাতন চালান হইয়াছে। পাবনা শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

সভায় বিএনপি'র পক্ষে সাবেক মন্ত্রী শামসুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির (জা-মো) কাজী জাফর আহমদ, মহাসচিব শামীম আল মামুন, জামায়াতের আবদুল কাদের মোল্লা ও অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ডিএল-এর অলি আহাদ, জাগপার শফিউল আলম প্রধান, পিএনপি'র শওকত হোসেন নীলু, এনডিএ'র এএসএম সোলায়মান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

<u>'সেনাকুঞ্জে'র সম্বর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা</u>

**দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব**
**বজায় রাখিয়াই পার্বত্য সমস্যার**
**সমাধান করা হইবে**

**বাসস ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, তিনি জাতির কল্যাণের কাজে দেশের সুশৃংখল, সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সম্ভাবনাময় সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োগ করিতে চাহেন। সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় সেনাকুঞ্জে এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণদানকালে তিনি বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষায় সদা সজাগ থাকিবে।" তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সম্বর্ধনা সভায় মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক দলের নেতা, পদস্থ বেসামরিক-সামরিক কর্মকর্তা, কূটনৈতিক মিশনের সদস্য, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও গণমান্য ব্যক্তিসহ বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যোগদান করেন। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সহিত সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিন আহমদ এবং নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল নূরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতিথিদের সহিত কুশল বিনিময় করেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় গায়ক-গায়িকা এই সময়ে দেশপ্রেমমূলক সংগীত পরিবেশন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ বিশিষ্ট অতিথিদের সহিতও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সশস্ত্র বাহিনী একটি সুশৃংখল ও সুসংগঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। তাহারা দেশ-বিদেশে নাম ও যশ অর্জন করিয়াছে। তাহারা দেশের ভিতরে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য একটি আধুনিক, শক্তিশালী, সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। অনেক প্রতিকূলতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়াছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত দুই দশক পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিরাজ করায় দেশের সংহতি, স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যসহ শত শত লোক প্রাণ হারায়। বর্তমান সরকার দীর্ঘস্থায়ী এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্তরিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার 'রাজনৈতিক সমাধানই সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান' বিবেচনা করিয়া শান্তি বাহিনীর সহিত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিয়াই এ সমস্যার সমাধান করা হইবে। এতদসংক্রান্ত কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্যও রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগ দেশ-বিদেশে প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করিয়াছে। তিনি আন্তরিকভাবে আশা প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই প্রচেষ্টার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিবে।



সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করিয়া তিনি বলেন, বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভের পর সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান সরকার শুধুই উন্নয়ন এবং সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই, অধিকন্তু তিন বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, আগামী বছরের মধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, সামরিক প্রকৌশল কলেজ ও সামরিক মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সকল কাজ শেষ হইবে এবং এসব প্রতিষ্ঠান ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে কাজ শুরু করিবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুশী মনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বলেন, এই স্মরণীয় ও শুভদিনে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া তিনি গর্বিত ও সুখী। তাহাদের উপস্থিতিতে ইহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের সুখী জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধকালে অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের কূটনীতিকবৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, বর্তমান মান অর্জনে ও সশস্ত্র বাহিনী গঠনে অবদান রাখার জন্য তিনি তাঁহাদের অবদানের কথা স্বীকার করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ ব্যাপারে বন্ধু দেশগুলির আরও সহযোগিতা অব্যাহত থাকিবে।

পূর্বে প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতা অর্জনে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ ও অবদান রাখিয়াছেন গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের স্মরণ করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চল ও উপকূল এলাকাসমূহে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায় মূল্যবান তৈল ও গ্যাস সংরক্ষিত রহিয়াছে। সেদিন বেশী দূরে নয় যে দিন এই দেশ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**২২শে নভেম্বর ১৯৯৭**

**পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি অভিনন্দন**

জাতীয় বীর আবদুল কুদ্দুস মাখন স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা হাসমত জাহান মাখন বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেত্রীত্বে দেশের পার্বত্য অঞ্চলে যে শান্তির পতাকা

উড়িতে যাইতেছে, আমরা উহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত জটিল সমস্যা ও রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান হইতে যাইতেছে। ফলে প্রকৃতির লীলাভূমি খনিজ সম্পদে ভরপুর এই পার্বত্য এলাকা হইবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র ও বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু। গড়িয়া উঠিবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। শান্তি চুক্তির ফলে বিনিয়োগ বাড়িবে এবং দেশ হইয়া উঠিবে সমৃদ্ধশালী। ফলে দেশে বিদেশে শেখ হাসিনা ও তাহার সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি হইবে। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া এই সরকারের সাফল্য কিছুতেই মানিতে পারিতেছেন না। তিনি স্বাধীনতা বিরোধী গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, সালাউদ্দিন কাদের চৌঃ, আনোয়ার জাহিদ ও সাত খুনের আসামী সফিউল আলম প্রধানদের নিয়া শান্তি চুক্তিকে নস্যাৎ করিয়া দেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করিতে চাহিতেছেন। তিনি বলেন, দেশবাসী ও পার্বত্যবাসী চায় শান্তি ও সমৃদ্ধি। তাহারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তিনি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এবং বর্তমান সরকারের সফলতা কামনা করেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭**

মহিলা পরিষদের সমাবেশ

**শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে**
**বিভ্রান্তিকর তৎপরতা**
**বন্ধের দাবী**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** গতকাল (রবিবার) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক সমাবেশে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে সকল অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর তৎপরতা বন্ধের দাবী জানাইয়াছেন। তাহারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, শান্তিচুক্তি বিষয়ে বিরোধীদল বিএনপি'র ক্রমাগত উস্কানিমূলক বক্তব্য ও অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশ ও জনগণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি দায়িত্বহীনতারই পরিচায়ক। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার অবিলম্বে এই চুক্তি জনসাধারণের জানার জন্য প্রকাশ করিয়া সকল প্রকার বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইবে। হেনা দাসের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম, মহিলা নেত্রী ডাঃ মাখদুমা নার্গিস, রত্না ও রেখা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। প্রস্তাব পাঠ করেন সারাবান তাহুরা।



প্রস্তাবে বলা হয়, জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইতে যাইতেছে তাহাতে ঐ এলাকার পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ইহা লইয়া বিএনপি'র ভ্রান্ত রাজনীতিতে দেশবাসী বীতশ্রদ্ধ। এই সমাবেশ বিএনপি'র এই হেন আচরণের নিন্দা জানাইতেছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭**

সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ

**সংসদের বিশেষ অধিবেশনে**
**পার্বত্য শান্তি চুক্তির খসড়া**
**আলোচনা করুন**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ গতকাল (সোমবার) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের আগে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে চুক্তির খসড়া আলোচনা করার জন্য সরকারকে তাগিদ দিয়াছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অবশ্য বলেন, আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে উত্থাপন ও আলোচনার বিধান সংবিধানে আছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ চুক্তির ব্যাপারে সংবিধানে কিছু নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি লইয়া সারাদেশে ''তুলকালাম কাণ্ড'' হইতেছে, সেজন্য এ শান্তি চুক্তির খসড়া সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, শান্তি চুক্তি হইতে হইবে সমতা ও সংবিধানের ভিত্তিতে। সমতা বলিতে তিনি কী বুঝান?–এ প্রশ্নের উত্তরে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান বলেন, এ চুক্তির কারণে পাহাড়ীদের সহিত অ-উপজাতীয়দের কোন বৈষম্য সৃষ্টি যাহাতে না হয়, উহাই সমতার ভিত্তি। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে প্রশ্নের জবাবে জনাব এরশাদ বলেন, দীঘিনালা হইতে বাঙ্গালীদের বাহির করিয়া দিবার মত ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহা যেন আর না ঘটে। সরকারকে উহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। আর যদি বাঙ্গালী বিতারন করা হয়, তাহা হইলে সমস্যা হইবে। তিনি সতর্ক করিয়া বলেন, এ চুক্তি সমতল ভূমির জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে এবং সমতার ভিত্তিতে না হইলে তিনি ও তাহার দল এ চুক্তির বিরোধিতা করিবেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট তাহার বারিধারা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। দলের অতিরিক্ত মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জু, প্রেসিডিয়াম সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন, চেয়ারম্যানের তথ্য উপদেষ্টা ফকির আশরাফ, সিনহা এম এ সাঈদ ও মহানগরী জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, কোন কোন দল শান্তি চুক্তি লইয়া অভিযোগ করিতেছে যে, দেশ বিক্রি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন, 'কিভাবে দেশ বিক্রি হইতেছে? দলের লোকেরাও ক্ষমতায় থাকার সময় চুক্তি করিতে চাহিয়াছিল। সফল হয় নাই।' এখন আওয়ামী লীগ চুক্তি সম্পাদনে সফল হইলে ইহা আওয়ামী লীগের "প্লাস পয়েন্ট" হইবে ভাবিয়া তাহারা বিরোধিতায় নামিয়াছে। লিখিত বক্তব্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ১৯৭৩-এ বঙ্গবন্ধু রাঙ্গামাটির নির্বাচনী জনসভায় রাজা ত্রিদিব রায়কে স্বাধীনতা বিরোধী বলিয়া চিহ্নিত করিলে উপজাতীয়রা আরও প্রতিবাদমুখর হইয়া ওঠে। অবশ্য এম এন লারমা বাকশালে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৭৯-এ জিয়া তিন পার্বত্য জেলায় সমতল ভূমির লোকদের বসতি পত্তনে নামিলে শান্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধে নামে। দুই দশকে ৩০ হাজার পাহাড়ী বাঙ্গালী ও নিরাপত্তা সদস্য নিহত হওয়া ছাড়াও এই সংঘর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বলেন, আমার শাসনামলে ১ জন সমতলবাসীকেও সেখানে বসানো হয় নাই। বরং ৪৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করিয়া যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়িয়া তোলা হয়। তাহার আমলে বরকল হত্যাকাণ্ড, প্রীতি গ্রুপের আত্মসমর্পণ, তিনবার সাধারণ ক্ষমা, তিন পার্বত্য এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এরশাদ তাহার প্রস্তাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য শান্তিবাহিনী সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়া অস্ত্র সমর্পণ করানোর কথা জানান, এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেল, 'জিয়া হয়তো অউপজাতীয় বসতি স্থাপনকালে মনে করিয়াছিলেন, পাহাড়িয়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পাইবে। শেষ পর্যন্ত তাহা কাজে লাগে নাই। তিনি বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের ফিরাইয়া আনা হইবে না' বলিয়া উল্লেখ করেন।

খালেদা জিয়া আইএসআই-এর এজেন্ট কিনা এ ব্যাপারে মন্তব্য করিতে বলা হইলে এরশাদ বলেন, আমার কোন ধারণা নাই।

শান্তি চুক্তির পর বিদেশী মদদে শান্তি বাহিনী স্বাধীনতা চাহিবে কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, না।

এ সমস্যা সৃষ্টিতে ভারতের মদদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, তবু মনে করি ভারত জড়িত নয়। অন্য দেশে ইনসার্টেন্সী করা বোকামি।

সেনাকুঞ্জে নেতানেত্রীদের পাশাপাশি উপবেশন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, সংসদে আমরা বসিতে পারি। তাহা হইলে কি আমরা গণতন্ত্র চাহি না? সেনাকুঞ্জে নেতৃবৃন্দের আচরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবার সহিত কথা বলিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী আসিলে তাহাকে সংসদ নেত্রী হিসাবে মান্য করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি। বেগম জিয়া ওঠেন নাই।



খালেদা জিয়াকে সেনাকুঞ্জে বাড়ী প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে এরশাদ বলেন, জেনারেলদের বিরোধিতার মধ্যেও সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধানের সন্তানদের কথা ভাবিয়া আমি দিয়াছিলাম।

প্রশ্ন: পরে সম্পর্কের অবনতি ঘটল কেন?

উত্তর ঃ মহিলাদের মন–জানা খুব কঠিন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭

**যাহারা দেশের মঙ্গল চায় না তাহারাই সম্প্রীতি চুক্তির বিরোধী –রাজ্জাক**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** পানিসম্পদ মন্ত্রী ও ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতা আবদুর রাজ্জাক বলিয়াছেন যাহারা দেশের মঙ্গল চায় না তাহারাই সম্প্রীতি চুক্তির বিরোধিতা করিতেছে। তিনি বলেন, ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের আশায় বাঙ্গালী-পাহাড়ীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন না। দেশের মানুষ শান্তি চায়। কাজেই শান্তির পক্ষে আসিয়া দাঁড়ান। গতকাল (মঙ্গলবার) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি আয়োজিত পাহাড়ী-বাঙ্গালী সম্প্রীতি সমাবেশে আবদুর রাজ্জাক এই কথা বলিয়াছেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী, শামসুন্নাহার সিদ্দিক, শাহরিয়ার কবির, মাওলানা আবদুল আউয়াল, গোলাম কুদ্দুস, সালাউদ্দিন বাদল প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিগত ২১ বছর ধরিয়া বাংলাদেশে চলিয়াছে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবেশ। ১৯৭৯ সালে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের আশায় বাঙ্গালী-পাহাড়ীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। বিগত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সফল হয় নাই।

বর্তমান সরকার যখন এই ক্ষেত্রে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে তখনই পুনরার ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রয়োজন। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

## দৈনিক ইত্তেফাক
## ২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭
## 'শান্তিবাহিনী'র সহিত আজ আলোচনা শুরু

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** জটিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান উদ্ভাবন এবং এই অশান্ত অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনার ক্রমাগত প্রচেষ্টার শেষ পর্যায়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতি আজ (বুধবার) আবারও বৈঠকে মিলিত হইতেছে। গত ১৬ই নভেম্বর এই সংলাপ অনুষ্ঠানের কথা ছিল; কিন্তু জনসংহতি সমিতির অনুরোধে ইহার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হয়। এবারের বৈঠকেই সকল বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া উভয় পক্ষ হইতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হইলেও অমীমাংসিত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান না হইলে তাহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। এই বিষয়গুলি হইলঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠন, অস্ত্র সমর্পণ ও শান্তি বাহিনী সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনার শর্ত এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা।

সরকারের একটি সূত্র জানায়, উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছিলে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়ায় সার্বিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকার এই সমঝোতা স্মারকটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করিবে। ইহার উপর বিতর্কের পর প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হইবে।

ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আজ দুপুরে আলোচনা শুরু হইবে। বরাবরের মত সরকারী দলের নেতৃত্ব দিবেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। কমিটির অন্য সদস্যগণও বৈঠকে যোগ দিবেন। তবে বিএনপির দুইজন সদস্য পূর্বের ন্যায় এবারের বৈঠকেও অনুপস্থিত থাকিবেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শান্তি বাহিনীর সহিত অনুষ্ঠিত কোন বৈঠকেই তাহারা যোগদান করেন নাই। পক্ষান্তরে বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত আলোচনায় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ বরাবর অংশগ্রহণ করেন। জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও তাহার সহকর্মীগণ একটি সরকারী হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি হইতে আজ সকালে ঢাকা পৌঁছিবেন। জাতীয় কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার তাহাদিগকে ঢাকা লইয়া আসিবেন।



আলোচনায় সন্তু লারমাকে সহযোগিতা করিবেন গৌতম চাকমা (অশোক), রূপায়ন দেওয়ান ও রক্তোৎপাল ত্রিপুরা। সুধাসিন্ধু খীসা দুদুকছড়িতে অবস্থান করিবেন বলিয়া যোগাযোগ কমিটির একটি সূত্র জানাইয়াছে।

শান্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী যে প্রচারণা চালাইতেছে সরকারী কর্মকর্তাগণ উহা খণ্ডন করিয়া বলেন, সংবিধান বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইতিমধ্যে বিরোধী দলগুলির সমালোচনার জবাব দিয়া বলিয়াছেন, তাহার সরকার যখন দীর্ঘদিনের এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তখনই বিরোধীদল ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিতে শুরু করিয়াছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি পুনর্বার বলিয়াছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সেনাবাহিনী যেমন প্রত্যাহার করা হইবে না, তেমনি বাঙ্গালীদেরও বহিষ্কার করা হইবে না। তাহার এই ঘোষণার পরও বিরোধী দল আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে।

আঞ্চলিক পরিষদ প্রশ্নে সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। জনসংহতি চাহিতেছে সকল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি তথা যোগ্যতা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, শাস্তি, শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল, বদলি, তদন্ত পদ্ধতি, বরখাস্ত, অপসারণ ইত্যাদির ক্ষমতা থাকিবে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের। ইহাছাড়া পরিষদ বিভিন্ন দফতরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

পরিষদের নির্বাচনের পূর্বেই তাহারা পরিষদে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন কায়েম করিতে চায়। সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হইলে তাহাদের প্রস্তাবিত ও মনোনীত ব্যক্তিরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন।

অপরদিকে, সরকারের একটি সূত্র জানায়, বর্তমান তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদের ১৯৮৯ সালের আইনের সংশোধন করিয়া প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে। এই পরিষদের দায়িত্ব থাকিবে মূলতঃ তিন জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে শান্তিবাহিনী দীর্ঘ দুই দশক ধরিয়া সীমান্তের এপার ও ওপার হইতে সশস্ত্র আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭**
চট্টগ্রামে শান্তি মিছিল
**'পাহাড়ী বাঙ্গালী**
**ভাই ভাই**
**যুদ্ধ নয়,**
**শান্তি চাই'**

**চট্টগ্রাম অফিস ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির সমর্থনে গতকাল (বুধবার) নগরীতে বর্ণাঢ্য মিছিল বাহির করা হয়। সিটি মেয়র এ, বি, এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন, বিপুলসংখ্যক নাট্যশিল্পী, স্কুল-কলেজ ও এতিমখানার ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতকালের শান্তি মিছিলে যোগ দেন। প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানারসহ গানের সুরে ব্যান্ডের তালে তালে বিশাল শান্তি মিছিলটি শহীদ মিনার হইতে শুরু হইয়া নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে যোগদানকারী হাজার হাজার নর-নারী "পাহাড়ী বাঙালী ভাই ভাই যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই", 'সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই-বাঁচার মত বাঁচতে চাই', 'পাহাড়ী বাঙালী ভাই ভাই একসাথে বসবাস করতে চাই' ইত্যাদি শ্লোগান মুখরিত মিছিল নগরীর সড়ক প্রদক্ষিণকালে আশপাশের লোকজন হাত নাড়াইয়া সমর্থন জানায়। মিছিলের শুরুতে সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ডঃ আবু ইউসুফ আলম, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান থোয়াইং চ প্রু মাষ্টার।

সমাবেশে সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে শান্তিচুক্তির বিরোধীরা দেশের শান্তি চায় না, তাহারা জনগণের শত্রু। সিটি মেয়র বলেন, ক্ষমতা হারাইয়া দিশেহারা বিএনপি জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাইতেছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭**
**সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে**
**শান্তি বাহিনীর সহিত অলোচনা শুরু**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** বিরোধী বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর তীব্র বিরোধিতা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে শান্তি মিছিল অনুষ্ঠানের



প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী গতকাল (বুধবার) ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পুনরায় আলোচনা শুরু করিয়াছে।

ইহা হইতেছে আওয়ামী লীগ সরকারের সহিত শান্তি বাহিনীর সপ্তম বৈঠক। গত বছর জুন মাসে সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া শান্তি বাহিনীর সহিত সংলাপ চালাইয়া যাওয়ার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সহিত প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত বছর ২১শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। ইহার পর অবশিষ্ট সকল বৈঠকই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সকালে একটি সরকারী হেলিকপ্টারে করিয়া শান্তি বাহিনী নেতাদের ঢাকায় লইয়া আসা হয়। বৈঠকে সরকার পক্ষের নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, এডভোকেট ফজলে রাব্বি এমপি, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব এস এস চাকমা ও চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান তাহাকে সহায়তা করেন। অপরদিকে জনসংহতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) শান্তি বাহিনী দলের নেতৃত্ব দেন। তাহাকে সহায়তা করেন রূপায়াণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও ডাঃ বাবুল চাকমা।

সীমিত পর্যায়ের বৈঠকে সরকারী দলের পক্ষে ছিলেন আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার। অন্যদিকে শান্তি বাহিনীর পক্ষে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা।

বিভিন্ন সূত্রের সহিত আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে, অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে গতকাল বিকাল সাড়ে তিনটায় আলোচনা শুরু হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট আলোচনার পর সীমিত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় উভয় পক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া এই সমস্যার সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকার পক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করিয়া শান্তি বাহিনী নেতাদের অবগত করেন যে, এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাইয়া ঢাকা এবং তিন পার্বত্য জেলা সদরে শান্তি মিছিল বাহির হইয়াছে।

একটি সূত্র জানায়, বৈঠকে অগ্রগতি হইতেছে। বড় রকমের কোন বাধা না আসিলে দুই-এক দিনের মধ্যেই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হইতে পারে

বলিয়া তিনি আভাস দেন। কর্মকর্তারা বলেন, সীমিত পর্যায়ের বৈঠকে অমীমাংসিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে। এ বৈঠকে শান্তি বাহিনী যে সকল বিষয়ের সমাধান চাহিতেছে সেগুলি হইল ঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠন, শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে শর্ত নির্ধারণ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা। আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে আবার তাহারা বৈঠকে বসিবেন।

গতকাল দুই পক্ষের মধ্যে যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন ঢাকা ও চট্টগ্রামে উপজাতীয় ও বাঙালীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তি মিছিল বাহির করে। পরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানান হয়।

অপরদিকে, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত কয়েকদিন যাবৎ শান্তি আলোচনা ও সমঝোতার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক কমিটি এবং রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন উপ-কমিটি শান্তি বাহিনীর সহিত মোট ১৩ বার বৈঠকে বসে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাহার সরকারও শান্তি বাহিনী ভিন্ন অন্য কোন সংগঠন বা নেতার সহিত বৈঠকে বসে নাই।

**৭৬৪ জন শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন**

অপরদিকে গতকাল (বুধবার) ভারতের ত্রিপুরা হইতে চাকমা শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪র্থ পর্যায়ে প্রত্যাবাসনের ষষ্ঠ দিনে তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়া আরও ৭শত ৬৪ জন শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই নিয়া গত ৬ দিনে সীমান্তের ওপার হইতে ৮শত ৪৬ পরিবারের ৪ হাজার ৮শত ৫৭ জন শরণার্থী ফেরত আসিয়াছে। এই পর্যায়ে ১২শত ১৬ পরিবারের ৬ হাজার ৬৮৪ জন শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা। চতুর্থ পর্যায়ের প্রত্যাবাসন কাজ শেষ হইবে আগামী ৩০শে নভেম্বর এবং ইহার পরদিন অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর হইতে শুরু হইবে পঞ্চম পর্যায়ের প্রত্যাবাসন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

নাগরিক সমাবেশ

**শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখিয়া দাঁড়ানোর আহ্বান**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** গতকাল (বুধবার) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে যাহারা ষড়যন্ত্র



করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহারা সরকারকে দেশের কল্যাণে অবিলম্বে এই চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানাইয়া বলেন, এই শান্তিচুক্তি সংবিধান বহির্ভূত নহে। চুক্তি হইলে সাংবিধানিকভাবেই মানুষের অধিকার নিশ্চিত হইবে। কিন্তু বিরোধীদলীয় নেত্রী সংবিধান না জানিয়া চুক্তি সম্পর্কে অযথা মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছেন।

প্রফেসর কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমর্থনে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি কে এম সোবহান, এডভোকেট গাজীউল হক, ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সৈয়দ হাসান ইমাম, অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, কবি মহাদেব সাহা, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক শাহাদত আলী, সালাহউদ্দিন বাদল, আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, ডঃ ইনামুল হক, ডঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাহবুবউদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম, এডভোকেট সালাম তালুকদার, শাহরিয়ার কবির, হাবিবুর রহমান খান, ইসমত কাদির গামা প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন ডঃ হারুন অর রশিদ।

প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা পাহাড়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করিয়াছি। অশান্ত পরিবেশে দেশ আগাইতে পারে না। তিনি বলেন, শান্তির প্রচেষ্টা হইলেই বিরোধী দল বাধা দিতেছে। তাহারা শান্তি চায় না। চায় অশান্তি। শান্তি চুক্তি হইলে হরতালের ডাক দেওয়াটা শান্তিসুলভ নহে। কবীর চৌধুরী দেশবাসীকে শান্তি নস্যাতের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে কেবল দেশে নহে, বিদেশেও চক্রান্ত চলিতেছে। মাদক ব্যবসায়ীরাও চক্রান্ত করিতেছে। কারণ চুক্তি হইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম রুটে তাহারা ব্যবসা করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, এই চুক্তি হইল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। ইহার মাধ্যমে পাহাড়ীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাও হইতে যাইতেছে।

ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম বলেন, এই শান্তি চুক্তির সহিত দেশের সকল মানুষের ভাগ্য জড়িত। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়া বা না বুঝিয়া হউক ষড়যন্ত্রে পা ফেলিয়াছেন।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, যাহারা এই চুক্তি নিয়া অশান্তি কমিটি করার ঘোষণা দেয় তাহাদের কিভাবে এই দেশে রাজনীতি করিতে দেওয়া হয়? অশান্তি কমিটির জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

আহাদ চৌধুরী বলেন, দেশ স্বাধীন করিয়াছি পাহাড়ী-বাঙ্গালী একসঙ্গে শান্তিতে বাঁচার জন্য। কিন্তু শান্তি চায় না এমন মানুষও এই দেশে থাকিতে

পারে, বিশ্বাস করা যায় না। প্রয়োজনে শান্তির জন্য একাত্তরের মত দামাল ছেলেরা লড়াই করিবে।

গাজীউল হক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ মানুষ ও সৈনিক মরিতেছে। সরকারের অনেক অর্থের অপচয় হইতেছে। দেশের সমস্ত উন্নতি বন্ধ রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পিছনে টাকা ঢালিতে হইতেছে। এইজন্য শান্তি জরুরী।

মমতাজউদ্দিন আহমদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মাদক ব্যবসায় জমজমাট। জামায়াত-শিবিরের অস্ত্রের ব্যবসাও চলিতেছে। এই কারণে তাহারা শান্তি চায় না।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭

**চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে : সন্তু লারমা**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই দশকের সমস্যা সমাধান এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতি চুক্তি সম্পাদনের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আজ-কালের মধ্যেই তাহারা সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারেন।

জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাও (সন্তু লারমা) গতকাল আলোচনা শেষে অনেকটা এই ধরনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে এবং তাহারা শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন করিতে যাইতেছেন। এই সময় তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি কোন কথা বলেন নাই এবং তাহাদের কেহ সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নেরও জবাব দেন নাই।

সূত্রগুলি জানায়, গত দুইদিনের আলোচনার পর সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয়পক্ষই অনতিবিলম্বে চুক্তি সম্পাদনের তাগিদ অনুভব করিয়া তাহাদের মধ্যকার মত-বিরোধ দূর করার ব্যাপারে একমত হন। জানা গিয়াছে যে, অমীমাংসিত বিষয়গুলির সন্তোষজনক সমাধানও তাহারা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে বিষয়গুলি নিয়া শান্তি বাহিনী শেষ মুহূর্তে দরকষাকষি



করিতেছিল সেগুলি হইল ঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠন, শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসার শর্ত নির্ধারণ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা। তবে এ সকল প্রশ্নে তাহারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

গতকাল দুই দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে সকাল ১১টা হইতে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে বিকাল সাড়ে পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সোয়া সাতটা পর্যন্ত।

গতকাল সীমিত পর্যায়ের বৈঠকে সরকারী দলের পক্ষে ছিলেন আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার। অপরদিকে শান্তি বাহিনীর দলে ছিলেন সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা (অশোক) ও রূপায়ণ দেওয়ান (রিপ)।

আজ (শুক্রবার) কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে কিনা তাহা সরকারীভাবে জানান হয় নাই। তবে ধারণা করা হইতেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আজ সকালে আবার তাহারা বৈঠকে বসিবেন।

জনসংহতি সমিতির সহিত শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। এরশাদ সরকারের আমলে ছয়টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বেগম জিয়ার বিএনপি শাসনামলে বৈঠক হয় মোট ১৩টি। গত ডিসেম্বর হইতে আওয়ামী লীগ সাত দফা বৈঠকে বসিয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রামে**
**সতর্কতামূলক**
**ব্যবস্থা গ্রহণ**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একটি মহল পার্বত্য অঞ্চলে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করিতেছে এই মর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন এবং মিছিল বাহির করার জন্য বিরোধী দলের একজন প্রভাবশালী এমপি নিজস্ব ক্যাডারদের এ ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছেন বলিয়া গোয়েন্দা সংস্থা জানিতে পারিয়াছেন। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম হইতে 'ক্যাডারদের' পার্বত্য অঞ্চলে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া এই সূত্র হইতে জানানো হয়। শান্তিবাহিনীর সহিত চুক্তি করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের

অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে এই অপপ্রচারে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই এই অশুভ উদ্যোগের লক্ষ্য বলিয়া জানা যায়।

নিউজ মিডিয়া জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে সামনে রাখিয়া একটি রাজনৈতিক দলের নাশকতার পরিকল্পনা ফাঁস হইয়া যাইবার কারণে প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনীতে শান্তি চুক্তির পর ভারতীয় পতাকা উড়ানো, উস্কানিমূলক দেয়াল লিখন, রাতে গোপনে মাইকিং করা, লিফলেট, পোষ্টার প্রকাশ, সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নাম ব্যবহার করার কথা গোয়েন্দা সংস্থা সরকারের উচ্চপর্যায়ে অবহিত করার পরই প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এসব জেলায় অতিরিক্ত রিজার্ভ পুলিশ, বিডিআর মোতায়েন করা হইতেছে। এ ধরনের দেশদ্রোহী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। সন্দেহভাজন এ ধরনের তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বর্তমান সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করিতে দেখিয়া একটি রাজনৈতিক দল এবং উহার সহযোগীরা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় নামিয়াছে। চুক্তি দেখার আগেই তাহারা বিভিন্ন প্রচারণা শুরু করিয়াছে। চুক্তিকে ব্যাহত করিতে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ তথ্য পাইবার পরই সবকিছু সরকারকে অবহিত করে। প্রশাসনকে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

**শান্তি আলোচনায়**

**শেষ মুহূর্তে জট**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** গত বৃহস্পতিবারের আলোচনার পর সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিলেও শেষ মুহূর্তের দরকষাকষির দরুন উভয় পক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

সূত্রগুলি জানায়, অমীমাংসিত বিষয়াদি লইয়াই এখন বিরোধ বাধিয়াছে এবং চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সেগুলি বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



যে বিষয়গুলি নিয়া তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে সেগুলি হইলঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠন, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ ও তাহাদের যথাযথ পুনর্বাসন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা।

একটি সূত্র জানায়, এ বিষয়গুলির নিস্পত্তি হইলেই যে কোন দিন চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠনের ব্যাপারে দুই পক্ষ একমত হইলেও জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী নির্বাচন এড়াইয়া অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে। এ প্রশ্নে সরকারের মনোভাব জানা যায় নাই। ঠিক তেমনি, ভূমি ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিক পরিষদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছে জনসংহতি সমিতি। কিন্তু সরকার ইহাতে সম্মত হইতেছে না। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ ও তাহাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনার জন্যও জনসংহতি সমিতি কয়েকটি শর্ত আরোপ করিয়াছে। এ ব্যাপারেও তাহারা মতৈক্যে পৌঁছিতে পারে নাই।

সূত্রগুলি জানায়, গতকাল উভয় পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নাই। তবে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বিকাল সাড়ে তিনটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-এর সহিত একান্তে কথাবার্তা বলেন। অপরদিকে, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সারও শান্তিবাহিনীর অন্য নেতাদের সহিত অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অব্যাহত রাখেন।

কেহ কেহ মনে করেন, এই জট খুলিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হইতে পারে।

জানা গিয়াছে যে, আজ (শনিবার) সকালে উভয় পক্ষ আবার বৈঠকে বসিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে**

**–আনিসুজ্জামান**

কয়েকদিন আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একজন ড. আনিসুজ্জামান আছেন। এ বিষয়ে বন্ধু-বান্ধবদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে, ওই

স্বাক্ষরকারী আমি–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান নই; তবে দেশের বেশির ভাগ জনগণের মতো আমিও শান্তি চাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সেখানকার সমস্যা নিয়ে আমি উদ্‌বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত এবং এর আশু সমাধান কামনা করি। সমস্যাটি বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে, ফলে এর সমাধান একদিনেই হয়ে যাবে আশা করা দুরূহ। তবে সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে এগুতে পারে–যত তাড়াতাড়ি হয়, তত মঙ্গল। হাতে ফল পাওয়া না গেলেও তাতে অদূর ভবিষ্যতে সুফল আশা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের মোট এলাকার এক-দশমাংশ। জনসংখ্যা এক শতাংশের কম, তার মধ্যে পাহাড়িদের সংখ্যা ০.৫ শতাংশের মতো। বাকিরা সমতলভূমির মানুষ; সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। ১৮৭২ সালে ওই অঞ্চলে পাহাড়িরা ছিল ৯৮.২৬ শতাংশ, বাঙালিরা ১.৭৩ শতাংশ। ১৯৫১ সালে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০.৯১ এবং ৯.০৮ শতাংশে। ১৯৯১তে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ৫ লক্ষ পাহাড়ি আর ৪.৭ লক্ষ বাঙালি। পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভারসাম্যের অভাব সেখানকার একটা বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

পাহাড়িদের মধ্যে তেরোটি নৃগোষ্ঠী আছে, তার মধ্যে চাকমারাই প্রধান। প্রত্যেক গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। পাহাড়িদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও প্রাণী-পূজারী আছে। তবে সব গোষ্ঠীই বাঙালিদের চেয়ে আলাদা। আবার রাজনৈতিক কারণে সকল পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীকে এখন এক জুম্ম জাতি বলে অভিহিত করা হচ্ছে। কিন্তু বংশপরম্পরায় এসব গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগত স্বতন্ত্র এবং বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার ভেদ উপেক্ষণীয় নয়।

পাহাড়িরা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে বারে বারে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধানের (চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন অফ নাইনটিন হানড্রেড) উল্লেখ করেন। আপাতদৃষ্টিতে এতে পাহাড়িদের–তখন যাদের উপজাতীয় বলা হতো, তাদের–স্বার্থরক্ষা করা হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু এ প্রবিধান আসলে ব্রিটিশ শাসনকেই পোক্ত করেছিল। ততদিনে ব্রিটিশদের সঙ্গে পাহাড়িদের যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হয়ে গেছে, পাহাড়িরা ব্রিটিশদের সার্বভৌমত্ব মানতে বাধ্য হয়েছে, জুম চাষের জায়গায় লাঙলের কৃষি প্রবর্তন করতে গিয়ে গুলী পর্যন্ত চলেছে, বাঙালিরা নানারকম কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনে তাদের এক রকম প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছে।

এই অবস্থায় এই প্রবিধানে এক ধরনের দ্বৈত শাসন চালু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ''বহির্ভূত এলাকা" বলে চিহ্নিত করে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের



প্রশাসন প্রবর্তিত হয়। এখানকার ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) অন্য যে-কোনো জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর হয়ে পড়েন। পুরো এলাকাকে একদিকে তিনটি মহকুমায় ভাগ করে তিনজন মহকুমা অফিসারের (এসডিও) অধীনে ন্যস্ত করা হয়; অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটে সার্কলে ভাগ করে উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে তিনজন প্রধান–পরে তাঁরা রাজা বলেই পরিচিত হন–নিয়োগ করা হয়। ডিসির সম্মতিক্রমে তাঁরা মৌজার দেওয়ান এবং পাড়ার কারবারি নিযুক্ত করতেন–এতে স্থানীয় স্বায়তশাসনের খানিকটা আদল দেখা যায়। ডিসি-র অনুমতি ছাড়া বহিরাগতরা এখানে প্রবেশ করতে, বসবাস করতে কিংবা জমি কিনতে পারতেন না। সে অনুমতি দেওয়া হতো মূলত শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এবং খানিকটা বাসস্থানের জন্যেও।

১৯৪৭ সালে পাহাড়িরা নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে একটা প্রদেশের মর্যাদা দাবি করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পার্বত্য এলাকার অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বিদায়ী ইংরেজ প্রভুরা একে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। পাহাড়ি নেতাদের অনেকেই এই এলাকার ভারতভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। পাকিস্তানকে মেনে নিতে তাঁদের অস্বীকৃতি ছোটখাটো বিদ্রোহের রূপ নেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সামরিক অভিযান চালিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

আইউব খানের উন্নয়ন-দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যকর হয়। এতে জেলার ৪০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে কয়েক হাজার বাঙালি এবং লক্ষাধিক পাহাড়ি নিজেদের জমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়। উচ্ছেদকৃত পাহাড়িরা এ ঘটনাকে তাদের প্রতি সমতলবাসীর অন্যায় আচরণ হিসেবেই দেখে এবং এর দাগ প্রগাঢ় হয় এই কারণে যে, উচ্ছেদকৃত পাহাড়িরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ লাভ থেকেও বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে এই সময়ে ১৯০০ সালের প্রবিধানটি রহিত করা হয় এবং বহিরাগতদের সম্পত্তিলাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। বাঙালিরা আগে থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিতে যে প্রাধান্য লাভ করে এসেছিল, তার সঙ্গে এখন নতুন করে তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু কিছু উন্নয়ন যে হয়নি, তা নয়। তাতে পাহাড়িরা–বিশেষত, চাকমারা–লেখাপড়া শিখে, সরকারি চাকরি লাভ করে এবং প্রথাগত ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তার ফলে পাহাড়ি-বাঙালি বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে।

এদিকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববঙ্গের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, তাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়

এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা প্রবল ঢেউ জেগে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কিংবা পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে পাহাড়িরা কোনো ভূমিকা নেয়নি।

বরঞ্চ ভারতবিরোধী কাজকর্মে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষকে পাকিস্তান সরকার যেভাবে ব্যবহার করেছিল, তাতে কেন্দ্রের সঙ্গেই পাহাড়িদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যেও এমন কিছু ছিল না যা পাহাড়িদের স্বতন্ত্র সমস্যাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এবং ওই পরিস্থিতিতে তা স্বাভাবিক ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জাতীয় সংসদে রাজা ত্রিদিব রায় এবং প্রাদেশিক পরিষদে মানবেন্দ্র লারমার সদস্যপদ-লাভ বাঙালি-পাহাড়ির মানসিক দূরত্বকে প্রতিফলিত করেছিল, কিন্তু তার তাৎপর্য আমাদের কাছে তখন বোধগম্য হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক পাহাড়ি তাতে যোগ দেন। তার চেয়ে বেশিসংখ্যক পাহাড়ি এবং তাঁদের দু'জন নেতা রাজা ত্রিদিব রায় ও অংশু প্রু চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। প্রথম জন বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করেন, দ্বিতীয়জন ডঃ মালেকের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তার চেয়েও বেশিসংখ্যক পাহাড়ি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। ফলে আমাদের চোখে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক পাহাড়িরা ব্যতিক্রম এবং পাকিস্তানের পক্ষপাতী পাহাড়িরাই নিয়ম বলে প্রতিভাত হয়। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়লাভের পরে পাকিস্তানপন্থীরা অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় লাভ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত সামরিক অভিযানে বাংলাদেশবিরোধী এসব ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা হয়।

১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময়ে যখন বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় বাঙালি হবে বলে স্থির করা হয়, তখন মানবেন্দ্র লারমা উপজাতিদের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি করেছিলেন। তিনি উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সত্তার ওপরে জোর দেন এবং বলেন যে, তাঁরা বাংলাদেশী হতে রাজি, তবে বাঙালি হতে সম্মত নন। বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রায়-সমজাতীয়তা, পূর্ববর্তী ২৪ বৎসরের রাজনৈতিক সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা এবং নতুন রাষ্ট্রলাভের আনন্দ–এসবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন লারমার বক্তব্য বাঙালিবিরোধী এবং নতুন জাতির জন্যে ভেদমূলক স্বাতন্ত্র্যপন্থী বলে মনে হয়েছিল। আমরা তাই পাহাড়িদের বাঙালি হতে বলে সমজাতীয় জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পথকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরে জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েও পাড়াড়িদের ওপরে জাতিগত নির্যাতনের সম্ভাবনা বা আশঙ্কাকে ঠিকমতো দেখতে পাইনি।



১৯৭২ সালেই মানবেন্দ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি পরিষদ গঠন করেন এবং অচিরে এর সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। সরকারী উদ্‌যোগে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, কিন্তু এই বোর্ড তেমন কিছু কাজ করার আগেই সংঘটিত হয় বঙ্গবন্ধু-হত্যা এবং রাজনৈতিক আমলের পরিবর্তন। এর পরপরই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানবেন্দ্রের যোগাযোগ হয় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শান্তিবাহিনী আশ্রয় পায়। নতুন শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দাবির উত্তরে বড়রকম সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং ১৯৭৭ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে এই এলাকায় বাঙালিদের বসতি স্থাপন করা হয়, যাতে পাহাড়িদের জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেতে পারে।

বাঙালি বসতি সম্পর্কে দু'টি কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। এক, পাহাড়িরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন, তাঁরাও বাইরে থেকে এসেছেন। সেই অর্থে তাঁরা বাঙালিদের মতোই বহিরাগত। এই যুক্তি ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, আমরা কেউ কোনো এলাকার আদিবাসী নই, সকলেই বহিরাগত, এমনকি, আদম হাওয়াও স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাই তাঁরাও মূলত অন্য লোকের। দ্বিতীয় কথাটা এই যে সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের নাগরিকেরা দেশের যে কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করতে পারেন। তা নিশ্চয় পারেন, তবে দেশের আর কোথাও সরকারী উদ্‌যোগে, রাষ্ট্রীয় অনুদান দিয়ে, কাউকে যে বসতি করে দেওয়া হয়, তারও দৃষ্টান্ত নেই। এক হিসেবে বলা হয়েছে যে, দুই লক্ষাধিক বাঙালি পরিবার সেখানে গত কয়েক বছর বসতি স্থাপন করেছে।

যুদ্ধকালের দুর্বিষহ অবস্থার পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। একটা রাজনৈতিক বিষয়কে সামরিক বিষয়ে রূপান্তরিত করলে যা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাই ঘটেছে। ১৯৭৯ সালে আমাদের সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয় যে, তাঁরা এই সমস্যার সামরিক সমাধানে আস্থাবান। গত জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৌজন্যে আমরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, তিনদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় যাওয়ার সুযোগ পাই। এবারে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়, এক-আধজন ছাড়া প্রায় সব সামরিক কর্তাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপিনসে সশস্ত্র অভ্যুত্থান-রোধে সামরিক বাহিনীর বহু বছরের প্রয়াস যে সফল হয়নি, সেকথা তাঁরা ভালো করে বোঝেন। আমাদের সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে থেকে যেতে চায়, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি আমি দেখতে পাইনি। সেখানকার জীবন অত্যন্ত কষ্টকর এবং

ওই অঞ্চলে মশার কামড়ে নিহত বাঙালি সৈন্যের সংখ্যা শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালি সৈন্যের চেয়ে বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধবিরতি চলছে–মাঝে মাঝে তা যে ভঙ্গ হচ্ছে না, তা নয়, তবু ঠিক যুদ্ধাবস্থা নেই। ভারত ও বাংলাদেশে কাছাকাছি সময়ে সরকারের পরিবর্তন ঘটায় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এবং বাস্তব ব্যবস্থা-গ্রহণের ক্ষেত্রেও কিছু রদবদল ঘটেছে। নতুন করে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে এবং আশা করা যায়, খবু শীঘ্রই শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে শরণার্থী পাহাড়িরা অনেকে ফিরে এসেছেন। আমরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলাম, তখন প্রত্যাগত শরণার্থীদের সঙ্গে এবং বাঙালি-পাহাড়িদের সঙ্গে মিলিতভাবে ও পৃথকভাবে কয়েকটি বৈঠক করার সুযোগ হলো। শরণার্থীদের অভিযোগ, তাঁরা বাড়ি-ঘর জমিজমা ঠিকমতো ফেরত পাচ্ছেন না; চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; বন্যহাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকটি পোল বসিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েও ফল পাননি। এসব অভিযোগ কল্পিত নয়, বাস্তব। ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা এই যে, পাহাড়িদের ভূমিস্বত্ব-সংক্রান্ত কোনো দলিল নেই। জুম চাষ যাঁরা করেন, তাঁরা এককে বছরে এককে জায়গায় তা করে থাকেন। শুধু কারবারিরাই তাঁদের পক্ষে বলতে পারেন যে, সে জমি কার। অন্যদিকে তাঁরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে–সে সময়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে যিনি জমি দখল করে নেন, তিনি সে দখল ছাড়তে চান না। অনেক সময়ে হয়তো প্রশাসনের সম্মতি নিয়েই তিনি এই জায়গা দখল করে রাখেন।

প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রতি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের তুলনায় বেসামরিক কর্মকর্তাদের আমার কম সহানুভূতিশীল মনে হয়েছে। সকলে নয়, তবে অনেকে। ডাক্তার থাকছেন না, বৈদ্যুতিক সংযোগ চাইলে বলা হচ্ছে আগুন জ্বালিয়ে হাতি তাড়ায় না কেন; জমির প্রশ্নে দলিলপত্রের কথা উঠছে। অন্যদিকে নতুন বসতি স্থাপনকারীদের অভিযোগ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পাহাড়িদের পক্ষে, কেননা পাহাড়িরা সহিংস কাজে লিপ্ত। তারা বলছেন, বোধহয় আমরা সহিংস হলে সরকার আমাদের দিকটা দেখবে। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন, নতুন স্থানীয় প্রশাসনব্যবস্থায় পাহাড়িদের তুলনায় তাদের প্রতি বৈষম্য করা হবে। আর নতুন বসতি স্থাপনকারীদের সম্পর্কে পাহাড়িদেরও অনেক অভিযোগ।

এই অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজ নয়, কিন্তু তা অবশ্যকর্তব্য। পাহাড়িদের মানতে হবে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। বাঙালিদের



মানতে হবে যে, 'পাহাড়িরা গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে ভিন্ন। তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সেই সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে এবং বাংলাদেশকে বহুজাতিক দেশ বলে স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা সকলে বাংলাদেশের নাগরিক, সংবিধান আমাদের সমানাধিকার দিয়েছে। সেই সমানাধিকারের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান আমরা চাই। আমরা শান্তি চাই, দেশের উন্নয়ন চাই, সমৃদ্ধি চাই। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। বরঞ্চ রাষ্ট্রকাঠামোর কোনো গোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ থাকলেই রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিপন্ন হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
**২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭**
**পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও শান্তিচুক্তি**
**–শামসুজ্জামান খান**

**(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)**

যতদূর বোঝা যায়, ইংরেজ রাজশক্তি এই অঞ্চলের গোটা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানামাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিতভাবে তাদের শাসনের স্ট্রাটেজি নির্ধারণ করে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ এই একশত বছরে ইংরেজ তার নিজস্ব অবস্থানকে সংহত করেছে। যুদ্ধবিগ্রহের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী ৪০ বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯০০ সালে ১ মে তারিখে তারা জারি করেছে, ১৯০০ সালের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এ্যাক্ট' (CHT Regulation Act 1900) এতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন-রেগুলেটেড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯০০-এর এ্যাক্ট-এর ৩৪, ৫১ ও ৫২ ধারায় এই এলাকার উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ৩৪ ধারা অনুযায়ী বহিরাগত অ-উপজাতিদের জন্য জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ; ৫১ ধারায় অ-উপজাতি কোন ব্যক্তি উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থবিরোধী কোন তৎপরতায় লিপ্ত হলে তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করা যাবে, অন্যদিকে ৫২ ধারায় বলা আছে কোন অ-উপজাতি শুধু জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়েই ঐ এলাকায় প্রবেশ বা বসবাস করতে পারবে।

১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area হিসাবে ঘোষণা করে গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় উপজাতিদের একটা অংশ এর বিরোধিতা করে। এরা ভারতে অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিল। ১৯৬২ সালে

পাকিস্তান সরকার এক সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area-এর পরিবর্তে উপজাতীয় এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৬৪তে উপজাতীয় এলাকার বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করে রেগুলেশন ১৯০০ চালু রাখা হয়। তবে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তান হাইকোর্ট উক্ত রেগুলেশনের ৫১ ধারাকে Ultra-Vires বা রীতি বিরুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩৪নং ধারারও সংশোধন করা হয়। এর ফলে জেলা প্রশাসক কোন অ-উপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা হারান। এবং যেসব অ-উপজাতি ১৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন তাদেরকে জমি ক্রয়ের অধিকার দেয়া হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অবশ্য ৫২ ধারারও কিছু পরিবর্তন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এইসব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এলাকার জনগণের মতামত ও তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সম্মতি বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা হয়নি। এমনকি উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও এদের অংশগ্রহণের সুযোগ বা অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। বরং কোন কোন উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। এর উদাহরণ ঃ এক–১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ ও কাঠের উপর নির্ভর করে বিশাল চন্দ্রঘোনা পেপার মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রকল্পসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে পাহাড়িরা চাকুরী-বাকরীর সুযোগ-সুবিধা প্রায় পায়নি বল্লেই চলে। আমরা সেনাবাহিনীর কয়েকটি ক্যাম্প, তার আশপাশের অবস্থা, স্থানীয় পাহাড়ি ও বাঙালিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনারও সুযোগ পাই। মনে রাখতে হবে এখন যুদ্ধ-বিরতি চলছে এবং বিগত ২৩ বছরে এই প্রথম উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ জীবনের সঙ্গে মানুষের আবার পরিচয় ঘটছে। ভারত সরকারও সাম্প্রতিককালে তাদের এলাকায় শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প রাখতে দিচ্ছে না। ফলে এরা মায়ানমারের দিকে সরে এসে ক্যাম্প করছে। এই অঞ্চল একেবারেই দুর্ভেদ্য। মিজোরামের সীমান্তের দিকে ১২৬ কিলোমিটার এলাকায় আমাদের কোন বর্ডার আউটপোস্ট নেই। ১৯৭৬ সালে ইনসারজেন্সির প্রথম পর্যায়ে বার্মিজ কমিউনিষ্ট পার্টি পাহাড়ি গেরিলাদের ট্রেনিং দেয়। কিছু বিদ্রোহী দেরাদুনেও প্রশিক্ষণ লাভ করে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লেখ করার মতো কোন শান্তিবাহিনী ক্যাম্প নেই। তবে সাজেক অঞ্চলে উত্তরের গভীর বনভূমিতে কিছু অস্থায়ী ক্যাম্প ছিলো। এইসব ক্যাম্প নেই। তবে সাজেক অঞ্চলের উত্তরের গভীর বনভূমিতে কিছু অস্থায়ী ক্যাম্প ছিলো। এইসব ক্যাম্পে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব ক্যাম্পসহ শান্তিবাহিনীর সীমান্ত অঞ্চলের ক্যাম্প বা অস্থায়ী গোপন আশ্রয়স্থল থেকে হামলা চালানো হতো। এই অঞ্চল গেরিলা



যোদ্ধাদের জন্য স্বর্গরাজ্য। তারা সেই পদ্ধতিতেই যুদ্ধ চালিয়েছে এতদিন। এই গেরিলাযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য তারা বছরে ২৫-৩০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে। পাহাড়ি-বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়নকর্মী, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী সকলকেই চাঁদা দিতে হয়। চাঁদাবাজির এই জুলুম ভয়ে ত্রাসে-শঙ্কায় মানুষ সহ্য করে। সেনাবাহিনী ছাড়া আর সকলেই এই জবরদস্তি চাঁদাবাজির শিকার। বিগত ১৭ আগষ্ট আমরা চট্টগ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে করে রাবার বাজার সেনাছাউনিতে যাই। হেলিকপ্টার পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকে দু'টি লাইট মেশিনগান কপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরের বনাঞ্চলের দিকে তাক করে রাখা হয়। যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও নিরাপত্তামূলক সতর্কতার জন্য এই ব্যবস্থা। দু'একবার হেলিকপ্টার আক্রমণের মুখে পড়েছে বলেই এই অবস্থা। যাহোক, ১৯৯৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী এই ক্যাম্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুটো পাশাপাশি পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত নিচুটিতে হেলিপ্যাড করা হয়েছে–উঁচুটিতে ক্যাম্প। বাবুছড়ায় জোন কমান্ডার আমাদের অভ্যর্থনা জানান। উঁচু-নিচু খাঁজকাটা রাস্তা দিয়ে আমরা সেনাছাউনিতে উঠে আসি। চারদিকে শান্ত, সবুজে ঘেরা মনকাড়া সৌন্দর্যের ঘেরাটোপ। ঘুঘুর ডাকও শুনলাম। সেনাছাউনির পাদদেশে ছোট্ট একটি জলাশয়। এখান থেকে ৪০০ ফিট নিচে একটি পুকুর। খাবার ও গোসলের পানির উৎস ঐ একটাই–ওখানে গোসল করে পাহাড়ে উঠতে উঠতে আবার ঘামেই আর একটা গোসল হয়ে যায়। পাহাড় থেকে নিচে নামার বেশ নিচু একটা ধাপে দেখলাম কয়েকজন উপজাতি বসে আছেন। এরা কেউ রাবার বাগানের কর্মী কেউবা সেনাবাহিনীর শান্তকরণ কর্মসূচীর (Pacification programmes) সুবিধাভোগী। ক্যাম্প কমান্ডার লেঃ কাজী মুরশেদ আমাদের জন্য উপস্থাপনা করলেন, ভদ্র, বিনয়ী বুদ্ধিমান সেনাঅফিসার। লম্বা ঘর, বসবার জন্য ব্যবস্থা, সাধারণ সৈনিক ও অফিসারের থাকার ব্যবস্থা সবই খুব সাধারণ, তবে নিপাট। একদিকে পাহারারত সৈন্যের মেশিনগান পাহাড়ের দিকে তাক করা। সেনা সদস্যরা বেশ উচ্ছল, প্রাণবন্ত। অফিসার-সৈনিক সম্পর্কও বেশ সহজ এবং কিছুটা কাছাকাছি। নির্জন এলাকার নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা এবং অস্বাভাবিকতা, পরিস্থিতিকে এমন করেছে। এ এলাকায় ২০০০ লোকের বাস। প্রধানত ত্রিপুরা অধ্যুষিত এলাকা। ত্রিপুরারা কিছুটা বাঙালিদের মত। ৪১ জন পুরুষকর্মী রাবার বাগানে কাজ করে। শান্তকরণ কর্মসূচীর আওতায় রাবার বাগানের লাভের ৬০% শ্রমিকদের দেয়া হয়। কর্নেলের উপস্থাপনা থেকে জানা গেল সেনাবাহিনী ত্রিপুরাদের জন্য মন্দির করে দিয়েছেন। পূজা করতে সহযোগিতা করা হয়। ৭টি চাকমা পাড়াও এ অঞ্চলে আছে। উপস্থাপনা

থেকে জানা গেল ক্যাম্পের ২ মাসের রেশন একসঙ্গে আসে পোর্টারের মাধ্যমে। স্যালাইন পানিও আসে। মশা ও ম্যালেরিয়ার ভয় আছে। এখানকার মশা ভয়ঙ্কর এবং হন্তারক। পাহাড়িদের তেমন অসুবিধা হয় না-তারা অভ্যস্ত। আমাদের সৈন্যদের জন্য শান্তিবাহিনী নয়, এই মশাই ত্রাস। আমাদের পেয়ে সৈন্যরা আনন্দিত। যত্নআত্তির জন্য তৎপর। চিপস, পিঁয়াজো ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। ওদের থালা-প্লেট ও পরিবেশন সামগ্রীতে দেশজ ও স্থানিক উদ্ভাবনা আছে। আজ এদের খাবার মেনুতে ছিলো ঃ ভাত, ঢেঁকি শাক, ঢেঁরসভাজি, ডাল ও গোস্ত। একটু উন্নত খাবারই বলতে হবে। এতটা ভাল খাবার সব দিন হয় না। দাবা-কেরাম খেলার ব্যবস্থা আছে। টেলিভিশনও চলে। এ নির্জন অঞ্চলে এই নিয়েই ভয়ে শঙ্কায় উদ্বেগে দেশের জন্য জীবনযাপন। দেশপ্রেমিকতার পরীক্ষায় আমাদের সেনা সদস্যদের উজ্জ্বল উত্তরণের এক চমৎকার উদাহরণ।

১৭ আগষ্ট বিকেলে আমরা খাগড়াছড়ি পৌছি। শেষ বিকেলে সার্কিট হাউসে বাঙালি-পাহাড়ি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক হয়। আওয়ামী লীগ, জাসদ, জাপা, জামায়াত নেতারা এবং হংসধ্বজ চাকমা, অনন্ত বাবুসহ প্রবীণ ও ঝানু পাহাড়ি নেতারা এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, আমরা আপনাদের দু'তিনজনকে চিনি এবং আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভাবনা ও বিপরীতধর্মী মতাদর্শের সঙ্গেও পরিচিত। এই অবস্থায় আপনাদের দলটির গঠন ও এর উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এর উত্তরে গিয়াস কামাল চৌধুরী ও আমি বলিঃ 'আমাদের মতামত ও অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও শান্তি প্রক্রিয়া চালু থাকুক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, স্বস্তি ও অগ্রগতির ধারা প্রতিষ্ঠিত হোক-এটাই আমাদের অন্তরের কামনা।' তারা আশ্বস্ত হন, তবু কেউ কেউ বলেনঃ 'সামরিক বাহিনীর সঙ্গে এবং তাদের হেলিকপ্টারে করে এলেন কেন? তৃণমূলে মিশুন, আমাদের সঙ্গে পাড়ায় মহল্লায় চলুন' পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহলেই ভাল করে জানতে-বুঝতে পারবেন। ডঃ তারেক শামসুর রহমান তখন বললেনঃ আপনারা এখানে সেমিনার বা মতবিনিময় অনুষ্ঠান করুন। আমাদেরও খবর দেবেন, আমরা আগ্রহের সঙ্গে আসবো। ঘণ্টাখানেককাল ধরে এখানে কথা হয়। সকল মহলের মতামত বেরিয়ে আসে। খুব খোলামেলা কথা হয়। হংসধ্বজ বাবু একবার বলেনঃ সব দৃষ্টিকোণ তুলে ধরুন, তবে কেউ এমন কিছু বলবেন না যাতে চলমান সংলাপ ও শান্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে যায়। আমরা আলোচনাকে সংহত ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে সযত্ন প্রয়াস চালাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে দৃঢ় থেকে কথা বললেও সবাই



শান্তি চান, এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ বলেন ঃ 'বাঙালিরা স্মরণাতীতকাল ধরে পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের সঙ্গে বসবাস করছেন। তাতে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। কারণ সেটা ছিল একটা নেচারাল প্রসেস। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমাদের বিলুপ্ত করতে এবং এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের অধিকার ও প্রাধান্য খর্ব করতে জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব ১৯৭৯-এ তিন/চার লক্ষ বাঙালীকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে আমাদের উপর জোরজবরদস্তি চাপিয়ে দেন। এটা অন্যায়, এটা ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচায়ক। এটা জাতিগত নিপীড়নের কৌশল। এটা আমাদের দাবিয়ে রাখার, ধ্বংস করে দিবার প্রয়াস। অন্যদিকে বাঙালি প্রতিনিধিরাও তাদের বঞ্চনা এবং অসহায়তার উদাহরণ তুলে ধরেন। শান্তিবাহিনীর নির্মমতা, চাঁদাবাজি ও হত্যাযজ্ঞের নজির তুলে ধরেন। তাদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ আনেন। তবে সব মিলিয়ে বলা হয়, সকলেই শান্তিতে সহ-অবস্থানের পরিবেশ চান।

১৮ তারিখ সকালে আমরা দীঘিনালা শরণার্থী শিবির দেখতে যাই। শরণার্থীরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলেন। তাদের জমি বেদখল হবার কথা বলেন। সেনা সদস্যদের সামনেই তারা নানা অভিযোগ তুলে ধরেন। এতে বোঝা যায় সেনা সদস্যরা ধৈর্য ও সহনশীলতার বিচক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছেন। তবে গুচ্ছগ্রামে ঘুরে-ফিরে দেখে তৃণমূল পর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা যায়। মনে হয় টেনশন ও অশান্তি আছে। থিতু হয়ে বসবার পর্যায়ে শরণার্থীরা তখনো আসেনি। ব্রিগেডিয়ার আশফাক মিশুক প্রকৃতির মানুষ। তিনি ও তাঁর বাহিনীর সদস্যরা উন্মুক্ত ময়দানে চেয়ার টেবিল পেতে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। হাসি ঠাট্টা করলেন। তাঁর টেলিফোন-এ যোগাযোগ করে চলে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন আমাদের। তারপরে আন্তরিক বিদায় জানালেন।

দীঘিনালা থেকে চিংলকপাড়া ক্যাম্প-এ যেয়ে সেনা সদস্যদের দুঃখ-কষ্টের গভীরতা উপলব্ধি করি। ঘরে যারা আছেন তারা মশারির ভেতরে বসে বা শুয়ে আছেন। বেশ কজন রুগী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। হাতিপোকা নামে এক ভয়ঙ্কর পোকার উৎপাত। বাইরে যারা কাজ করছেন বা চৌকি পাহারা দিচ্ছেন তারা বোরখার উপরের অংশের মত মশারির এক ঝুলন্ত অংশ মাথায় পরে আছেন-যা কাঁধের শক্ত জামা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এনোফিলিস মশার ভয়ে এই সতর্কতা। কোন সময় এই মশার কামড়ে দূষিত রক্ত মাথায় চলে গেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও রুগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। এ ক্যাম্পে ভীতিকর অবস্থার তীব্রতা রাবার বাজার ক্যাম্পের চেয়ে বেশী। এখানেই শুনলাম এক আর্মি আফসারের ১৩ বছরের এক ফুটফুটে মেয়ে ছুটি

কাটাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমিতে বাবার কাছে এসেছিলো। কিন্তু ওই হন্তারক মশার কামড়ে তার জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে। চিংলকপাড়া ক্যাম্পেও শান্তকরণ কর্মসূচীর আওতায় স্কুল, সমাজ সেবা কেন্দ্র, সুদহীন ঋণ প্রভৃতি চালু করা হয়েছে। 'শান্তকরণ কর্মসূচী' খুব মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন আনবে না। তবে এটা সংহতি, সমন্বয় ও সহ-অবস্থানের একটা প্রয়াস বটে। চিংলকপাড়ায় ত্রিপুরা বেশী এর পরে মুরং। এদের সঙ্গে চাকমাদের সম্পর্ক অতটা সুদৃঢ় নয়।

বান্দরবান-এ এসে হোঁচট খাই। পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু আমাদের গাড়ীর সামনে প্রোটেকশন কারে মেশিনগান ফিট করা। অনেকটা যুদ্ধাবস্থার মতো। এভাবেই স্থানীয় সরকার পরিষদে এলিটদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে যাই। এই সভায় একজন উপজাতীয় প্রতিনিধি বলেন ঃ 'স্থানীয় সরকার পরিষদকে শক্তিশালী করতে হলে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।' নাট্যকার কাজি নাসির বলেন ঃ 'সরকারকে শান্তি উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন জানাই। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তির ফলে যে যে অবস্থানে আছে তা ঠিক থাকলে শান্তিচুক্তি ঠিক আছে। শান্তিবাহিনী ছাড়াও অন্য উপদল আছে। তাদের কি লারমা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন?' পৌর চেয়ারম্যান জনাব আইয়ুব চৌধুরী বলেন ঃ একটি মহল এ এলাকাকে মিয়ানমারের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন ছাত্রনেতা, উপজাতীয় কোটায় ছাত্র ভর্তির বিরুদ্ধে বলেন, লুসাই মং বান্দরবান সেনাবাহিনীর অবস্থান চান। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীর সমঅধিকার দাবী করেন কোন কোন বক্তা।

বান্দরবান থেকে হেলিকপ্টারে রাঙ্গামাটি যাবার সময় পাহাড়ের উপরে অসম্ভব সুন্দর একটি লেক আমাদের দেখানো হয়। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যে অভিভূত হই। রাঙ্গামাটিতে জোনাল কমান্ডারের উপস্থাপনাটি ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। চাকমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংগ্রাম শিক্ষা-দীক্ষার একটা নিখুঁত চিত্র পাই। চাকমাদের শিক্ষার হার ৭২%। অন্যদের ২০%-এর বেশী নয়। সাধু বনভান্তের কথাও শুনি। আমি ও ডঃ তারেক তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ চাই। ভবিষ্যতে সে সুযোগ করে দেয়া হবে বলে বলা হয়। আরো বলা হয় ৬০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। বিশেষ ইকোনমিক জোন করা হবে। এও বলা হয়–পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতলের ৫০% জেলার চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত।

রাঙ্গামাটিতে সুধীজনের সঙ্গে দু'দফা আলোচনায় মিঃ বি, কে দেওয়ান, চারুবিকাশ চাকমাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মিঃ চাকমা বলেন, জমির সমস্যা সমাধান হলেই শান্তি সম্ভব। তিনি বলেন, ১৯৭৯-এ যে সব



বাঙালী এসেছেন তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামেরই অন্যত্র স্থানান্তর করে শান্তি আনা যায়। তিনি বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধ ও স্বায়ত্তশাসন এ দুটোই 'আসল সমস্যা'। সাংবাদিক মোকলেছুর রহমান বলেন, 'বাঙালীরা হত্যাযজ্ঞের শিকার। এরা মুসলমান বাঙালির প্রতি বৈরী। এতে বোঝা যায়, সমস্যার একটা অংশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা আছে। এ সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক রূপ নিয়েছে।' তিনি বলেন, ১৯০০ সালের আইন বাতিল করে সুচিন্তিত নতুন আইন করতে হবে। জনাব শাখাওয়াত হোসেন বলেনঃ পাহাড়িরা আমাদের accept করতে চায় না। একজন বলেন ঃ উপজাতিদের এদেশের প্রতি Sense of belonging নেই। কিছু কিছু এন.জি.ও'র নেতিবাচক ও বৈরী ভূমিকাও সামনে আসে। ১৯ তারিখ দুপুরে আমতলী ক্যাম্পে দেখি এখানে বাঙালিরা চাষবাস করছেন। গাছপালা, ফলমূল এবং সমতলের গাছ যেমন ডাব গাছ ও কাঁঠাল গাছ ইত্যাদি লাগিয়েছে। চাষাবাদে একটা নতুন ধরন ও মৎস্য চাষ হচ্ছে। এখানকার সেনা ক্যাম্পও সমতলে। তাই বেশ সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ও আরামদায়ক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল আয়তন ১৩২৯৪.৭১ বর্গ কিলোমিটার বা ৫০৯৩ বর্গমাইল। দেশের সমগ্র এলাকার ১০ ভাগের এক ভাগ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। তিনটি পার্বত্য জেলার ২৫টি থানা রয়েছে। এ অঞ্চলের সীমানা মিজোরামের সঙ্গে ১৭৫.৮৬ কিলোমিটার, ত্রিপুরার সঙ্গে ২৩৬.৮০ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সঙ্গে ২৮৮.০০ কিলোমিটার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ৯,৭৪,৪৪৫ জন। এখানে তেরটি উপজাতি বাস করে। এ অঞ্চলে বাঙালি বাস করে ৩৯.৮৮%। উপজাতিরা নতুন জীবন পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। আধুনিক জীবনের ছোঁয়া লাগছে।

শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এ অঞ্চলে জীবন ফিরে এসেছে। ঢাকায় শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ায় এবং শান্তিচুক্তি হবার ঘোষণায় সারা দেশে ও পাহাড়ি এলাকায় প্রাণচাঞ্চল্য ও উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। সবাই শান্তি চায়। জনমত জরিপে ৯০%-এরও বেশী শান্তিচুক্তির পক্ষে। সিভিল সমাজ বিভিন্ন সংগঠন এই লক্ষ্যে কাজ করছে। শান্তি হলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটবে। এ অঞ্চলের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হবে। যুদ্ধবিরতির সময়ও বান্দরবানে বা রাঙামাটিতে আমাদের মেশিনগানের ছত্রচ্ছায়ায় ঘুরতে হয়েছে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সে অবস্থা থাকবে না। এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ গোটা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। এ অঞ্চলের অস্ত্র ব্যবসা ও চোরাচালান দূর হবে। উগ্র মৌলবাদীদের ক্যাম্প এবং পাকিস্তানের আশ্রয়-প্রশ্রয়প্রাপ্ত তৎপরতা দূর হবে। সম্ভবতঃ সেজন্যই কুখ্যাত স্বাধীনতাবিরোধী প্রধান জামায়াত নেতা শান্তিচুক্তি নিয়ে এত পেরেশানিতে আছেন। ভারতের

যে সাতটি রাজ্যে বিপ্লবের কথা বলা হয় এবং কেউ কেউ তাতে পাকিস্তান আমলের রণনীতি অনুযায়ী সমর্থন দিতে চান–তা কি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা? এটা বুমেরাং হয়ে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে আঘাত করতে পারে।

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষি, উদ্যান চাষ, ফলের বাগান, বাঁশ, কাঠ, মাছের চাষ ও তরিতরকারি চাষে গ্রামীণ অর্থনীতি খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে।

সেনাবাহিনীর তিনটি ক্যান্টনমেন্ট বজায় রেখে অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ গুটিয়ে আনলে কোন ক্ষতি নেই। এতে বছরে ৫০০ কোটি টাকা বাঁচবে। এ দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন হতে পারবে। ক্যাম্পে সেনা সদস্যদের দুর্বিষহ জীবনের অবসান ঘটবে। এখন নিরাপত্তার ধারণায় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় যুক্ত হয়েছে।

অতএব শান্তিচুক্তি সারা জাতির প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণ হোক। এরপরে সতর্কতার সঙ্গে এই চুক্তির বাস্তবায়ন করতে হবে। সে পর্যায় হবে অত্যন্ত কঠিন। 'জুম্মজাতি' এখন যেমন ঐক্যবদ্ধ পরে ততটা থাকবে না। বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতির দাবী মিটাতে হবে। বাস্তবতা প্রখর থেকে প্রখরতর হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতি নির্ধারণ করতে হবে। এবং এর মধ্য থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যারও সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে জনসংহতি সমিতিকে তাদের ৫-দফাকে সঙ্কুচিত করে অনেক ছাড় দিতে হবে। তবেই বাস্তবে শান্তি আসবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩০শে নভেম্বর ১৯৯৭

বরগুনার জনসভায় খালেদা জিয়া

**শান্তি চুক্তির নামে দেশের মাটি ভারতের কাছে হস্তান্তর চলিবে না**

**বরিশাল অফিস, বরগুনা (উঃ ও দঃ) সংবাদদাতা ॥** বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, জাতীয় সংসদে আলোচনা না করিয়া শান্তি চুক্তির নামে দেশের মাটি ভারতের কাছে হস্তান্তর করা চলিবে না। এই চুক্তি সই হইলে 'দেশ বিদ্রোহী'-এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইবে। গতকাল (শনিবার) বিকালে বরগুনা কলেজ মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে বেগম জিয়া বলেন, শান্তিচুক্তি কার্যকর করার সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের হাতে চলিয়া যাইবে। এক-দশমাংশ ভূখণ্ড



হাতছাড়া হইয়া যাইবে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ভারতের সাথে এসব ব্যাপারে আগাম চুক্তি করায় ভারত ঐ দলকে ক্ষমতায় বসাইয়াছে।

খালেদা জিয়া বলেন, শান্তি চুক্তির নামে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সাথে আলাপ করা হইতেছে। যাহারা ভারত হইতে প্রশিক্ষণ নিয়া ও অস্ত্র নিয়া আমাদের সেনাবাহিনী ও বিডিআর সদস্যদের সাথে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সাথেই এখন চুক্তির আয়োজন চলিতেছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীনের পর ২৫ বছর মেয়াদী গোলামি চুক্তি করিয়াছিল। আমরা ক্ষমতায় গিয়া ঐ চুক্তি ভাঙ্গিয়া দেশকে শৃংখলমুক্ত করিয়াছি। পানি চুক্তির পর পানি সরবরাহ আরও হ্রাস পাইয়াছে। পানির স্তর কমিয়া যাওয়ায় দেশ ভূমিকম্পের কবলে পড়িতেছে। খালেদা জিয়া বলেন, সরকার কৃষক বাঁচাও আন্দোলন শুরু করিয়াছে। অথচ দেশের ৮৫ ভাগ কৃষক আজ দুর্দশাগ্রস্ত। কৃষিপণ্যের মূল্য তাহারা পাইতেছে না। কৃষি উপকরণের মূল্যও সরকার বৃদ্ধি করিয়াছে। বেগম জিয়া বলেন, দেশে বিদ্যুৎ সংকট একটি পরিকল্পিত সংকট। ভারতের নিকট হইতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ চুক্তি করার লক্ষ্যে ঐ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হইতেছে। তিনি বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দারুণ খারাপ। ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপত্তা নাই। মহিলারা ঘরের বাইরে যাইতে পারে না। সন্ত্রাসীরা হইতেছে সরকার দলীয় লোক। তাহারা সন্ত্রাস করিলেও গ্রেফতার হয় না। তাহারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করিতেছে। দুর্নীতিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। অর্থনীতির অবস্থা মন্দা। টাকার অবমূল্যায়ন হইয়াছে ১১ বার। দেশে শিক্ষার পরিবেশ নাই। কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভোট বাক্স হাইজ্যাক হইতেছে। এভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হয় সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন। ইহাতেই তাহারা তৃপ্তি পায়।

বিএনপি নেত্রী বলেন, বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পণ্য করা হইয়াছে। সীমান্ত খুলিয়া দিয়া ভারতীয় পণ্যে এদেশের বাজার সয়লাব করা হইয়াছে। দেশে কোন উন্নয়নমূলক কাজ হইতেছে না। বায়তুল মোকাররম মসজিদের চারিদিকে ১৪৪ ধারা জারি রহিয়াছে। দুর্গাপূজার মণ্ডপ হইতে স্বর্ণালংকার চুরি যায়। এ সরকার ধর্মে বিশ্বাসী নয়। মিথ্যা কথা বলায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, সরকার গণতন্ত্রের কথা বলেন। অথচ সংসদে আমাদের কথা বলিতে দেওয়া হয় না। বিরোধী দলীয় নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমি মাইক পাই না। ইউপি নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই নির্বাচনে কারচুপি হইলে সরকার পতনের আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইবে।

দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার বলেন, ১২ই জুন ভোট চুরির মাধ্যমে এ সরকার ক্ষমতায় আসিয়াছে। ইউপি

নির্বাচনে ভোট চুরি করিলে ক্ষমতায় থাকা যাইবে না। মীর শওকত আলী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া করা যাইবে না।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এম,পি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতীয় আগ্রাসন হইতে রক্ষার জন্য আমাদের আন্দোলন করিতে হইবে। শেখ হাসিনা হাত জোড় করিয়া একবারের জন্য ক্ষমতায় যাইতে চাহিয়াছিলেন, ক্ষমতায় গিয়াই ভারতের কাছে দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র পাকাপাকি করিয়াছে।

গতকাল দুপুর ১২টায় বেগম খালেদা জিয়া পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী লঞ্চযোগে বরগুনায় পৌঁছান। লঞ্চঘাটে হাজার হাজার লোক তাহাকে স্বাগত জানায়। বরগুনা সার্কিট হাউসে এক কর্মী সম্মেলনের পর বিকাল ৪টায় তিনি সভামঞ্চে পৌঁছান। সভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ফারাক্কা বাঁধ আওয়ামী লীগের সৃষ্টি। ৩০ বছরের পানি চুক্তির পরেও পানি আসে নাই। ফারাক্কার কারণে পানির স্তর নামিয়া যাওয়ায় আজ দেশে আর্সেনিক সমস্যা। আমাদের আন্দোলন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে রহিয়াছে প্রচুর খনিজ সম্পদ, কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ, চট্টগ্রাম বন্দর। শান্তিচুক্তির নামে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ ভারতের হাতে চলিয়া গেলে দেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ভারতীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনীর সহিত কোন শান্তিচুক্তি হইতে পারে না।

বর্তমান সরকার দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে। এই সরকারের ব্যর্থতার কারণেই দেশে আজ বহু ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তিনি বলেন, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হইয়া বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সরকার রেডিও-টেলিভিশনে মিথ্যা প্রচারণা চালাইয়া যাইতেছে।

জেলা বিএনপি সভাপতি মাহাবুবুল আলম ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন এম,পি, মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদ এম,পি, সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সেলিমা রহমান, মেজর (অবঃ) শাহজাহান ওমর এম,পি, মোশারেফ হোসেন মংগু এম,পি, অধ্যক্ষ আঃ রশীদ খান, জেলা শাখার সম্পাদক ফজলুল হক ছগীর, দেলোয়ার হোসেন মন্টু প্রমুখ বক্তৃতা করেন। জনসভায় বরগুনা পৌরসভার পক্ষ হইতে বেগম খালেদা জিয়াকে স্বর্ণনির্মিত চাবি উপহার দেওয়া হয়। বেগম জিয়ার আগমন উপলক্ষে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি রাত ৮টায় সফরসঙ্গীদেরসহ লঞ্চযোগে বরগুনা ত্যাগ করেন।



**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩০শে নভেম্বর ১৯৯৭

**গতকাল সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যে বৈঠক হয় নাই**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে সরকার ও জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় দিনের মত গতকাল (শনিবার)ও কোন আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নাই। তবে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অব্যাহত রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ৭ম বৈঠক শুরু হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) সাংবাদিকদের জানান, খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে এবং তাঁহারা শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদন করিতে যাইতেছেন। সূত্রগুলি জানায়, ইত্যবসরে অমীমাংসিত বিষয়গুলির নিস্পত্তির ব্যাপারে শান্তিবাহিনী উহার প্রস্তাব পেশ করিলে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাহা প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। অমীমাংসিত বিষয়গুলি হইতেছেঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক নিয়োগ, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ ও তাঁহাদের পুনর্বাসন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা।

আজ (রবিবার) সকালে কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে না। তবে বিকালে আবার আলোচনা চলিতে পারে বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, দুই পক্ষের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে, তাহা দূরীভূত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলিতেছে। সূত্রটি জানায়, এবারের বৈঠকেই চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

এদিকে বর্তমান পর্যায়ের শরণার্থী প্রত্যাবাসন আগামী ৬ই ডিসেম্বর সমাপ্ত হইবে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারটি নির্ভর করিতেছে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উপর।

**আরও ১০৯৯ জন শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন**

এদিকে গতকাল ভারতের ত্রিপুরা হইতে চতুর্থ পর্যায়ের চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের নবম দিনে আরও এক হাজার ৯৯ জন শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এই সকল শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত আনা হয় রামগড় মন্দিরঘাট সীমান্ত দিয়া। এই সীমান্ত দিয়া চতুর্থ পর্যায়ের শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ইহাই ছিল প্রথম। এখানে গতকাল শরণার্থীদের প্রথম দলটিকে অভ্যর্থনা জানান খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল। ওপারে

শরণার্থীদের বিদায় জানান দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা প্রশাসক মিঃ লোকরঞ্জন। রামগড় সীমান্ত পথে গতকাল ১শ ৪ পরিবারের ৪শ ৩১ জন এবং মাটিরাংগার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়া ১শ ২৩ পরিবারের ৬শ ৬৮ জন শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করে। আজ (রবিবার) এই দুই পথ দিয়া আরও ২শ ১২ পরিবারের এক হাজার ১২ জন শরণার্থী দেশে ফিরিয়া আসার কথা। তবে গত ২১শে নভেম্বর হইতে গতকাল পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়ে এক হাজার তিনশত ৮১ পরিবারের ৭ হাজার ৬ শত ২০ জন ফিরিয়া আসে। আগামীকাল সোমবার হইতে পঞ্চম পর্যায়ের তালিকাভুক্ত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন শুরু হইবে এবং তাহা একনাগাড়ে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে। এদিকে প্রত্যাগত শরণার্থীরা স্ব স্ব গ্রামের নিকটবর্তী ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌঁছিবার পর পরই প্রশাসন তাহাদের মধ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য ঢেউটিন বিতরণ করিতেছে। গতকাল পর্যন্ত ৭ শত পরিবারের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ করা হইয়াছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## শান্তি বাহিনী
## যা চেয়েছিল

**এক ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং নির্বাচিত এই পরিষদের অধীনে বিভিন্ন সরকারী ও আধাসরকারী অফিস ন্যস্ত করা।

**দুই ঃ** চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খেয়াং ও চাক এই ১০টি ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য 'বিশেষ শাসনবিধি' প্রণয়ন, বহিরাগতদের জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত প্রদান নিষিদ্ধ করা, সরকারী কর্মকর্তা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয় এমন ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ, গণভোট ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন না করা, স্বতন্ত্র পুলিশবাহিনী গঠন, যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে জরুরী অবস্থা ঘোষণা না করা, সকল সরকারী ও আধা-সরকারী পদে স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ করা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক ও ইউনিট গঠন করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া 'জুম্মল্যান্ড' করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন, জুম্ম জনগণের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, জাতীয় সংসদে জুম্ম জনগণের জন্য আসন সংরক্ষণ করা, সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা, জমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন-এমন লোকের দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য উপায়ে প্রাপ্ত জমি প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া ও জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা।

**তিন ঃ** ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের বহিষ্কার, ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নরনারী ভারতে গিয়াছে তাহাদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন।

**চার ঃ** সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া নেওয়া, কোন সেনানিবাস স্থাপন না করা, জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের পুনর্বাসন ও মামলা প্রত্যাহার, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ, সরকারী চাকুরীতে বয়ঃসীমা শিথিল করা, সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, ভূমিহীনদের জমি বরাদ্দ করা, পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন, উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা ও উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা।

**পাঁচ ঃ** সাজাপ্রাপ্ত ও গ্রেফতারকৃত জুম্ম নর-নারীদের বিনা শর্তে মুক্তি দান, পার্বত্য চট্টগ্রামকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা, গুচ্ছ গ্রাম ভাঙ্গিয়া দেওয়া। অন্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা, গুচ্ছ গ্রামে বসবাসরতদের বহিষ্কার এবং সেনানিবাস ও ক্যাম্প প্রত্যাহার।—**নিজস্ব প্রতিনিধি**

**দৈনিক ইত্তেফাক**
১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৭

## এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম

**রাঙ্গামাটি**

| | | |
|---|---|---|
| আয়তন | ঃ | ৬১১৬.১৩ বর্গ কিঃমিঃ |
| জনসংখ্যা | ঃ | ৪,০১,৩৮৮ (উপজাতীয়-২,২৩,২৯২ জন+বাঙ্গালী-১,৭৮,০৯৬) |
| শিক্ষার হার | ঃ | ৩৬.৪৮% জন |
| মৌজার সংখ্যা | ঃ | ১৬৪টি |
| ইউনিয়ন সংখ্যা | ঃ | ৪৭টি |
| থানার সংখ্যা | ঃ | ১০টি |

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ কলেজ-৩টি
উচ্চ বিদ্যালয়-৩৯টি
জুনিয়র বিদ্যালয়-১২টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫০৭টি
কারিগরি বিদ্যালয়-৩টি

উপজাতির সংখ্যা ঃ ১১টি (চাকমা, মার্মা, তংচংগা, ত্রিপুরা, পাংখো, লুসাই, বম, খিয়াং, মুরুং, চাক, খুমী)।

## খাগড়াছড়ি

আয়তন ঃ ২৬৬০ বর্গকিলোমিটার
জনসংখ্যা ঃ ৩,২৯,৯২৩ জন
(উপজাতীয় ঃ ২,০৪,৬৩৫ + বাঙ্গালী ঃ ১,২৫,৬৪০ জন)
শিক্ষার হার ঃ ২০% জন
মৌজার সংখ্যা ঃ ১২০টি
ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ ৩৪টি
থানার সংখ্যা ঃ ৮টি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ কলেজ-৫টি
উচ্চ বিদ্যালয়-২৫টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৫৬টি
কারিগরি বিদ্যালয়-১টি

উপজাতির সংখ্যা ঃ ৩টি (চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা)

## বান্দরবান

আয়তন ঃ ৪৫০২ বর্গকিলোমিটার
জনসংখ্যা ঃ ২,৩০,৫৬৯ জন
(উপজাতীয় ঃ ১,১০,৩৩৩ + বাঙ্গালী - ১,২০,২৩৬ জন)
শিক্ষার হার ঃ ২৩.৮৮% জন
মৌজার সংখ্যা ঃ ৯৬টি
ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ ২৯টি
থানার সংখ্যা ঃ ৭টি



শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ কলেজ-২টি
উচ্চ বিদ্যালয়-১৫টি
জুনিয়র বিদ্যালয়-২৮টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩১০টি

উপজাতির সংখ্যা ঃ ১২টি (মারমা, মুরুং, ত্রিপুরা, তংচংগ্যা, বম, চাকমা, খুমী, খিয়াং, চাক উসাই, লুসাই, পাংখো)

### শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণ

| | মেয়াদ | সশস্ত্র | অস্ত্রবিহীন | মোট |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে | ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর পর্যন্ত | ১৪ | ২৭ | ৪১ |
| প্রথম সাধারণ ক্ষমা | ৩ অক্টোবর '৮৩-২৫ এপ্রিল '৮৪ | ১৪৬ | ৭৬৬ | ৯১২ |
| দ্বিতীয় সাধারণ ক্ষমা | ২৬ এপ্রিল '৮৪-২১ এপ্রিল '৮৯ | ৭৮৫ | ৪৬৭ | ১২৫২ |
| তৃতীয় সাধারণ ক্ষমা | ২২ এপ্রিল '৮৯-২২ জুন '৮৯ | ০৩ | ০৮ | ০১ |
| চতুর্থ সাধারণ ক্ষমা | ২৩ আগস্ট '৮৯-৩০ সেপ্টেম্বর '৮৯ | ১৪৩ | ২০৩ | ৩৪৬ |
| পঞ্চম সাধারণ ক্ষমা | ২৪ আগস্ট '৯১-৩১ আগস্ট '৯৭ | ১০৭ | ৩২৪ | ৪৩১ |
| | মোট | ১১৯৮ | ১৭৯৫ | ২৯৯৩ |

### তিন পার্বত্য জেলা ভূমি

| জেলার নাম | বনভূমি | আবাদী জমি | খাস জমি | পতিত জমি |
|---|---|---|---|---|
| নাম | (একর) | (একর) | (একর) | (একর) |
| রাঙ্গামাটি | ১২,৪১,৪২২ | ১,১৭,৬৯৫ | ৪৭৯৩৭৮ | ২৬৮৬১ |
| খাগড়াছড়ি | ৬,২৭,০৮১ | ৯২৭৮১ | ৫৭১৯৪২ | ২০৪৮৩ |
| বান্দরবান | ১০,৫২,০৫১ | ৫৩৪২৪ | ২,৬০৬৪০ | ৭৪৮৭ |

### শান্তিবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নিহত

**নিরাপত্তা কর্মী**

| সন | আর্মি | বিডিআর | আর্মডপুলিশ | পুলিশ | আনসার | ভিডিপি | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৯ইং থেকে ১৯৯৭ইং পর্যন্ত | ১৭৩ | ৯৬ | ২৩ | ৪১ | ০৭ | ০৩ | ৩৪৩ |

### শান্তিবাহিনীর হামলা ও পাল্টা হামলায় আহত-নিহত

| সন | জেলার নাম | নিহত | | আহত | | অপহরণ/নিখোঁজ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বাঙ্গালী | উপজাতি | বাঙ্গালী | উপজাতি | বাঙ্গালী | উপজাতি |
| ১৯৮০ হইতে ১৯৯৭ পর্যন্ত (১৮ বছর) | খাগড়াছড়ি | ৩৪৩ | ৯৭ | ২০৪ | ৪৮ | ১২৯ | ৯১ |
| | রাঙ্গামাটি | ৪৯৩ | ৯১ | ২৬০ | ৯০ | ১৫০ | ১০৮ |
| | বান্দরবান | ২২৬ | ৪৯ | ২১৭ | ৪৩ | ১৭৩ | ৭৬ |
| | মোট | ১০৬২ | ২৩৭ | ৬৮১ | ১৮১ | ৪৫২ | ২৭৫ |

* সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯৮০'র দশকে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

**১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭**

### সহাবস্থানেই শান্তি

সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। এর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য এককালে অসংখ্য দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করতো। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। গত দু'দশকে সেখানে চলেছে সন্ত্রাস যুদ্ধ। অসংখ্য উপজাতীয়, বাঙ্গালী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা এতে প্রাণ হারিয়েছেন। আর সেইসাথে অশান্ত হয়ে উঠেছে সমগ্র অঞ্চল। এখন প্রাণের ভয়ে কেউ আর সেখানে যায় না।

পার্বত্য উপজাতীয়দের ক্ষোভ, আদিবাসীদের অস্তিত্ব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে স্ব-শাসনের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের আগমন বন্ধ এবং উপজাতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিলেও তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সুপারিনটেনডেন্ট অথবা জেলা কমিশনারই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সার্কেল চীফগণ জেলা কমিশনারের অধীনে কর আদায় ও সাংস্কৃতিক বিচার-ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ম্যানুয়েল পরিবর্তন করে 'এক্সক্লুডেড এলাকা'র মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে বহিরাগতদের সেখানে বসতি করার সুযোগ করে দেয়া হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে সংবিধানের আওতায় তারা প্রথমবারের মত রাজনৈতিক অধিকারও ভোগ করতে শুরু করে।

যে অধিকার তারা পাকিস্তান আমলে হারিয়েছিলো, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তা তারা ফেরত চাইলো। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ নিজেকে



সামলে নেয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তারা দেখা করলো, দাবী জানালো স্বায়ত্তশাসনের। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। উপজাতীয়রা গড়ে তুললো নয়া রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকদের 'বাঙালী' বলে আখ্যায়িত করায় উপজাতীয়রা শুধু ক্ষুব্ধই হলো না, মনে করলো এ বুঝি তাদের জাতিসত্তার প্রতি চরম আঘাত। এর কিছুদিনের মধ্যেই তারা সৃষ্টি করলো আর্মড ক্যাডার শান্তিবাহিনী। তারপর ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে একটি পুলিশ পেট্রোলকে এ্যামবুশের মাধ্যমে তারা শুরু করলো তাদের সশস্ত্র তৎপরতা। ঐ সময়েই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করে।

এর পরের ইতিহাস সংঘাতপূর্ণ। শান্তিবাহিনীর অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় প্রকাশ্য গুলী করে মেরেছে উপজাতীয় ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের। অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ করেছে দেশী-বিদেশী ব্যক্তিদের।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক কায়দায় এ সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যবস্থায় যখন কাজ হলো না, তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারসাম্য নষ্ট করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে নতুনভাবে প্রায় এক লাখ ছিন্নমূল বাঙ্গালীকে পুনর্বাসিত করেন। এতে সন্ত্রাসের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করে। বাঙ্গালীদের উপর ক্রমবর্ধমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সালে তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর গুচ্ছগ্রাম নিয়ে আসা হয়। সরকারী রেশনের উপর নির্ভরশীল এই বাঙ্গালী পরিবারগুলো দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ প্রথমদিকে জেনারেল জিয়ার নীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে না উপলব্ধি করতে পেরে তিনি রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান চাইলেন। শুরু হলো শান্তিবাহিনীর সাথে সংলাপ। কিন্তু ছ'টি বৈঠকের পরও এর সমাধানের কোন পথ দেখতে না পেয়ে তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেয়ার চেষ্টা করেন। একজন উপমন্ত্রীর পদ-মর্যাদা সম্পন্ন চেয়ারম্যানের অধীনে স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা যে ক্ষমতা পেয়েছে, বাংলাদেশের অন্য জেলাগুলো তা পায়নি।

কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। শান্তিবাহিনী সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রাখে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একটি কমিটি গঠন করে দেন। সেই কমিটি এবং উপ-কমিটি ১৩টি বৈঠক করে শান্তিবাহিনীর সাথে কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেনি।

শেখ হাসিনার সরকার গঠিত জাতীয় কমিটি শান্তিবাহিনীর সাথে নতুন করে আলোচনা শুরু করে গত বছর ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে। শান্তিবাহিনী পেশ করলো সংশোধিত পাঁচ দফা। আগে একটি আলাদা প্রদেশ এবং আইন প্রণয়নের অধিকার দাবী করলেও সংশোধিত দাবীনামা থেকে সেগুলো তারা বাদ দেয়।

অবশেষে সরকার জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সাথে একটি সমঝোতায় আসছে। কিন্তু এই সমঝোতাকে কেন্দ্র করে দেশের বিরোধী দলগুলোতে এক ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, এর বিরুদ্ধে তিনি দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন। তাকে মদদ দিচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী ও অন্য দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো। অপরদিকে, শেখ হাসিনাকে সমর্থন জানিয়েছে বামপন্থী এবং স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিগুলো। বেগম জিয়া এখন বলছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙ্গালীদের সাথে চুক্তি করতে হবে। তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন একবারও তো তার রাজনৈতিক কমিটি বাঙ্গালীদের সাথে কথা বলেনি। পাকিস্তান সরকার যেমন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাথে কথা বলেছিলেন, বিহারীদের সাথে নয়; তেমনি এরশাদ, বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল স্রোতধারা জনসংহতি সমিতির সাথেই সংলাপ করেছে। তবে সরকারকে বাঙ্গালীদের জান-মাল ও সম্পত্তি যেমন নিরাপত্তা দিতে হবে, তেমনি নিশ্চিত করতে হবে তারা যেন লেখাপড়া, চাকরি, ব্যবসা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার না হয়।

জনসংহতি সমিতি অঙ্গীকার করেছে, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। আর সেই সাথে শান্তি ফিরে আসবে পার্বত্য চট্টগ্রামে, কিন্তু অনেকেই সন্দেহ পোষণ করছেন, বাস্তবে হয়তো তা নাও হতে পারে। বাঙ্গালীরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল জনপদের এক বিরাট অংশ তা ভুলে গেলে চলবে না। সত্যিকার সেদিনই ফিরে আসবে, যেদিন পাহাড়ী-বাঙ্গালীর সহাবস্থান এবং অধিকার নিশ্চিত করা হবে। **–হাসান শাহরিয়ার**

**দৈনিক ইত্তেফাক**
১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**আপন দেশে প্রত্যাবর্তন**
**–তরুণ ভট্টাচার্য**

পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনেক উপজাতীয়কে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে শরণার্থী হতে হয়েছে।



অনেককে চলে যেতে হয়েছে নিজের ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্যত্র। ১৯৭৯-৮১ সনে সরকারীভাবে বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-হানাহানি দেখা দেয়। এর ফলে অসংখ্য উপজাতীয় ও বাঙ্গালী প্রাণ হারায়, ক্ষয়ক্ষতি হয় বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির। এসময়ে আরও পাল্টা হামলার ভয়ে প্রায় দুই হাজারের মতো উপজাতীয় পরিবার পালিয়ে ত্রিপুরায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন ১৯৮১ সনের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস। এ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই অবশ্য ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৮৪ সনে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনী আবারও হামলা চালিয়ে অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুললে জুন মাসে ভূষণছড়া ও হরিণা থেকে পাল্টা হামলার আশঙ্কায় ১০ হাজারেরও বেশী উপজাতীয় ভারতের মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমেই তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তবে এ সময়ে উত্তেজনা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিলে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি থেকে আরও ৫ হাজারের মতো উপজাতীয় সীমান্ত পার হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তখন এসব আশ্রিত শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের প্রশ্ন উঠলে প্রথমবারের মতো শর্ত আরোপ করে এই বলে যে, পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের দখল থেকে উপজাতীয়দের ঘর-বাড়ী ও বসতভিটা ফেরত দিতে হবে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শরণার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার পক্ষ থেকে এসব দাবী পূরণের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় শরণার্থীরা দেশে ফিরতে অসম্মতি জানায়। পরবর্তীতে ভারত সরকার সেনা ও পুলিশ-এর সহায়তায় শরণার্থীদের এপারে পাঠিয়ে দেয়।

সবচেয়ে বেশী উপজাতীয়দের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। ২৯শে এপ্রিল রাতে খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী থানা মাটিরাঙ্গা ও পানছড়ির একাধিক গ্রামে শান্তিবাহিনী যুগপৎ হামলা চালিয়ে শতাধিক বাঙ্গালীকে হতাহত করে, বহু ঘর-বাড়ী ও দোকান-পাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। পার্বত্য এলাকায় শুরু হয় এক বিভীষিকাময় তাণ্ডব। ঘটনার আকস্মিকতায় বাঙ্গালীদের মধ্যেও দেখা দেয় প্রতিক্রিয়া। তাদের পাল্টা হামলায় খাগড়াছড়ি, মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও পানছড়িতে বেশ কিছু উপজাতীয় প্রাণ হারায় এবং ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়। এমনি এক নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে হাজার হাজার উপজাতীয় ত্রিপুরায় গিয়ে ওঠে, আশ্রয় নেয় শরণার্থী শিবিরে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা ৪৯ হাজার। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ তখন দাবী করে ২৯ হাজার ৯শ ২২ জন। ১৯৮৭

সনের জানুয়ারী মাসে দু'দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয় যে, আশ্রিত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের কাজ ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুরু হবে।

প্রত্যাবাসন হওয়ার কথা তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে। সব ছিল ঠিকঠাক। কিন্তু ১৪ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে শান্তিবাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায় ঐ পয়েন্টে ডিউটিরত নিরাপত্তাকর্মী ও বিডিআর-এর উপর। ফলে শুরু হওয়ার আগেই শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনার পর ৫ই জুন প্রত্যাবাসনের দিন পুনরায় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে গোলযোগ চলছে এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে এই অজুহাত দেখিয়ে শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরতে অনীহা প্রকাশ করে। ১৯৮৮ সনে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ফারুক আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরার আশ্রয় শিবিরে গিয়ে শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান জানালে শরণার্থীরা সে আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করে।

এদিকে, জনসংহতি সমিতির সংগে ১৯৮৫ সনে সামরিক কর্মকর্তা পর্যায়ের শান্তি সংলাপ শুরু হলে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় সরকার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে 'স্থানীয় সরকার পরিষদ' প্রবর্তনের জন্য পার্বত্য উপজাতীয় নেতাদের সংগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যার সূত্র ধরে জাতীয় সংসদে ১৯৮৯ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৩টি স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাস করা হয় এবং ২৫শে জুন তারিখে সেই তিনটি পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য সমগ্র পার্বত্যাঞ্চল জুড়ে শান্তিবাহিনী শুরু করে সশস্ত্র তৎপরতা। সৃষ্টি হয় চারদিকে অরাজকতা। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সরকার এখানে আবারও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। কিন্তু পরিস্থিতি থাকে অপরিবর্তিত। উপরন্তু আরও কয়েক হাজার উপজাতীয় দেশ ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় ত্রিপুরায়। তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হিসেব মতে, শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় সত্তর হাজার। ১৯৯২ সনের মে মাসে দিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও নরসিমা রাও শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলোচনায় একমত হন। জুলাই মাসে তৎকালীন মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক রাজনৈতিক কমিটি গঠনের পর তাঁরাও সফর করেন ত্রিপুরা। তাঁদের সফরও ব্যর্থ হয়। দাবী পূরণ না হওয়ায় দেশে ফিরবে না বলে জানিয়ে দেয় শরণার্থীরা। পরবর্তীতে ২৩শে সেপ্টেম্বর শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ির ৫টি থানা পরিদর্শন করে। ত্রিপুরা ফিরে গিয়ে শরণার্থী প্রতিনিধিদল ৪ মাস পর ঘোষণা দেয় যে, ১৯৯৪ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৪শ ৫ পরিবার



শরণার্থী প্রথমাবস্থায় দেশে ফিরবে। ৫ মাস পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৬শ ৪৮ পরিবার শরণার্থী দেশে ফিরে আসে।

পর পর দু'দফায় প্রত্যাগত এসব পাহাড়ী শরণার্থীকে চুক্তি অনুযায়ী পুনর্বাসন করা হয়নি এবং বেহাত হয়ে যাওয়া জমি-জমা উদ্ধার ও ফেরত দেয়া হয়নি এমন অজুহাতে শরণার্থীদের দেশে ফেরা বন্ধ হয়ে যায়। শরণার্থীদের আপত্তির মুখে ঐ সময়ে সরকার প্রায় ১৬শ বাঙ্গালী পরিবারকে পাহাড়ীদের বসতভিটা ও জমি-জমা থেকে সরিয়ে নেয়। এসব বাঙ্গালী পরিবারকে তখন এক হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিও ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ নেন। ত্রিপুরা সফরে গিয়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেন। সরকারের সর্বশেষ ঘোষিত ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাব নিম্নরূপ ঃ

১। শরণার্থীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হইবে।

২। প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি উপজাতীয় শরণার্থী পরিবারকে গৃহনির্মাণ ও কৃষি অনুদান বাবদ এককালীন পূর্ব প্রদত্ত ১০,০০০/- টাকার স্থলে ১৪-২-১৯৯৪ তারিখে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের দাবী অনুযায়ী আরও ৫,০০০/- টাকা যোগ করিয়া মোট ১৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে। পার্বত্য এলাকায় শরণার্থী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকাভুক্ত পরিবারের নিহত সদস্যদের শেষকৃত্য পালনের জন্য অনুদান প্রদান করা হইবে।

৩। প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে সপ্তাহে প্রতিপ্রাপ্ত বয়স্ক ৫ কেজি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক আড়াই কেজি হিসাবে ১২ মাস চাউল এবং পরিবার প্রতি মাসিক ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি সয়াবিন তেল ও ২ কেজি লবণ হিসাবে ১২ মাস প্রদান করা হইবে।

৪। গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে ২ বান্ডিল ঢেউ টিন প্রদান করা হইবে।

৫। যেসব শরণার্থী কৃষক পরিবারের চাষযোগ্য জমি রহিয়াছে দেশে ফেরার পর যথাযথ যাচাই সাপেক্ষে তাদের প্রতিটি পরিবারকে এক জোড়া হালের গরু বাবদ ১০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে। যেসব ক্ষেত্রে শরণার্থীরা পিতা বা পিতামহের জমি নিজেদের নামে নামজারি করিতে পারে নাই অথচ তাহারা ওয়ারিস হিসাবে জমি-জমা ভোগ করিতেছে তাহারা হেডম্যানের কাছ হইতে প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই সুযোগ পাইবে।

৬। ভূমিহীন প্রতি পরিবারকে একটি গাভী বাবদ ৩,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে এবং প্রতি পরিবারের জন্য সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৭। ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারের বেলায় প্রযোজ্য হইবে।

৮। অন্যান্য সরকারী ব্যাংক ঋণ বাবদ পাওনা ভারতে অবস্থানরত সকল উপজাতীয় শরণার্থী পরিবার স্বদেশে ফিরার পর যথাযথ যাচাই সাপেক্ষে মওকুফ করা হইবে।

৯। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ করা হবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা বলবৎ থাকিবে। ইন্সারজেন্সি সংক্রান্ত সকল মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

১১। প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাহাদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে এবং ধর্মীয় স্থানসমূহ পুনঃবহাল করা হইবে। উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করা হইবে না।

১২। দেশ ত্যাগের পূর্বে যেসব শরণার্থী সরকারী/আধাসরকারী চাকুরীতে ছিলেন, প্রত্যাবর্তনের পর চাকুরীতে পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাহাদের বিষয়ে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হইবে এবং বিদ্যমান চাকুরীবিধি অনুযায়ী তাহাদেরকে জ্যেষ্ঠতা প্রদান ও চাকুরী সুবিধাসহ পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। অনগ্রসর এবং অনুন্নত জনগোষ্ঠী হিসাবে উপজাতীয়দের জন্য চাকুরীতে আগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

১৩। ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে স্থাপিত উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় হইতে যেসব ছাত্র/ছাত্রী এস,এস,সি এবং এইচ,এস,সি পরীক্ষার সার্টিফিকেট আনিবে তাহাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীনে 'বিশেষ পরীক্ষা' গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৪। প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থী পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পুনঃভর্তি করার সুবিধাদি দেওয়া হইবে।

১৫। প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে পূর্ব সিদ্ধান্তমত ২ (দুই) বান্ডিল টেউটিন প্রদান ছাড়াও একটি ঘর নির্মাণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঠের পারমিট প্রদান করা হইবে।

১৬। যথাযথ যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় তরুণ-তরুণীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের



আওতাধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৭। যেসব বাংলাদেশী শরণার্থী ত্রিপুরায় অবস্থানকালে বাংলাদেশে চাকুরীতে নিয়োগের নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করিয়াছেন, সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে তাঁহাদের বয়স শিথিল করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করা হইবে।

১৮। যে সকল উপজাতীয় শরণার্থীর বিরুদ্ধে পূর্বতন সরকারের আমলে অন্তর্ঘাতমূলক ফৌজদারী মামলায় শাস্তি ঘোষিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৯। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে সংগতি রাখিয়া পর্যায়ক্রমে বেসামরিক এলাকা থেকে ক্যাম্পসমূহ তুলিয়া নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে

২০। সকল প্রত্যাগত উপজাতীয় হেডম্যানকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে।

সরকারের দেওয়া এই প্রস্তাব মানিয়া নিলে শরণার্থী নেতারা ২৮শে মার্চ হইতে তৃতীয় পর্যায়ে শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠাইতে সম্মত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ১২শ' ৪৮ পরিবার শরণার্থীকে ফেরত আনা হয়। তৃতীয় পর্যায়ের শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বেলায়ও সমস্যা বা জটিলতা আছে বলিয়া ত্রিপুরার শরণার্থী নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরিয়া গিয়া অভিযোগ তুলেন। শরণার্থী নেতারা আরও ৫ দফা দাবী উত্থাপন করেন। ফলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় ফের জটিলতা। সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা এই জটিলতা নিরসনের জন্য ত্রিপুরা গিয়া আলোচনা করিয়াও ব্যর্থ হন। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে অচলাবস্থার অবসান হয়। গত-১২ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যমান সমস্যার সমাধান দাবী করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় উপেন্দ্র লাল চাকমা শরণার্থীদের কতিপয় দাবীও বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার দাবী পুনঃবিবেচনা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন এবং শরণার্থী প্রত্যাবাসন কাজ শুরু করার ব্যাপারে তাঁহাকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী পরে যে দাবীগুলি বিবেচনা করেন তাহা হইতেছে–৯ মাসের স্থলে ১ বৎসরের জন্য ফ্রি রেশন, শরণার্থীদের মৃত আত্মীয়স্বজনের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার জন্য এককালীন অর্থ প্রদান, ভূমিহীনদের নামে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে শরণার্থীরা ঘোষণা দেন যে, ২১শে নভেম্বর '৯৭ থেকে চতুর্থ পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হইবে। ঘোষণা

অনুযায়ী এই পর্যায়ের প্রত্যাবাসন শুরু হইয়াছে তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্টে। চতুর্থ পর্যায়ে ১২শ ১৬ পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত আনার কাজ অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার রাজ্য সরকার ৫ম পর্যায়ে প্রত্যাবাসনের জন্য আরও ১৩শ ৬১টি পরিবারের তালিকা হস্তান্তর করিয়াছে। ইহাদের প্রত্যাবর্তন শেষ হইলে রাজ্য সরকারের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরার ছয়টি শিবিরে আরও ৫ হাজার ৫শ' ৪২ পরিবার শরণার্থী দেশে ফিরার অপেক্ষায় থাকিবে।**–তরুণ ভট্টাচার্য**

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**আজ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা**

**হাসান শাহরিয়ার ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাপারে 'শান্তিবাহিনী'র সহিত সরকারের আলোচনা প্রায় শেষ। এখন উভয়পক্ষ চুক্তির চূড়ান্ত রূপ দিতেছেন। জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং কমিটির অধিকাংশ সদস্য গতকাল (সোমবার) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় যান এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সহিত কথাবার্তা বলেন। তবে গতকাল কোন আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নাই। পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর গতকালও পদ্মায় যান। একটি সূত্র জানায়, চুক্তি প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি সহায়তা করেন। গত রবিবারের ১০ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় ও ডঃ আলমগীর যোগদান করেন এবং চুক্তির বিভিন্ন খুঁটিনাটি ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করিয়া পরামর্শ দেন।

অমীমাংসিত বিষয়াদির প্রশ্নে দুইপক্ষ একটি সমঝোতায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া সূত্রটি উল্লেখ করে। তবে তাহারা কি সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। যে বিষয়গুলি নিয়া তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল সেগুলি হইল ঃ অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন নিয়োগ, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ ও পুনর্বাসনের শর্ত নির্ধারণ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা।

গতকাল সকালে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও কল্পরঞ্জন চাকমা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে যান। তবে শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) কিছুটা অসুস্থ হইয়া পড়ায় কোন আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন নাই। বিকালে কল্পরঞ্জন চাকমা ও এডভোকেট ফজলে রাব্বী ব্যতীত জাতীয় কমিটির সকল সদস্য বৈঠকস্থলে গমন করেন। সূত্রগুলি জানায়, গতরাতের মধ্যেই



যাহাতে চুক্তির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে উভয়পক্ষই যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। আজ (মঙ্গলবার) চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আজ সকাল আটটায় জাতীয় কমিটির সকল সদস্যকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। তখনই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে পারে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রমে ভারতীয় পতাকা**
**উত্তোলনের চক্রান্ত ॥ গ্রেফতার ১**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** শান্তি চুক্তির দিন পার্বত্য জেলাসমূহে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র উন্মোচিত করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি যখন দ্বারপ্রান্তে তখনই একটি বিশেষ মহল শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে। মহলটি শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তাহারা শান্তি চুক্তির দিন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করার গোপন তৎপরতা শুরু করে এই উদ্দেশ্যে যে, ভারতীয় পতাকা দেখিয়া মানুষ বিভ্রান্ত হইবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে গোপনে শত শত ভারতীয় পতাকা তৈয়ারী করিতে থাকে। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ডিসি সৈয়দ বজলুল করিম গোপনে জানিতে পারেন যে, ধানমন্ডি সুপার মার্কেটে একটি দর্জির দোকানে ভারতীয় পতাকা তৈয়ার করা হইতেছে। এই খবরের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল দর্জির দোকানে তল্লাশী চালাইয়া ১৬টি ভারতীয় জাতীয় পতাকা উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি জানাইয়াছে যে, একটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন কর্মী তাহাকে এই পতাকা তৈয়ার করার জন্য আগাম টাকা দিয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ আলাউদ্দিনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত**

**হাসান শাহরিয়ার ॥** অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার শান্তির অরুণ আলো উদ্ভাসিত হইতে চলিয়াছে। দুই যুগের হানাহানি সংঘাতের পর দীর্ঘ

আলোচনার সফল পরিসমাপ্তিতে গতকাল (মঙ্গলবার) সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লবীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াই এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হইয়াছে।

এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেনানিবাসগুলিতে সেনাবাহিনী অবস্থান করিবে এবং শান্তিবাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবে। তিন পার্বত্য জেলা সমন্বয়ে গঠিত হইবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ করিবেন এই পরিষদের চেয়ারম্যান। ইহাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হইবে। একজন উপজাতীয় এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হইবেন। সন্তু লারমা ইতিমধ্যেই খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি প্রত্যাবর্তন করিলে পাহাড়ী-বাঙ্গালী জনগণ তাহাকে সাদর অভিনন্দন জানায়। বহু প্রতীক্ষিত এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এই চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধী দল বিএনপিসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। তবে বিএনপি গতকালই এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছে, ইহা সংবিধান পরিপন্থী এবং ইহার ফলে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আজ (বুধবার) সন্ধ্যায় দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রদান ও পরবর্তী দলীয় কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন। জামায়াতে ইসলামীও এই চুক্তির সমালোচনা করিয়াছে। অপরদিকে শান্তি বাহিনীর প্রকাশ্য ফ্রন্ট পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইম্যান ফেডারেশনের একাংশ এই চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছে, এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সরকারকে অনেক ছাড় দেওয়া হইয়াছে।

গতকাল সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পাঁচ মিনিট পূর্বে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের লবীতে পৌঁছিয়া দুই পক্ষের সদস্যদের সহিত কুশল বিনিময় করেন। ইহার পর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে এই চুক্তিকে অভিনন্দিত করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের নিকট তাঁহার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবর্গ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধান এবং পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ। জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন



দলের মহাসচিব ও যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন এবং জাসদের সভাপতি জাহাজ চলাচল মন্ত্রী আ স ম আবদুর রব।

সাংবাদিকদের সহিত আলাপকালে সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমি আনন্দিত। আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়া যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়া সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান বলেন, আজ আনন্দের দিন। আজ এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হইয়াছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ্, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হইবে।

চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট চুক্তির একটি কপি অর্পণ করেন।

বিএনপি চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছে, ইহা দেশের সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী।

চুক্তি স্বাক্ষরের খবর ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা হইতে চুক্তির পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির হয়। অবশ্য পরে চুক্তির বিরোধিতা করিয়াও মিছিল বাহির হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির মহাসচিব যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন ও জাসদ সভাপতি জাহাজ চলাচল মন্ত্রী আ স ম আবদুর রব ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জানান, বিএনপি চেয়ারপরসন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সকাল ৯টার দিকে টেলিফোন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি টেলিফোন ধরেন নাই। সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা ড. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে টেলিফোন করা হইলে তিনি বলেন, আচ্ছা দেখি। জাতীয় পার্টির এরশাদ সাহেব দেশের বাহিরে থাকায় দলের মহাসচিবকে অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হয়। ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেননকে টেলিফোন করা হইয়াছিল। তাহার বাসভবন হইতে বলা হয়, তিনি দিল্লী গিয়াছেন। চার তারিখে দেশে ফিরিবেন।

দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ যে জটিল সমস্যার সমাধান ইতিপূর্বেকার সরকার করিতে পারে নাই, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার দেড় বছরের মধ্যেই

উপজাতীয়দের সহিত একটি স্থায়ী সমঝোতায় উপনীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের জন্য ইহা এক বিরাট সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। দিল্লীতে ঐতিহাসিক পানি চুক্তি সম্পাদনের পর ইহা হইতেছে দ্বিতীয় মাইফলক। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সেনা প্রত্যাহারের দাবী নাকচ করিয়া দিয়াছে। ফলে বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাসগুলির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকিবে। তবে সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পগুলি পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে। ১৯৪৭ সাল হইতে বসবাসরত বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বহিষ্কার করার যে দাবী জনসংহতি সমিতি করিয়াছিল, সরকার তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। শান্তি চুক্তির শর্ত হিসাবে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র ক্যাডার শান্তিবাহিনীর সদস্যগণ অস্ত্র সমর্পণ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবে এবং যে বাঙ্গালীদের তাহারা বহিষ্কার দাবী করিয়াছিল, তাহাদেরই সহিত সহাবস্থান করিবে। সম্পূর্ণরূপে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও বাঙ্গালীদের বহিষ্কারের দাবী নাকচ করিয়া দিয়া সরকার সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেমন নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়াছে, তেমনি স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাসরত প্রায় সাড়ে চার লাখ বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর। শুধু তাহাই নয়, প্রাণ ভয়ে ভারতের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী ৪৩ হাজার শরণার্থীকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে উভয় পক্ষ তাহা অব্যাহত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে চাকমা উপজাতীয়রা একদিন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বাছিয়া নিলেও ২২ সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পার্বত্য পরিষদ গঠনেই জনসংহতি সমিতি সম্মত হইয়াছে। অবশ্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা দেওয়া হইয়াছে একজন প্রতিমন্ত্রীর। তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন। সরকার উপজাতীয়দের সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের দাবীটি প্রত্যাখ্যান করিলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সম্মত হইয়াছে। উপজাতীয়দের মধ্য হইতেই এই দফতরের মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে।

### সর্বশেষ বৈঠক

গত ছয়দিনের আলোচনার পর উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছেন। আলোচনার এক পর্যায়ে পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় যোগদান করেন। তাঁহাদের সহায়তায় উভয় পক্ষ চুক্তির খুঁটিনাটি ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করেন।



গত বছর জুন মাসে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁহার নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধানের তাগিদ অনুভব করেন। জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির অন্য সদস্যগণ হইলেন : চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর, বিএনপি সাংসদ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম ও আমির খসরু মাহমুদ, জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য এডভোকেট ফজলে রাব্বি, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক সচিব এস এস চাকমা। জনসংহতি সমিতির সহিত এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত বছর ২১শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। ইহার পর ছয়টি বৈঠক ঢাকা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি দলীয় দুই সদস্য কোন বৈঠকেই যোগদান করেন নাই। পক্ষান্তরে বিএনপি সরকার যখন মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করে, তখন আওয়ামী লীগ সদস্যগণ সকল বৈঠকেই অংশগ্রহণ করেন। বিএনপি আমলে মোট ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বৈঠকেই জনসংহতির পক্ষে সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেন। তাহাকে সহায়তা করেন গৌতম চাকমা (অশোক), রূপায়ন দেওয়ান (রিপ), সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। বর্তমান সরকারের আমলেই সর্বপ্রথম জনসংহতি সমিতির নেতারা ঢাকায় আসিয়া সংলাপে অংশ নেন। সীমিত পর্যায়ের বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে থাকিতেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার। অপরদিকে, সন্তু লারমাকে সহায়তা করিতেন গৌতম চাকমা ও রুপায়ন দেওয়ান। এই ছয় নেতার চেষ্টার ফলেই সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হইয়াছে।

ইতিপূর্বে জনসংহতি সমিতির সহিত শান্তি সংলাপ শুরু হয় এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৫ সালে। তখন মোট ছয়টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

### চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

চুক্তিতে উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য হইবেন উহার আহ্বায়ক। অন্য দুই সদস্য হইবেন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন

চাকমা এমপি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা। স্বাক্ষরের পর হইতেই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে।

এই চুক্তিতে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য জেলা পরিষদ করা হইয়াছে। অ-উপজাতীয় বলিয়া তাহাকেই চিহ্নিত করা হইয়াছে যিনি উপজাতীয় নন এবং পার্বত্য জেলায় যাহার বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন, চুক্তিতে ১৯৮৯ সালের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন তিনটির বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**যে সকল বিষয় জেলা পরিষদের অধীনে থাকিবে**

পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ঃ ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, যুব কল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, কাপ্তাই হ্রদের জল সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, মহাজনী কারবার ও জুম চাষ।

জেলা পরিষদ যে সকল সূত্র ও ক্ষেত্র হইতে কর, টোল, ফিস ইত্যাদি আদায় করিতে পারিবে সেগুলি হইল ঃ অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর, ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর, গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর, সামাজিক বিচারের ফিস, সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর, বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশবিশেষ, সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর, খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ, ব্যবসা, লটারী ও মৎস্য ধরার উপর কর। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে অ-উপজাতীয়কে সংশ্লিষ্ট সার্কেল প্রধানের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হইবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথ করাইবেন একজন বিচারপতি। আগে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এই দায়িত্ব পালন করিতেন। জেলা পরিষদের মেয়াদও বর্ধিত হইবে–তিন বছরের স্থলে পাঁচ বছর। পরিষদের সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র উপজাতীয় সদস্য



সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হইবেন একজন উপ-সচিবের সমকক্ষ। এ পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। পরিষদ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিবে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বদলি, অপসারণ ইত্যাদি উহার উপর ন্যস্ত হইবে। কিন্তু কর্মকর্তাদের নিয়োগ করিবে সরকার। তাহাদের বদলি, বরখাস্ত ইত্যাদিও সরকারই স্থির করিবে।

চুক্তিতে জেলা পরিষদগুলিকে বাজেট প্রণয়নে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার পরিষদকে পরামর্শ প্রদান ও অনুশাসন এবং প্রয়োজনে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে ও পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারিবে। পরিষদ বাতিলের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান চুক্তিতে রাখা হইয়াছে। পরিষদ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও অধস্তন স্তরের সকল সদস্যকে নিয়োগ করিবে এবং এ ক্ষেত্রে উপজাতীয়গণ অগ্রাধিকার পাইবে।

**ভূমি প্রসঙ্গ**

পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না। কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

পরিষদ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে। সরকার প্রণীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় 'কষ্টকর' বা 'আপত্তিকর' হইলে লিখিত আবেদন পাইলে সরকার তাহা বিবেচনা করিতে পারিবে। পরিষদের বিষয়সমূহের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

**পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ**

তিন জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন ও সংযোজন করিয়া তিন জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলির সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদেও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। তিনি একজন উপজাতীয় হইবেন এবং তাহার

পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ। পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সদস্য থাকিবেন ২২ জন। ইহাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হইবেন উপজাতীয়। পরিষদের গঠন হইবে নিম্নরূপ ঃ চেয়ারম্যান ১ জন, উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) ১২ জন, উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) ২ জন, অ-উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) ৬ জন ও অ-উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) ১ জন। উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও লিয়াং উপজাতি হইতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে দুইজন করিয়া নির্বাচিত হইবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে একজন ও অন্যান্য উপজাতি হইতে একজন নির্বাচিত হইবেন। পরিষদের মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় হইবে।

তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন। পরিষদের মেয়াদ হইবে ৫ বছর। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সঠিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই হইবে চূড়ান্ত। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহও এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। প্রশাসন, পরিষদ আইন-শৃংখলা ও উন্নয়ন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও এনজিওদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার পরিচালনা এবং ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সরকার একজন উপজাতীয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইহার চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করিবেন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনে কোন অসঙ্গতি থাকিলে তাহা দূর করা হইবে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিবেন।

নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠিত হইবে ঃ জেলা পরিষদ, পরিষদের উপর ন্যস্ত সম্পত্তি, সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান, কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের অর্থ



বিনিয়োগ হইতে মুনাফা, পরিষদ হইতে প্রাপ্ত যে কোন অর্থ, সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

**পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা**

চুক্তি মোতাবেক শরণার্থী প্রত্যাবাসন অব্যাহত থাকিবে এবং একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। ভূমি জরিপ কাজ শুরু করার ব্যাপারে চুক্তিতে উভয়পক্ষ একমত হন। ইহাছাড়া, জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হইবে। উপজাতীয় শরণার্থীদের ঋণ-সুদ মওকুফ করা হইবে। চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার জন্য কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকিবে। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা হইবে।

জনসংহতি সমিতি ইহার সদস্যদের তালিকা ও অস্ত্র ও গোলাবারুদেরও বিবরণী চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে। এগুলি জমাদানের দিন-তারিখও এই সময়ের মধ্যেই নির্ধারিত হইবে। অস্ত্র সম্বরণের পর তাহাদিগকে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে। যাহারা নির্ধারিত তারিখে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন তাহারা সাধারণ ক্ষমা ভোগ করিবেন। যাহারা ইহার অন্যথা করিবেন সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারিবে। জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সদস্যগণ ৫০ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন পুনর্বাসন ব্যয় হিসাবে। তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, হুলিয়া ইত্যাদি প্রত্যাহার করা হইবে। তাহাদের ব্যাংক ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে। তাহারা তাহাদের পূর্বের চাকুরী ফেরত এবং সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ পাইবেন।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**চট্টগ্রামে**

**আনন্দ**

**মিছিল**

**চট্টগ্রাম অফিস ॥** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাপারে শান্তি বাহিনীর সহিত সরকারের চুক্তি সম্পাদনের পর সিটি মেয়র এ,বি,এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মহানগরী আওয়ামী লীগ শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া উচ্ছাসমুখর মিছিল বাহির করে। পরে দারুল ফজল মার্কেট চত্বরে এক সমাবেশ হয়। সমাবেশে শান্তি চুক্তিকে দীর্ঘ ১৮ বৎসরের পুঞ্জিভূত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে এক ঐতিহাসিক এবং বর্তমান সরকারের

কৃতিত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বক্তাগণ মত প্রকাশ করেন। চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রলীগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ পৃথক পৃথকভাবে শান্তি চুক্তির সমর্থনে আনন্দ মিছিল বাহির করে।

**খুলনা অফিস ॥** গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইয়া নগরীতে একটি মিছিল বাহির করে। মিছিল শেষে দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন চত্বরে সমাবেশে খুলনা মহানগরী আওয়ামী লীগ সভাপতি এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম শান্তিচুক্তিকে ঐতিহাসিক হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

**ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ॥** পার্বত্য জেলার শান্তি চুক্তির পক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় উত্তরাঞ্চলের জেলায় আওয়ামী লীগ আনন্দ মিছিল বাহির করে। রাজশাহী মহানগরে বাদ্যযন্ত্রসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল করে। মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান, লেখা প্লে-কার্ড ও ব্যানার হাতে নিয়া শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে স্থানীয় কলেজ মাঠে এক সমাবেশে মিলিত হয়। পাহাড়ী গণপরিষদের নেতা শক্তিপদ রোয়াজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে শক্তিমান চাকমা, ডাঃ কনিস্ক চাকমা, রূপক চাকমা, থোয়াই অং মার্মা, মৃগাংক খীসা, খগেশ্বর ত্রিপুরা ও চৈতালী ত্রিপুরা প্রমুখ পাহাড়ী নেতা বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শান্তি চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ও তাহাদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী জানান। বক্তারা বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই দশকের হিংসা, হানাহানি ও রক্তপাতের অবসান ঘটাইয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করিবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ী বাঙ্গালী সকলের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনেও শান্তি চুক্তি সহায়তা ভূমিকা রাখিবে। নেতৃবৃন্দ এই চুক্তিকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রগতির একটি ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বলেন, অবিলম্বে এই চুক্তি কার্যকর করিয়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

এদিকে পাহাড়ী পেশাজীবী ঐক্য কমিটি ও জেলা নাগরিক কমিটি শান্তি চুক্তির সমর্থনে গতকাল বিকালে খাগড়াছড়িতে যে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়াছিল তা শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হইয়াছে। বিএনপির শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল পালন কর্মসূচীর সমর্থনে জেলা সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ এখানে বিক্ষোভ মশাল মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করায় সম্ভাব্য সংঘাত এড়াইবার জন্য আনন্দ মিছিল স্থগিত করা হয় বলিয়া



এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়। বিজ্ঞপ্তিতে খাগড়াছড়িতে যে কোনো মুহূর্তে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটিতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া এ ব্যাপারে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**দুদুকছড়িতে সন্তু লারমা :**
**পাহাড়ী-বাঙ্গালীর**
**সম্বর্ধনা**

**খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা ॥** জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র লারমা (সন্তু)কে লইয়া সরকারী হেলিকপ্টারটি সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে পৌঁছিলে শত শত উপজাতীয় ও বাঙ্গালী জনগণ তাঁহাকে ফুলের তোড়া লইয়া এক নজর দেখার ও অভিনন্দন জানাইবার জন্য ভিড় জমায়। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হইয়াছে। তিনি বলেন, সকলকেই এই চুক্তিকে স্বাগত জানান উচিত। শান্তির লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্যও তিনি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, পার্বত্য মানুষের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে এবং বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে আজ প্রত্যাশিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছি। আমি এইজন্য পার্বত্যবাসী তথা সকল দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে সকলকে অকৃত্রিম সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাইয়া বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করা বাস্তববিবর্জিত কাজ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত এই চুক্তি বাস্তবায়নে তিনি দলমত নির্বিশেষে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

শান্তি চুক্তিকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা ও সদস্য প্রবীণ উপজাতীয় নেতা নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা বলিয়াছেন, "শান্তি স্থাপনের জন্য যোগাযোগ কমিটির পক্ষে ভূমিকা রাখিতে পারিয়া আমরা আজ গর্বিত ও আনন্দিত। আমরা আশা করি, চুক্তি বাস্তবায়নে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই আন্তরিক সহযোগিতা করিবেন। "পার্বত্য খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া চুক্তি বাস্তবায়নে তাঁহার পরিষদের পক্ষ হইতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এদিকে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিয়া পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা সদরে ও মহালছড়ি থানা সদরে খণ্ড মিছিল করিয়াছে। অপরদিকে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের খবর ছড়াইয়া পড়ার পরপরই খাগড়াছড়ি জেলা সদরের বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে আতশবাজি ফুটাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে।

এদিকে শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া জেলার বিভিন্ন সংগঠন পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি সমর্থিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ-এর কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ শাহাজউদ্দিন, সদস্য সচিব সৈয়দ আবদুল মোমিন এক যুক্ত বিবৃতিতে চুক্তিকে 'গোপন চুক্তি' আখ্যায়িত করিয়া বলেন, জনগণ এই কালো চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কেননা এই চুক্তি বাঙ্গালী স্বার্থ ও সংবিধান এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী। মাটিরাংগা থানা সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে মাটিরাংগায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। অন্যদিকে শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, জেলা নাগরিক কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জেলা মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার পক্ষ হইতে পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয় যে, সম্পাদিত শান্তি চুক্তি অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই যুগের হিংসা, হানাহানি ও রক্তপাতের অবসান ঘটাইয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করিবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ী-বাঙ্গালী নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে। শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন যথাক্রমে নূরুন্নবী চৌধুরী, হাজী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রণ বিক্রম ত্রিপুরা, মোহাম্মদ জাহেদুল আলম, মনির খান, ছালেহ আহমদ, মুশফিকুর রহমান মারুফ, মাসুদুজ্জামান, শিবু দেব, তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, মোঃ হাজী রফিক উদ্দিন, মোঃ এস এম শফি ও কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া প্রমুখ।



**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## শান্তি চুক্তি নিয়া খোলা আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য গড়ুন

**-জাসদ**

গতকাল জাসদ কেন্দ্রীয় পুনর্গঠন কমিটির সভায় বলা হয়, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়সহ সকল মহল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ সকল অধিবাসীর নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষায় সতর্ক থাকিবেন। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের উন্নয়ন ও শান্তি-যেমন দেশের ১২ কোটি বাঙ্গালীর ভাগ্যের সহিত জড়িত, ঠিক তেমনি ১২ কোটি বাঙ্গালীর উন্নয়ন ও শান্তির জন্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সহিত মৈত্রী প্রয়োজন। সভায় এই চুক্তির ব্যাপারে সংসদের ভিতরে ও বাহিরে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য গড়িয়া তোলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলীয় সভাপতি আ, স, ম আবদুর রব। উপস্থিত ছিলেন হাসানুল হক ইনু, নুরে আলম জিকু, কাজী আরেফ আহমেদ প্রমুখ।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## সংঘাতের ২৪ বছর

**বিশেষ প্রতিনিধি ও তরুণ ভট্টাচার্য ॥** শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা কত এবং ইহার নিয়ন্ত্রণাধীনে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রহিয়াছে তাহা সরকারের জানা নাই। সে কারণেই ইহার বিবরণ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে জনসংহতি সমিতিকে। ৪৫ দিনের মধ্যে সমিতি তাহা সরকারকে জানাইবে। গত ২০ বছরে তাহারা বিভিন্ন দেশের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করিয়াছে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিলে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। নতুবা তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। গতকাল স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অস্ত্র জমাদানকারী শান্তি বাহিনীর সদস্যগণকে পুনর্বাসিত করা হইবে।

গত দুই দশকের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ২০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হইবে কমপক্ষে পাঁচশত। শান্তিবাহিনীর সহিত সংঘর্ষ বাধিয়াছে বাঙ্গালী ও

উপজাতীয়দেরও। শান্তিবাহিনী তাহাদের উপরেও অত্যাচার-অবিচার করিয়াছে। নিরাপত্তার অভাবে প্রায় ৬০ হাজার উপজাতীয় ভারতের ত্রিপুরায় গিয়া আশ্রয় নিয়াছে।

সকল মহল আশা করিতেছেন যে, শান্তিবাহিনীর সদস্যগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমা দিবে। তবে এ ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)কে দায়িত্ব নিতে হইবে। তিনিই বলিতে পারিবেন তাহার দলে কত সদস্য ও কি পরিমাণ গোলাবারুদ আছে।

স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ে ব্যর্থ হইয়া জনসংহতি সমিতি ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গড়িয়া তুলে। থানা আক্রমণ, অস্ত্র লুণ্ঠন, ব্রীজ, কালভার্ট ও সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, বিত্তবান ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাদের অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের মধ্যেই ইহার কর্মকাণ্ড সীমিত থাকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৬ হইতে '৮০ সালে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সহিত শান্তিবাহিনীর খণ্ড যুদ্ধ বাঁধে এবং উভয় পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়। এ সময়ে শান্তিবাহিনীর অনেক সদস্য গ্রেফতার হয়। ১৯৭৬ সালে জিয়া সরকার উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে এবং ১৯৭৯ সালে এক লক্ষাধিক ছিন্নমূল বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করে। এ সময় উপজাতীয়দের ঐতিহ্য, সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং ভূমির অধিকার সংরক্ষণে তাহারা সন্দিহান হইয়া পড়ে। ফলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসে চিড় ধরে। ১৯৮১ সালেও বাঙ্গালী পুনর্বাসন অব্যাহত থাকে। তবে ১৯৮০-৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বিভিন্ন স্থানে জাতিগত দাঙ্গা দেখা দেয় এবং হামলা ও পাল্টা হামলায় অসংখ্য উপজাতীয় ও বাঙ্গালী প্রাণ হারায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৮১ সালের জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় দুই হাজার উপজাতীয় পরিবার পালাইয়া গিয়া ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। সরকারী উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসে তাহারা স্বদেশ ফিরিয়া আসে।

১৯৮৪ সালে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। জুন মাসে রাঙ্গামাটির ভুবনছড়া ও হরিণা হইতে ১০ হাজারেরও বেশী উপজাতীয় ভারতের মিজোরামে গিয়া আশ্রয় নেয়। দুই সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। তবে এই সময় উত্তেজনা দেখা দিলে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি হইতে আরও ৪/৫ হাজার উপজাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা চলিয়া যায়। তখন প্রত্যাবাসনের জন্য তাহারা শর্ত আরোপ করে যে, বাঙ্গালীদের দখল হইতে তাহাদের ঘর-বাড়ী ও জমিজমা ফিরিয়া দিতে হইবে। দাবী পূরণ না হওয়ায় তাহারা সেখানে থাকিয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারত সরকার তাহাদিগকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে প্রেরণ করে।



এই সময় শান্তিবাহিনীও উহার তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এরশাদ সরকার রাজনৈতিকভাবে সমস্যাটির সমাধানের লক্ষ্যে শান্তিবাহিনীকে সংলাপে আহ্বান জানাইলে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১শে অক্টোবর। সেনা কর্মকর্তারা এই বৈঠকে যোগদান করেন।

পরের বছর ২৯শে এপ্রিল শান্তিবাহিনী খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা ও পানছড়ি থানার একাধিক গ্রামে সশস্ত্র হামলা চালায় এবং চার শতাধিক বাঙ্গালীকে হতাহত করে। তাহাদের ঘরবাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিলে এলাকায় বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পরপরই জেলার বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাহারাও পাল্টা হামলা চালায় এবং খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা ও মাটিরাঙ্গায় বেশকিছু উপজাতীয় প্রাণ হারায়। তাহাদের সহায়-সম্পত্তিরও ক্ষতি সাধন হয়। তখন নিরাপত্তাহীনতায় হাজার হাজার উপজাতীয় রাতের অন্ধকারে ত্রিপুরায় গিয়া আশ্রয় নেয়। ১৯৮৭ সালে প্রত্যাবাসন শুরু হইবার আগের দিন শান্তিবাহিনী অতর্কিতে নিরাপত্তা বাহিনী ও বিডিআরের উপর হামলা চালাইলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে সরকারের সহিত শান্তিবাহিনী ছয়টি বৈঠকে মিলিত হয়। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকিয়া যায়। ঐ সময় সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তন করিলে আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায়।

বিএনপি আমলে মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ও উহার উপ-কমিটি মোট ১৩টি বৈঠক করে শান্তিবাহিনীর সহিত। কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই।

আওয়ামী লীগ সরকার গত বছর জুন মাসে ক্ষমতায় আসার পর যে কমিটি গঠন করে তাহা আলোচনা শুরু করে ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে। ইহার পর এই কমিটি আরও ছয়টি বৈঠকে মিলিত হয়। এবারের বৈঠক ছিল ৭ম ও শেষ বৈঠক।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**চুক্তির বিশেষ দিক**

* পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।
* স্বাক্ষরের পর হইতেই চুক্তি বলবৎ হইবে।
* বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হইবে।

* পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
* পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হইবে। একজন উপজাতীয় এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হইবেন।
* রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোকন করা হইবে।
* পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নূতন নাম হইবে পার্বত্য জেলা পরিষদ।
* প্রতি জেলা পরিষদের তিনটি মহিলা আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।
* পরিষদের সহিত আলোচনা ছাড়া সরকার কোন জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করিবে না।
* কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকারভিত্তিতে জমির মূল মালিকদিগকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।
* মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হইবে।
* তিন জেলা সমন্বয়ে ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে। ইহার মেয়াদ হইবে পাঁচ বছর।
* পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। তাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি হইবেন উপজাতীয়।
* পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তা হইবেন একজন যুগ্মসচিব সমপর্যায়ের। উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
* আঞ্চলিক পরিষদ তিন জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়সাধন এবং তত্ত্বাবধান করিবে।
* উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে এবং ইহা ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিবে।
* ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য আইনে অসঙ্গতি থাকিলে তাহা দূর করা হইবে।
* পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর হইবে।
* জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন উপ-সচিবের সমতুল্য এবং এ পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।



* জেলা পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিবে। তবে পরিষদের সহিত আলাপ করিয়া সরকার কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে। তাহাদের বদলি, অপসারণ ইত্যাদিও সরকারই করিবে।
* পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার পরিষদকে পরামর্শ প্রদান ও অনুশাসন এবং প্রয়োজনে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে ও পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।
* পরিষদ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও অধস্তন স্তরের সকল সদস্যকে নিয়োগ করিবে এবং উপজাতীয়রা অগ্রাধিকার পাইবে।
* পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
* নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইবার পূর্বে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।
* পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে সরকার এই পরিষদের সহিত আলাপ করিবে।
* শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।
* শরণার্থীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা হইবে।
* অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করা হইবে।
* উপজাতীয় শরণার্থীদের ঋণ সুদ মওকুফ করা হইবে।
* সরকারী চাকুরী ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকিবে।
* উপজাতীর কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা হইবে।
* জনসংহতি সমিতি ইহার সদস্যদের তালিকা এবং অস্ত্র ও গোলা-বারুদের বিবরণ ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবে।
* নির্ধারিত তারিখে অস্ত্র জমা দিলে সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা ও মামলা প্রত্যাহার করিবে। তবে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**আনন্দময়**
**কিছুক্ষণ**

**গোলাম সারওয়ার ॥** সকাল ১১টা। বাহিরে মেঘভাঙ্গা রোদ। শীতের ঈষৎ আমেজ তখনো অবশিষ্ট। রাজপথে যানবাহন, পথচারীর ব্যস্ততা। ঠিক এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তিনতলায় গভীর উষ্ণতার, আনন্দময়তার মুগ্ধ আবহ। মাত্র ৪৭ মিনিট পূর্বে বহুল আলোচিত, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চা পানের জন্য প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিকরা সমবেত। প্রফুল্ল পরিবেশে সকলের সাথে একান্ত হালকা মেজাজে প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা। শুভ্র সিল্কের শাড়ী পরিহিত প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল পুঞ্জীভূত এক গুরুভার, দুশ্চিন্তার পাথর সরিয়া গিয়াছে। দুশ্চিন্তামুক্ত প্রধানমন্ত্রীর চোখে-মুখে উদ্ভাসিত অনাবিল এক প্রশান্তি। আর প্রশান্ত এক হাল্কা মেজাজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রী, জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক সকলের সাথে কথাবার্তা বলিয়াছেন। ইহার পূর্বে 'শান্তিবাহিনী'র সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই এক সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দারুণ সপ্রতিভ।

চা পান পর্বে কেক, স্যান্ডউইচ, সামুচা ছাড়াও ছিল প্রচুর মিষ্টির আয়োজন। প্রধানমন্ত্রী একটি রসগোল্লার এক-তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনী প্রধানের প্লেটে তুলিয়া দিতে দিতে বলেন—আপনি একটু বেশী মিষ্টি খান। আপনি আজ দারুণ খুশী। সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধ হইতেছে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মাহবুবুর রহমান দারুণ খুশী, সহাস্যে তিনি বাড়তি রসগোল্লার টুকরা গলাধঃকরণ করিলেন। পাশে ছিলেন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। তিনিও কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে খোশালাপে মশগুল ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মেয়রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ নগর পিতার খবর কি? রাজপথে ভাংচুর শুরু হইয়াছে নাকি! মেয়রের জবাব ঃ না, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। গোলমাল নাই। প্রধানমন্ত্রী পিছনে ঘুরিয়া দেখিলেন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও আব্দুর রাজ্জাক ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখার গৌরবে আনন্দিত চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্, তাঁহার পত্নী কয়েকজন সাংবাদিকের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্‌কে তাঁহার স্ত্রীর পাশে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন—আজ বড় খুশীর দিন। দুইজনে একসঙ্গে ছবি তুলুন। ননদ-ভাবীর মধ্যে কিছু তীর্যক



কৌতুককর বাক্য বিনিময়ও হইল। প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—হাসনাত ভাই হোম ডিপার্টমেন্ট হান্ড্রেট পার্সেন্ট ঠিক রাখিয়া চলেন। ঘর সামলাইয়া, অর্থাৎ স্ত্রী সামলাইয়া চলার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথাও উঠিল। একজন বলিলেন, বঙ্গবন্ধু ভাবীকে দারুণ গুরুত্ব দিতেন। প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—জেল, জুলুম কিছুই পরোয়া করিতেন না আব্বা। কিন্তু আম্মার কাছে আব্বা ছিলেন অন্যরকম মানুষ। সেখানে আম্মাই হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। নানা হালকা কথার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গও তুলিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—আওয়ামী লীগ এবার ক্ষমতায় আসার পরই যে পার্বত্য সমস্যা লইয়া চিন্তা শুরু করিয়াছে তাহা নহে। ১৯৮৪ সন হইতেই আওয়ামী লীগ পার্বত্য অঞ্চলে অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তক্ষরণ বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। তখনই আওয়ামী লীগ একটি সেল গঠন করিয়া এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে এবং সমাধানের লক্ষ্যে কর্তব্য স্থির করে। প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চারিত আহ্বানের পুনরোক্তি করিয়া বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এখন উহার বাস্তবায়নে সব মহলের আন্তরিকতা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিরোধী দলসহ সকলের সহযোগিতা।

প্রধানমন্ত্রী কিঞ্চিৎ আফসোসের সুরে বলিলেন—ত্রিদেশীয় বাণিজ্যিক সম্মেলন হইল না। পাকিস্তান, ভারতে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি না হইলে এই সম্মেলনেও আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নূতন দিক-নির্দেশনা দিতে পারিতাম। প্রশ্ন করিলাম—কবে নাগাদ ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ভাবিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—ভারতে নূতন সরকার গঠন হউক, পাকিস্তানের আবেগ-উত্তেজনা সমস্যার সমাধান হউক তারপর যথাশীঘ্র স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সম্মেলন আয়োজনের আবার উদ্যোগ গ্রহণ করিব।

চা-চক্রে সন্তু লারমা, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্‌কে সাংবাদিকরা জোঁকের মত ছাকিয়া ধরিয়াছিল। কিছু বলুন, কী আপনার প্রতিক্রিয়া। খুশী, খুশী, খুশী। দুইজনেরই এক কথা। জীবনে ইহার চাইতে আর বেশী খুশী কী হইতে পারে। কে হইবেন পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী? তীর্যক কিন্তু 'আনন্দদায়ক' এ প্রশ্নের জবাব স্মিতহাস্যে এড়াইয়া গিয়াছেন সন্তু লারমা।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
আমি খুশি–দারুণ খুশী

**চুক্তি সংসদে উত্থাপনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিবেন –প্রধানমন্ত্রী**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই সাংবাদিকদের নিকট তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন–'আমি দারুণ খুশী হইয়াছি। দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথ অবারিত হইয়াছে। এই চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধী দলসহ আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি'।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গতকাল এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাংবাদিকদের নিকট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় প্রধানমন্ত্রীর পাশে ছিলেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ ও সন্তু লারমা।

প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, জনসংহতি সমিতির সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির কপি প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করা হইবে। বিদেশের সহিত কোন চুক্তি হইলে উহা সংসদে উপস্থাপনের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে দেশের মানুষের সঙ্গে। তবে এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট যাহা বলিবেন তাহা করা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত পরিবেশ দেশ ও জাতির উন্নয়নে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা দেশে সংঘাত, যুদ্ধাবস্থা চাই না। শান্তির সীমারেখায় অশান্তি চাই না। ইতিপূর্বে অন্যান্য সরকারও 'শান্তি বাহিনী'র সহিত আলাপ করিয়াছে। আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হইয়াছি। আল্লাহ্র দরবারে অশেষ শুকরিয়া।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হইলে সংঘাতের অবসান হইবে, উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দুইটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরে সমর্থ হইয়াছে। শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাহারা নিরলস পরিশ্রম ও সহযোগিতা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসন, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।



বিশেষ মহল শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করায় প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, দেশে শান্তি আসুক, স্থিতি আসুক বিশেষ মহল উহা চায় না। তাহারাও চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। আমরা সক্ষম হইয়াছি। এখন তাহারা নানারকম উস্কানি দিতেছে। যে কোন রকম উস্কানি ধৈর্যের সহিত মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অন্য দেশের পতাকা উত্তোলন করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। তিনি বিরোধী দল বিএনপি'র প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, অযথা অশান্তি সৃষ্টি না করিয়া শান্তির পথে আসুন। ইসলামেও শান্তির পথে থাকার কথা রহিয়াছে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রাও আমাদের ভাই। ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া হয়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়, আবার মিলমিশ হয়। অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত দ্রুত সম্ভব তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করিবেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলে থাকাকালেও আমি বহুবার পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়াছি।

একজন রিপোর্টার প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষরে আপনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি? প্রধানমন্ত্রী স্মিতহাস্যে বলেন, –আমি দারুণ খুশী হইয়াছি। আমরা চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সাফল্য অর্জন করিয়াছি।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**'জনগণ নীরবে বিএনপি'র সন্ত্রাস নৈরাজ্য সহ্য করিবে না'**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি নস্যাতের ষড়যন্ত্র, বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রামে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং ইস্যু বিহীন হরতাল ডাকিয়া ১ জন রিকশা চালককে হত্যার প্রতিবাদে গত সোমবার বিকালে পল্টন ময়দানে জাতীয় শ্রমিক লীগের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, হরতালের নামে বোমাবাজি, গোলাগুলী করিয়া খালেদা জিয়ার মাস্তান বাহিনী রিকশা চালক হাফিজউদ্দিনকে হত্যা করিয়াছে। তিনি রিকশা চালক হাফিজউদ্দিনের হত্যাকারীর গ্রেফতার ও বিচার দাবী করিয়া বলেন, জনগণ নীরবে বিএনপির সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সহ্য করিবে না।

রিকশা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ইনসুর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ডাঃ আঃ সালাম, শামসুল ইসলাম, ময়নুল হক মঞ্জু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ শেষে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী, রিকশা শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনতা নিহত রিকশা শ্রমিক হাফিজউদ্দিনের লাশ নিয়া শোক মিছিল বাহির করে। মিছিলটি পল্টন ময়দান, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, নুর হোসেন স্কোয়ার হইয়া বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আসিয়া শেষ হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিতেছি -সন্তু লারমা

**বিশেষ প্রতিনিধি ॥** দীর্ঘ ১২ বছরের আলোচনার পর অবশেষে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনী নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)কে গতকাল (মঙ্গলবার) অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত দেখাইতেছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে। তিনি বলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়া আমরা একটি নূতন জীবন শুরু করিতেছি।

স্বল্পভাষী সন্তু লারমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করিয়াছেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন। ১৯৮০ সালে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি ভারত চলিয়া যান এবং সশস্ত্র সংগ্রামে জড়াইয়া পড়েন। তাহার ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুর পর তিনি জনসংহতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

হাসি মুখে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদানকালে বলেন, আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিতেছি। এখন হইতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন শুরু হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, একটি চুক্তি সই করা কষ্টকর; কিন্তু তাহা বাস্তবায়ন করা আরও কষ্টকর।

সন্তু লারমা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা লাগিবে। এ ব্যাপারে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণের



আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আসুন, দেশকে আগাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য আমরা একযোগে কাজ করি।

পূর্ববর্তী সরকারগুলি সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করিতে অসম্মতি জানান। তবে বর্তমান সরকারের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, এ দেশের মানুষ এখন শান্তিতে বসবাস করিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## বান্দরবানে চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে মিছিল

**বান্দরবান সংবাদদাতা ॥** সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়া বান্দরবানে পাহাড়ী-বাঙ্গালীর বিশাল মিছিল হইয়াছে। গতকাল বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় হইতে মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অপরদিকে পার্বত্য ঐক্য পরিষদের ব্যানারে বিএনপি ও জামায়াত চুক্তির বিরুদ্ধে সন্ধ্যায় বিশাল জঙ্গী মিছিল বাহির করে এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করে। বিএনপি ও জামায়াতের মিছিল বাজারের আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে আসিলে উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। মুহূর্তের মধ্যে শহরের দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায়। ইট-পাটকেল নিক্ষেপে ২ জন পুলিশ অফিসারসহ ২০ জন আহত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে ঢাকায় চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদ সকালে বান্দরবানে জানাজানি হওয়ার পর অনেক পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মধ্যে কোলাকুলী ও ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণ হইয়াছে। অধিকাংশ পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মুখে সারাদিন হাসি দেখা গিয়াছে। অফিস-আদালত, দোকানপাট সর্বত্র একই কথা ছিল–সরকার সফলভাবে দীর্ঘদিনের শান্তি চুক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

## দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**চুক্তি বাস্তবায়নে**
**সরকার**
**আন্তরিক**
**-আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্**

**বিশেষ প্রতিনিধি ॥** জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ গতকাল (মঙ্গলবার) বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদনায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাহার নেতৃত্বাধীন কমিটি জনসংহতি সমিতির সহিত সাতবার আলোচনা চালাইয়া একটি সমঝোতায় পৌঁছায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন আনন্দ উদ্বেলিত।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি আজ খুশী এই জন্য যে, আমরা দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছি।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তিনি জনসংহতি সমিতির সহিত আলোচনা চালাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাহাকে সাহস ও প্রেরণা যুগাইয়াছেন।

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সরকারী কর্মকর্তাসহ সকলের নিকট হইতে তিনি সহযোগিতা পাইয়াছেন।

তিনি বলেন, এই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার খুব আন্তরিক।

## দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
পল্টনে নগর আওয়ামী লীগের সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ
**ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি**
**সংবিধান সম্মত**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও ঢাকার মেয়র হানিফসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও নগর নেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ মাসের সরকারের আর একটি ঐতিহাসিক সাফল্য হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য অসার প্রমাণিত



করিয়া ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সংবিধান সম্মতভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে। গতকাল (মঙ্গলবার) নগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চট্টগ্রামে বিএনপি'র সন্ত্রাসী কর্তৃক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত এক স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। মূলতঃ নগর আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সমাবেশটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপটে শান্তি সমাবেশে পরিণত হয়। শান্তি সমাবেশ শেষে বিশাল শান্তি মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলটি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, জাতীয় প্রেসক্লাব হইয়া জাতীয় ঈদগাহ পর্যন্ত গিয়া শেষ হয়।

নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মেয়র মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মোজাফফর হোসেন পল্টু, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আবদুল মান্নান, এডভোকেট সাহারা খাতুন, মুকুল বোস, আবদুল মান্নান খান, নূরুল ফজল বুলবুল, আবদুর রউফ সিদ্দিক, ফজলুল হক, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, এডভোকেট কাজী ইকবাল, আহসান উল্লাহ মাষ্টার এমপি, ফজলুর রহমান ফ্যান্টমাস, এডভোকেট কামরুল ইসলাম, ফয়েজ উদ্দিন, ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জিল্লুর রহমান বলেন, ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির এই দিনটি প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য আনন্দের, মহামুক্তির দিন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন সংঘাত, সংঘর্ষ, অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠা বার বার হুমকির সম্মুখীন হইয়াছে। তিনি শান্তি চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

আবদুর রাজ্জাক বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নেত্রী সফল হইয়াছেন। তিনি বিএনপি সরকারের পানির হিস্যা আদায়ের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গঙ্গার পানি চুক্তির মাধ্যমে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের সাফল্যের কথা তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের দালাল, রাজাকারদের নিয়া বিএনপি শান্তি চুক্তি বানচালের ষড়যন্ত্রে মাঠে নামিয়াছে।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বহু দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি হইয়াছে। প্রকাশ্যে চুক্তি হইয়াছে অথচ বিএনপি নেত্রী অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়াইয়াছিলেন গোপনে সংবিধানের পরিপন্থী চুক্তি হইতেছে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি যাহা প্রতিশ্রুতি দেন তাহা রক্ষা করেন। তিনি বলেন, দেশের সকল মানুষ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত

হওয়ায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। তিনি শান্তি চুক্তিনামার অংশবিশেষ জনগণের সম্মুখে পাঠ করিয়া বলেন, সংবিধানের আওতায় শান্তি চুক্তি হইয়াছে। চুক্তিতে পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনী থাকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী বাঙালী, পাহাড়ী, উপজাতি, অ-উপজাতি সকলে মিলিয়া-মিশিয়া বসবাস করিবে। তিনি বলেন, বিএনপি পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার অর্থে শান্তি চুক্তি বানচালের ষড়যন্ত্র করিতেছে। বিএনপির ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। তিনি শান্তি চুক্তি বানচালের জন্য চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র দেশবাসী মোকাবিলা করিবে। তিনি বলেন, বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়া আরও একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হইয়াছে।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি শান্তি চুক্তির সুফল জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য বিএনপিসহ সকলকে সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন বলেন, শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার চালানোর উদ্দেশ্যে যাহারা ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি নিয়াছিল তাহাদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

আবদুল মান্নান খান বলেন, শান্তি চুক্তির ফলে দেশবাসী আনন্দিত হইলেও বিএনপি নেত্রীর অন্তরে আগুন জ্বলিতেছে।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির ফলে দেশের প্রতিটি এলাকায় শান্তি মিছিল হইয়াছে। কিন্তু বিএনপি শান্তি চায় না। তিনি বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন, আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতা-কর্মীর লাশ নিয়াছেন। হরতাল, নৈরাজ্যের নামে আর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিলে আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগের কর্মীরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না।

সভাপতির ভাষণে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির জন্য নগরবাসীর পক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, এই শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে কেহ অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সহিত তাহাদের বোঝাপড়া হইবে। তিনি বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বার বার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিনষ্টের পাঁয়তারার কথা বলেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বুকের রক্ত দিয়া দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে আপনাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি পতাকা চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।



পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ায় গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন। নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, শান্তি চুক্তি সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নে বলিষ্ঠ অবদান রাখিবে এবং সকলের মধ্যে সৌহার্দ-সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিবে। এই চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৫ জন শিক্ষক গতকাল মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সরকার, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনের পর ইহা বর্তমান সরকারের আরও একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। শান্তি চুক্তি দীর্ঘ এক শান্তি আলোচনার ধারাবাহিকতায় সম্পাদিত। সে কারণে বিগত সরকারসমূহের আমলে যাহারা ইহার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শান্তি আলোচনাকে আগাইয়া নিতে বিভিন্ন সময়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাহাড়ী, বাঙ্গালী নির্বিশেষে দেশের শান্তিকামী সকল মানুষ এই সাফল্যের অংশীদার। এই চুক্তি সম্পাদন জাতীয় অগ্রগতি–উন্নতির পথ সুগম করিবে। শিক্ষকগণ আশা প্রকাশ করেন, দলমত নির্বিশেষে সরকার-বিরোধী উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ তাহাদের মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থাকিয়া এই চুক্তির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিবেন। তাহারা এই চুক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করিতে দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বিবৃতিদানকারী শিক্ষকগণের মধ্যে রহিয়াছেনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, ডঃ হারুণ অর রশিদ, ডঃ আরেফিন সিদ্দিক, ডঃ ইফতেখার গনি চৌধুরী, অধ্যাপক মহিবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ফসিউল আলম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল্লাহ তালুকদার। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ও সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা তাহার আরেকটি নির্বাচনী অংগীকার পূরণ করিলেন।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব প্রকৌশলী এম এ কাসেম এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের সার্বভৌমত্বকে নিরাপদ করা এবং

পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চুক্তি ঐতিহাসিক অবদান রাখিবে।

বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম ও সাধারণ সম্পাদিকা এডঃ সাহারা খাতুন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া শেখ হাসিনা সরকার একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক সৃষ্টি করিয়াছে।

অভিনন্দন জ্ঞাপনকারী অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রহিয়াছেনঃ জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুস সালাম খান, সাধারণ সম্পাদক আহসানউল্লাহ মাষ্টার এমপি, বঙ্গমাতা আদর্শ বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক আবুল হোসেন বজল, যুগ্ম আহ্বায়িকা সজ্জিতা, যুগ্ম আহ্বায়িকা দিপালী রাণী সরকার। বাংলাদেশ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সংহতি পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের সভাপতি সৈয়দ মহীউদ্দিন, মহাসচিব মোঃ শাহাবুদ্দীন, আওয়ামী লীগ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভানেত্রী অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য শামিম ওসমান, যুগ্ম সম্পাদক সাহাবউদ্দিন আহমদ, বিআইডব্লিউটিসি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শুক্কুর মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমদ, বাংলাদেশ আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়িকা এডভোকেট সাহারা খাতুন, সদস্য-সচিব এডভোকেট আবদুল্লাহ আবু, বাংলাদেশ সচিবালয় চতুর্থ সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ মমিন উদ্দিন মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, নদী সংস্কার পানি শাসন ও ব্যবহার সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের আহ্বায়ক এসএম শাহাদত হোসেন হামজা, ঢাকা জেলা অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল ইসলাম পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক মতলুবুর রহমান, কার্যকরী সভাপতি মোঃ মঞ্জু খান, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সহিদউল্লাহ, সহ-সভাপতি এম এ কাশেম, সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা ও নগর বাস টার্মিনাল পরিবহন শ্রমিক কমিটির সভাপতি মোঃ আলী শোভা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ খায়রুল আলম মোল্লা, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ সোনালী ব্যাংক শাখার সভাপতি আঃ জব্বার সিকদার, পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সদুরউদ্দিন মোল্লা, মোঃ নাজিম উদ্দিন, আঃ খালেক সরদার, অগ্রণী ব্যাংক কর্মচারী সংসদ সভাপতি মোঃ আবদুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোবারক হোসেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও কল্যাণ পরিষদ চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক প্রবাল রায়, সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন সভাপতি আমিনুল হক ফারুক, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ স্বাধীনতার স্বপক্ষ ওলামা সংগঠন সভাপতি আলহাজ্ব কাজী মাওলানা মোঃ জহিরুল ইসলাম,



মহাসচিব কাজী মাওলানা আবু দাউদ, জয়-বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট সভাপতি সালাউদ্দিন বাদল, সাধারণ সম্পাদক শেখ আবদুল কাদের, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার এমপি, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন এমপি, সৈয়দ হাসান ইমাম, সমর দাশ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ডঃ ইনামুল হক, জামাল উদ্দিন হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোঃ নাদিম মিয়া এডভোকেট, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কবির হোসাইন এডভোকেট।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**চুক্তি পর্যালোচনার**
**জন্য বিএনপি'র**
**কমিটি গঠন**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** শান্তিবাহিনীর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির আইনগত বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপি'র একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির অন্যান্য সদস্য হইলেন ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদার, অলি আহমেদ, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, এডভোকেট মাহবুব উদ্দীন আহমদ, ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, মীর শওকত আলী, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান, ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দীন সরকার, ব্যারিষ্টার আমিনুল হক ও ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান খান। কমিটি আজ বিকালের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করিবেন। দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়া সন্ধ্যা ৭টায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের প্রতিক্রিয়া ও কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন। গতকাল বিরোধী দলীয় নেত্রীর ২৯, মিন্টো রোডস্থ সরকারী বাসভবনে অনুষ্ঠিত বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির ৪ ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে এই কমিটি গঠন করা হয়।

**দৈনিক ইত্তেফাক**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**শান্তি চুক্তি সম্পর্কে**
**কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের**
**অবহিত করা হইয়াছে**

**ইউএনবি ॥** পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সংস্থার প্রধানদের নিকট সরকার

ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেন। চুক্তির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইহার ফলে গোলযোগপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

**দৈনিক ইত্তেফাক**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**প্রধানমন্ত্রীর শোকরিয়া আদায়**

**ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে গিয়া বেশকিছু সময় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সেখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘ হানাহানি বন্ধে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রধানমন্ত্রী মহান আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি

ভোরের কাগজ

**ভোরের কাগজ**

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

এখনো নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি

## পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ সোমবার শেষ হচ্ছে

**হরি কিশোর চাকমা রাঙ্গামাটি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার শেষ হচ্ছে। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আরো বাড়ানোর জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। শেষ মুহূর্তেও কোনো উদ্যোগ দেখা না যাওয়ায় পার্বত্যবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ২৫ বার অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবারই অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার মুহূর্তে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে হয় আলোচনা করে, না হয় পত্রের মাধ্যমে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে সরকার ও সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির মধ্যে পত্র বা সংবাদ আদান-প্রদান হতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির অন্যতম সদস্য মথুরা লাল চাকমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাই মূলত সংবাদ আদান-প্রদানের কাজটি করেন। সরকার বা জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে কোনো পত্র বা সংবাদ পাঠানো হলে তিনি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করেন। মথুরা লাল চাকমা জানান, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সরাসরি কোনো পত্র আদান-প্রদান হয় না। দুপক্ষই যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ককে তাদের সিদ্ধান্ত জানান। তিনি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একপক্ষের সিদ্ধান্ত অন্য পক্ষকে জানিয়ে দেন। সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন ও শান্তিবাহিনীর অস্ত্রবিরতি চুক্তি মূলত জেন্টেলমেন্স এগ্রিমেন্ট বলে উল্লেখ করে মথুরা লাল চাকমা বলেন, এ ব্যাপারে কোনো লিখিত চুক্তি হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্ত্রবিরতির ব্যাপারে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে এখনো মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পাওয়া যায়নি।



জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকেও কোনো কিছু জানানো হয়নি বলে জেলা প্রশাসক জানান।

এদিকে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হবে কিনা তা নিয়ে সর্বস্তরের লোকজনের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, অস্ত্রবিরতি যদি একবার ভেঙে যায় তবে পরে আবার উদ্যোগ গ্রহণে নানা জটিলতার সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জুলাই সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি তাদের সর্বশেষ চিঠিতে এই শর্তে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয় যে, ১৫ আগস্টের মধ্যে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে, অস্ত্রবিরতি চলাকালীন আটক শান্তিবাহিনীর সকল সদস্যকে বিনাশর্তে মুক্তিদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি বহাল রাখা হবে। জনসংহতি সমিতির প্রথম দুটি শর্ত এখনো পূরণ হয়নি বলে জানা গেছে।

**ভোরের কাগজ**

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

দুদিনব্যাপী সেমিনার শুরু : বক্তাদের আহ্বান

## পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খোলা আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত করার উদ্যোগ নিতে হবে

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করতে হবে রাজনৈতিকভাবে। এর কোনো সামরিক সমাধান নেই। সরকারকেই দ্রুত সমস্যা সমাধানের বাস্তবনীতির কথা ভাবতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পথ বের করার জন্য। গতকাল বৃহস্পতিবার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : শান্তি, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ধানমন্ডিতে জার্মান কালচারাল সেন্টার মিলনায়তনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি' আয়োজিত দুদিনব্যাপী মুক্ত আলোচনা ও সেমিনারের প্রথম দিনে গতকালের অনুষ্ঠানের বক্তারা সময়ক্ষেপণ না করে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে আলোচনা শুরু করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহানের সভাপতিত্বে গতকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার কে এস

নবী, ভোরের কাগজের সম্পাদক মতিউর রহমান, সম্মিলিত নারী সমাজের ফরিদা আখতার। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রারম্ভিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুক্ত আলোচনা শুরু হয়।

আলোচনায় অংশ নেওয়া পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে হবে রাজনৈতিকভাবে, এর বিকল্প কোনো পথ নেই। যথাশিগগির সম্ভব এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের বিষয়টিও রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, হত্যা-অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে সমাধান হবে না। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিরোধী দলকে এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যাদের নিয়ে সমস্যা তাদেরকেও আগ্রহী হতে হবে। নিজের আলোচনা শেষে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আবদুর রাজ্জাক বলেন, অস্ত্রবিরতি চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে নতুন চুক্তি করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসন অব্যাহত থাকার প্রশ্নই ওঠে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন বলেন, জাতীয় পর্যায়ে কোনো নীতি না থাকলে আলোচনায় কিছু হবে না। সমস্ত রাজনৈতিক দলের একটি বৈঠক করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, গত ৫ বছরে কোনো নীতি ছিল না। রাশেদ খান মেনন সংবিধান সংশোধন করে পাহাড়ি জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, প্রয়োজনে বিশেষ সিডিউল করে পার্বত্যবাসীদের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে যা ভারতের সংবিধানে রয়েছে। রাশেদ খান মেনন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে বলেন, দেশের মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হোন। এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার কে এস নবী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

ভোরের কাগজের সম্পাদক মতিউর রহমান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, অচিরেই মন্ত্রিসভার কাউন্সিল কমিটি ও সংসদীয় কমিটি গঠন করে আলোচনা শুরু করতে হবে। সংসদের বাইরে সামরিক-বেসামরিক দক্ষ ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে হবে। জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা গভীর অরণ্যের পরিবর্তে চট্টগ্রাম অথবা রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মতিউর রহমান বলেন, এটা সত্য যে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যেমন সেনাবাহিনীকে অত্যাচারী শক্তি হিসেবে দেখেছে তেমনি শান্তিবাহিনীও সশস্ত্র কর্মকাণ্ড, মুক্তিপণ বা চাঁদা আদায়ের সঙ্গে জড়িত



যা কেউ সমর্থন করতে পারে না। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এতোদিনের ক্ষরিত রক্তের ঋণ শোধ হবে কিভাবে?

সম্মিলিত নারীসমাজের পক্ষে ফরিদা আখতার বলেন, আমরা কল্পনা চাকমার খবর চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু নারী ধর্ষিতা হয়েছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী থাকলে নারীঘটিত ব্যাপারে প্রেমের দরকার পড়ে না।

নির্ধারিত বক্তাদের আলোচনা শেষে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন সাবেক রাষ্ট্রদূত রেজাউল করিম, জাসদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, ব্যারিস্টার সালমা সোবহান, আবদুস সবুর, রবি শংকর চাকমা প্রমুখ।

গতকাল সেমিনারের বিকেলের অধিবেশনের বিষয় ছিল 'ভূমি, বসতি স্থাপনকারী, শরণার্থী ও রাজনৈতিক সমাধান'। এ পর্বে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন রাজা দেবাশীষ রায়। আলোচনা করেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, ফিলিপ গাইন, আবু সাঈদ খান ও প্রসিত বিকাশ খীসা। এ পর্বে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন আনু মোহাম্মদ।

রাজা দেবাশীষ রায় তার মূল প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সঙ্কটের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ১৯৭৯ থেকে '৮৪ সালে কয়েক লাখ বাঙালি চাষীকে পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়। অথচ ১৯৬৪ সালেই জমির অভাবে কয়েক হাজার চাকমা ভারতে চলে গিয়েছিল। তিনি বলেন, বাঙালিদের পুনর্বাসনের সময় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসন সম্পর্কে তিনি বলেন, যে কোনো উপায়ে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বরং যে কারণে তারা চলে গিয়েছিল তা দূর করতে হবে। তাদের প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তিনি বাঙালি বসতি স্থাপনাকারীদের স্বেচ্ছায় সসম্মানে অন্য কোথাও পুনর্বাসনের দাবি জানান। তিনি একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন যে কমিশন বিচার ও অনসুন্ধান করবে, যার রায় দেওয়া ও তা কার্যকর করার ক্ষমতা থাকবে।

আলোচকদের সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বহুমুখী সমস্যা। তাই নিছক রাজনৈতিক সমাধানে তা শেষ হবে না। বরং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, পাহাড়িদের আন্দোলন যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী হবে তবে তারা তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাবে কেন? তিনি রাজনৈতিক সমাধান করে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান।

**ভোরের কাগজ**
২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির সুপারিশ

**পা. চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে জনসংহতির সঙ্গে ঢাকায় আলোচনা শুরু করতে হবে**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে ঢাকায় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা শুরু করার সুপারিশ করেছে। কমিটি আয়োজিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : শান্তি, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার' শীর্ষক দুদিনের সেমিনারের শেষদিনে গতকাল শুক্রবার এ সুপারিশ করা হয়। জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গৃহীত অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে কল্পনা চাকমাকে উদ্ধার ও দোষীদের শাস্তি, বাঘাইছড়ি হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান ও বিচার, জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমি সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া এবং উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার পরিবেশ সৃষ্টি।

গতকালের দুটি অধিবেশনের মধ্যে সকালের অধিবেশনের বিষয় ছিল 'মানবাধিকার/নারী অধিকার/সামরিকায়ন।' এ অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন ফরিদা আখতার, আদিলুর রহমান খান, ড. আমেন মহসিন। আলোচনায় অংশ নেন খালেদা খাতুন, শিশির মোড়ল, কবিতা চাকমা প্রমুখ। মডারেটর ছিলেন মেঘনা গুহ ঠাকুরতা। বিকেলের অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রশ্ন।' এ পর্বে প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, আলোচনা করেন ফখরুদ্দিন আহমেদ, মাহফুজ আনাম, আহমদ ছফা, ফেরদৌস হোসেন, মোস্তফা ফারুক, ভারতীয় সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক, তপন বোস ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ। এ পর্বের মডারেটর ছিলেন লুৎফর রহমান শাহজাহান।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, একটি জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রথম শর্ত। বারবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। সবাই মিলে একটি গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বিবিসির সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর স্বার্থেই অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজনীতি যতোদিন বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করবে ততোদিন এ সমস্যার সমাধান সহজ, কিন্তু বন্দুক যখন রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে যাবে, তখন এ সমস্যা সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে।



আহমদ ছফা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কথা কেউ শুনছে না। সমস্যা সমাধানের আগে পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি আলোচনা শুরুর আগে পার্বত্য জনগণ বাংলাদেশের অধীনে থাকতে চায় কিনা তা স্পষ্ট করার আহ্বান জানান।

আদিলুর রহমান খান বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করতে একটি মহল সক্রিয় রয়েছে। ফরিদা আখতার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে সামরিক বাহিনীকে পোষা হচ্ছে। নিরাপত্তার নামে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে পার্বত্য এলাকার প্রাণবৈচিত্র্য, উজাড় হয়ে যাচ্ছে বন। খালেদা খাতুন বলেন, সামরিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের কারণে পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় সরকার কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। শিশির মোড়ল বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। কবিতা চাকমা বলেন, যতোদিন এ সমস্যা জিইয়ে রাখা হবে ততোদিন পার্বত্য এলাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত গণহত্যা, নির্যাতন চলবে।

**ভোরের কাগজ**
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
**জনসংহতি সমিতির একতরফা ঘোষণা**

**পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ এক মাস বাড়লো**

**আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে :** শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আরো এক দফা বাড়িয়েছে। গতকাল রোববার শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রথম জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ঘোষণা করলো। এর আগে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সর্বশেষ অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আজ সোমবার শেষ হচ্ছে।

এদিকে জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোয় পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। উল্লেখ্য, সরকার ও জনসংহতি সমিতির সংলাপে যে অচলাবস্থা চলছে, তাতে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গতকাল জনসংহতি সমিতির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান সরকার রাষ্ট্রের শাসন

ক্ষমতাগ্রহণ করার পর সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে ৫টি প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ বা প্রত্যুত্তর জনসংহতি সমিতিকে জানানো হয়নি। তাছাড়া অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আরো বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাবও দেওয়া হয়নি। বরং প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকারের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে দেশে-বিদেশে বক্তব্য রেখেছেন।

সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের জগদীশ চাকমা স্বাক্ষরিত এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকার কর্তৃক অস্ত্রবিরতি চুক্তি লংঘনের অভিযোগ করা হয়। এ ছাড়া সম্প্রতি সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও কল্পনা চাকমার অপহরণ সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়; একটি বিশেষ মহল পার্বত্যাঞ্চলে অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে জনসংহতি সমিতির উপর মিথ্যা দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির বাতাবরণ তৈরি করছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোনো সমাধানের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। উপরন্তু পরিস্থিতি অশান্ত অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। তা সত্ত্বেও পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে একটি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি চলমান অস্ত্রবিরতি ও শান্তি প্রক্রিয়া এবং সংলাপ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে সরকারকে প্রস্তুতি নেওয়ার সুবিধার্থে একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

**ভোরের কাগজ**
১লা অক্টোবর ১৯৯৬

**চিফ হুইপের নেতৃত্বে**
**পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক**
**জাতীয় কমিটি**

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ বৃন্দ এবং গণ্যমান্য নাগরিকরা কমিটির সদস্য থাকবেন। এই কমিটি শিগগিরই কাজ শুরু করবে। বাসস।



এদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য এলাকায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছে সরকার তাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ ও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করে স্বাগত জানিয়েছে।

**মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত**

সরকারি তথ্যবিবরণীতে জানানো হয়, মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মন্ত্রিসভা দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি খাতে স্টলসহ উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

বৈঠকে জানানো হয় যে, দেশে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি এবং এর প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব আইয়ুবুর রহমানের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার গৌরবোজ্জ্বল অবদান এবং ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় তার প্রশংসনীয় ভূমিকা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

**ভোরের কাগজ**
৬ই অক্টোবর ১৯৯৬

**পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক**
**জাতীয় কমিটির**
**বৈঠক অনুষ্ঠিত**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ১১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটির প্রথম বৈঠক গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ সম্পর্ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির চেয়ারম্যান এবং জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এতে উপস্থিত ছিলেন। ইউএনবি।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আশু রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে বলে এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।

তথ্য বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কমিটির কয়েকজন সদস্য তাদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল খাগড়াছড়ির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

**ভোরের কাগজ**

৭ই অক্টোবর ১৯৯৬

খাগড়াছড়িতে জাতীয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

**জনসংহতি সমিতির কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে, সম্মতি পেলে বৈঠক**

**হরিকিশোর চাকমা ও আজিম-উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে গঠিত জাতীয় কমিটি গতকাল রোববার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছে। বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আজ সোমবার দ্রুত বৈঠক অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানিয়ে শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, বিগত একুশ বছর যাবত পার্বত্য এলাকায় যে অশান্তি, অশান্ত ঘটনা প্রবাহ চলছিল তার একটা সমাধানে পৌঁছতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ১০৩ দিনের মাথায় এই শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছে। তিনি আরো বলেন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সুষ্ঠু ও রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে আমরা যে কোনো সময়, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো জায়গায় আলোচনা করতে রাজি আছি। তিনি বলেন, যারা আন্দোলন করছেন, বিভ্রান্ত হয়ে যে সমস্ত ভাইরা পার্শ্ববর্তী বন্ধু দেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের কাছে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা আপনাদের মাধ্যমে পৌঁছানোর জন্য আমরা এখানে এসেছি। পার্বত্য জেলার দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণের সঙ্গে খোলামনে আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান সরকার পার্বত্য সমস্যা সমাধানে আগ্রহী বলে চিফ হুইপ উল্লেখ করেন। চিফ হুইপ এই আলোচনা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য যোগাযোগ কমিটির সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, মোশাররফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার, যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরালাল চাকমা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা ও মোঃ



শফি। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি রিজিওনাল কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কাজী আশফাক আহমেদ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও ডিআইজি আলী মোহাম্মদ ইকবাল।

উল্লেখ্য, জাতীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিএনপি দলীয় ২ জন ও জাতীয় পার্টির ১ জন সদস্য এ বৈঠকে আসেননি। তবে তাদের না আসার কারণ ব্যক্তিগত বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভারতে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আরেক সদস্য অনন্ত বিহারী খীসা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বৈঠক শেষে যোগাযোগ কমিটির তিন সদস্যের সঙ্গেও একান্ত বৈঠকে মিলিত হন।

এদিকে, যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা গতকাল রোববার জনসংহতি সমিতির কাছে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চিঠি পাঠানোর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। আজ সোমবার একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে চিঠি পাঠানোর পর জনসংহতি সমিতির সম্মতি পাওয়া গেলে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রথমবারের মতো দুপক্ষের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে এরশাদ আমলে ৬ বার এবং সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে ১৩বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় ২৮ বার অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

২১শে আক্টোবর ১৯৯৬

**আলোচনা শুরুর জন্য শান্তিবাহিনীর সাড়া পাওয়া যায়নি**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে গঠিত ১১ সদস্যের জাতীয় কমিটি এখন শান্তিবাহিনীর আলোচনা শুরুর প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করছে বলে জানা গেছে। বাসস।

কমিটি চেয়ারম্যান চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে লিয়াজোঁ কমিটিকে গত ৬ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত সমাধানে সরকারের যে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা রয়েছে

তা শান্তিবাহিনীকে জানাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় কমিটি এখন পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সাড়া পায়নি।

গতকালের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সময়ে যেসব কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও রাজনৈতিক নেতা কাজ করেছেন, তাদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

**ভোরের কাগজ**

২২শে অক্টোবর ১৯৯৬

অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংলাপ

**পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ২৭ অক্টোবরের মধ্যে সরকারের জবাব চেয়েছে**

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানকল্পে চলতি মাসের প্রথমদিকে সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিটি পদ্ধতিগত হয়নি বলে অভিযোগ করেছে জনসংহতি সমিতি। গতকাল সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঐ অভিযোগসহ চার দফা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও সংলাপ শুরুর লক্ষ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা এবং এই বিষয়ে সরকার পক্ষ সম্মত থাকলে আগামী রোববার ২৭ অক্টোবরের মধ্যে যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে লিখিতভাবে জানানোর প্রস্তাব করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয় যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক উপায় বের করার জন্য সংলাপ শুরু করা, যোগাযোগ কমিটি বহাল রাখা, বৈঠকের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সমিতির সদস্যদের মুক্তি প্রদান সংবলিত চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু সরকার শুধু যোগাযোগ কমিটি পুনর্বহাল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সমিতির কাছে পাঠিয়েছে। এমনকি সমিতির পক্ষ থেকে একতরফাভাবে ঘোষিত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়েও সরকার পক্ষ পদ্ধতিগতভাবে কোনো মতামত দেয়নি এবং পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে কিনা সে ব্যাপারেও সরকার কিছু জানায়নি। আরো অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে প্রচার করা হলেও অদ্যাবধি এ কমিটি গঠন, সদস্যদের নাম ও পরিচিতি, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনসংহতি সমিতিকে কিছুই জানানো হয়নি।



জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনতিবিলম্বে সংলাপ শুরু করা এবং সরকার কর্তৃক পদ্ধতিগতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন করা এবং উক্ত কমিটির হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা। বিগত সরকারের আমলে যে ব্যবস্থাধীনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুরূপ ব্যবস্থাধীনে উভয়পক্ষের মধ্যকার আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করা। শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও সংলাপ শুরুর লক্ষ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি মেয়াদ বৃদ্ধি করা এবং এই বিষয়ে সরকার পক্ষ সম্মত হয়ে থাকলে, আগামী ২৭ অক্টোবরের মধ্যে সরকার কর্তৃক যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতিকে লিখিতভাবে অবহিত করা। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে বিশেষত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, বসতি সম্প্রসারণ, ভূমি বেদখল ও সরকারিভাবে বন্দোবস্ত প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি অনতিবিলম্বে বন্ধ করা। যুদ্ধবিরতিকালীন গ্রেপ্তারকৃত জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যকে বিনাশর্তে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

**ভোরের কাগজ**

২৭শে অক্টোবর ১৯৯৬

নভেম্বরে বৈঠক অনুষ্ঠানের আশাবাদ

**জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবের জবাব আজ দেওয়া হবে**

**হরি কিশোর চাকমা/আজিম-উল হক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর জনসংহতি সমিতির দেওয়া প্রস্তাবের জবাব আজ রোববার পাঠানো হবে। নভেম্বর মাসের মধ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ মাসের প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির কাছে যে চিঠি পাঠায় তা পদ্ধতিগতভাবে হয়নি বলে সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করে 'পদ্ধতিগতভাবে দ্রুত কার্যকর' পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিগত সরকারের আমলে বৈঠকের সময় যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেসব ব্যবস্থা অনুসরণের দাবি জানানো হয়।

গতকাল শনিবার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ থেকে পাঠানো জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবের জবাব তিনি

সরাসরি ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছেন। আজ রোববার সে চিঠিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে হস্তান্তর করা হবে। সরকারি চিঠিতে কি লেখা হয়েছে তার বিস্তারিত জানাতে জেলা প্রশাসক অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানান, চিঠি পাওয়া গেলে একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে অতিদ্রুত জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানো হবে। সরকারি মনোগ্রাম সংবলিত কাগজ ছাড়া জাতীয় কমিটি চিঠি পাঠানোর কারণে বৈঠক অনুষ্ঠান বিলম্ব হওয়ার কথা উল্লেখ করে হংসধ্বজ চাকমা বলেন, দুপক্ষ থেকেই আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নভেম্বর মাসের মধ্যেই দুপক্ষের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব হবে।

অপরদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, সরকারি চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, আগামীতে আর সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হবে না। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে জনসংহতিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

**ভোরের কাগজ**
২৮শে অক্টোবর ১৯৯৬

**জনসংহতি সমিতি প্রদত্ত চিঠির জবাব হস্তান্তর হয়েছে গতকাল**

**হরি কিশোর চাকমা/আজিম-উল হক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির দেওয়া চিঠির জবাব গতকাল রোববার পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইল এ চিঠি হস্তান্তর করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ থেকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বর্তমানে বিদেশ সফরে থাকায় বৈঠকের দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে জানানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে জনসংহতি সমিতির প্রস্তাব অনুযায়ী গত সরকারের আমলে যে ব্যবস্থায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আগামী বৈঠকে সে ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হবে। চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ১১ জনের নাম, ঠিকানা, পদবি জানিয়ে বলা হয়েছে আলোচ্য ১১ জন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন।



উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এ মাসের প্রথম দিকে খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেন।

**ভোরের কাগজ**
৩১শে অক্টোবর ১৯৯৬

**পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আজ**

**মোঃ আজিম-উল-হক, খাগড়াছড়ি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে আর কোনো চিঠি আসেনি। আগে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার সপ্তাহকাল পূর্বে শান্তিবাহিনী চিঠি দিয়ে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর কথা জানিয়ে দিতো। কিন্তু এবার তা করা হয়নি।

**ভোরের কাগজ**
২রা নভেম্বর ১৯৯৬
মন্তব্য প্রতিবেদন

**পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে?**

**-মতিউর রহমান**

গতকাল শুক্রবার (১ নভেম্বর) থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় কোনো অস্ত্রবিরতি নেই। গত বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) শান্তিবাহিনীর দিক থেকে এককভাবে প্রস্তাবিত সর্বশেষ অস্ত্রবিরতির সময় শেষ হয়ে গেছে। ১৯৯২ সালের ১০ আগস্টে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনী বা জনসংহতি সমিতির প্রথম ঘোষিত অস্ত্রবিরতির পর থেকে সর্বমোট ৩০ বার অস্ত্রবিরতি ঘোষিত হয়েছিল।

চার বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো নতুন করে অস্ত্রবিরতি ঘোষিত না হওয়ায় পার্বত্য তিন জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ভয়ভীতির খবর আমরা পাচ্ছি। গতবারের মতো শান্তিবাহিনী এককভাবে কোনো ঘোষণা দেয়নি। বাংলাদেশ সরকারও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো সংঘর্ষ বা সশস্ত্র ঘটনা ঘটে গেলে পার্বত্য অঞ্চলের সমগ্র পরিস্থিতিই জটিল হয়ে পড়বে। কেননা, এটা আমরা জানি যে, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে অস্ত্রবিরতি চলাকালেই লংগদু ইউনিয়নে (বাঘাইছড়ি থানায়)

যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তাতে করে সামগ্রিক অবস্থাই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে বা এখন কোনো ভয়ভীতি নেই, এমন ভাবা ঠিক নয়। কারণ, শুধু বাঘাইছড়ি থানা নয়, সর্বত্রই স্থানীয় চাকমা জনগোষ্ঠী এবং পুনর্বাসিত বাঙালিদের মধ্যে গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়ে গেছে। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। এ রকম অবস্থায় আবার যেকোনো ঘটনা ঘটে গেলে সরকারের জন্যই সেটা বিব্রতকর হবে, খুব ক্ষতিকর হবে। এ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়েই সরকারের সকল পদক্ষেপ হতে হবে অত্যন্ত পরিকল্পিত। না হলে সমস্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

সরকারের অবস্থান হলো, অস্ত্রবিরতির ব্যাপারে জনসংহতি সমিতিকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। হতে পারে এভাবেই সরকার তাদের ওপর চাপ প্রয়োগের নীতি নিয়েছে। সাধারণভাবে অনেকেই মনে করছেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় শান্তিবাহিনী বিভিন্ন কারণে অতীতের চেয়ে নমনীয় হয়েছে। সে জন্যই তারা এককভাবেই সর্বশেষ অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করেছিল। এবং সে সময়েই সর্বপ্রথম জনসংহতি সমিতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, ''বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির পূর্ণ মাত্রায় সদিচ্ছা ও বাসনা রয়েছে।"

তবে এর মধ্যে গত মাসে দু'পক্ষের মধ্যে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হলেও তেমন কিছু এগোয়নি। শান্তিবাহিনী অক্টোবর মাসের শুরুর শুরুর দিকে অস্ত্রবিরতিতে সম্মত থাকলে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে সম্মতি প্রদানসহ পূর্বোল্লিখিত কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সরকারের কাছে জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে দুই পক্ষের মধ্যে বৈঠকের পূর্ব ব্যবস্থা এবং জাতীয় কমিটির সদস্যদের পরিচয় ইত্যাদি জানানো হয়েছে। অস্ত্রবিরতি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের বিশেষ বিভাগ থেকে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বিদেশে অবস্থান করায় দু'পক্ষের মধ্যে বৈঠকের ব্যাপারে কোনো তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি। নভেম্বরের মধ্যে এই বৈঠক হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করছেন।

আসলে বর্তমান সরকার গঠনের পর থেকে বা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি (৩০ সেপ্টেম্বর) যেটুকু উদ্যোগ নিয়েছে সেটুকুকে যথেষ্ট বলা যায় না। এই সমস্যার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরই এই রকম মত। তাছাড়া এই জাতীয় কমিটিতে যারা অন্তর্ভুক্ত তাদের কারো কারো যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। তারপরও দেখা যাচ্ছে যে, এই



কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সদস্যরা সক্রিয় নন, তারা অক্টোবরের শুরুতে দুই পক্ষের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত থাকেননি। সর্বোপরি, এই জাতীয় কমিটির এখতিয়ার কি, কি প্রস্তাব তাদের রয়েছে এবং পুরো সমস্যা সম্পর্কে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি, এ ব্যাপারে একটি জাতীয় ঐকমত্য থাকা জরুরি। তা না হলে সমস্যা সমাধানে অন্তরায় সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। সরকার 'জাতীয় কমিটি' গঠন না করে পূর্বের মতো সংসদীয় কমিটি গঠন করলো না কেন? এই সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি কতটুকু কি করেছে, সে সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অভিমত হলো যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে সরকারের অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে, অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনে জাতীয় কমিটিকে গ্রহণযোগ্যভাবে পুনর্গঠিত করে এ সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানে দ্রুতই জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রথমেই স্থায়ী অস্ত্রবিরতির জন্য চেষ্টা করতে হবে তা না হলে প্রতি মাসেই নতুন করে অস্ত্রবিরতির জন্য অপেক্ষার অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এতে কোনো কাজ এগোয় না। এই সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সরকারকে গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বিষয়গুলো হলো : এক. পার্বত্য অঞ্চলের জাতীয় সংখ্যালঘুদের (উপজাতীয়দের) জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান; দুই. চট্টগ্রামের তিনটি পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদকে ২২টি বিষয়ের দায়িত্ব পুরোপুরি প্রদান; তিন. স্থানীয় সরকার পরিষদকে সাংবিধানিক গ্যারান্টি দেয়া; চার. তিন জেলা পরিষদ নিয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন বা বিশেষ অঞ্চলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান; পাঁচ. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে চট্টগ্রামের জিওসি'র জায়গায় বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ; ছয়. বাঙালি পুনর্বাসন বন্ধ এবং প্রয়োজনে পুনর্বাসিত বাঙালিদের নতুন করে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা; এবং সাত, ভারত থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য কূটনৈতিকসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সকল নিরাপত্তাসহ ঢাকা বা চট্টগ্রামে বৈঠক করার উদ্যোগ নিতে পারে। এই সব প্রশ্নগুলোতে সরকার বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত জনসহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপাত্র 'জুম্ম সংবাদ বুলেটিনে'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে, ''বর্তমান আওয়ামী লীগ

সরকারের কাছে জুম্ম জনগণও এক নিবিড় প্রত্যাশার দাবীদার।" আরো বলা হয়েছে, ''শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সফর করে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছে।" সেজন্য জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি স্থায়ী ও সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান বর্তমান সরকারের কাছে প্রত্যাশা করে বলে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে সে কথা মনে রাখতে হবে।

**ভোরের কাগজ**
৫ই নভেম্বর ১৯৯৬
সম্পাদকীয়

## পার্বত্য সমস্যা ও বর্তমান সরকার

আপাতত খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় কয়েকটা দিন গেছে অস্ত্র বিরতিহীন। ৩ নভেম্বর শান্তিবাহিনী আবার একতরফা অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করেছে, একমাসের জন্য। গত ৩১ অক্টোবর শান্তিবাহিনী ঘোষিত ৩০তম অস্ত্রবিরতির মেয়াদ শেষ হলে পার্বত্য এলাকায় উদ্বেগ-আতঙ্ক দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে অস্ত্রবিরতি চলাকালেই লংগদু ইউনিয়নে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, তা ভাবলে এই আতঙ্ক স্বাভাবিক যে, অস্ত্রবিরতির ঘোষণা না থাকলে যেন কী হয়! ৩১তম অস্ত্রবিরতির ঘোষণায় উভয়পক্ষ এক মাসের মতো সময় পেলো। এটা তেমন কোনো সময় নয়। দেখতে দেখতেই চলে যাবে। তখন কি আবার সন্ত্রাসের করাল ছায়া গ্রাস করবে পার্বত্য জনপদকে? আবার তাকিয়ে থাকতে হবে অস্ত্রবিরতির ঘোষণার দিকে? এভাবেই খড়্গের নিচে মাথা সঁপে দিন যাবে অগুণতি মানুষের?

এই প্রশ্ন আরো তীব্র হয়ে উঠছে, যখন আওয়ামী লীগ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অগোছালো কিংবা গুছিয়ে ওঠার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ! অথচ পার্বত্য এলাকাবাসীসহ অনেকের মধ্যেই এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপরই ভরসা বেশি, আশাবাদ বেশি। ওই এলাকা থেকে বিগত দুই সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরাই প্রতিবারই তিনটি আসন পেয়েছেন, পার্বত্যবাসীরা ভোট দিয়ে জিতিয়েছে আওয়ামী লীগ মনোনীতদের। অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় শান্তিবাহিনী বিভিন্ন কারণে অতীতের চেয়ে নমনীয় হয়েছে। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই কেবল জনসংহতি সমিতি



প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, 'বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির পূর্ণমাত্রার সদিচ্ছা ও বাসনা রয়েছে।' এ অবস্থায় বর্তমান সরকার কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না এবং এর রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে অর্থপূর্ণ সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না, সেটাই একটা প্রশ্ন বটে! সমস্যা সমাধানে সরকারের এ ধরনের এলানো ভাব থেকেই আসছে হতাশা, দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক।

সরকার অবশ্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু সেই কমিটি এখনো পর্যন্ত চিঠি বিনিময় ছাড়া তেমন কিছু করেনি। জাতীয় কমিটিভুক্ত বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সদস্যরা অক্টোবরের শুরুতে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বাধীন যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত হননি। বর্তমান সরকার নিজেকে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে; সরকার নিজে ঐকমত্যের হওয়ার চেয়ে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা বেশি জরুরি, বলা যায়, অনিবার্য।

বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে, সরকারের কর্তব্যের অগ্রাধিকার তালিকায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান নেই, এ সমস্যার ভয়াবহতা ও আশু সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করতে পারছে না। অথবা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেও ইস্যুটা নিয়ে ঠিক যুৎসইভাবে কাজ করতে পারছে না। এটা বাইরে থেকে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চাই এ মনে হওয়াটা ভুল বলে প্রমাণিত হোক। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অর্জন করুক, ওই এলাকায় শান্তি আসুক, রক্তপাতের অবসান ঘটুক।

**ভোরের কাগজ**
৯ই নভেম্বর ১৯৯৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

## ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সরকারের জবাব চেয়ে চিঠি দিয়েছে জনসংহতি সমিতি

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির ক্ষমতা, দায়িত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে জনসংহতি সমিতি। এ কমিটিকে সমস্যা সমাধানে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি না, একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি গঠন না করে কেন জাতীয় কমিটি করা হলো তার ব্যাখ্যা এবং তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রশ্নে আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সরকারের জবাব চাওয়া হয়েছে। এর আগে অস্ত্র বিরতি ছাড়া

৩ দিন চলার পর জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। গত ৩ নভেম্বর এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

এদিকে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানে টানাপড়েন চলায় পার্বত্য এলাকার মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা গেছে। জনসংহতি সমিতির সর্বশেষ চিঠির জবাব নিয়েও গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত সরকারি কোনো উদ্যোগের খবর পাওয়া যায়নি।

১২ জুনের সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকারের আমলে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি কমিটির পরিবর্তে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে। সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটি ৩ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বৈঠক করে। বৈঠকের পর পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারের আগ্রহের কথা জনসংহতি সমিতিকে জানানো হয় কিন্তু জনসংহতি সমিতি সে চিঠিটি পদ্ধতিগতভাবে যথাযথ হয়নি বলে উল্লেখ করে এবং এ ব্যাপারে সরকারকে 'দ্রুত কার্যকর' ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। যার প্রেক্ষিতে সরকার গত ২৬ অক্টোবর জনসংহতি সমিতিকে চিঠি দেয়।

এদিকে সর্বশেষ চিঠির জবাব সরকার দিতে ব্যর্থ হলে অস্ত্র বিরতি ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বজায় থাকবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। এ অবস্থায় ভিন্ন চিন্তা করতে বাধ্য হবে বলেও জনসংহতি সমিতি চিঠিতে উল্লেখ করে। তাই বর্তমানে অস্ত্রবিরতি বজায় থাকলেও এক ধরনের অনিশ্চয়তায় পার্বত্যবাসীর মধ্যে উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯২ সালে ১০ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একতরফাভাবে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করার পর এ পর্যন্ত ৩১ বার অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং ১৩ বার উভয় পক্ষের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্র লাল চাকমা বলেন, পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে অস্ত্রবিরতি বজায় রাখা উচিত আর পার্বত্যবাসীদের আশা-আকাংক্ষা অনুযায়ী দুপক্ষের মধ্যে যেকোনোভাবে একবার বৈঠক অনুষ্ঠান সম্ভব হলে যে টানাপড়েন চলছে তা কেটে যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান মং ক্য চিং চৌধুরী বলেন, পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। তাই একটু ধৈর্য ধরে কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিত।



**ভোরের কাগজ**

**১২ই নভেম্বর ১৯৯৬**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

**জনসংহতি সমিতিকে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সরকার**

**আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘকালের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সরকার আগামী ২৩ নভেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে জনসংহতি সমিতিকে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সমিতির সর্বশেষ (১ নভেম্বর স্বাক্ষরিত) পত্রের জবাবে স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক (প্রশাসন) মসিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাকে লেখা এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। হংসধ্বজ চাকমা গতকাল সরকারি প্রস্তাব সংবলিত চিঠিটি বিশেষ দূতের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতিকে পৌঁছে দিয়েছে। পত্রের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির চাহিদা মোতাবেক সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের ৩ প্রস্থ অনুলিপিও সমিতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

সরকারি প্রস্তাব পত্রে উল্লেখ করা হয় সরকার ক্ষমতা গ্রহণের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পার্বত্য সমস্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের মনোনীত সাংসদ বর্গ, চট্টগ্রাম পৌর করপোরেশনের মেয়র এবং সমস্যার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৩ জন সম্মানিত নাগরিককে নিয়ে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপের নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। এবং দ্রুত কার্যক্রম শুরু করেছে। পত্রে আরো উল্লেখ করা হয় সরকারের প্রত্যাশা ছিল বিগত ২৪ অক্টোবরের সরকারি পত্রের উত্তরে সমিতি বিরাজমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে, তাদের আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে সরকারের কাছে সংলাপের তারিখ সময় ও স্থান সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব সরকার পায়নি তথাপি সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে ২৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক বৈঠকের প্রস্তাব দিচ্ছে এবং জাতীয় কমিটি আশা করে যে প্রস্তাবিত তারিখেই প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরবর্তী সময়ে সংলাপ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রথম বৈঠকেই পরের বৈঠকের কর্ম পদ্ধতি স্থান সময় ও তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।

প্রস্তাব পত্রে আরো উল্লেখ করা হয় সমিতি কর্তৃক ইতিপূর্বে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়াদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৈঠকে আলোচনা করা সম্ভব। পরে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ককে সমিতির তরফ থেকে সংলাপ অনুষ্ঠানের দিন সময় স্থানের ব্যাপারে নিশ্চিতকরণ এবং জনসংহতি সমিতির যে সকল

প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেবে তাদেরকে নির্ধারিত সময়ে বৈঠকে যোগদানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য সর্বশেষ চিঠিতে জনসংহতি সমিতি তাদের দেওয়া ৪ দফা প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সমিতিকে জানানোর অনুরোধ করেছিল। আগামী ২৩ নভেম্বর যদি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাহলে এ সরকারের সঙ্গে সমিতির নতুন করে সমঝোতার দ্বার উন্মোচিত হবে। বিগত সরকারের আমলে মূল কমিটির সঙ্গে ৬ বার সাব কমিটির সঙ্গে ৭ বার সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩১ বার অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।

**ভোরের কাগজ**

১৩ই নভেম্বর ১৯৯৬

**খাগড়াছড়িতে আজ যোগাযোগ কমিটি বৈঠকে বসছে**

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংহতি সমিতিকে বৈঠকে বসতে রাজি করাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ কমিটি বৈঠকে বসেছে। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ থেকে পাঠানো চিঠিতে আগামী ২৩ নভেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য জনসংহতি সমিতিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

১৯শে নভেম্বর ১৯৯৬

**সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**

**বর্তমান সরকার পার্বত্যবাসীর সমস্যার ব্যাপারে সচেতন**

**কূটনৈতিক প্রতিবেদক :** পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা নিয়ে আলোচনায় পাশাপাশি বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্যও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি



বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্যবাসীদের সমস্যার ব্যাপারে সচেতন। তাই ক্ষমতা গ্রহণের পরই এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে।

গতকাল সোমবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদ আয়োজিত 'পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া এবং আজকের প্রচেষ্টা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম দিলদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বার্তাসংস্থা ইউএনবি'র চেয়ারম্যান আমানুল্লাহ খান, এডভোকেট একে এম হক কায়সার, অধ্যাপক ওসমান গনি, স্বপ্না চাকমা, কাজী মোশাররফ হোসেন ও রুহুল আমিন বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের মহাসচিব সুবিনয় চাকমা।

সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পররাষ্ট্র বিষয়ে জটিল যে সমস্যাগুলো আছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সেগুলোর মধ্যে একটি। বিগত দুটি সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। তাই আমার বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করবে এ আস্থা পার্বত্যবাসীর রয়েছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার আলোচনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে চিফ হুইপের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। এছাড়া ত্রিপুরায় অবস্থানরত চাকমা শরণার্থীদেরও ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমরা জানি, কেউ উদ্বাস্তু হিসেবে বিদেশে থাকতে চান না। তারা দেশে ফিরে আসুন, নিজ দেশে আনন্দের সঙ্গে জীবনযাপন করার এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

তিনি বলেন, শান্তিবাহিনীর ভূমিকা ইতিমধ্যে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। শান্তির নামে তারা অশান্তির কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আমাদের দেশে পানি বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধ যেখানে আছে, সেখানে না হয়ে অন্য কোথাও হলে হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস অন্যরকম হতো। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের আগে তৎকালীন সরকার এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে দেখেনি।

ইউএনবির চেয়ারম্যান আমানউল্লাহ খান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। অভ্যন্তরীণভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালাতে হবে। এই সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হলে সেটা হবে দুঃখজনক।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধে সুবিনয় চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ১১ দফা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

### ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৬
### জনসংহতি সমিতির কাছে চিঠি
### ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে সরকার

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠকের তারিখ ১০ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে ২১ ডিসেম্বর নির্ধারণ করার এবং বলবৎ অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন শান্তিবাহিনীর কাছে এ চিঠি পাঠিয়েছে। ইউএনবি

### ভোরের কাগজ
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯৬
### তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ আবারো বাড়ছে

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** সরকার তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ আরো একদফা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটির মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে।

স্থানীয় কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের একটি সূত্রে জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারি নীতি নির্ধারকদের আগ্রহ থাকলেও সময়ের স্বল্পতা, বিদ্যমান ভোটদান পদ্ধতির জটিলতা এবং সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে পরিষদসমূহের মেয়াদ আরো একদফা বাড়ানো হচ্ছে। এ বর্ধিত মেয়াদ ৬ মাস থেকে এক বছর হতে পারে বলে সূত্র উল্লেখ করেন।

এদিকে নির্বাচন পদ্ধতি সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির মেয়াদ আরো ৩ মাস বাড়ানো সংক্রান্ত চিঠি ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহে পাঠানো হয়েছে। এ কমিটির গত ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল।



### ভোরের কাগজ
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯৬
### জনসংহতি সমিতি ২১ ডিসেম্বর শান্তি সংলাপে বসতে সম্মত

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** জনসংহতি সমিতি সরকার প্রস্তাবিত আগামী ২১ ডিসেম্বর শান্তি সংলাপে বসতে সম্মত হয়েছে। সমিতি গতকাল যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পাঠানো এক পত্রে এই সম্মতি জানিয়েছে। তিনি এই পত্র গতকালই সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এর আগে জনসংহতি সমিতি এক পত্রে আগামী ১০ ডিসেম্বর বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিলে সরকার মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী উদযাপন নিয়ে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে ২১ ডিসেম্বর বৈঠকের প্রস্তাব দেয়। পত্রে সরকার প্রস্তাবিত ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জনসংহতি সমিতি জানিয়েছে।

### ভোরের কাগজ
২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৬
### পার্বত্য চট্টগ্রাম
### জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারি কমিটির বৈঠক কাল

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিমউল হক :** আগামীকাল শনিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারি কমিটির বৈঠক বসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে এটাই হবে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বৈঠক অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বৈঠক শুরু হবে।

বৈঠকে সরকারি পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সভাপতি জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতা, জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা ।

এদিকে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উভয় পক্ষে নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সীমান্তবর্তী পানছড়ি থানার দুদুকছড়ি এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পক্ষের ৮টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও ৫টি ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে। ক্যাম্পগুলোর এ অবস্থা বৈঠকের পর

৩ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র দল শান্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী দল সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নিয়েছে বলে জানা যায়। আজ শুক্রবার জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ সীমান্তবর্তী এলাকায় এসে পৌঁছুবেন বলে জানা গেছে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের জন্য খাগড়াছড়ি শহর থেকে খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছেন।

বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়কের সভাপতিত্বে স্বেচ্ছাসেবক কমিটির এক সভা হয়েছে। বৈঠকের দিন স্বেচ্ছাসেবক কমিটির কর্মপদ্ধতি কি হবে সভায় এ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য, বৈঠককালে স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সদস্যরাই এ এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

বৈঠকে যোগদানের জন্য সরকারি কমিটির সদস্যরা আজ খাগড়াছড়ি পৌঁছুবেন। চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আজ সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য জেলার উপজাতি ও অউপজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। অন্যদিকে কাল সকাল ১০টায় হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ি এলাকা থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে বৈঠকস্থলে নিয়ে আসা হবে।

এ বৈঠককে কেন্দ্র করে পার্বত্য এলাকার জনগণের মধ্যে বেশ আশার সঞ্চার হয়েছে। ২৩ জুন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রথমবার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসছে। এর আগে একাধিকবার বৈঠকের তারিখ পরিবর্তনও হয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

**২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬**

### বিএনপি সাংসদরা বৈঠকে যাচ্ছেন না

### জনসংহতি সমিতির সঙ্গে জাতীয় কমিটির বৈঠক আজ শুরু

**খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতি আজ শনিবার সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে বৈঠকে বসছে। এই বৈঠকের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে বলে জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের বৈঠক হচ্ছে। বৈঠকে গত



এক বছরে পার্বত্য এলাকায় যে সব সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে সামরিক হেলিকপ্টারে করে সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ির পাহাড়ি এলাকা থেকে সার্কিট হাউজে নিয়ে আসা হবে। বৈঠকস্থলে যাতে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা না ঘটে তার প্রস্তুতি হিসেবে গতকাল শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি ও আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে গতকাল শুক্রবার জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহসহ কমিটির সদস্যরা খাগড়াছড়ি এসে পৌঁছেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় কমিটির সঙ্গে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, পেশাজীবী ও সরকারি কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিগত নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ পার্বত্য সমস্যা সমাধানে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। আজকের বৈঠক সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে চিফ হুইপ বলেন, পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বৈঠকে ৮ সদস্যের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন চিফ হুইপ। কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, তিন পার্বত্য জেলার সাংসদ দীপংকর তালুকদার, কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর ও জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। এদিকে জাতীয় কমিটিভুক্ত বিএনপি সাংসদ আমির খসরু মোঃ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে বৈঠকে ৫ সদস্যবিশিষ্ট জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি নেতৃত্ব দেবেন সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। দলের অন্য সদস্যরা হচ্ছেন গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রূপায়ন দেওয়ান ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের জাতীয় কমিটি ও সাব কমিটির মোট ১৯ বার বৈঠক হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে এই প্রথম জনসংহতি সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

**ভোরের কাগজ**
২২শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

## জাতীয় কমিটি ও জনসংহতির বৈঠকে প্রথম দিনে অস্ত্রবিরতি ৩১ মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত

*নেতারা বলেন 'সৌহার্দপূর্ণ' ■ ফের আলোচনা মঙ্গলবার*

**সানাউল্লাহ/আজিম উল হক/হরি কিশোর চাকমা, খাগড়াছড়ি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির বৈঠক গতকাল শনিবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে শুরু হয়েছে। এটা ছিল গত ১৩ জুন ক্ষমতাসীন হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক। গতকাল বৈঠক ৩ ঘন্টা চলার পর মুলতুবি হয়ে যায়। মুলতুবি বৈঠক আগামী মঙ্গলবার সকাল ১০টায় একই স্থানে আবার বসবে এবং টানা ২/৩ দিন চলতে পারে। এদিকে বৈঠকে উভয়পক্ষ আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি বাড়াতে সম্মত হয়েছে।

বৈঠক শেষে জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সাংবাদিকদের বলেছেন, আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক এবং কার্যকর হয়েছে।

সকাল পৌনে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত স্থায়ী গতকালের বৈঠকে স্ব স্ব প্রতিনিধিদলের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেন। জাতীয় কমিটির সদস্য বিএনপির দুই সাংসদ আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এবং চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান উপস্থিত ছিলেন না। জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, এডভোকেট ফজলে রাব্বী ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার উপস্থিত ছিলেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষে রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা আলোচনায় অংশ নেন। এ ছাড়া যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, কে শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, মহাপরিচালক সি এম মোহসীন, বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।



বৈঠক শেষে সার্কিট হাউসেই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সন্তু লারমা স্বল্পক্ষণের জন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। চিফ হুইপ বলেন, আলোচনা আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে। সন্তু লারমা এর সঙ্গে 'ফলপ্রসূ হয়েছে' কথাগুলো যুক্ত করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সন্তু লারমা বলেন, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত সরকার ও শান্তিবাহিনী অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়েছে। নতুন সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টিকে তিনি নতুন উদ্যোগ, নতুন অনুভূতি বলে অভিহিত করে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিরাজমান সশস্ত্র সংঘাতের সমাধানে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ ৫ দফা দাবি আদায়ে বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গত দুই দশক ধরে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত। উভয়পক্ষের এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে বেসামরিক লোকসহ প্রায় ২০ হাজার জীবনহানির ঘটনা ঘটেছে বলে বিভিন্ন পক্ষ দাবি করে আসছে।

সম্প্রতি ২৮ কাঠুরিয়া হত্যা, থানচি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ৬ ব্যক্তি অপহরণ এবং পানছড়ি থেকে ৯ কাঠুরিয়া অপহরণ ঘটনার সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট কিনা এ প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা বলেন, 'আমাদের পার্টি এসব ঘটনায় জড়িত নয়।' তাহলে তৃতীয় কোনো পক্ষ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সেটা আমরা কি করে বলবো। আপনারাই (সাংবাদিক) বের করতে পারেন।' আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জানান, সন্তু লারমা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। এখনো তাঁর গা গরম। সে কারণে ২৪ তারিখ মুলতুবি বৈঠক হবে। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় পানছড়ি থানার সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি থেকে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে সন্তু লারমাসহ জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলকে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে নিয়ে আসা হয়। চিফ হুইপসহ জাতীয় কমিটি ও যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা তাদের স্বাগত জানান। সকাল পৌনে ১১টায় উভয় পক্ষের বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শেষে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সার্কিট হাউসেই দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। তাদের খাবারের মেন্যুতে পোলাও, মুরগি ও খাসির মাংস, ভাজি এবং ডাল ছিল বলে জানা যায়। তবে সন্তু লারমা নিরামিষভোজী বলে তার খাবার হংসধ্বজ চাকমার বাসা থেকে পাঠানো হয়।

বৈঠককালে সার্কিট হাউস এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যোগাযোগ কমিটি গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল। বিকেল সাড়ে ৩টায় সার্কিট হাউস থেকেই সন্তু লারমাসহ জনসংহতির প্রতিনিধিরা হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ি ফিরে যান।

এর কিছুক্ষণ পর জাতীয় কমিটির সদস্যরা হেলিকপ্টারে করে চট্টগ্রাম ফিরে যান। কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জানান, চট্টগ্রামে গিয়ে সদস্যরা বৈঠকের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবেন। তারপর তিনি ঢাকা গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বৈঠকের ফলাফল জানিয়ে কাল সোমবার বিকেলে তিনি খাগড়াছড়ি ফিরে আসবেন, বলে জানিয়েছেন।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মূলত মুলতুবি বৈঠকের দিন-ক্ষণ ঠিক করাসহ প্রারম্ভিক কথাবার্তা হয়েছে। জনসংহতি সমিতি তাদের সংশোধিত ৫ দফা দাবি জাতীয় কমিটির কাছে পেশ করে। সন্তু লারমা বৈঠকে বলেন, তারা তাদের দাবি পেশ করেছেন। সরকার কি দিতে পারবে সেটা তারা ঠিক করবে। টিএনও অপহরণ, কাঠুরিয়া হত্যার ব্যাপারে জাতীয় কমিটি জনসংহতির বক্তব্য জানতে চায়। সন্তু লারমা এসব ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেন।

**ভোরের কাগজ**

**২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৬**

**সরকার-জনসংহতি পরবর্তী বৈঠক ২৫ জানুয়ারি**

**পার্বত্য সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত রূপরেখার ব্যাপারে আশাবাদ**

**সানাউল্লাহ/আজিমউল হক/হরিকিশোর চাকমা, খাগড়াছড়ি থেকে :** আগামী ২৫ জানুয়ারি '৯৭ পরবর্তী বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা দেশবাসীকে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে গতকাল সরকার ও জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় দফা বৈঠক শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির বৈঠক শেষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, পার্বত্য সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা মোটামুটি ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এ সময় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি।

গতকাল সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে উভয়পক্ষ বৈঠক শুরু করে। দুপুর ২টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। এর আগে গত শনিবার একই স্থানে উভয়পক্ষের বৈঠক হয়েছিল এবং তা গতকাল পর্যন্ত মুলতবি ছিল। গতকালের বৈঠক টানা ২/৩ দিন চলার কথা থাকলেও মূলত জনসংহতি সমিতির প্রধান এবং তাদের পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্বদানকারী সন্তু লারমার



অসুস্থতায় তা আর চলেনি। পরবর্তী বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করা হয় আগামী বছরের ২৫ জানুয়ারি।

তবে সরকার ইতিমধ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এক মাস পর ২৫ জানুয়ারির পরবর্তী বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা চলবে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে নির্বাচিত সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা যোগাযোগ কমিটির সদস্য মথুরালাল চাকমাকে নিয়ে গত সোমবার দুদুকছড়ি গিয়েছিলেন। জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে তাঁরা সেখানেই রাত কাটান এবং গতকাল সকালে খাগড়াছড়ি ফিরে আসেন। এর আগে গত রোববার রাতে জাতীয় কমিটির তিন নেতা সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এবং আতাউর রহমান খান কায়সার ঢাকায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন বলে জানা যায়। সে বৈঠকে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা এবং সমঝোতায় পৌঁছার কৌশল ও নীতি নিয়ে কথা হয়। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতীয় কমিটির সদস্যরা পরবর্তী বৈঠকে বসবেন।

গতকাল সকাল পৌনে ১০টায় চট্টগ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে করে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ি এসে পৌঁছেন। একই হেলিকপ্টার জেলার পানছড়ি থানার ভারতীয় সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি গ্রাম থেকে জনসংহতি সমিতির নেতাদের খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে নিয়ে আসে সকাল সাড়ে ১০টায়। বৈঠক শেষে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে দুপুরের খাবার খেয়ে জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এক সঙ্গে বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে হেলিকপ্টারে চড়েন। প্রথমে দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির নেতাদের নামিয়ে হেলিকপ্টারটি চট্টগ্রাম ফিরে যায়।

গতকাল বৈঠক চলে দুই পর্যায়ে। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি, সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাসহ নেতৃবৃন্দ, সরকারের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক প্রমুখ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রামের মেয়র এবি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং আতাউর রহমান খান কায়সার; জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা এবং রক্ত উৎপল ত্রিপুরা; যোগাযোগ কমিটির পক্ষে নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, কে শৈ অং মারমা, বিশ্বজিৎ চাকমা, মোহাম্মদ শফি বৈঠকে যোগ দেন। জাতীয় কমিটির

সদস্য বিএনপির দুই সাংসদ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম আগের দিনের মতো গতকালও বৈঠকে যোগ দেননি। একই কমিটির অপর সদস্য জাতীয় পার্টির এডভোকেট ফজলে রাব্বী ছেলের অসুস্থতা এবং সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান নিজের অসুস্থতার কারণে বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি।

গতকাল বড়ো পর্যায়ে বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর জাতীয় কমিটির তিন নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির তিন নেতা সন্তু লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা বৈঠক থেকে উঠে পৃথকভাবে বসেন। উভয়পক্ষের ৬ নেতার বৈঠক চলে প্রায় দু'ঘন্টা। পরে তারা বড়ো পর্যায়ের বৈঠকে ফিরে আসেন। সার্কিট হাউসেই এক ব্রিফিঙে চিফ হুইপ হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আন্তরিক পরিবেশে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা মোটামুটি ঐকমত্যে পৌঁছেছি। পরবর্তী বৈঠক হবে ২৫ জানুয়ারি। আশা করি সেদিন এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে আমরা একটি চূড়ান্ত রূপরেখা জাতিকে দিতে পারবো, ইনশাল্লাহ।'

আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন, 'এটা অনেকদিনের পুরোনো সমস্যা। সমাধানের লক্ষ্যে আমরা একত্রিত হয়েছি, এগুচ্ছি। কথা বলছি। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও আমরা একমত হয়েছি।' তিনি বৈঠককে 'অর্থবহ' বলে অভিহিত করে বলেন, 'আমি মনে করি বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ মাত্রই আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রী খোঁজখবর নিচ্ছেন। সরকার আন্তরিক বলেই তো অনুভব করা যায়।'

চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় তাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা তাঁকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী বৈঠক কোথায় হবে, ঢাকায় নাকি খাগড়াছড়িতে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনো বৈঠকের স্থান ঠিক করা হয়নি। যোগাযোগের মাধ্যমে ঠিক হবে।

**ভোরের কাগজ**

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

**পার্বত্য সমস্যার আদ্যোপান্ত**

**আগামী আলোচনার প্রধান বিষয়**
**হতে পারে বসতি স্থাপনকারী**
**বাঙালি ইস্যু ও ভূমি সমস্যা**

**সানাউল্লাহ, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে :** বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যু এবং ভূমির সমস্যা আগামী দিনগুলোতে সরকার



ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে। গত ২১ ডিসেম্বর (শনিবার) ও গত মঙ্গলবার উভয়পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে এমন ধারণাই পাওয়া গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার উদ্ভব মূলত পাকিস্তানি শাসনামলে । চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক- ভিন্ন ভাষাভাষি এই ১০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯০০ সালের ৬ জানুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও এ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে যায়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে অবশ্য ১৯০০ সালের শাসনবিধির মাধ্যমে পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা আবার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৬২-র দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে 'পৃথক শাসিত অঞ্চলের পরিবর্তে 'উপজাতীয় অঞ্চল' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

এদিকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কাপ্তাই বাঁধ সৃষ্টি করায় ১৯৬০ সালে পার্বত্য অঞ্চলের ৫৪ হাজার একর আবাদি জমিসহ বিপুল জমি ডুবে যায় । এই জমি তখন মোট আবাদি জমির প্রায় ৪০ শতাংশ ছিল। বাঁধের কারণে ১ লাখ পাহাড়ি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যায়। পুনর্বাসন না হওয়ায় প্রায় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু পার্শ্ববর্তী ভারতে চলে যায় শরণার্থী হয়ে। কাপ্তাই বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসন আজো সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৭০ সালে পাহাড়ি জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রথমবারের মতো স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে পাহাড়ি এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ এবং তাদের স্বার্থ পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সংবিধান প্রণেতাদের কেউ কেউ স্বীকারও করেন তারা সে সময় সমস্যাটির গুরুত্ব বোঝেননি। মূলত সে বছরই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। বৃহত্তর বাঙালি শাসক ও জনগণের সহানুভূতি না পেয়ে ১৯৭৪ সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন 'শান্তিবাহিনী'র উদ্ভব ঘটে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'জুম্মল্যান্ড' ঘোষণার জন্য স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু করে। সেই থেকে গত ২২ বছরে বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংঘাতে পার্বত্য এই অরণ্যভূমি বারবার নিরীহ পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের রক্তে লাল হয়েছে। দাবি করা হয় মারা পড়েছে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। যাদের বেশির ভাগই বেসামরিক নারী-পুরুষ, শিশু।

এ ছাড়া নিরাপত্তা বাহিনী ও বাঙালিদের নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ১৯৮৬ সাল থেকে '৮৯ পর্যন্ত সময়কালে আরো প্রায় ১০ হাজার ৫ শতাধিক পাহাড়ি পরিবার পার্শ্ববর্তী ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। গত প্রায় আড়াই বছরে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ১৮০০ পরিবার দেশে ফিরে এসেছে। বাকিদের প্রত্যাবাসন এখনো বড় সমস্যা হিসেবে ঝুলে আছে। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি বসতি স্থাপন এবং ভূমির সমস্যা এসেছে মূলত পরস্পরের হাত ধরে। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সমস্যা মোকাবিলায় সমতল অঞ্চল থেকে দরিদ্র বাঙালিদের এনে এখানে পুনর্বাসন শুরু করেন। বসতি স্থাপনকারীদের ভূমির বন্দোবস্তও দেওয়া হয় তখন। সে সময় প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে পাহাড়ে পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে তাই পাহাড়ি ও বাঙালি জনসংখ্যা অনুপাতও কাছাকাছি চলে আসে। সর্বশেষ হিসেবে বলা হয় পার্বত্য তিন জেলায় পাহাড়ি ও বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত ৫৩ঃ৪৭। অর্থাৎ, ৫ লাখ ১ হাজার পাহাড়ি ও ৪ লাখ ৮৩ হাজার বাঙালি।

একাধিক পাহাড়ি নেতার সঙ্গে কথা বলে বসতি স্থাপনকারী বাঙালি ও ভূমির সমস্যার গুরুত্ব বোঝা যায়। পাহাড়িরা বাঙালিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এখানে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আতঙ্কে ভুগছেন। তারা মনে করেন ভূমি হস্তান্তর বন্ধ করা না গেলে এবং বসতি স্থাপনকারীদের সরানো না গেলে এক সময় তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে পড়বেন।

তবে ভূমি সমস্যার সমাধান বেশ জটিল এবং কঠিন বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে যে সব ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি উভয় গোষ্ঠীই চিন্তিত। অন্যদিকে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াও কঠিন বিষয়। জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা দাবির ৩(১) দাবিতে বলছে : ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্টের পর যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় বা জমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করে অথবা কোনো প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয়-বন্দোবস্ত ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করছে সে সব বহিরাগতদের সকলকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব বেশ কঠোর। গত ক'দিনে পানছড়ি এলাকায় একাধিক সমাবেশেও শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের (সেটেলার) বিষয়টি ফয়সালা না করে যদি তাদের স্বাধীনতাও দেওয়া হয় তা তারা প্রত্যাখ্যান করবেন বলে জানিয়েছেন।

বসতি স্থাপনকারীদের বিষয়টি কিভাবে ফয়সালা হবে তা নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালিদের মধ্যেও শংকা-উদ্বেগ দেখা যায়। কারণ এতে সেখানে



বসবাসরত পৌনে ৫ লাখ বাঙালি এবং তাদের সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত।

**ভোরের কাগজ**
**২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৬**
**পার্বত্য শান্তি পরিষদ নেতা সুবিনয় খুন**

**রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের মহাসচিব সুবিনয় চাকমা (৪৫) অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। পার্বত্য অঞ্চলে সর্বশেষ অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির পাঁচদিনের মাথায় গতকাল বুধবার এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো।

জানা গেছে, বনরূপা থেকে বাজার করে ফিরে আসার সময় রাঙ্গামাটি শহরের চম্পকনগরের নিজ বাড়ির মাত্র ১০ গজ দূরে সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় সুবিনয় চাকমা নিহত হন। আততায়ী তাকে পেছন থেকে মাথায় গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবিনয় চাকমার হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি হত্যাকারীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করতে জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সুবিনয় চাকমার নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গামাটির সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্রলাল চাকমা, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, পৌরসভা চেয়ারম্যান মনি স্বপন দেওয়ান, রাঙ্গামাটি নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান, রাঙ্গামাটি ইউপি চেয়ারম্যান সমিতি ও রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব।

সাংসদ দীপংকর তালুকদার বিবৃতিতে বলেন, পার্বত্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান যে মুহূর্তে নিশ্চিত হতে যাচ্ছে তখন সুবিনয় চাকমাকে হত্যার মাধ্যমে এক জঘন্য কাজ করেছে ষড়যন্ত্রকারীরা। এ হত্যাকাণ্ডকে পার্বত্য সমস্যার সমাধানে বর্তমান সরকারের উদ্যোগকে ব্যাহত করার গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে সাংসদ দীপংকর পার্বত্যবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাঙ্গামাটি নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান বলেছেন, এ হত্যাকাণ্ড পার্বত্য অঞ্চলের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ।

উল্লেখ্য, সুবিনয় চাকমা এক সময় শান্তিবাহিনীর সক্রিয় নেতা ছিলেন। ১০ বছর আগে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়ায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবিনয় চাকমার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি স্থাপন ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে তিনি আরো বলেন, সুবিনয় চাকমার অকাল মৃত্যুতে দেশ ও জাতির বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যাচ্ছে সে সময় এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে গভীর ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ।

**ভোরের কাগজ**

১৯শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## <u>২৫শে জানুয়ারি সরকারের সঙ্গে বৈঠক</u>
## শান্তিবাহিনীর নেতারা প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছেন

**আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে :** আগামী ২৫ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনীর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)সহ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসছেন। সেদিন তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠক করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য গত দুই দশকের সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এই প্রথমবার দেশের রাজধানী ঢাকায় সরকারের সঙ্গে শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক অভিভাবক সংগঠন জনসংহতি সমিতির বৈঠক হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে ঢাকায় আলোচনা শুরুর বিষয়টিকে একটি বড়ো অগ্রগতি হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

সরকারের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতি গতকাল এক চিঠিতে ঢাকায় বৈঠকে বসার ব্যাপারে তাদের সম্মতির কথা জানায়। জাতীয় কমিটি গত ১০ জানুয়ারি এক চিঠিতে ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় বৈঠকে বসার জন্য জনসংহতি সমিতিকে আমন্ত্রণ জানায়। সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকায় বসে



একাধিক দিনে টানা বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছিল।

জনসংহতি সমিতির নেতা রূপায়ন দেওয়ান স্বাক্ষরিত চিঠিটি গতকাল যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পৌঁছে। ঢাকা থেকে যোগাযোগ করা হলে হংসধ্বজ চাকমা ভোরের কাগজকে বলেন, ২৫ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতি ঢাকায় বৈঠকে বসতে সম্মত হয়েছে।

রূপায়ন দেওয়ানের চিঠিতে বৈঠকের দিন সকাল **১১**টায় খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য এবং বৈঠক শেষে দুদুকছড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির পক্ষে বৈঠকে সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, সদস্য কৈ শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমাও বৈঠকে যোগ দেবেন। অন্যদিকে সরকার পক্ষে জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিক হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লার নেতৃত্বে অন্য সদস্যরা থাকবেন।

জানা যায়, সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির সঙ্গে টানা বৈঠকে বসার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। জনসংহতি সমিতিকেও সেরকম আমন্ত্রণই জানানো হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি এখনই টানা বৈঠকের জন্য তৈরি নয়। বৈঠক শেষে সেদিনই তারা দুদুকছড়ি ফিরে যেতে চান। তবে টানা বৈঠক করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, গত দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ অব্যাহত রেখেছে। এই সময়কালে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত চলে আসছে। ধারণা করা হয়, এই সংঘাতে বেসামরিক নারী, শিশুসহ প্রায় বিশ হাজার পাহাড়ী ও বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। গত সোয়া চার বছর ধরে উভয়পক্ষে দফায় দফায় অস্ত্র বিরতি চললেও প্রাণহানিসহ সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

৮০-র দশকের শেষ দিকে জাতীয় পার্টির সরকারের সঙ্গে এবং চলতি দশকের অর্ধেক সময় বিএনপি সরকার গঠিত সংসদীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রচুর বৈঠক হয়েছে। বর্তমান সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গেও ইতিমধ্যে দুই দফা বৈঠক হয়েছে। তবে এসব বৈঠকের স্থান সর্বোচ্চ খাগড়াছড়ি জেলা সদর পর্যন্ত সীমিত ছিল। বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই ঢাকায় টানা বৈঠকে বসে সমস্যা সমাধানে তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে। আর তারই প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের মতো উভয়পক্ষের বৈঠক ঢাকায় হতে যাচ্ছে।

ভোরের কাগজ

২৪শে জানুয়ারি ১৯৯৭

**দৃষ্টি এখন সরকার-শান্তিবাহিনীর ঢাকা বৈঠকের দিকে**

**পার্বত্য চট্টগ্রামের পৌনে ৫ লাখ বাঙালির সামনে আশা ও সংশয়ের মিশ্র অনুভূতি**

**সানাউল্লাহ, খাগড়াছড়ি থেকে :** আশা এবং সংশয়ের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৌনে ৫ লাখ বাঙালি জনগোষ্ঠী সরকার ও জনসংহতি সমিতির আগামীকাল শনিবারের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তক্ষয়ী অশান্ত পরিস্থিতির সমাধানে ঢাকার এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সকলেই ধারণা করছেন। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বরের বৈঠক শেষে আগামীকালের বৈঠক সম্পর্কে বেশ উচ্ছ্বসিত আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার একটা বড়ো অংশই জুড়ে আছে বাঙালিদের বিষয়। বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে সমতলের বাঙালিদের পুনর্বাসন এবং তাদের জমি বন্দোবস্ত নেওয়া, ভোগ-দখল পার্বত্য সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী-বাঙালিদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতীতেও সন্দেহ, অবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। কিন্তু তা আগে সংঘাত, সংঘর্ষের পথে যায়নি। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পার্বত্য অঞ্চলে সমতলের বাঙালিদের এনে পুনর্বাসন শুরু করলে পাহাড়ী-বাঙালি সম্পর্ক প্রচণ্ড তিক্ততায় পরিবর্তিত হয়। সে সময় জিয়াউর রহমান প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে পাহাড়ে এনে জমিজমা, বাড়িঘর দিয়ে পুনর্বাসিত করেন। বিষয়টিকে পাহাড়ী জনগণ তাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি মনে করে। পাহাড়ী জনগণ মনে করে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধ্বংস করে, তাদের নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার চক্রান্ত হিসেবে বিষয়টিকে গণ্য করে।

জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফা দাবিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: "১৭ আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে যারা বেআইনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করে অথবা কোনো প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয়-বন্দোবস্ত বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করছে, সেই সকল বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।"

জনসংহতি সমিতি ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্টকে 'ডেটলাইন' ধরলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ৯০-৯৫ শতাংশ বাঙালিকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম



থেকে সরিয়ে নিতে হবে। বিষয়টি এ অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালিদের উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করে তুলেছে। তবে বেশির ভাগই মনে করেন না জনসংহতি সমিতি এ 'ডেটলাইন'কেই চূড়ান্ত ধরে নেবে। তবে ডেটলাইন ১৯৭২ বা ১৯৭৯ যাই হোক না কেন পুনর্বাসিত বাঙালিদের ইস্যুটি থাকছে এবং এখানে সংখ্যাগুরু বাঙালির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ আবুল কাসেম বলেন, 'আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এতোটুকুই চাই যেন এখানে বসবাস করতে পারি। এটা আমার জন্মগত অধিকার। একই সঙ্গে নাগরিক অধিকার। একজন চাকমা বা মারমা বা পাহাড়ী নাগরিক যদি ঢাকায় বা দেশের যে কোনো স্থানে বাড়ি করতে পারেন, আর তাতে যদি কেউ বাধা না দেয়, তাহলে আমাকে এখানে বসবাসে বাধা দেওয়া হবে কেন?'

একই প্রশ্ন করেছেন সাবেক সাংসদ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জাতীয় পার্টি নেতা এ কে এম আলিমউল্লাহ। তিনি বলেন, 'আমাদের কাগজপত্রে সরকার যে জমি বন্দোবস্ত দিয়েছে, যা আমরা কিনেছি, সেটা তো আমাদেরই সম্পত্তি।' তবে কেউ যদি জোর করে অবৈধভাবে জমি দখল করে থাকে, সেটা উদ্ধার করতে তারাও সহায়তা করবেন বলে আলিমউল্লাহ জানান। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাগরিক অধিকারের সুবাদেই আমরা বাঙালিরা এখানে বসবাস করছি। অনগ্রসর জাতি হিসেবে পাহাড়ীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক। সেটা বাঙালিরাও চায়। তিনি বলেন, 'আমরা পাহাড়ীদের জন্য হুমকি নই, হতেও চাই না।' উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন শান্তিপূর্ণভাবে এ অঞ্চলে বসবাস করতে আগ্রহী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তবে '৭৯ সাল বা পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসিত বাঙালিদের 'রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার' বলে উল্লেখ করেন আবুল কাসেম। তিনি বলেন, এই বাঙালিরা যেন রাজনৈতিক খেলার হাতিয়ারে পরিণত না হয় সেটা দেখা দরকার।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান জাহেদুল আলম বলেন, 'পাহাড়ীদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, তাদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি দরকার- এটা একটা বাস্তবতা। অন্য বাস্তবতা হলো বাঙালিদের অধিকারও যাতে নিশ্চিত হয়, সেটা দেখা।' তিনি আশা করেন যে, বাঙালি পুনর্বাসন, ভূমি সমস্যার বিষয়টি সহনশীলভাবে এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে সমাধানে জনসংহতি সমিতি এগিয়ে আসবে।

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থাকলেও পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালিরা কেউই মনে করেন না সরকার বা জনসংহতি সমিতি তাদের উপেক্ষা করবে। পাহাড়ী জনগণের মতো বাঙালিরাও সমস্যা সমাধানের জন্য অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে। আর তা উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য শান্তি ও সম্প্রীতি বয়ে আনবে- এ আশাবাদ সকলের হৃদয়ে।

**ভোরের কাগজ**
**২৫শে জানুয়ারি ১৯৯৭**

## আলোচনা দু'তিন দিন চলতে পারে
## জনসংহতি নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় সরকারের বৈঠক আজ : বড়ো ধরনের অগ্রগতির সম্ভাবনা

**প্রণব সাহা :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠক আজ শনিবার ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হচ্ছে। উভয়পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে আপাতত দুদিন বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে এ দফায় তিনদিন আলোচনা চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হবে। প্রথম দিনের বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ থেকে আজ সন্ধ্যা ৬টায় একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন জাতীয় কমিটির প্রধান চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। উভয়পক্ষের মধ্যে এটি হবে ২১তম বৈঠক। তবে ঢাকায় এটিই হবে প্রথম আলোচনা।

জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঢাকায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠেয় বৈঠকটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'একটি বড়ো ধরনের অগ্রগতি' বলে অভিহিত করছে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল। উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর ভিত্তি সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসেবে আজকের বৈঠকটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উভয়পক্ষের আন্তরিকতার কারণে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই ঢাকার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে সকলে মনে করছেন। জানা গেছে, খাগড়াছড়ি থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টারে ঢাকার পুরাতন বিমানবন্দরে পৌঁছালে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হবে।

আজকের বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির একটি সভা গতকাল শুক্রবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সূত্রে জানা গেছে, আজকের বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ২/৩ দিন ধরে



আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হবে। আজ দুপুর একটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এই বৈঠক শুরু হবে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের ঢাকায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা ও মেঘনায়। ঢাকা অবস্থানকালে সন্তু লারমাসহ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ঢাকার বৈঠকে যোগদানের জন্য সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি এলাকা থেকে হেলিকপ্টারে রওয়ানা দেবেন সকাল ১১টায়। খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ও যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা তাদের সঙ্গে থাকবেন। চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিবেন জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আজকের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে : পার্বত্য জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, তিন পার্বত্য জেলা সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, বিদ্যমান স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্যকর ও শক্তিশালী করা, পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, বাঙালি বসতি স্থাপন সমস্যার সমাধান এবং ভূমি সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। আজকের বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবি সম্পর্কে সরকারি চিন্তাধারা তুলে ধরা হবে। এ ছাড়াও সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য একটি পথ খুঁজে বের না করা পর্যন্ত লাগাতার আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতাদের আহ্বান জানানো হবে। গতকাল অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে সচিবালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর, দীপঙ্কর তালুকদার, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিবসহ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সম্পর্কে কিছু না জানালেও ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন গতকাল ভোরের কাগজকে বলেছেন, 'আমরা আশাবাদী। সমস্যা সমাধানে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে।'

খাগড়াছড়ি থেকে ভোরের কাগজ প্রতিনিধি হরি কিশোর চাকমা ও আজিমউল হক জানিয়েছেন, আজকের বৈঠকে সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় কমিটির চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। কমিটির অন্য সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী,

চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার ও চট্টগ্রাম বিভাগের সাবেক কমিশনার আলী হায়দার খান উপস্থিত থাকবেন। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দেবেন সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সমিতির শীর্ষপর্যায়ের নেতা রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। এ ছাড়া যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাসহ বিশ্বজিৎ চাকমা, কে শৈ অং মারমা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশীষ চাকমা বৈঠকে যোগ দেবেন।

জাতীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বিএনপির দুই সাংসদ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না বলে জানা গেছে।

জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকটি টানা একাধিক দিন চালানোর ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তবে যোগাযোগ কমিটির একটি সূত্র বলেছে বৈঠক একাধিক দিন চলতে পারে এমন প্রস্তুতি নিয়েই জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ঢাকা যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, আজকের বৈঠকটি সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত ২১তম বৈঠক। এর আগে এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর থেকে '৮৮ সালের ১৪ ও ১৫ জুন পর্যন্ত ৬ বার, বিএনপি সরকারের আমলে '৯২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে '৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ১৩ বার এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গত ২১ ডিসেম্বর ও ২৪ ডিসেম্বর '৯৬ দুই দফা বৈঠক হয়। পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি '৯২ সালের ১ আগস্ট থেকে একতরফাভাবে অস্ত্র বিরতি ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩১ বার অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে উভয়পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। চলমান অস্ত্র বিরতির মেয়াদ শেষ হবে আগামী মার্চ মাসের ৩১ তারিখে।

১৯৭৬ সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন 'শান্তিবাহিনী'র উদ্ভব ঘটার পর সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘাতে পার্বত্য অরন্যভূমিতে প্রায় ২০ হাজার পাহাড়ি-বাঙালির প্রাণহানি ঘটেছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়। এ ছাড়া '৮৬ থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রায় ১০ হাজার ৫ শতাধিক পাহাড়ি পরিবার পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীতে প্রায় ১৮শ পরিবার দেশে ফিরে আসে। বাকিরা এখনো সেখানে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছে।



**ভোরের কাগজ**
২৫শে জানুয়ারি ১৯৯৭
**সরকার-জনসংহতি সমিতি
আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছে
সমন্বয় ও শান্তি পরিষদ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আজ শনিবার ঢাকায় অনুষ্ঠেয় শান্তি আলোচনার প্রাক্কালে ১১ দফা সুপারিশ ও প্রস্তাব পেশ করেছে। গতবছর ১৯ ডিসেম্বর এই একই সুপারিশনামা জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর কাছে পেশ করা হয়েছিল।

পরিষদ আজকের বৈঠককে স্বাগত জানিয়ে তাদের ১১ দফা সুপারিশনামায় কার্যকর সংলাপের ব্যবস্থা করে তাতে সাংবাদিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, এ যাবত পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাসে নিহত-আহত সকল উপজাতি-অউপজাতির তালিকা প্রণয়ন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন, শান্তিবাহিনী সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি।

**ভোরের কাগজ**
২৫শে জানুয়ারি ১৯৯৭
**নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বসহ বাঙালিদের সঙ্গে আস্থা নিয়ে বসবাস করাই আকাঙ্ক্ষা
পাহাড়িরা চায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর
সাংবিধানিক স্বীকৃতি**

**সানাউল্লাহ, খাগড়াছড়ি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগণের প্রধান এবং এক নম্বর দাবি তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান। পাশাপাশি তাদের মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক গ্যারান্টিও বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাহাড়ি জনগণের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে শেষে এ ধারণা পাওয়া যায়।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক- ভিন্ন ভাষাভাষি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ ৫ লাখ ১ হাজার মানুষ এসব জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। ১৯৭৯ সালের আগে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সেসময় এবং পরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সমতল এলাকা থেকে

প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে এনে পাহাড়ে পুনর্বাসিত করেন। আর তাতেই পাহাড়ি জনগণ নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠায় পড়ে।

পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। জনসংহতি সমিতি তাদের সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠন করে ১৯৭৬ সাল থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। জনসংহতি সমিতি ১৯৮৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে তাদের সংশোধিত ৫ দফা দাবি পেশ করে। ৫ দফার অন্যতম প্রধান দাবিই হচ্ছে ক্ষুদ্র ১০টি জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয় ।

প্রবীণ শিক্ষাবিদ খাগড়াছড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তি অনন্ত বিহারী খীসা ভোরের কাগজকে বলেন, পাহাড়ি জনগণের অস্তিত্বের জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি লাগবেই। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানিরাও এটা পাহাড়িদের দিয়েছিল। 'তাহলে বাংলাদেশ তা দেবে না কেন'- তিনি প্রশ্ন করেন।

একই কথা বলেন খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক প্রবীণ চন্দ্র চাকমা এবং পাহাড়ি গণপরিষদের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য সৌখিন চাকমা। প্রবীণ চন্দ্র চাকমা বলেন, পাহাড়ি জনগণের কাছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি একটা বড়ো বিষয়। দেশের ১২ কোটি মানুষের সঙ্গে ৫ লাখ মানুষের সহাবস্থানের স্বীকৃতি থাকছে এতে।

প্রবীণ চাকমা বলেন, দেশের বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর তুলনায়, সংখ্যায় খুবই ক্ষুদ্র মাত্র ৫ লাখ পাহাড়ি মানুষ তাদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে এ দেশে বসবাস করতে চায়। তাদের চাওয়াও খুবই কম। তারা এমন কিছুই দাবি করে না যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়। তিনি মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব ভৌগোলিক অবস্থা, ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

জনসংহতি সমিতির ৫ দফার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে সৌখিন চাকমা বলেন, এটা পাহাড়ি জনগণের প্রাণের দাবি। পাহাড়ের মানুষ সবাই জনসংহতির নেতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা এ অঞ্চলে শান্তি-সম্প্রীতি এনে দেবেন।

অনন্ত বিহারী খীসা বলেন, পাহাড়ে বাঙালি-পাহাড়ি দীর্ঘদিন ধরে, আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। এখানে ৯৫ ভাগ ব্যবসাই বাঙালিদের হাতে, তাতে কি পাহাড়িরা কখনোই আপত্তি করেছে? কিন্তু গত দুই দশকে এখানে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন একটা পাহাড়ি পরিবার নেই যেটি অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়নি। এই যে সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা, তাকেও গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়েছিল। পরিস্থিতি আগের চেয়ে পরিবর্তিত হলেও পাহাড়িদের মধ্যে ভয়ভীতি, উদ্বেগ আছে বলে তিনি মনে করেন ।



অনন্ত বিহারী খীসা পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির সমস্যা সমাধানে তাগিদ দিয়ে বলেন, 'ভূমি আমাদের হৃদপিণ্ডের মতো। এটা আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে। জায়গা-জমি ছাড়া আমরা টিকবো কি করে?'

সৌখিন চাকমাও বাঙালি বসতি স্থাপনকারী এবং ভূমি সমস্যার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পুনর্বাসিত বাঙালিদের সমস্যার সমাধান এবং ভূমির সমস্যা মিটলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি মনে করেন। পুনর্বাসিত বাঙালিদের কারণে অনেক পাহাড়ি গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্বকে তৈরি করা সমস্যা বলে উল্লেখ করেন প্রবীণ চন্দ্র চাকমা। তিনি বলেন, বাঙালিদের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক পাহাড়িদের ছিল না। তাদের সঙ্গে পাহাড়িদের বিদ্বেষ বা সংঘাত নেই। তবে অনন্ত বিহারী খীসা বলেন, কিন্তু এক সময় বাঙালি পুনর্বাসিতদের তোপের মুখে ফেলা হয়। এখানে পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টাও হয়েছে। কেবল তাই নয় পাহাড়ি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও রেষারেষি তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কারা এসব করেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সবাই জানে।

খাগড়াছড়িতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব প্রবীণ শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা বলেন, পাহাড়িদের আসলেই 'সাংবিধানিক প্রটেকশন' দরকার। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, পাহাড়িরা সবাই অনুন্নত, অনগ্রসর। তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। অস্তিত্বের সঙ্কটে তারা দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ সখে নিজের মাটি, বসতবাটি ফেলে যায় না। তিনি বলেন, 'পাহাড়িরা এখন চারাগাছের মতো। চারাগাছকে নানা প্রতিকূলতা থেকে বাঁচাতে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। এই বেড়া হচ্ছে সাংবিধানিক প্রটেকশন। তারপর চারাগাছটি যখন বড়ো হবে তখন তার বেড়ার প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া পরিপূর্ণ গাছের বিকাশে বেড়া তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়।'

**ভোরের কাগজ**
**২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৭**

**জনসংহতির সঙ্গে জাতীয় কমিটির বৈঠক শুরু, আলোচনা চলবে**

**পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রগতিতে উভয়পক্ষ আশাবাদী**

**কাগজ প্রতিবেদক :** দুই দশকের সংঘাত, রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে গতকাল শনিবার ঢাকায় সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকার পক্ষে পার্বত্য

চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে এর চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) গতকালের পৌনে ৪ ঘণ্টা দীর্ঘ বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে উভয় নেতা যতো শিগগির সম্ভব একটি সমাধানে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সরকার পক্ষের নেতা চিফ হুইপ জোর দিয়েই বলেন, তারা সমঝোতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। বৈঠক আজ সকাল ১০টায় আবার শুরু হবে।

১৯৭৬ সালে শান্তিবাহিনী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ বেছে নিলেও ১৯৮৫ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে সেনাবাহিনী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রথম আলোচনায় বসেছিল। তারপর এরশাদ আমলে মোট ৬ বার, ১৯৯২ সাল থেকে বিএনপি সরকারের আমলে মোট ১৩ বার এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গত ২১ ও ২৪ ডিসেম্বর ১টি বৈঠক হয়। এসব আলোচনার পথ ধরেই গতকাল উভয়পক্ষের মধ্যে দেশের রাজধানী ঢাকায় প্রথমবারের মতো বৈঠক শুরু হয়েছে। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যারা এক সময় সরকারের কাছে চরম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ছিল তাদের সঙ্গে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে একাধিক দিনে টানা বৈঠকের ঘটনাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে বড়ো ধরনের অগ্রগতি হিসেবে সকলেই বিবেচনা করছে। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে শান্তিবাহিনী নেতা সন্তু লারমা এবং চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহসহ উভয়পক্ষের সকলকে বেশ উৎফুল্ল দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনার গাড়ি বারান্দায় গতকাল সন্ধ্যার সংবাদ সম্মেলনে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আলোচনায় তারা সন্তুষ্ট। এটা আন্তরিকভাবেই বলছেন। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে কতোদিন লাগবে জানতে চাইলে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর প্রধান বলেন, এটা সরকারের ওপর নির্ভর করছে। কতো দ্রুত শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে যেতে পারবেন বলে আশা করেন - এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা আশাবাদী, মানুষ মাত্রেই তাই। যতো শিগগির সম্ভব হবে ততোই তা সকলের জন্য ভালো বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কিনা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে পাহাড়ি জনগণের নেতা সন্তু লারমা বলেন, এরকম কোনো সংবাদ তিনি এখনো পাননি। ফলে তা তিনি বলতে পারবেন না। তিনি নিজে আগ্রহী কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রয়োজন হলে কেন নয়?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় তাঁর চিকিৎসার জন্য বলেছিলেন, এ বিষয়ে জানতে চাইলে সন্তু লারমা বলেন, তার এখন আর চিকিৎসার প্রয়োজন



নেই। চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, সে কথাও সাংবাদিকদের অবহিত করেন। এর আগে ঢাকায় এসেছিলেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঢাকায় তিনি পড়াশুনা করেছেন। তবে আলোচনার জন্য এবারই ঢাকায় প্রথম এসেছেন বলে জানান।

কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনা আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এবং ফলপ্রসূ হয়েছে। সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। চিফ হুইপ বলেন, 'আমরা সমঝোতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি।' বৈঠক কতোদিন চলবে জানতে চাইলে সরকার পক্ষের দলনেতা বলেন, এটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

গতকাল দুপুর দেড়টায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মগবাজার এলিফ্যান্ট রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় উভয়পক্ষের বৈঠক শুরু হয় এবং তা সোয়া ৫টা পর্যন্ত চলে। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার এ মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান উপস্থিত ছিলেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা ছিলেন। যোগাযোগ কমিটির দুই সদস্য কে শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা, স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সন্তু লারমার সঙ্গে আশা স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই সদস্য শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশীষ চাকমা বৈঠকের বাইরে ছিলেন।

বিএনপির দুই সাংসদ জাতীয় কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম দলীয় সিদ্ধান্তের কারণে বৈঠকে অংশ নেননি। জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী নিজের অসুস্থতার কারণে অংশ নিতে পারেননি।

অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা শেষ পর্যন্ত ঢাকায় আসেননি। এ ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে সন্তু লারমা জানান, তাদের প্রতিনিধিদলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সুধাসিন্ধু খীসার প্রয়োজন ছিল না বলে আসেননি। তার স্থানে অন্য কেউ আসেননি। সন্তু লারমা তার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বললেও জানা গেছে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. বাবুল ঢাকায় এসেছেন।

এর আগে গতকাল সকালে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে সন্তু লারমাসহ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। জাতীয় কমিটির উপনেতা চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী জনসংহতি সমিতির নেতাদের দুদুকছড়ি থেকে নিয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ছিলেন। হেলিকপ্টারটি ঢাকার তেজগাঁওয়ের পুরোনো এয়ারপোর্টে নামে দুপুর সোয়া ১২টায়। এ সময় বিমানবন্দর এবং আশপাশে কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল।

চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সেখানে সন্তু লারমাকে স্বাগত জানান। তিনি পাহাড়ি নেতাকে ফুলের তোড়াও উপহার দেন। সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা চিফ হুইপের সঙ্গে ছিলেন। পুরোনো এয়ারপোর্ট থেকে চিফ হুইপ ও চট্টগ্রামের মেয়রের সঙ্গে একই গাড়িতে সন্তু লারমা এবং অন্যরা পৃথক পৃথক গাড়িতে করে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসেন।

জানা যায়, পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের একটি পদ্মায় জনসংহতি সমিতির নেতাদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা এবং মেঘনায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন দুটির বাইরের চারপাশ এবং ভিতরে অবস্থান নিয়ে ছিল। সেখানে পৃথক দাঙ্গা পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতাদের ঢাকায় অবস্থানকালে এরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

তবে সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনের সময়। সংবাদ সম্মেলনের জন্য কোনো স্থান না করায় গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে উভয়পক্ষের নেতা সাংবাদিকদের সঙ্গে খালি গলায় কথা বলেন। এ সময় বেশকিছু সাংবাদিক সংবাদ সম্মেলনে থাকলেও আরো অনেকে ছিলেন মেঘনার প্রধান ফটকের বাইরে। পুলিশ এবং নিরাপত্তাকর্মীরা এসব সাংবাদিককে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয়। তুমুল চিৎকার ও হৈ চৈ-এর কারণে পিছনের সাংবাদিকরা নেতাদের কথাও শুনতে পারেননি।

**ভোরের কাগজ**

**২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৬**

**আলোচনা জটিল ভূমি সমস্যা নিয়ে**

**সানাউল্লাহ্ :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির আলোচনা এখন সবচেয়ে জটিল বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা এবং বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের ইস্যুতে প্রবেশ করেছে। গতকাল শনিবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন



মেঘনায় এ বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির আলোচনায় গুরুত্ব পায়। গতকালের আলোচনা উভয়পক্ষের সকল সদস্যকে নিয়ে শুরু হলেও অধিকাংশ সময় জাতীয় কমিটির তিন নেতা ও জনসংহতি সমিতির তিন নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে জানা যায় ।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী একাধিক সূত্রে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সবচেয়ে জটিল ও কঠিন বিষয় ভূমি সমস্যা নিয়ে গতকাল দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। একই বিষয়ের সূত্র ধরে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যুটিও আলোচনায় আসে। পাহাড়ি জনগণের অভিযোগ রয়েছে, তাদের প্রচুর আবাদী জমি ও পাহাড় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা দখল করে নিয়েছে। তবে এ বিষয়ে আলোচনার বিস্তারিত কেউ জানাতে রাজি হননি।

জাতীয় কমিটির একজন নেতা বলেন, ভূমি সমস্যা ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের বিষয়টি সমাধান হলে পার্বত্য সমস্যার বেশির ভাগই সমাধান হয়ে যায়। আর বাদবাকি বিষয় যেমন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেনা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় সমাধানে সময় লাগবে না ।

সূত্র জানান, গতকাল চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার জাতীয় কমিটির পক্ষে এবং সন্তু লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা জনসংহতি সমিতির পক্ষে পৃথকভাবে বসে বেশির ভাগ সময় আলোচনা করেন। এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত আগের বৈঠকেও উভয়পক্ষের এই ছয় নেতা বৈঠক করেছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন জানতে চাইলে আতাউর রহমান খান কায়সার বলেন, যেহেতু পাহাড়ে বিদ্রোহ আছে সে কারণে সেখানকার বিস্তীর্ণ এলাকায় সেনা ক্যাম্প আছে। বিদ্রোহ না থাকলে সেনা ক্যাম্পও থাকবে না। আর দেশের অন্যত্র যে রকম সেনানিবাস আছে সে রকম পার্বত্য চট্টগ্রামেও আছে, থাকবে। তবে এর অপারেশনাল ভূমিকা থাকবে না। জনসংহতি সমিতি এটা গ্রহণ করছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যা বস্তব তা তো সবাই মানবে।

এ বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সূত্র জানান, জনসংহতি নেতারা বেশ আন্তরিকভাবেই আলোচনায় অংশ নেন। সাবেক জাতীয় পার্টি ও বিএনপি সরকারের সঙ্গে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় পার্থক্য নিয়ে এক পর্যায়ে সন্তু লারমা বৈঠকে মন্তব্য করেন, ‘পার্থক্য আছে বলেই তো ঢাকায় এসেছি।’ বৈঠকে আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলা মিলিয়ে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, বিদ্যমান তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার বিষয়ও আসে।

পাহাড়ি ১০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিয়েও বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতির নেতাদের উদ্দেশে জাতীয় কমিটির একজন নেতা বলেন, সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে তো কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এজন্য সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সাংসদরা এমনকি এ বৈঠকেও যোগ দিচ্ছেন না।

জানা যায়, বৈঠক এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ তিনদিন চলতে পারে। আজ রোববার সারাদিন বৈঠক করার ব্যাপারে উভয়পক্ষই প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। তবে বৈঠক কদিন চলবে সে নিয়ে কোনো কথাই গতকাল আলোচনায় আসেনি।

**ভোরের কাগজ**

২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৬

**পাহাড়ি শরণার্থী : ত্রিপুরা যাবে জাতীয় কমিটি প্রতিনিধি দল**

**হরি কিশোর চাকমা :** ভারতে অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া আবার শুরু করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির একটি প্রতিনিধিদল আগামী ঈদুল ফিতরের পর সেখানে যাবেন। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেদিন সচিবালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় কমিটির প্রস্তুতিমূলক সভা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সাল থেকে '৮৯ পর্যন্ত সময়কালে বৈরী পরিবেশ ও সংঘাতের আশঙ্কায় প্রায় ১০ হাজার ৫ শতাধিক পাহাড়ি পরিবার পার্বত্য তিন জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯৪ সালে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হলে কয়েক দফায় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ১ হাজার ৮০০ পরিবার দেশে ফিরে আসে। কিন্তু অধিকাংশ পাহাড়ি শরণার্থী এখনো ত্রিপুরায় মানবেতর জীবনযাপন করছে।

শরণার্থীদের অবস্থা দেখা, তাদের এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে কারণে ঈদের পর একটি প্রতিনিধিদল সেখানে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিধিদলে পার্বত্য চট্টগ্রামের একাধিক সাংসদ থাকতে পারেন বলে জানা গেছে।



**ভোরের কাগজ**

২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৭

**সরকার-জনসংহতি আলোচনা অব্যাহত : আনুষ্ঠানিক বৈঠকের বাইরেও কথাবার্তা**

**তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে প্রতিনিধিত্বশীল আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে সরকার সম্মত**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে সরকার সম্মত হয়েছে। এই আঞ্চলিক পরিষদে পাহাড়ী জনগণের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকবে। বাঙালি জনগণের প্রতিনিধিও থাকবে এতে। প্রতিনিধিরা তিন জেলার পাহাড়ী ও বাঙালি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

এছাড়া তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করে সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেওয়া এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত পাহাড়ী শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জাতীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে। গত দুদিন ধরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠক চলছে। আজ সোমবারও বৈঠক অব্যাহত থাকবে। গতকাল দ্বিতীয় দিনে তিন দফায় আনুষ্ঠানিক সাড়ে ৬ ঘন্টা বৈঠকের পরও উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেছেন।

তবে ভূমি সমস্যা এবং বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের বিষয় নিয়ে জটিল আলোচনায় অগ্রগতির তেমন একটা খবর পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত এবং আগামীতে অধিগ্রহণ করা হবে এমন বাদে পার্বত্য অঞ্চলের জায়গা-জমি পাহাড়ী জনগণ বাদে অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না এমন স্থায়ী বিধান চায় জনসংহতি সমিতি। সরকার বলছে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হবে। তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো জমি হস্তান্তর হবে না। কিন্তু একটি সূত্র জানায়, জনসংহতি নেতারা এ ব্যবস্থায় আপত্তি করেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন আঞ্চলিক পরিষদের নেতারা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে জমি হস্তান্তরে সম্মতি দেন তাহলে কি হবে?

অন্যদিকে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের বিষয়ে জনসংহতি সমিতির নেতারা বলেছেন, তাদের দাবি ১৯৪৭ সালের পর বেআইনিভাবে যারাই পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছে তাদের সরিয়ে নিতে হবে। এখন

সরকার বলুক তারা কি চায়। নাজুক এ প্রশ্নে সরকার এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে জানা গেছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় উভয়পক্ষের বৈঠক পুনরায় শুরু হয়। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। মাঝে বিরতি দিয়ে বেলা আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত বৈঠক অব্যাহত ছিল। এছাড়া ইফতারের পর জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) সঙ্গে কথা বলেন। রাত ৯টায় আবার উভয়পক্ষে আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হয় এবং সাড়ে ১০টা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে আজ সকাল ১০টায় আবার বৈঠক মেঘনায় শুরু হবে।

এদিকে একাধিক সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার জাতীয় কমিটির ৩ নেতা সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে রাত কাটান। সেখানে উভয় পক্ষে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয়।

পৃথক সূত্র জানায়, সন্তু লারমাসহ শান্তিবাহিনীর নেতারা আজ বিকেলে খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়িতে ফিরে যেতে চাইছেন। যদিও সরকার চাইছে তাদের আরো দুএকদিন ঢাকায় রেখে আলোচনাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে। শান্তিবাহিনীর নেতারা ঢাকায় আরো থাকবেন কিনা আজ সকালের বৈঠকের পর তা পরিষ্কার হবে।

জাতীয় কমিটির একাধিক সূত্র বৈঠকে আলোচনার অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। তবে পৃথক সূত্র কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছে। তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সরকার পক্ষ বিভিন্ন দাবিতে তাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিলেও সেগুলো মানা-না মানার বিষয়ে জনসংহতি সমিতির নেতারা কিছুই স্পষ্ট জানাচ্ছেন না। তারা সরকারের প্রস্তাবগুলো টুকে নিচ্ছেন। যেমনটি আগের বৈঠকেও নিতেন। ধারণা করা হয়, সরকারের প্রস্তাব নিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতারা তাদের লোকজনের কাছে ফিরে যাবেন এবং আলোচনা করবেন। তারপর এসব বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানাবেন।

অন্যদিকে পাহাড়ী জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি যে গ্রহণযোগ্য তাও সরকার জনসংহতি সমিতিকে জানিয়েছে। সরকার একই সঙ্গে বলেছে, প্রধান বিরোধীদল বিএনপির সহায়তা ছাড়া এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধন সম্ভব হচ্ছে না। বিএনপি রাজি হলে সরকার সংবিধান সংশোধন করতে প্রস্তুত।



**ভোরের কাগজ**

২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## জনসংহতি সমিতি ও সন্তু লারমা

**বিশেষ প্রতিনিধি :** সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর ঢাকা বৈঠক কেবল দেশে নয়, গোটা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমে সাড়া ফেলেছে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র দেশেই পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী এবং এর বর্তমান শীর্ষ নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) আজ যে পর্যায়ে এসেছেন সে পথটি কিন্তু সরল-সোজা ছিল না।

সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতা পঞ্চাশোর্ধ বয়সী সন্তু লারমার জীবনের বড়ো সময় কেটেছে আত্মগোপনে। আর রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতি এবং সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী কখনো এ দেশে নিষিদ্ধ সংগঠন না হলেও জন্মের পর থেকে বেশিরভাগ সময়ই গোপনে কাজ করেছে। উভয় সংগঠনের প্রাণপুরুষ অবশ্য সন্তু লারমার বড়ো ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে ১৯৮৩ সালে নিহত হন।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সিদ্ধার্থ চাকমার 'প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক বইতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ১৯৭০ সালের ১৬ মে মানবেন্দ্র লারমা, সন্তু লারমাসহ ৫ পাহাড়ি যুবক রাঙ্গামাটিতে এক গোপন বৈঠকে বসে পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ রক্ষায় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তাভাবনা করেন। এদের একজন পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। স্বাধীনতার পর বাকি ৪ জন এবং আরো অন্যরা মিলে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা লিখিত 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ' বইতে অবশ্য বলা হয়েছে ৭২-এর ২৪ জুন জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। শুরুতেই এটা প্রকাশ্য সংগঠন ছিল। জনসংহতি সমিতির সভাপতি হন বি কে রোয়াজা এবং সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র লারমা। '৭৩ এর সাধারণ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতি সমর্থিত মানবেন্দ্র লারমা এবং চাই থোয়াই রোয়াজা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন।

১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতি তাদের সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠন করে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা নামধারী এক শ্রেণীর বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, লুণ্ঠন ইত্যাদি চালাচ্ছিল। অসংখ্য পাহাড়ি মানুষও হত্যা করেছিল তারা। মূলত

তাদের অত্যাচার প্রতিহত করতে শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। সন্তু লারমা শুরু থেকেই শান্তিবাহিনীর মূল দায়িত্বে ছিলেন। যদিও প্রধান ছিলেন মানবেন্দ্র লারমা। '৭৫ সালে মানবেন্দ্র লারমা বাকশালে যোগও দিয়েছিলেন।

'৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর মানবেন্দ্র লারমা শংকিত হন। এ সময় জনসংহতি সমিতিও গোপন সংগঠনে পরিণত হয়। শান্তিবাহিনীও শক্তিশালী করা হয়। কিন্তু '৭৫ সালের ২৬ অক্টোবর সন্তু লারমা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এদিকে '৭৫ পরবর্তীতে শান্তিবাহিনীর তৎপরতা বেড়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীকে পাঠানো হয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও তাদের নিয়মিত সংঘাত বাধতে থাকে। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়ার গণভোটের একদিন আগে কাপ্তাইয়ের বাংগালহালিয়া গ্রামে শান্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে সেনাবাহিনীর ১ জন কর্মকর্তাসহ কয়েকজন সেনা সদস্যকে হত্যা করে। পরে '৭৯ সাল নাগাদ শান্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা কমে আসে। এ সময় তাদের সংগঠনেও উপদলীয় তৎপরতা চাড়া দেয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৭৯ অথবা '৮০ সালের ২৩ জানুয়ারি সন্তু লারমাসহ বন্দি কয়েকজন পাহাড়ি নেতাকে সরকার মুক্তি দেয়। পাহাড়ি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা এবং কারাগারে সন্তু লারমার সঙ্গে আলোচনা করে তৎকালীন সরকার তাঁকে মুক্তি দেন। কথা ছিল তিনি বা তার দল সরকারের সঙ্গে সংলাপে বসবেন। যদিও মুক্তির পর এরকম সংলাপে শান্তিবাহিনী আসেনি। ১৯৮২ সালে সন্তু লারমা শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার (সামরিক প্রধান) নির্বাচিত হন।

এদিকে উপদলীয় কোন্দল বেড়ে যাওয়ায় শান্তিবাহিনী মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে লারমা গ্রুপ ও প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বে প্রীতি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমার ইজারা গ্রামের কল্যাণপুর ক্যাম্পে মানবেন্দ্র লারমা তার ৮ সহযোগীসহ প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর সন্তু লারমা কেবল শান্তিবাহিনী নয়, জনসংহতি সমিতিরও শীর্ষ নেতায় পরিণত হন। অন্যদিকে প্রীতি কুমার চাকমাসহ কয়েকজন বাদে প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন নেতাকর্মী ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মধ্য ষাটের দশকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়াশোনা করেন। সে সময় তিনি ছাত্র ইউনিয়নের জগন্নাথ হল শাখার নেতা ছিলেন। বিভক্তির পর সন্তু লারমা মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নে সক্রিয় ছিলেন।

এরপর থেকে শান্তিবাহিনীতে প্রকাশ্য কোনো উপদলীয় তৎপরতা দেখা যায়নি। তবে নেতৃত্ব পর্যায়ে কিছু মত পার্থক্যের কথা শোনা যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে এর কোনো নজির নেই ।



১৯৮৫ সালেই সশস্ত্র তৎপরতার পাশাপাশি সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী তৎকালীন এরশাদ সরকারের সঙ্গে সংলাপ শুরু করে। তবে তা ছিল শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংলাপ। '৯০-এর অভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯২ সালে সন্তু লারমা সরকারের মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে সরকারি কমিটির সঙ্গে সংলাপ শুরু করেন। বর্তমান সরকারের আমলে এখন ঢাকায় সংলাপ চলছে।

**ভোরের কাগজ**

২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৭

**সরকার-জনসংহতির তিন দিনের বৈঠক শেষ, আবার ১২ মার্চ**

**ভূমি ও বাঙালি বসতকারী ছাড়া**

**অন্যান্য বিষয়ে দুপক্ষ কাছাকাছি**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** ভূমি সমস্যা এবং বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যু ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বাকি বিষয়গুলোতে সরকার ও জনসংহতি সমিতির অবস্থান বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। ৫ দফা দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল সোমবার তাদের নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে গেছেন। গতকাল দুপুরে সরকারের জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির তিনদিনব্যাপী বৈঠক শেষ হয়। আগামী ১২ মার্চ উভয়পক্ষের পরবর্তী বৈঠক হবে। আগামী বৈঠকটি কোথায় হবে উভয়পক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে পরবর্তীতে ঠিক করবেন।

ঢাকা ত্যাগের পূর্বে এবং তৃতীয় দিনের বৈঠক শেষে গতকাল দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'গত তিনদিনে আমরা সৌহার্দপূর্ণভাবে আন্তরিক পরিবেশে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন বিষয়ে একমতে পৌঁছেছি। আগামী ১২ মার্চ পরবর্তী আলোচনা হবে।' চিফ হুইপের এ বক্তব্যের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সাংবাদিকদের বলেন, চিফ হুইপের এ বক্তব্য উভয়পক্ষের যৌথ বিবৃতি হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। সকল বিষয়ে তারা একমতে পৌঁছেছেন কিনা সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে সন্তু লারমা বলেন, তারা উভয়পক্ষ ১২ মার্চ আবার বৈঠক করবেন। তার আগে এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছু বলা ঠিক হবে না। পরবর্তী বৈঠকের স্থান কোথায় হবে জানতে চাইলে চিফ

হুইপ বলেন, তারা উভয়পক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে স্থানের বিষয়টি পরে ঠিক করবেন। এর বেশি আর কিছু বলতে উভয় নেতাই অস্বীকৃতি জানান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথার বলার কিছুক্ষণ পর বেলা ২টা ৩৭ মিনিটে চিফ হুইপের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করে সন্তু লারমা এবং জনসংহতি সমিতির অন্য নেতারা পৃথক পৃথক গাড়িতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ত্যাগ করেন। তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাড থেকে সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার জনসংহতি সমিতির নেতাদের নিয়ে বিকেল ৩টায় খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। খাগড়াছড়ি থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, বিকেল সোয়া ৪টায় তারা দুদুকছড়িতে অবতরণ করেন এবং সেখানে পাহাড়ি জনগণের উদ্দেশে এক সভায় সন্তু লারমা ও গৌতম চাকমা বক্তব্য দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনার জন্য জনসংহতি সমিতির ৪ নেতা গত শনিবার দুপুরে ঢাকা এসেছিলেন। গত তিনদিন ধরে তারা মগবাজার এলিফ্যান্ট রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অবস্থান করেন এবং অতিথি ভবন মেঘনায় বসে আলোচনা করেন। জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলে সংগঠনের প্রধান সন্তু লারমার নেতৃত্বে আরো ছিলেন : রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা এবং রক্ত উৎপল ত্রিপুরা। জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. বাবুল, যোগাযোগ কমিটির সদস্য কে শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য শক্তিপদ ত্রিপুরা ও আশীষ চাকমা দুদুকছড়ি থেকে ঢাকায় এসেছিলেন।

গতকাল এ পর্যায়ে বৈঠকের শেষ দিনে সকাল সাড়ে ১০টা থেকেই জাতীয় কমিটির আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরা বৈঠক করেন। জাতীয় কমিটির অন্য সদস্য সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন সকালে বৈঠক স্থলে গিয়ে অল্প কিছুক্ষণ ছিলেন। অন্য সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গতকাল সকালেই চট্টগ্রামের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

তিনদিনব্যাপী এবারের বৈঠক ছিল গত ১২ জুনের '৯৬ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক। এর আগে প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল গত বছরের ২১ ও ২৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। তবে ১৯৮৫ সাল থেকে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতা ধরলে গতকাল সমাপ্ত বৈঠকটি ছিল সরকার ও জনসংহতি সমিতির ২১তম বৈঠক।



বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর আগে খাগড়াছড়ির বৈঠকে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির কাছে তাদের ৫ দফা দাবির ব্যাপারে একটি সামগ্রিক প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছিল। জনসংহতি সমিতির নেতারা সরকারি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন, এ নিয়ে তারা দলীয় কংগ্রেসে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ২৫ জানুয়ারির বৈঠকে জানাবেন। কিন্তু এবারের বৈঠকে তারা সে রকম কিছু জানাননি। এবারের বৈঠকেও সরকার জনসংহতি সমিতির ৫ দফা অর্থাৎ আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, স্থানীয় সরকার সংস্থার কাজ, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ভূমিকার পরিবর্তন, ভারত থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে আনা, ভূমি হস্তান্তর বন্ধ, বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যু- সামগ্রিক দাবি সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতারা এবারো বলেছেন তারা পুরো প্রস্তাব নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে তাদের বক্তব্য আগামী ১২ মার্চের বৈঠকে জানাবেন।

সূত্র জানায়, সরকারের প্রস্তাব জনসংহতি সমিতির বর্তমান চিন্তা-ভাবনার চেয়ে বেশি ভিন্ন নয়। তবে ভূমি হস্তান্তর বন্ধ, বেদখল হয়ে যাওয়া পাহাড়ীদের জমি পুনরুদ্ধারে সরকারি প্রস্তাব এবং বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যুতে সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির নেতারা ভিন্নমত পোষণ করেন। সরকারি সূত্র জানান, ভূমি সমস্যা ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যু পরস্পর সম্পর্কিত। বিষয় দুটি বেশ জটিল হলেও পাহাড়ী নেতাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌছানোর ব্যাপারে সরকার আশাবাদী। বাকি বিষয়গুলোতে উভয়পক্ষের অবস্থানে বড়ো ধরনের পার্থক্য নেই। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে আগামী ১২ মার্চের বৈঠকটিও ঢাকায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। তবে স্থানের বিষয়ে এখনি জনসংহতি সমিতির নেতারা স্পষ্ট কিছু বলেননি। আগামী ১২ মার্চের বৈঠকে সরকার জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে পৌছানোর ব্যাপারে চেষ্টা চালাবে। তবে সেটা সম্ভব হবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

**ভোরের কাগজ**

২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৭

## <u>দুদুকছড়িতে পাহাড়িদের সমাবেশে সন্তু লারমা</u>
## পার্বত্য সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীসহ সকলকে জানাতে ঢাকা গিয়েছিলাম

**দুদুকছড়ি থেকে ফিরে আজিম উল হক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু লারমা সংশোধিত ৫ দফা দাবি

পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুম্ম (পাহাড়ী) জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধৈর্যের সঙ্গে সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি পাহাড়ী জনগণের বিগত দিনের ত্যাগের কথা স্বীকার করে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকায় তিন দিনব্যাপী বৈঠক শেষে গতকাল সোমবার বিকেলে দুদুকছড়িতে হেলিকপ্টারে করে ফিরে পাহাড়ীদের এক বিশাল স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে সন্তু লারমা একথা বলেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারী কয়েক জন জানিয়েছেন, সন্তু লারমা বৈঠকের ফলাফল জনগণকে অবহিত করতে গিয়ে বলেন, পার্বত্য সমস্যা সম্পর্কে দেশের বাকি জনগণসহ বিশ্ববাসীকে জানাতে ঢাকায় আলোচনা করতে গিয়েছি। তিনি বলেন, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

দুদুকছড়ি গ্রাম থেকে প্রায় ৪শ গজ দূরে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সমিতি নেতা গৌতম চাকমা বিগত দুটি সরকারের আমলে বৈঠক ও বর্তমান সরকারের সাম্প্রতিককালের বৈঠকে তুলনামূলক প্রেক্ষাপট ও ফলাফল জনগণকে অবহিত করে বক্তব্য রাখেন।

বিকেল সোয়া ৪টায় সমিতির নেতৃবৃন্দ সামরিক হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়িতে পৌঁছুলে অপেক্ষমাণ জনতা সন্তু লারমাসহ পাহাড়ী নেতাদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। সন্তু লারমা হাত নেড়ে এর জবাব দেন। সন্তু লারমাসহ নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসলে শান্তি বাহিনীর কয়েকজন সশস্ত্র সদস্য তাকে ঘিরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেন এবং জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যান। এ সময় জনতা তার পিছু নেয়। জঙ্গলাকীর্ণ সমাবেশ স্থলের উঁচুনিচু টিলায় বসে জনতা নেতাদের বক্তব্য শোনে। ধারণা করা হচ্ছে শান্তি বাহিনী নেতা ও সদস্যরা দুদুকছড়ি থেকে আজ মঙ্গলবার তাদের গোপন আস্তানায় ফিরে যাবেন।

**ভোরের কাগজ**
**৬ই মার্চ ১৯৯৭**

**ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী**
**ত্রিপুরায় শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলো**
**ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে**

**সানাউল্লাহ, আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে :** ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ক্যাম্পগুলো ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাটিতে এসব ক্যাম্প আর থাকবে



না। ভোরের কাগজ প্রতিনিধির সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিপুরা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও রাজস্বমন্ত্রী সমর চৌধুরী গতকাল বুধবার এ কথা বলেছেন।

রাজধানী আগরতলার মহাকরণে (সচিবালয়) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয়ে গতকাল বুধবার বিকেল ৩টায় এ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সমর চৌধুরী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে কদিন আগে রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় শান্তি বাহিনীর যেসব ক্যাম্প রয়েছে তা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এসব ক্যাম্প এখন আর থাকার কথা নয়। কিন্তু এখনো শান্তিবাহিনী এখানে আছে এবং এখান থেকেই কাজ করছে। এ প্রশ্নের উত্তরে ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ হয়তো থাকতে পারে। সেটা এক্ষুণি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েছে কোনো ক্যাম্প থাকবে না।'

সমর চৌধুরী বলেন, 'আপনাদের ওখানে (বাংলাদেশে) তো পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কাজ করে।' কিন্তু ভারতীয় পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে বাংলাদেশে আইএসআই ঘাঁটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে–এ কথার জবাবে মন্ত্রী বলেন, সেটা হয়েছে। সে রকম খবরই আমরা পাচ্ছি। কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান–এই উপমহাদেশের সর্বত্র সবসময়ই বিদেশী শক্তি তৎপর ছিল, আছে। তাদের উদ্দেশ্য এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে এ অঞ্চলকে ঘিরে।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বলেছে, তাদের ভূখণ্ড ভারতবিরোধী তৎপরতায় আর ব্যবহৃত হতে দেবে না। এ কথার জবাবে বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক বিদ্রোহীরা বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়ে ক্যাম্প করে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এসব কাজে আইএসআই মদদ দিয়েছে। আগে ভারতের বিদ্রোহীরা বাংলাদেশে আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছে। তবে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের এসব বিদ্রোহীরা হোঁচট খেয়েছে। বিশেষ করে বিদ্রোহীরা বাংলাদেশে ভূখণ্ড ব্যবহার করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা খুব ভালো কাজ করেছে।

সমর চৌধুরী বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে উন্নতি ঘটেছে। বাংলাদেশের জলের সমস্যা মিটে গেছে। শরণার্থী সমস্যাও সমাধানের দিকে এগুচ্ছে। এখন সম্পর্কটা আরো ভালো করার জন্য আমাদের দিকেও দেখা উচিত। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-ব্যণিজ্য দরকার, ট্রানজিট দরকার।

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ও সরকারের তৎপরতা সত্ত্বেও এটা সত্যি যে, ভারতের বিদ্রোহীরা এখনো সেখানে যাচ্ছে, আশ্রয় নিচ্ছে। এরকম খবর আমাদের কাছে আছে। কি কায়দায়, কিভাবে আশ্রয় নিচ্ছে জানি না।

তবে তারা আশ্রয় পাচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি। আশা করি আগামী কিছুদিনের মধ্যে এটাও বিদ্রোহীরা সেখানে পাবে না। আপনারা করিডোর, ট্রানজিট ইত্যাদি চাচ্ছেন। বাংলাদেশে একটা কথা আছে যে, করিডোর বা ট্রানজিট হলে আপনারা কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এসব রাজ্যে সামরিক বাহিনী আনা-নেওয়া করবেন। এ প্রশ্নের জবাবে সমর চৌধুরী বলেন, করিডোর বা ট্রানজিট মানে মালামাল ও মানুষের সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা। এটা গোটা বিশ্বে চলছে। ইউরোপে তো হরহামেশাই হচ্ছে। এতে কোনো দেশ তো তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে না। তবে হ্যাঁ, কোনো বিষয় নিয়ে সমস্যা হলে, বিভ্রান্তি হলে তখনই বসে তা মিটিয়ে ফেলা যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত উভয়পক্ষের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা হওয়া উচিত। দুটো দেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক, সৌহার্দ্য প্রয়োজন। এক সময় এ দুটো দেশ আলাদা হয়েছে। উভয়ের নিজের নিজের স্বাধীন সত্তা আছে। উভয়কেই তা বিবেচনায় নিয়ে এগুতে হবে।

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট হলে ত্রিপুরারও স্বার্থ আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মধ্যে ত্রিপুরার ভূমিকা তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর তাতে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যসহ এ গোটা অঞ্চলের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে মোড় নেবে। বাংলাদেশ ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারলে ভারতের সঙ্গে সমস্যা কোথায়? সাক্ষাৎকারের শেষে এসে মন্ত্রী প্রতিবেদকের প্রতি এ প্রশ্ন ছুড়ে দেন।

**ভোরের কাগজ**
**৬ই মার্চ ১৯৯৭**

**আজ আগরতলায় আবার শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে জাতীয় কমিটির বৈঠক**

**ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে :** জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির



১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা সফরে আজ বৃহস্পতিবার আসছেন। ভারতের এই রাজ্যে গত ১১ বছর ধরে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৫০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী আশ্রয় নিয়ে আছে। এই উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরিয়ে নিতে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করার জন্যই জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদল আজ আসছে।

জাতীয় কমিটির আজকের দ্বিতীয় সফরের ভিত্তি হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ দিনের পূর্ববর্তী সফরে। গত ১ মার্চ উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ২০ দফা একটি প্যাকেজ প্রস্তাব করেছিলেন। শরণার্থী নেতারা প্রত্যাবর্তনকারীদের সুযোগ-সুবিধা কিছু বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিল। ঢাকায় ফিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এসব বিষয় ফয়সালা করে প্রতিনিধিদলটি শরণার্থী নেতাদের তা জানাতে আজ আসছে।

দুপুর ১২টা নাগাদ প্রতিনিধিদলটি ঢাকা থেকে সড়ক পথে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আজ বিকেল ৪টায় আগরতলা সার্কিট হাউসে শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে জাতীয় কমিটির প্রথম দফা বৈঠক হবে। রাতে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদের সম্মানে ডিনারের আয়োজন করেছেন। পরে আগামীকাল সকাল সাড়ে ৮টায় একই স্থানে শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে সরকারি কমিটির দ্বিতীয় দফা বৈঠক হবে। এ বৈঠক চলবে দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত। মাঝে ১ ঘন্টার জন্য বৈঠকে বিরতি দিয়ে সকাল ১০টায় প্রতিনিধিদল রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের সঙ্গে বৈঠক করতে মন্ত্রীর কার্যালয়ে যাবে। বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ কমিটির সদস্যরা আগরতলা থেকে সড়কপথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য নয়াদিল্লি থেকে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মি. এম শফি সামি গতকাল বুধবার বিকেলে আগরতলা এসে পৌঁছেছেন। চিফ হুইপের সঙ্গে এবারের প্রতিনিধিদলে জাতীয় কমিটির ৩ সদস্য থাকছেন। এরা হলেন : সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর এবং আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। প্রতিনিধি দলে আরো থাকছেন স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক এম ইসলাম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কের মহাপরিচালক এফএ শামীম আহমদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সৈয়দ আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

**ভোরের কাগজ**

**৮ই মার্চ ১৯৯৭**

শরণার্থীদের ফেরার তারিখ ঘোষণা হবে কাল

**ভারতের মাটিতে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প**

**এক মাসের মধ্যে গুটাতে হবে**

**সানাউল্লাহ, আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে :** ভারতের মাটি থেকে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প সরানোর সময় হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লাখ পাহাড়ি উপজাতি জনগোষ্ঠীর দাবি আদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাম্প্রতিক সংগঠন শান্তিবাহিনী আর মাসখানেকের বেশি ভারতের মাটিতে থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এ মনোভাবের কথা সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছে। উভয় সরকারের একাধিক সূত্রে এ সংবাদ পাওয়া গেছে। এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী ভোরের কাগজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তারা শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলো ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাহাড়ি জনগণের দাবি-দাওয়া আদায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে পাহাড়িদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি এবং একই বছর জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শান্তিবাহিনী এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর (সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ) সংঘর্ষ এবং পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গায় গত দুই দশকে উভয়পক্ষে অনেক প্রাণহানি ঘটেছে।

শান্তিবাহিনী ভারতের মাটিতে আশ্রয়, প্রশিক্ষণ পেয়ে এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বাংলাদেশে অপারেশন চালাচ্ছে, এরকম অভিযোগ বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘদিনই করে আসছে। কিন্তু ভারত সরকার সবসময়ই এ অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের বিদ্রোহী উপজাতি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশে আশ্রয়, প্রশিক্ষণ পাচ্ছে–ভারত সরকারের এ অভিযোগ বাংলাদেশ সরকার সবসময় অস্বীকার করে এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার এবং ভারতের কেন্দ্রে ডান-বাম বিভিন্ন গোষ্ঠী সমর্থক দেব গৌড়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অস্বস্তিকর সম্পর্কের অবসান ঘটে। দ্রুততার সঙ্গে সম্পর্কের নাটকীয় উন্নতিও ঘটে। গত ডিসেম্বরে গঙ্গার পানি চুক্তির পর এখন উভয় দেশের সামনে পরস্পরের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থীদের ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি সামনে চলে এসেছে।



বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভারতীয় উগ্রপন্থীরা আর ব্যবহার করতে পারবে না–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণার পর সরকারের পক্ষ থেকেও উগ্রপন্থীদের বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় অংশে উগ্রপন্থীদের অনেকে আত্মসমর্পণ করছে, নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ছে এ রকম খবর প্রায় প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় উগ্রপন্থীদের সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর ভারতও তাদের মাটি থেকে শান্তিবাহিনীকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের শান্তিবাহিনীকে আর আশ্রয় নেওয়া, ক্যাম্প করা বা প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে না কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম সিদ্ধান্তের কথা গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় রাজ্য সরকারসমূহকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানকার সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন আর বড়োজোর মাসখানেকের মধ্যেই শান্তিবাহিনীকে তাদের ভারতের আশ্রয় ছাড়তে হবে। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সূত্রগুলোর হিসেবে শান্তিবাহিনীতে বর্তমানে ২ হাজারের মতো সদস্য রয়েছে। এদের অধিকাংশই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে, ঘাঁটি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন চালায়। তবে ভারতে শান্তিবাহিনীর ঠিক কতোগুলো ঘাঁটি বা ক্যাম্প আছে তা জানা যায়নি।

এদিকে আগামী বুধবার (১২ মার্চ) থেকে ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা-মেঘনায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারি জাতীয় কমিটির তৃতীয় দফা বৈঠক হতে যাচ্ছে। ঐ বৈঠকের আগে আগামীকাল রোববার জাতীয় কমিটি এবং শরণার্থী নেতারা ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী ৫০ হাজার পাহাড়ি উদ্বাস্তুর প্রথম দফার দেশে ফেরার দিন-তারিখ ঘোষণা করবেন, এ ঘোষণাও বুধবারের বৈঠককে প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আগরতলা সার্কিট হাউসের বৈঠকে উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবিত ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। এর আগে একই স্থানে গত ১ মার্চের বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে এর প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সরকারের এই প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শরণার্থী নেতারা কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানালে তাও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে পূরণ করা হয়। জানা যায়, এর আগে প্রত্যেক শরণার্থী পরিবার যাদের চাষযোগ্য জমি আছে তাদের হালের বলদ কেনার জন্য ৮ হাজার টাকা সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এখন সেটা আরো ২ হাজার টাকা বেড়ে ১০ হাজার টাকা হবে। তাছাড়া

প্রত্যাবাসনকারী শরণার্থী পরিবারগুলোকে ৬ মাস চাল, ডাল, তেল, লবণ, রেশন হিসেবে দেওয়ার মূল প্রস্তাব ছিল। এখন তারা এ রেশন ৯ মাস পাবেন। সংযোজিত এসব সুযোগ-সুবিধাসহ শরণার্থী পুনর্বাসনের সংশোধিত ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবও আগামীকালের যৌথ ঘোষণায় প্রকাশ করা হবে।

**ভোরের কাগজ**
**১২ই মার্চ ১৯৯৭**
**সরকার-শান্তিবাহিনী তৃতীয় দফা বৈঠক আজ ঢাকায়**

**বিশেষ প্রতিনিধি :** শান্তিবাহিনীর নেতাদের সঙ্গে আজ বুধবার সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্যরা আবার বৈঠকে বসবেন। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর এটা হবে এ সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর তৃতীয় বৈঠক। বৈঠকে শান্তিবাহিনীর পক্ষে তাদের প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) নেতৃত্ব দেবেন। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির পক্ষে এর প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ নেতৃত্ব দেবেন। বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য শান্তিবাহিনীর নেতারা সামরিক হেলিকপ্টারে করে আজ দুপুর নাগাদ পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার ভারতীয় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে ঢাকা এসে পৌঁছুবেন।

গত জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের মতো এবারো বৈঠকটি তিনদিন স্থায়ী হতে পারে। এবারের বৈঠকটি অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে পারে। সরকারি সূত্রে জানা যায়, গত ডিসেম্বরে খাগড়াছড়িতে এবং জানুয়ারিতে ঢাকার বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর নেতারা তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের মতামত জেনেছেন। এবার এসব ইস্যুতে সরকারের মতামত সম্পর্কে তাদের কি অবস্থান তা শান্তিবাহিনীর নেতারা জানাবেন । ফলে শান্তিবাহিনীর অবস্থান ও বক্তব্য জানার জন্য সরকারের মধ্যেও স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে।

সরকারের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে শান্তিবাহিনী তাদের যে ৫ দফা দাবি পেশ করেছিল তাতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক গ্যারান্টি, স্বশাসনের জন্য তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন, স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তাবাহিনী প্রত্যাহার, অপাহাড়িদের কাছে পার্বত্য এলাকার জমি হস্তান্তর বন্ধ এবং ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত বা বেদখল জমি পুনরুদ্ধার,



বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের পাহাড়ি এলাকা থেকে সরিয়ে আনা, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন, বিদ্রোহী তৎপরতার কারণে আটক, সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন সকল মামলা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাহাড়িদের মুক্তিদান ইত্যাদি।

শান্তিবাহিনীর এসব দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যে জাতীয় কমিটি সরকারের মতামত জানিয়েছে। সাংবিধানিক গ্যারান্টির ব্যাপারে বর্তমান সরকার আপত্তি না করলেও বলেছে যেহেতু জাতীয় সংসদে সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সে কারণে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক গ্যারান্টি দিয়ে সংবিধান সংশোধন সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বিরোধী দলগুলো সরকারকে সহায়তা করলে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করতে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার সম্পর্কে সরকার বলেছে সেখানে বিদ্রোহী এবং উস্কানিমূলক তৎপরতা বন্ধ হলে তিন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পগুলো গুটিয়ে নেওয়া হবে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তিন জেলায় যেসব সেনানিবাস আছে সেখানে থাকবে। কোনো সেনানিবাস প্রত্যাহার করা হবে না ।

অপাহাড়িদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জমি হস্তান্তর বন্ধে সরকার বলেছে সেখানকার জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদ বা স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হবে। এসব সংস্থায় যেহেতু পাহাড়ি প্রতিনিধিদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকবে তাই অপাহাড়িদের কাছে জমি হস্তান্তর বন্ধ করা সম্ভব হবে।

বসতিস্থাপনকারী (সেটেলার) বাঙালিদের সরিয়ে নেওয়ার দাবির সঙ্গে সরকার স্পষ্ট দ্বিমত প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়। সরকার বলেছে এটা অসম্ভব বিষয়। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী নেতারা বলেছেন বিষয়টি তাদের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাহাড়িদের সকলের মধ্যেই বসতিস্থাপনকারী বিশেষ করে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসিত বাঙালিদের সম্পর্কে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

সরকার ও শান্তিবাহিনীর এরকম অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আজ তৃতীয় দফা বৈঠক শুরু হবে। সকালে চট্টগ্রাম থেকে জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন হেলিকপ্টার নিয়ে খাগড়াছড়ি হয়ে দুদুকছড়ি যাবেন। সেখান থেকে সন্তু লারমাসহ শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ, যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা সরাসরি ঢাকার পথে সকাল ১১টায় রওয়ানা হবেন। ঢাকার পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে আবুল হাসনাত

আবদুল্লাহসহ জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ শান্তিবাহিনীর নেতাদের স্বাগত জানাবেন। পরে তারা সবাই গাড়িতে চেপে পুলিশি নিরাপত্তায় মগবাজার এলিফ্যান্ট রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা ও মেঘনায় আসবেন ।

খাগড়াছড়ি থেকে ভোরের কাগজ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধিদলে সন্তু লারমার সঙ্গে গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা থাকবেন। রূপায়ন দেওয়ান এবার বৈঠকে নাও আসতে পারেন। এছাড়া শান্তিবাহিনী প্রতিনিধিদলে সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. বাবুলও থাকবেন।

**ভোরের কাগজ**
**১৩ই মার্চ ১৯৯৭**
**সরকারের সঙ্গে ঢাকায়**
**শান্তিবাহিনীর বৈঠক শুরু**

**বিশেষ প্রতিনিধি :** জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু) নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির তৃতীয় দফা আলোচনা গতকাল বুধবার শুরু হয়েছে। ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দুপুর ২টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গতকাল বৈঠক চলে। জাতীয় কমিটির পক্ষে এর প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আবার বৈঠক বসবে।

সন্ধ্যা ৭টায় সরকারের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক মশিউর রহমান মেঘনার বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান, বৈঠক তখনো অব্যাহত আছে এবং রাতেও চলবে। সরকারি জাতীয় কমিটি বা শান্তিবাহিনী কোনো পক্ষই গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি।

এর আগে গতকাল সকালে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে সন্তু লারমাসহ শান্তিবাহিনীর নেতাদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। সরকারি জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন শান্তিবাহিনীর নেতাদের দুদুকছড়ি থেকে নিয়ে আসেন। সন্তু লারমার সঙ্গে গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তউৎপল ত্রিপুরা ঢাকায় এসেছেন। এ ছাড়া সন্তু লারমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ বাবুল, যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের ২ জন করে ৪ জন একই হেলিকপ্টারে ঢাকা আসেন।

ঢাকায় তেজগাঁওয়ের পুরোনো বিমানবন্দরে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ শান্তিবাহিনীর নেতাদের স্বাগত জানান। সেখান থেকে গাড়িতে করে জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায়



আসেন দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে। শান্তিবাহিনীর নেতারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অবস্থান করছেন। আর বৈঠক চলছে মেঘনায়। দুপুরের খাবারের পর এখানে উভয় পক্ষের বৈঠক শুরু হয়।

জাতীয় কমিটির পক্ষে বৈঠকে সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে এসে সন্ধ্যায় বৈঠকে যোগ দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লাখ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা, পৃথক শাসন ব্যবস্থা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ভূমির অধিকারসহ ৫ দফা দাবিতে শান্তিবাহিনী গত দুই যুগ ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম করে আসছে। বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ করে পার্বত্য এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে এর আগে গত ডিসেম্বরে খাগড়াছড়িতে ও জানুয়ারিতে ঢাকায় দুই দফা বৈঠক করেছে শান্তিবাহিনী।

**ভোরের কাগজ**
**১৪ই মার্চ ১৯৯৭**
**সরকার-শান্তিবাহিনীর অবস্থান**
**কাছাকাছি, জুনের আগেই**
**চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর আলোচনায় বড়ো ধরনের অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে। আলোচনার বিষয়গুলোতে উভয়পক্ষে তেমন কোনো মতপার্থক্য নেই। আর দুএকটি বৈঠকেই অর্থাৎ আগামী জুন মাসের আগে সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান করা যাবে বলে আলোচকবৃন্দ আশা প্রকাশ করছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বৈঠক শেষে সংক্ষিপ্ততম এক প্রেস ব্রিফিঙে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আলোচনা অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে। আলোচনায় আমরা একমত হয়েছি।' পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) সাংবাদিকদের বলেন, 'এটা আমাদের উভয়ের বক্তব্য।' শান্তিবাহিনীর নেতারা আজ সকালে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে তৃতীয় দফা আলোচনা গত বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় শুরু হয়।

গতকাল দ্বিতীয় এবং শেষ দিনে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুরের খাবারের বিরতি দিয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। উভয়পক্ষের চতুর্থ দফা বৈঠক আগামী ৩০ এপ্রিল হবে। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, উভয়পক্ষ আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়িয়েছে। আগের ঘোষণা অনুযায়ী অস্ত্রবিরতি মেয়াদ আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল।

সরকারি সূত্রগুলো আগেই আভাস দিয়েছিলেন, জুন মাসের আগেই তারা শান্তিবাহিনীর সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছুতে চান। এবারের বৈঠক সে লক্ষ্য অনুযায়ী ভালো হয়েছে বলেই একাধিক সূত্র মন্তব্য করেন। আগামী ৫ জুলাই তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাই জুন মাসের আগে চুক্তি হলে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই এসব স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন করা সম্ভব হবে। সে কারণে জুন মাসের আগে চুক্তিতে উপনীত হতে সরকার আগ্রহী।

গত দুদিনের বৈঠকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি, তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে শক্তিশালী করা, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার, ভূমির অধিকার, পাহাড়ে বাঙালি বসতি স্থাপনাকারীদের ইস্যু। সব বিষয়ই আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়। বিস্তারিত কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানালেও সূত্র বলেন, সকল বিষয়েই উভয়পক্ষের অবস্থান এখন সবচেয়ে কাছাকাছি। কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সরকার পক্ষ থেকে শান্তিবাহিনীর দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে বা শান্তিবাহিনীও তাদের যে অবস্থানের কথা বলেছে তাতে তেমন ফারাক পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, শান্তিবাহিনীর নেতারা বলেছিলেন, আঞ্চলিক পরিষদ একটি স্বাধীন সংস্থা হবে। এমনকি জাতীয় সংসদও এ সংস্থায় যাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে রকম বিধান করা দরকার। সরকার পক্ষ বলেছে, সংসদ হচ্ছে সার্বভৌম। সংসদের চেয়ে শক্তিশালী কোনো সংস্থা সাংবিধানিকভাবে হতে পারে না, সেটা করাও ঠিক নয় ।

শান্তিবাহিনীর নেতারা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কিছু বিধানের সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন। সরকার এ বিষয়গুলো আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর কথা বৈঠকে বলেছে। সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রশ্নে সরকার পক্ষ আগেই বলেছে, যেহেতু বর্তমান জাতীয় সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেহেতু এরকম কোনো সাংবিধানিক সংযোজন করতে তাদের বিরোধী দলের সহায়তা লাগবে। আর অন্তর্ঘাতের সমস্যা বা বিদ্রোহ পরিস্থিতি না থাকলে নিরাপত্তাবাহিনীর অপারেশন তৎপরতা থাকবে না এবং ক্যাম্পগুলো গুটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনানিবাসগুলোতে সৈনিকদের ফিরিয়ে আনা হবে এ কথাও সরকার বলেছে।



সরকার শান্তিবাহিনীর নেতাদের বলেছে, পার্বত্য এলাকায় জমি হস্তান্তরের পুরো অধিকার থাকবে জেলা পরিষদ তথা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর হাতে। আর এসব পরিষদে যেহেতু পাহাড়িদের আধিপত্য থাকবে, সে কারণে অপাহাড়িদের কাছে জমি হস্তান্তরও এভাবে বন্ধ করা যাবে বলে সরকার জানিয়েছে।

গত বুধবার চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের উচ্ছেদ করা হবে না বলে যে ঘোষণা দেন তা নিয়ে গতকাল সরকার-শান্তিবাহিনীর বৈঠকে কোনো কথা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সূত্র বলেন, তেমন কোনো কথা হয়নি। গত জানুয়ারিতে উভয় পক্ষের দ্বিতীয় বৈঠকেও সরকার এ বিষয়ে তাদের একই মনোভাবের কথা শান্তিবাহিনীকে জানিয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে শান্তিবাহিনী এবং পাহাড়ি জনগণের মনোভাব বেশ কঠোর। তারা বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে ও পরবর্তী সময়ে পাহাড়ি এলাকায় পুনর্বাসিত বাঙালিদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

জানা যায়, চতুর্থ দফা বৈঠকের তারিখ আগামী মে মাসে নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিল শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ। কিন্তু জাতীয় কমিটি এ মাসের শেষে অথবা আগামী মাসের মাঝামাঝি বসার কথা বলেছিল। শেষ পর্যন্ত তা আগামী মাসের শেষে ৩০ এপ্রিল ঠিক হয়।

গত দুদিনের বৈঠকে সন্তু লারমার সঙ্গে গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, আতাউর রহমান কায়সার উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ আজ শুক্রবার সকালে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি জেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়িতে ফিরে যাবেন। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ তাদের তেজগাঁও পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে বিদায় জানাবেন।

**ভোরের কাগজ**
**১৫ই মার্চ ১৯৯৭**
**পার্বত্য সমস্যা সমাধানে**
**সন্তু লারমা আশাবাদী**

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিম উল হক :** ঢাকায় বৈঠক শেষে সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে ফিরে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

(সন্তু) বলেছেন, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, ‘অনেক বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি। পার্বত্য সমস্যার সমাধান নিয়ে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, তবে বেশি কিছু আশা করা ঠিক হবে না।’

ঢাকায় দুদিনব্যাপী সরকারি কমিটির সঙ্গে বৈঠক শেষে সামরিক হেলিকপ্টারে করে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় দুদুকছড়ি গ্রামে ফিরে আসেন। অপেক্ষমাণ উৎসুক পাহাড়ি জনতার উদ্দেশে সন্তু লারমা ঐ কথা বলেন। ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়ে তিনি চাকমা ভাষায় আরো বলেন, ভূমি ও বসতি স্থাপনকারীদের বিষয় ছাড়া অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। ভূমির বিষয়ে বেশকিছু অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপনকারী অউপজাতীয়দের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

সমাবেশে উপস্থিত কয়েকজন উপজাতীয় ব্যক্তি পরে সাংবাদিকদের জানান, সন্তু লারমা জোর দিয়ে বলেছেন যে, পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকার পক্ষের উদারতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তার বিশ্বাস আগামী সংলাপে ফলাফল বেরিয়ে আসবে।

নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়িতে পৌঁছলে যোগাযোগ কমিটির সদস্য মোঃ শফি ও মথুরালাল চাকমা নেতাদের অভ্যর্থনা জানান। হেলিপ্যাডের কিছু দূরে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রেখে সন্তু লারমা অপর সহযোদ্ধা সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও ডা. বাবুল চাকমাকে নিয়ে চলে যান জঙ্গলাকীর্ণ অস্থায়ী ক্যাম্পে। আজ শনিবার বিকেলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের গোপন আস্তানায় ফিরে যাবেন বলে জানা গেছে।

**ভোরের কাগজ**

**১৯শে মার্চ ১৯৯৭**

**পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবহিনী প্রত্যাহার চায় শান্তিবাহিনী ❑ সরকার বলছে সেনানিবাস থাকবে**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** সীমান্তরক্ষী আধা সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) বাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী তাদের সকল স্থায়ী-অস্থায়ী স্থাপনা, সেনানিবাস সবকিছুরই পূর্ণ প্রত্যাহার চায় শান্তিবাহিনী। অন্যদিকে সরকার বলছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকবে। শান্তির সময়েও জেলা সদর দপ্তরগুলোতে স্থায়ী ছাউনি, সেনানিবাস থাকবে। তবে সে অঞ্চলের অপারেশনাল ক্যাম্পগুলো গুটানো হবে। শান্তিবাহিনী এবং সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রসমূহের সঙ্গে কথা বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা



প্রত্যাহারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে উভয়পক্ষের এ রকম অবস্থানের কথা জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই যুগ ধরে বিরাজমান সংঘাত-সমস্যা নিরসনে বর্তমান সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংলাপ চলছে। এ পর্যন্ত তিন দফা সংলাপে বিভিন্ন ইস্যুতে উভয়পক্ষের সর্বশেষ অবস্থান বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন আর দুয়েক দফা আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বেরিয়ে আসবে।

**সেনা প্রত্যাহার :** এ সম্পর্কে শান্তিবাহিনী তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বলেছে, সরকার ও তাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উভয়পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী বিডিআর বাদে বাকি সামরিক, আধা সামরিক সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করতে হবে। এর জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করা যায়। জেলা সদর দপ্তরে কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী সেনাছাউনি থাকবে না। তবে দুর্যোগ বা আইনশৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতির মতো সমস্যা ও জাতীয় বিপদে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে সে অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করা যাবে। তবে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সেনা মোতায়েন করা যাবে না।

অন্যদিকে এ সম্পর্কে সরকার বলেছে, শান্তি স্থাপনের পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর স্থায়ী ছাউনি (জেলা সদর দপ্তর) বাদে অন্য ক্যাম্প গুটানো হবে। তবে আইনশৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি হলে দেশের অন্যান্য জেলার মতো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে পারবে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগ সময় মোকাবিলা ও এ জাতীয় অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করা যাবে।

**শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও ভূমিবিষয়ক কমিশন :** ত্রিপুরায় আশ্রয়গ্রহণকারী পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার যে ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছে শান্তিবাহিনী তা গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে শরণার্থীদের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাবও দিয়েছে সরকার। সরকার বলেছে, কমিশন জমিজমা বিষয়ে যে রায় দেবে তার বিরুদ্ধে কোনো আপিল হবে না। কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমির ক্ষেত্রেই কমিশনের রায় প্রযোজ্য হবে।

শান্তিবাহিনী কমিশন গঠনের ব্যাপারে সরকারের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে তারা চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা

যেসব পাহাড়ি জমি অবৈধ দখল করে আছে তা বাতিল করার ক্ষমতাও এ কমিশনের হাতে দেওয়া হোক। তাছাড়া এ কমিশনের সম্ভাব্য সদস্যদের ব্যাপারেও শান্তিবাহিনী প্রস্তাব করেছে। তাদের মতে এ কমিশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ছাড়াও চাকমা ও বোমাং রাজা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ সাংসদ এবং জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি রাখা যায়।

**বসতি স্থাপনকারী বাঙালি ইস্যু :** একটি ভিত্তি বছর ধরে সে সময় এবং তারপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের পাহাড় থেকে সরিয়ে নিয়ে দেশের অন্যত্র পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে শান্তিবাহিনী। এর আগে শান্তিবাহিনী সরকারের কাছে তাদের সংশোধিত ৫ দফা দাবিতে ১৯৪৭ পরবর্তী বসতি স্থাপনকারী অপাহাড়ি সকলের বহিষ্কার দাবি করেছিল। কিন্তু পরে আরো কিছুটা নমনীয় হয়ে তারা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি বছরকে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে।

সরকার অবশ্য এ প্রশ্নে বলেছে, বিষয়টি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় সারা দেশের রাজনৈতিক বিবেচনারও প্রশ্ন আছে। পার্বত্য এলাকা থেকে বাঙালিদের সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোনো বাঙালিকে সরিয়ে আনা হবে না।

**আঞ্চলিক পরিষদ :** তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে শান্তিবাহিনী। তবে শান্তিবাহিনীর প্রস্তাব হচ্ছে এই আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্যরা তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। চেয়ারমানে পদটি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন হবে। এতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট সংখ্যাধিক্য থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদের মর্যাদা, ক্ষমতা, কাজ ইত্যাদি বিষয়েও বিস্তারিত প্রস্তাব করেছে শান্তিবাহিনী।

আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সরকার মনোনীত হবেন এমন প্রস্তাব দিয়েছে জাতীয় কমিটি। এর মর্যাদা, ক্ষমতা ও কাজ নিয়ে শান্তিবাহিনীর প্রস্তাবের সঙ্গে সরকারের বড়ো কোনো মতপার্থক্য নেই। সরকার বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জাতীয় সংসদে কোনো আইন করতে হলে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করেই তা করা হবে। শান্তিবাহিনী এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে একমত হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠনের ব্যাপারে সরকারি জাতীয় কমিটির প্রস্তাবের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর কোনো দ্বিমত নেই।



**স্থানীয় সরকার পরিষদ :** রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য শান্তিবাহিনী বেশকিছু প্রস্তাব দিয়েছে। বিশেষ করে এ সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় সুনির্দিষ্ট সংশোধনী দিয়েছে। সরকার তাদের প্রস্তাব বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে। বলেছে, আইন মন্ত্রণালয় এসব সংশোধনীর যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখবে।

**অস্ত্র সংবরণ ও সাধারণ ক্ষমা:** সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিকীকরণ এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সংবরণ ও সাধারণ ক্ষমা বিষয়ে সরকার একটি বিস্তারিত প্রস্তাব দিয়েছে। সরকার বলেছে, চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনী সদস্য এবং তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা সরকারের কাছে দেওয়া হবে। শান্তিবাহিনীর যে সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা আছে তারও একটি তালিকা সরকারকে দেওয়া হবে। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র জমাদানের তারিখ ঠিক করা হবে এবং যারা অস্ত্র জমা দেবে তারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় আসবে। তবে এই সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র জমাদানে কেউ ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার নেবে।

শান্তিবাহিনী সরকারের এ প্রস্তাবে দ্বিমত করেনি। তবে তারা বলেছে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় আলোচনা করে এসব বিষয় ঠিক করা যাবে।

**পরামর্শক কমিটি:** এসব বিষয়ের বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরামর্শক কমিটি করার প্রস্তাবও দিয়েছে শান্তিবাহিনী। তাদের প্রস্তাবে এই কমিটির প্রধান হবেন একজন পাহাড়ি, যার প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতা থাকবে। এছাড়া এই কমিটিতে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ সাংসদ, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ৩ চেয়ারম্যান, চাকমা রাজা, বোমাং রাজা ও মং রাজা থাকবেন। এ কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সকল ইস্যুতে সরকারকে পরামর্শ দেবে।

**অন্যান্য বিষয়:** পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসরকারিভাবে রাবার চাষের জন্য সরকার এ পর্যন্ত যে জমিজমা লিজ দিয়েছে তা বাতিল করা হবে না। তবে লিজ পাওয়ার পরবর্তী ১০ বছরে যারা চাষ শুরু করেনি সেসব ব্যবস্থা বাতিল করা হবে। সরকারের এ প্রস্তাবে শান্তিবাহিনী সম্মতি দিয়েছে। পর্যটন এবং উন্নয়নের জন্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব প্রকল্প নিতে আগ্রহী সে সম্পর্কে শান্তিবাহিনীর কোনো দ্বিমত নেই। চাকরি, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ইসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে পাহাড়িদের যে কোটা ব্যবস্থা বর্তমানে চালু এবং এ সম্পর্কিত বৃত্তির যে সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে তাতে শান্তিবাহিনী সন্তুষ্ট বলে জানা যায়।

## ভোরের কাগজ
## ২৩শে মার্চ ১৯৯৭
## প্রথম দফায় ৬,৭০০ পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরবে

**বিশেষ প্রতিনিধি:** ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রথম দফায় ৬ হাজার ৭০০ শরণার্থী দেশে ফিরবে। পাহাড়ি শরণার্থীদের এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে এ সপ্তাহের শেষে আগামী শুক্রবার ২৮ মার্চ। ৭ এপ্রিল প্রথম দফা প্রত্যাবাসন শেষ হবে।

এর আগে গত ৯ মার্চ ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশ সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বৈঠকে প্রথম দফায় ৫ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরবে বলে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যাবাসনকারীদের সংখ্যা ১ হাজার ৭০০ বেশি হচ্ছে।

গত সপ্তাহে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইলের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি সরকারি প্রতিনিধিদল ভারতের ত্রিপুরা গিয়েছিল। সেখানেই শরণার্থীদের তালিকা আদান প্রদান হয়। সরকারি সূত্রে জানা যায়, প্রথম দফা প্রত্যাবাসন ২৮ মার্চ শুরু হলেও শেষ হবে ৭ এপ্রিল। এ সময়কালে ১২৫২টি পরিবারের ৬ হাজার ৭০০ সদস্য দেশে ফিরবে।

২৮ থেকে ৩০ মার্চ ৩ দিনে খাগড়াছড়ির রামগড় সীমান্ত দিয়ে ২ শতাধিক শরণার্থী পরিবার দেশে ফিরবে। এই শরণার্থী কাছাকাছি কাঁঠালছড়ি ক্যাম্পের বাসিন্দা। বাকিরা ১ থেকে ৭ এপ্রিল খাগড়াছড়ির তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে আসবে। এরা ত্রিপুরার তাকুমবাড়িসহ বাকি ৫টি ক্যাম্পের বাসিন্দা।

শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রথম দিন ২৮ মার্চ বাংলাদেশের রামগড় সীমান্তে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এখানে শরণার্থীদের স্বাগত জানাবেন। তার সঙ্গে জাতীয় কমিটির অন্য সদস্যরা থাকবেন। শরণার্থীদের সীমান্ত অতিক্রমের সুবিধার জন্য এখানে ফেনী নদীর ওপর একটি কাঠের পুল তৈরি করা হচ্ছে।

অন্যদিকে রামগড়ের অপর দিকে ত্রিপুরার সাবরুম সীমান্তে শরণার্থীদের বিদায় জানাতে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার, বিদ্যুৎমন্ত্রী কেশব মজুমদার, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য ত্রিপুরার সরকারি কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল আগামী ২৫ মার্চ খাগড়াছড়ি আসবে। দলটি পরদিনই ত্রিপুরা ফিরে যাবে।



শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি দেখতে এবং এ সম্পর্কিত কাজকর্মকে অগ্রসর করে নিতে জাতীয় কমিটি প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ খাগড়াছড়ির উদ্দেশে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করবেন। তিনি সেখানে একদিন থাকবেন।

## ভোরের কাগজ
## ২৬শে এপ্রিল ১৯৯৭
## প্রত্যাবাসিত ৫৪৮ পরিবার নিজ জমিতে ঘর বেঁধেছে
## শরণার্থী পুনর্বাসন পর্যালোচনা করতে আজ খাগড়াছড়িতে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিম-উল হক :** ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসন অব্যাহত রয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য পুনর্বাসন বিষয়ক গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স কমিটি আজ শনিবার প্রথমবারের মতো খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বৈঠকে বসছে।

টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ কল্প রঞ্জন চাকমা বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। বৈঠকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে যাবতীয় সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হবে। এ পর্যন্ত যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে।

এদিকে শরণার্থীদের বেদখল হয়ে যাওয়া জায়গা জমি বাঙালিরা ছেড়ে দেওয়া অব্যাহত রাখায় দিঘীনালা থানায় প্রত্যাবাসিত উপজাতীয়দের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া গতি পেয়েছে। থানার টিএনও এসবি আইএম শফিকউদদৌলা জানান, যেসব বাঙালি পরিবার প্রত্যাগতদের জমি খালি করে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে সেরকম ৬০টি পরিবারকে ২ হাজার টাকা করে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের দাবির প্রেক্ষিতে পরিবার প্রতি আরো ১ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য ২০ একর খাস পাহাড় নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদেরকে এ খাস জমিতে পুনর্বাসিত করা হবে। প্রত্যাগতদের দাবির প্রেক্ষিতে ৭টি নিরাপত্তা চৌকি প্রত্যাহার করে প্রত্যাগতদের জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ভারত থেকে ফিরে আসা ১২৪৮ পরিবারের মধ্যে ৫৪৮ পরিবার নিজের জমিতে ঘর বেঁধেছে, আত্মীয়ের বাড়িতে এখনো আশ্রয়ে রয়েছে ২২৯ পরিবার, খাস জমিতে আছে ৮৬ পরিবার, চাকরি ফিরে পেয়েছে ৭ জন, প্রক্রিয়াধীন আছে ৭ জনের।

সূত্র জানায়, এখনো কিছু কিছু জটিলতার কারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে জমি ফেরত দেওয়া যায়নি। অচিরেই জটিলতা নিরসন করে জমি ফেরত দেওয়া হবে।

এদিকে আগামীকাল রোববার শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহসহ কমিটির সকল সদস্য দিঘীনালা সফরে আসার কথা রয়েছে। তাদের সফরসঙ্গী হিসেবে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমানেরও আসার কথা রয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা মে ১৯৯৭

১১ই মে সরকার-শান্তিবাহিনীর ৪র্থ বৈঠক

**পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অস্থির**

**সানাউল্লাহ :** আগামী ১১ মে বর্তমান সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে ৪র্থ বৈঠকের আগে একাধিক ইস্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর মেয়াদ, আগামী ৩০ জুনের পর সেখানে মনোনীত অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান বসানো, একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী কর্তৃক পুনর্বাসিত বাঙালিদের ক্ষেপিয়ে তোলা, সেখানে পাহাড়ি-বাঙালি সম্পর্কের আশঙ্কাজনক অবনতি; ইত্যাদি বিষয়গুলো ক্রমেই সামনে চলে আসছে।

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির আগামী বৈঠকেও প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে পাহাড়িদের ভূমির অধিকার এবং সেখানে বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যু। গত দুটি বৈঠকের মতো এবারের বৈঠকও ঢাকায় হবে এবং আলোচনা দুই থেকে তিন দিন চলতে পারে। সরকারি পক্ষ অবশ্য আশা করছে আগামী জুনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানে তারা সমর্থ হবে।

মধ্য মার্চে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে বেশ কতোগুলো সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন। আইন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এসব সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারি জবাব সম্প্রতি শান্তিবাহিনীর কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। সরকারি জবাবের ব্যাপারে শান্তিবাহিনীর বক্তব্য এখনো জানা যায়নি। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনীর বক্তব্য না এলে ধারণা করা যাবে সেটি ১১ মের বৈঠকেই উত্থাপিত হবে।



এদিকে তিন স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন শেষ হতে যাচ্ছে। এর আগে গত জানুয়ারি মাসে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর মেয়াদ বাড়ানোর সংশোধনী এনে সরকার জাতীয় সংসদে আইন পাস করেছিল। তবে সে আইনে বর্তমান সরকার একটি বিতর্কিত সংশোধনী এনে নতুন সমস্যার জন্ম দিতে চলেছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের একাধিক সূত্রে জানা যায়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী আগামী ৩০ জুনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকার যদি স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর নির্বাচন করতে না পারে তাহলে প্রতিটিতে সরকার মনোনীত একজন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন পরিচালনার সুযোগ নিতে পারে।

সংসদে পাস হয়ে বিষয়টি আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান স্থানীয় সরকার পরিষদগুলো এই বিধানের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ করে পাহাড়িদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টির সুযোগ করে দিতে পারে বলে পাহাড়ি সূত্রগুলো জানান। তাছাড়া বিষয়টি গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলে তারা মনে করেন। জানা গেছে, একাধিক পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এই বিধানটি পর্যালোচনা করার জন্য সরকারের কাছে চলতি সপ্তাহেই চিঠি দিতে পারে।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, পাহাড়ে পুনর্বাসিত বাঙালিদের অনেকেই শরণার্থী পাহাড়িদের জমিজমা, বসতভিটা দখল করে রেখেছে। অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করে সরকার পাহাড়িদের জমিজমা তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। আর এক্ষেত্রে অবৈধ দখলদার বাঙালিদেরও সরকার পুনর্বাসনের জন্য পরিবার প্রতি ৪ হাজার টাকা ও খাসজমি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

১৯৯৪ সালে সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে যে পাহাড়ি শরণার্থীরা দেশে ফিরেছিল, তাদের জমিও তৎকালীন সরকার একইভাবে উদ্ধার করেছিল। তখন কেউ এর বিরোধিতা না করলেও এখন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, জামাতে ইসলামী এ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অসন্তোষ উস্কে দিচ্ছে বলে সরকারি সূত্র অভিযোগ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও বাঙালি একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিষিয়ে তুলতে নানাভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে শীঘ্রই একটি সমাধানে পৌঁছুতে যাচ্ছে। এ রকম সম্ভাবনার কারণেই শন্তি প্রচেষ্টার বিরোধিতাকারী এসব মহল সক্রিয়।

**ভোরের কাগজ**
৬ই মে ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
**উত্তপ্ত পার্বত্য অঞ্চল**

বিডিআর আর পাহাড়ি গেরিলাদের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখজনক এক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেলো বান্দরবানের থানচিতে। শুক্রবারের নিশুতি রাতে ৭০ থেকে ১০০ জনের একটি পাহাড়ি গেরিলা দল থানচির বিডিআর পোস্ট দখল করার জন্য আক্রমণ চালায়। শনিবার ভোর ৭টা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী এক সশস্ত্র যুদ্ধ চলে উভয়পক্ষের মধ্যে। গোলাগুলিতে বেদনাদায়কভাবে মারা যান বিডিআরের একজন সদস্য ও দুজন পাহাড়ি গেরিলা। এরকম একটি ঘটনা ঘটার পর যা স্বাভাবিক, আতঙ্কে আর উদ্বেগে স্তব্ধ হয়ে আছে থানচি।

বিডিআর তার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, আক্রমণকারীরা ছিল শান্তিবাহিনীর সদস্য। সরকারের সামরিক ও আধা-সামরিক সূত্রগুলো মনে করছে, এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে শান্তিবাহিনীর কোনো উগ্রপন্থী অংশ। সমঝোতাপন্থীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তারা সশস্ত্র আক্রমণ চালালো নিজেদের অবস্থান সংহত করার জন্য। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এ ঘটনা ঘটলো তখন, যে সময় সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছে। তাছাড়া পাহাড়ি সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া চলছে উভয়পক্ষের মধ্যে।

শুধু বিচ্ছিন্ন এই একটি মাত্র ঘটনা নয়, লক্ষ্য করা যাবে, সরকারের সঙ্গে পাহাড়িদের শান্তিপূর্ণ সমঝোতার উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর থেকে তা ভেস্তে দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছে নানা অশুভ তৎপরতা। মীমাংসাবিরোধী উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ কোনো কোনো পাহাড়ির মতো বাঙালিদের কোনো কোনো দল বা গোষ্ঠীর কাছে সুস্পষ্ট। আমাদের খোদ প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নিয়েছে কার্যতঃ সমঝোতাবিরোধী অবস্থান। তাদের উগ্র ও একপেশে বক্তব্য পাহাড়ি অঞ্চলের বাঙালিদের উসকে দিচ্ছে। আঘাত হানছে বাঙালি পাহাড়ি ঐক্যের ভিত্তিমূলে।

অথচ শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রথম উদ্যোগ নেওয়ার গৌরব তো বিএনপিরই। তাদের সরকারের আমলে কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদের নেতৃত্বে পাহাড়িদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সমঝোতা বৈঠক হয় সরকারের। অবস্থার বেশ উন্নয়নও হয় তাতে। আলোচনাটা অবশ্য এক জায়গায় গিয়ে থিতিয়েও যায়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ বর্তমান সরকার উদ্যোগ নিলে বিএনপির তাতে অমত করার তো কথা নয়ই, বরং তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা



ও মতামত জানিয়ে মীমাংসা আরো ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করবেন সেটাই কাম্য। যুক্তিগ্রাহ্য এ পথ থেকে সরে এসে বিএনপিও বিস্ময়করভাবে উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে নানা কর্মকাণ্ড নিচ্ছে ও তপ্ত কথা বলছে।

বিএনপি বলেছে, সরকারের নেওয়া উদ্যোগের ফলে পাহাড়ি এলাকা থেকে বাঙালি উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহৃত করতে হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে–সরকার-পাহাড়ি আলোচনায় এরকম কোনো হয়নি। বরং তাদের শান্তিপূর্ণ বৈঠকের পর পাহাড়ি পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে, ফিরে এসেছেন বিপুলসংখ্যক পাহাড়ি শরণার্থী। এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় বড়ো কোনো দুর্ঘটনার খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অমীমাংসিত পাহাড়ি সমস্যার জট মোচনের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর তা তৈরি হয়েছে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ ধরে। বড়ো কষ্টে বহুদিন পর যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে আজ, সামান্য উগ্রতায় কি তা আমরা ভেঙে দেবো? সমস্ত উগ্রতার বিরুদ্ধে আজ আমাদের প্রয়োজন সংযম আর ধৈর্যের। সরকারের, রাজনৈতিক দলের, সামরিক বাহিনীর, বাঙালির, পাহাড়ির।

সমঝোতার ক্ষীণ আলোকে অন্ধকারের স্রোতে আমরা হারিয়ে যেতে দিতে চাই না।

**ভোরের কাগজ**
১১ই মে ১৯৯৭
**আজ ঢাকায় সরকার-শান্তিবাহিনী**
**চতুর্থ দফা বৈঠক শুরু হচ্ছে**

**বিশেষ প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে বৈঠক আজ রোববার শুরু হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে এটা হবে শান্তিবাহিনীর ৪র্থ দফা বৈঠক । রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় এ বৈঠক হবে।

আজকের বৈঠকে সরকার অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আলোচনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধের বিষয়গুলো যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ইস্যু, সেখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে শান্তিবাহিনীর দাবি, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে গণতান্ত্রিক চরিত্র দেওয়া, আরো আরো ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ

এবং শান্তিবাহিনী ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) নেতৃত্ব দেবেন। বৈঠক এবারও টানা দুতিন দিন চলতে পারে।

খাগড়াছড়ি থেকে আজিম উল হক জানিয়েছেন, ঢাকার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সীমান্তবর্তী খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়ি গ্রামে এসে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে তাদের বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হবে। সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ তারা দুদুকছড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। ঢাকায় বৈঠক চলাকালে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় থাকবেন এবং পার্শ্ববর্তী অতিথি ভবন মেঘনায় বৈঠক করবেন।

এদিকে জনসংহতি সমিতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গত ৩ মে বান্দরবান জেলার থানচি থানায় বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)-এর ক্যাম্পে আক্রমণ করা ও বিডিআর সদস্য হত্যার ঘটনার সঙ্গে তাদের সংগঠন শান্তিবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছে। প্রতিবাদপত্রে জনসংহতি সমিতি বলে, তারা শান্তি প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় অস্ত্র বিরতির শর্তসমূহ সঠিকভাবে পালন করে আসছে। সে কারণে বিডিআর সদস্যের ওপর শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না বলে জনসংহতি সমিতি জানায়।

জনসংহতি সমিতি বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে গত ১২ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানার মাইচছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা যাতে বেশ কজন পাহাড়ি নারী-পুরুষ, শিশু আক্রান্ত হয় এবং ১০ এপ্রিল রাঙ্গামাটির লংগদু থানার পাক্কাখালীতে ২২ পাহাড়ি যাত্রীবাহী স্পিড বোটে লুটতরাজের ঘটনায় জনসংহতি সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করে ।

**ভোরের কাগজ**

**১২ই মে ১৯৯৭**

**মতবিরোধের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা**

**ঢাকায় সরকার ও জনসংহতির**

**চতুর্থ দফা বৈঠক শুরু**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** সরকার ও শান্তিবাহিনীর চতুর্থ দফা বৈঠক গতকাল রোববার রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয়েছে। গতকালের বৈঠকে মূলত উভয়পক্ষের মতবিরোধের বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে বলে জানা যায়। তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম



বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আলোচনার অগ্রগতির বিষয়গুলো আলোচনার স্বার্থেই সুনির্দিষ্টভাবে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

গতকাল বৈঠক শুরু হয় বেলা ২টা ২০ মিনিটে। এর আগে পৌনে ১২টায় শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে খাগড়াছড়ি জেলার ভারতীয় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে ঢাকায় এসে পদ্মায় ওঠেন। সরকার পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

অন্যদিকে শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে এর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) নেতৃত্ব দেন। শান্তিবাহিনীর পক্ষে বৈঠকে অংশ নেন সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা। জাতীয় কমিটির পক্ষে ছিলেন চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, জাতীয় পার্টির হুইপ এডভোকেট ফজলে রাব্বী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা আলী হায়দার খান। এছাড়া কমিটির বাইরে সাবেক সরকারি কর্মকর্তা শরদিন্দু শেখর চাকমাও বৈঠকে ছিলেন।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৈঠক হয়েছে দুই স্তরে। বেলা ২টা ২০ মিনিট থেকে বিকেল পৌনে ৪টা পর্যন্ত বৈঠকে উভয়পক্ষের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। পরে সোয়া ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ছোট পর্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৈঠকে উভয়পক্ষের ৩ জন করে ৬ জন ছিলেন।

ছোট আকারের বৈঠকে জাতীয় কমিটির আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার এবং শান্তিবাহিনীর পক্ষে সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম চাকমা ছিলেন।

জানা যায়, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আরো গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গত মার্চ মাসের বৈঠকে শান্তিবাহিনী বেশ কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করেছিল। সেসব প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সরকার সে জবাব সপ্তাহ দুয়েক আগে শান্তিবাহিনীর কাছে পাঠায়। সরকারের জবাবের ব্যাপারে শান্তিবাহিনী গতকালের বৈঠকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে।

এছাড়া বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের সে এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে শান্তিবাহিনী উত্থাপিত দাবি নিয়েও আলোচনা হয় ।

গত ৩ মে বান্দরবানে থানচি থানায় বিডিআর ক্যাম্পে আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে অস্বীকার করেছেন। শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ মহিল্লায় পাহাড়িদের বাড়িতে ডাকাতি, মহালছড়ি

থানার মাইচছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ, শান্তিবাহিনীসহ ৪ পাহাড়ির গ্রেপ্তার ইত্যাদি বিষয় বৈঠকে উত্থাপন করে।

পাহাড়িদের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় ১ জনকে নোয়াখালী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান। তারা বলেন, ওটা স্রেফ ডাকাতি ছিল। অন্যদিকে শান্তিবাহিনীসহ আটক ৪ পাহাড়ির মুক্তির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে চিফ হুইপ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান।

জানা যায়, বৈঠকে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন তোলেন, সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী যদি অস্ত্রবিরতিকালে অস্ত্রসহ টহল দিতে পারে তাহলে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা কেন অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারবে না? জবাবে জাতীয় কমিটি জানায়, নিরাপত্তা বাহিনী সরকারের একটি সংস্থা। তাদের উপস্থিতি, তৎপরতা বৈধ ও স্বীকৃত বিষয়। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী কোনো বৈধ নিরাপত্তা সংস্থা নয়। ফলে তাদের অস্ত্রসহ চলাফেরার অধিকার নেই।

বৈঠকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে শান্তিবাহিনী সরকারের সহায়তা কামনা করে বলে জানা যায়। সরকারও বলেছে, তারা আন্তরিকভাবে সমস্যার সমাধান চান।

এর আগে গতকাল সকাল সোয়া ১০টায় জাতীয় কমিটির সদস্য এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন দুদুকছড়িতে শান্তিবাহিনীর নেতাদের স্বাগত জানান। শান্তিবাহিনীর নেতাদের নিয়ে হেলিকপ্টারে করে তারা ঢাকা আসেন। এদের সঙ্গে যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটির ২ জন করে ৪ জন সদস্য ঢাকা এসেছেন। ঢাকার তেজগাঁও পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে শান্তিবাহিনীর নেতাদের স্বাগত জানান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

তিনি জানান, আজ সকাল ১০টায় বৈঠক আবার বসবে। বৈঠক এবার কদিন চলবে সেটা এখনই বলা সম্ভব নয় বলেও চিফ হুইপ উল্লেখ করেন।

**ভোরের কাগজ**
**১২ই মে ১৯৯৭**

## পার্বত্যাঞ্চলে হরতালের পিছনে ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে : চিফ হুইপ

**বিশেষ প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছে এমন কোনো নজির নেই। বাঙালি বসতি



স্থাপনকারীরা যে সেখানে থাকবেন তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্টভাবে বলেছেন। এরপরও কেউ যদি হরতাল ডাকে বুঝতে হবে এর পিছনে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য আছে।

গতকাল রোববার রাতে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। গতকাল তিনি বা শান্তিবাহিনীর প্রধান সন্তু লারমা কোনো আনুষ্ঠানিক প্রেসব্রিফিং করেননি। সন্তু লারমা এমনকি সাংবাদিকদের সামনেও আসেননি।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ পৃথক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বৈঠকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতারা কেন অনুপস্থিত থাকছেন তা তিনি জানেন না। তবে বিষয়টি বিচারের ভার তিনি সাংবাদিকদের ওপর ছেড়ে দেন। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বিএনপি আমলে সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ১৩ বার বৈঠক করেছে। তাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এখন আমরা বৈঠক করছি।

তিনি বলেন, এটা দীর্ঘ ২১ বছরের পুরোনো একটা জাতীয় সমস্যা। একদিনের আলোচনায় সমাধান সম্ভব নয়। গতকালের বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা (শান্তিবাহিনী) কিছু দাবি করেছে। আমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় শান্তিবাহিনী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বলে তিনি জানান।

চিফ হুইপ বলেন, আলোচনা খুব ভালোভাবে হয়েছে। আলোচনা চলছে, চলবে। সকল বিষয় নিয়েই তাদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জাতীয় কমিটির প্রধান জানান। তিনি বলেন, আলোচনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রগতি না হলে তারা আলোচনা করছেন কেন?

**ভোরের কাগজ**
**১৩ই মে ১৯৯৭**

## আলোচনা ভালোভাবেই এগুচ্ছে : সন্তু লারমা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানো নিয়ে কথা হচ্ছে

**কাগজ প্রতিবেদক :** 'আলোচনা ভালোভাবেই এগুচ্ছে', সরকারের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের বৈঠকের এক পর্যায়ে গতকাল সোমবার রাতে জনসংহতি সমিতি ও এর সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর প্রধান জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সঙ্গে শান্তিবাহিনীর চতুর্থ দফা আলোচনা

গত রোববার নগরীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয়। জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, আলোচনা আজও অব্যাহত থাকবে।

তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের আরো গণতন্ত্রায়ন ও নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপারে শান্তিবাহিনী ইতিপূর্বে যে প্রস্তাব দিয়েছে, গতকাল সেটা ঘিরেই মূলত আলোচনা চলে। জানা যায়, স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা কি হবে, জেলায় সরকারি প্রশাসন ও পুলিশের যেসব কর্মকর্তা থাকবেন তাদের সঙ্গে স্থানীয় সরকার পরিষদের সম্পর্ক কেমন হবে, প্রশাসনের কর্তৃত্ব কাদের হাতে থাকবে এবং পার্বত্য এলাকার জমি অপাহাড়িদের কাছে হস্তান্তর বন্ধ করতে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলো কিভাবে ভূমিকা রাখবে- এসব বিষয়ে শান্তিবাহিনী গত ১২ ও ১৩ মার্চ ঢাকায় সরকারের সঙ্গে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকে বিস্তারিত প্রস্তাব দিয়েছিল। সরকারের আইন মন্ত্রণালয় এসব প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। পরে সপ্তাহ দুয়েক আগে এসব প্রস্তাবের

ব্যাপারে সরকারের মতামত শান্তিবাহিনীর কাছে পাঠানো হয়। এবারের বৈঠকে এসে শান্তিবাহিনীর নেতারা সরকারের মতামত সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ ও দাবি পেশ করেছেন বলে জানা যায়।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করার জন্য শান্তিবাহিনী ইতিপূর্বে যে দাবি তুলেছিল, তাও এখন উভয় পক্ষের আলোচনার মধ্যে রয়েছে। কোনো সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছানো যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়।

গতকাল সকাল পৌনে ১১টায় উভয় পক্ষের আলোচনা শুরু হয়, দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত চলে। খাবারের বিরতির পর বিকেল পৌনে ৬টা বৈঠক শুরু হয় এবং রাত সোয়া ৮টায় অল্প বিরতি দিয়ে ১০টা পর্যন্ত চলে। জানা যায়, গতকাল সারাদিনই সরকার পক্ষের তিনজন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার এবং শান্তিবাহিনীর পক্ষে তিনজন সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম চাকমা বৈঠক করেন। আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট বলে জানা যায় ।

রাত সোয়া ৮টায় পদ্মার গাড়ি বরান্দায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং সন্তু লারমা উপস্থিত হন। হাসনাত আবদুল্লাহ এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন, আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বৈঠকের অগ্রগতিও সন্তোষজনক। তিনি বলেন, 'শীঘ্রই সমঝোতায় পৌঁছানোর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' তবে এই শীঘ্রটা কবে হবে, এ ধরনের আর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেননি হাসনাত আবদুল্লাহ।



সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা জানান, হাসনাত আবদুল্লাহ যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা তাঁরও মত। বৈঠক আজ সকাল ১০টায় একই স্থানে আবার শুরু হবে।

**ভোরের কাগজ**
**১৪ই মে ১৯৯৭**

### পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসেছে

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। একটি সমাধানের দিকে দ্রুত এগুনোর জন্য উভয়পক্ষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে বলে জানা যায়। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের আলোচনার ইতিহাসে দীর্ঘতম বৈঠকটি আজ বুধবার চতুর্থ দিনে গড়াবে। বৃহস্পতিবারের আগে পাহাড়ি নেতারা খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি ফিরছেন না বলে আভাস পাওয়া গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতি ও এর সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর এবারের বৈঠক গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো অব্যাহত ছিল। সাবেক জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উভয়পক্ষের কোনো বৈঠক টানা এতোটা সময় আর চলেনি। বর্তমান সরকারের আমলে গত জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ আড়াই দিন উভয়পক্ষের বৈঠক হয়।

সূত্র জানায়, গতকাল সকালের পর্বে সাড়ে তিন ও বিকেলে সাড়ে চার ঘন্টা মিলিয়ে মোট আট ঘন্টা বৈঠক চলে। বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে এর প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে এর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম চাকমা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কমিটির অন্য সদস্যরা গতকাল এমনকি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মাতেও যাননি।

গতকালের বৈঠকে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ভবিষ্যৎ রূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জনসংহতি সমিতির নেতারা স্থানীয় সরকারের এ সংস্থাটিকে আরো শক্তিশালী, কার্যকর এবং গণতান্ত্রিক করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। জাতীয় কমিটির নেতারা চেষ্টা করছেন স্থানীয় সরকার পরিষদ, সরকারি প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যাতে সমঝোতার সম্পর্ক টিকে থাকে সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে। আর তা করতে গিয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদের বিদ্যমান আইনে বড়ো ধরনের সংশোধনীর প্রস্তাবও দিয়েছেন জনসংহতি সমিতির নেতারা।

জনসংহতি সমিতির এসব প্রস্তাব সরকারের কাছে কতোটা গ্রহণযোগ্য হবে তা জানতে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছেন। সার্ক শীর্ষসম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী আজ রাতে দেশে ফিরবেন। এরপর তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবেন জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। আর সে বৈঠকের ফলাফল জেনে যাওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আজ ঢাকায় থাকছেন বলে সূত্র জানায়। পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক করে আগামীকাল দুপুর নাগাদ পাহাড়ি নেতারা খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়ি ফিরে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের বিষয়টি ছাড়াও পাহাড়িদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে জনসংহতি সমিতি। সরকার পাহাড়িদের ভূমির অধিকার মেনে নিলেও পার্বত্য এলাকা থেকে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করে নিতে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না।

গতকাল জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ধরনের লুকোচুরি খেলেছেন। এ পর্যন্ত তিন দিনের বৈঠকে মাত্র একবার গত সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও সন্তু লারমা সাংবাদিকদের সামনে এসেছিলেন। সাংবাদিকরা গতকাল সারাদিন উভয়পক্ষের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে পদ্মার একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, রাত সাড়ে ৮টায় তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু পৌনে ৯টার দিকে চিফ হুইপের খালি গাড়ি পদ্মার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেও পরে জানা যায়, জাতীয় কমিটির নেতারা সাংবাদিকদের এড়াতে পার্শ্ববর্তী অতিথি ভবন মেঘনার দরজা দিয়ে চলে গেছেন।

**ভোরের কাগজ**

**১৫মে ১৯৯৭**

**<u>সরকার-জনসংহতি আলোচনায় ঐকমত্য</u>**

**পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে**

**শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** পার্বত্য চট্টগ্রামে আড়াই দশকের সশস্ত্র সংঘাত ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসনে সরকার ও জনসংহতি সমিতি একমত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সশস্ত্র সংগ্রামরত জনসংহতি সমিতি শিগগিরই একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবে। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে চার দিনব্যাপী চতুর্থ



দফা বৈঠক শেষে গতকাল বুধবার রাতে সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। এ সময় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান এবং এ সংগঠনের সামরিক শাখা শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার (সামরিক প্রধান) জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তাঁর পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গতকাল রাত ৮টা ১০ মিনিটে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার গাড়ি বারান্দায় অপেক্ষমান সাংবাদিকদের অনেকটা বিস্মিত করে দিয়েই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আমরা সকল বিষয়ে একমত হয়েছি। অতি শিগগিরই আমরা একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।' মাত্র দুটি বাক্যের এ বিবৃতি এবং ঘটনার গুরুত্বে সাংবাদিকরা কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েন। সে অবস্থা কাটিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতে শুরু করলে কোনো জবাব না দিয়েই চিফ হুইপ অতিথি ভবনের ভেতরে চলে যান। সঙ্গে ছিলেন সন্তু লারমা। সাংবাদিকরা তাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুড়লেও জবাবে তিনি কেবলই স্মিত হাসি উপহার দেন।

গতকাল বুধবার বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উভয়পক্ষের বৈঠকে সমস্যা সমাধানের একটি চূড়ান্ত রূপ বেরিয়ে আসে বলে জানা যায়। গত রোববার শুরু হওয়া এবারের ৪ দিনের আলোচনাতে জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবি এবং এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান নিয়ে খুটিনাটি কথা হয়। একটি খসড়াও এ ব্যাপারে প্রস্তুত হয়েছে।

সূত্র জানায়, বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারি নেতারা সার্ক শীর্ষসম্মেলন উপলক্ষে মালদ্বীপে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও টেলিফোনে নিয়মিত কথাবার্তা বলেছেন। ফলে অনেকক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি কমিটির জন্য সুবিধা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় সন্তু লারমাসহ জনসংহতির নেতারা বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলা খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

জানা যায়, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা কতোটা সম্ভব হবে তা নির্ভর করছে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের ওপর। ঢাকা থেকে আজ ফিরে যাওয়ার পর জনসংহতি সমিতির নেতারা প্রথমে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠক করবেন পাহাড়ি সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। ত্রিপুরায় অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের সঙ্গেও কথা বলবেন জনসংহতি সমিতির নেতারা। আর এসব প্রক্রিয়া তাদের সম্পন্ন করতে দুই মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে। ফলে জুন মাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এমন কথা এখনো নিশ্চিত করে কেউ বলতে রাজি নন।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, সরকার ও জনসংহতি সমিতি ইতিমধ্যে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আরো গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতা প্রদান, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়িদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা, অপাহাড়িদের কাছে হস্তান্তর বন্ধ, ভূমি বিষয়ক কমিশন গঠন, সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সংবরণ ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে একমত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে জনসংহতি সমিতি যে ৫ দফা দাবি পেশ করেছিল তাতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক গ্যারান্টি, স্বশাসনের জন্য তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন, স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, অপাহাড়িদের কাছে পার্বত্য এলাকার জমি হস্তান্তর বন্ধ এবং ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত বা বেদখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধার, বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের পাহাড়ি এলাকা থেকে সরিয়ে আনা, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন, বিদ্রোহী তৎপরতার কারণে আটক, সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন সকল মামলা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাহাড়িদের মুক্তিদান ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরকার ও জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে সম্মত হয়েছে তার প্রধান হবেন একজন পাহাড়ি। তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যান পাবেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার কোনো আইন করলে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে করবেন। এমনসব বিধি-বিধান ও মর্যাদা থাকবে এ সংস্থাটির।

স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর হাতে ক্ষমতা থাকবে দেশের অন্য যে কোনো স্থানীয় সরকারের চেয়ে বেশি। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এসব স্থানীয় সরকারে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট প্রাধান্য থাকবে। অপাহাড়িদের কাছে পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি হস্তান্তর বন্ধ করতে ভূমি বিষয়ক সকল ক্ষমতা থাকবে স্থানীয় সরকারের হাতে। ফলে নিজ বাসভূমে পাহাড়িদের পরবাসী হয়ে পড়ার আতঙ্ক কাটবে এতে। কেবল তাই নয় জেলার সরকারি প্রশাসনের ওপরেও স্থানীয় সরকারের প্রাধান্য থাকবে। জানা যায়, জেলা প্রশাসকদের চাকরি সংক্রান্ত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখবেন স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ।



পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট, গ্যারিসনসহ স্থায়ী স্থাপনা বাদে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারে সরকার সম্মত হয়েছে বলে সূত্র জানায়। এছাড়া সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ, আনসার, বিডিআর বর্তমানের মতোই সেখানে থাকবে।

পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের প্রত্যাহারে জনসংহতি সমিতির দাবির ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ কিভাবে সমাধানে পৌঁছেছে তা জানা যায়নি ।

পাহাড়িদের জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সমন্বয়ে একটি ভূমি বিষয়ক কমিশন গঠনে উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছে বলে জানা যায়। এ কমিশনে পার্বত্য এলাকার সাংসদগণ, চাকমা ও বোমাং রাজা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন।

এছাড়া সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সংবরণ, অস্ত্র জমা দেওয়া, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে উভয়পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

বর্তমান সরকারের সঙ্গে মাত্র ৪টি বৈঠকে দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যার সমাধান বেরিয়ে এলেও, এ পথটি এতোটা সরল-সোজা ছিল না। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় ও স্বার্থরক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়েছিল। আর অধিকার আদায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে জনসংহতি সমিতি ১৯৭৩ সালে ৭ জানুয়ারি গঠন করে তাদের সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় ১২ বছর আগে সাবেক জাতীয় পার্টি সরকারের আমলে । ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর পুজগাং-এ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রথম সংলাপে বসেছিল জনসংহতি সমিতি। এরপর ১৯৮৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সে সরকারের আমলে মোট ৬ দফা বৈঠক হয়েছিল।

পরে সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপ শুরু হয়। ১৯৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত অলি আহমদ কমিটি এবং সাবেক সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে সাব-কমিটির সঙ্গে মোট ১৩ দফা বৈঠক হয়। এসব বৈঠক হয় খাগড়াছড়ি ও দুদুকছড়ি গ্রামে।

আর গত ২১ ডিসেম্বর '৯৬ বর্তমান সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির তৃতীয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়।

প্রথম দফা বৈঠক খাগড়াছড়িতে হলেও এ বছরের ২৫-২৭ জানুয়ারি দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় ঢাকায়। তারপর এ নিয়ে ৩ বার ঢাকায় বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই প্রথমবার উভয়পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

**ভোরের কাগজ**

**১৬ই মে ১৯৯৭**

**আগামী মাসে জনসংহতি সমিতির**
**সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে**

***শান্তিবাহিনীর সদস্যসহ ৭ পাহাড়িকে মুক্তির নির্দেশ***

**সানাউল্লাহ :** আগামী মাসের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সরকার আশাবাদী। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি সূত্রে এ সংবাদ পাওয়া গেছে। এছাড়া আগামী ১০ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে জাতীয় কমিটির আরেকটি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে গ্রেপ্তারকৃত ৬ জন শান্তিবাহিনী সদস্যসহ ৭ জন পাহাড়িকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

চারদিনব্যাপী বৈঠক শেষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাসহ (সন্তু লারমা) জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং খাগড়াছড়ি জেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়িতে পৌঁছেন। বর্তমান সরকারের সঙ্গে চতুর্থ দফা আলোচনার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গত রোববার সকালে ঢাকা এসেছিলেন। আলোচনার চতুর্থ দিনে গত বুধবার সরকার ও জনসংহতি সমিতি তাদের বিরোধ নিরসনে একমত হয় এবং শিগগিরই একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে।

ঢাকা ছাড়ার পূর্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার গেটে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনসংহতি সমিতির প্রধান বলেন, উভয়পক্ষ আলোচনা করে ঠিক করবেন কবে তারা চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। সন্তু লারমা জানান, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তারা আবার ঢাকায় আসবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সন্তু লারমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা দেখা করবো।

দুদুকছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য তারা দুপুর ২টায় অতিথি ভবন পদ্মা ত্যাগ করেন। সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ সন্তু লারমাকে তেজগাঁও পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে বিদায় জানান।



বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে জনসংহতি সমিতির নেতাদের দুদুকছড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয় কমিটির সদস্য, আতাউর রহমান কায়সার জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে সেখানে যান। উল্লেখ্য, আলোচনার জন্য সন্তু লারমার সঙ্গে সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা ঢাকায় এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটির ২ জন করে ৪ জন সদস্যও ঢাকায় এসেছিলেন।

জাতীয় কমিটির সূত্রে জানা যায়, আগামী জুন মাসের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে তারা চুক্তি করতে আগ্রহী। কারণ জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে এসব স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে চায় সরকার ।

তবে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আগামী ৮/১০ দিনের মধ্যে আরেকদফা বৈঠক হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। এ বৈঠকে চুক্তির খুটিনাটি ঠিক হতে পারে। তবে সূত্র আভাস দিয়েছেন, এ বৈঠকটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার আগেও হতে পারে। এমনও হতে পারে জনসংহতি সমিতির নেতারা কয়েকদিন সময় নিয়ে ঢাকায় আসবেন। প্রথমে চুক্তির দলিলপত্র নিয়ে আলোচনা হবে। এবং পরে তাতে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর হবে।

এদিকে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে কারান্তরীণ কালাচান, অবনীসহ ৭ জন পাহাড়িকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সদ্য অনুষ্ঠিত বৈঠক চলাকালে সরকার এ নির্দেশ দেয়। এই ৭ জনের ৬ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য। বাকি একজন কালাচান ছিলেন ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয়গ্রহণকারী একজন শরণার্থী। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে কালাচানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, অন্তর্ঘাতসহ বিভিন্ন অভিযোগে মোট ১৫ জন শান্তিবাহিনীর সদস্য বর্তমানে কারান্তরীণ রয়েছেন। বিএনপি সরকারের আমলে অলি আহমদের নেতৃত্বে সরকারি কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আলোচনা চলাকালে এভাবে আটক শান্তিবাহিনীর বেশকিছু সদস্যকে অতীতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

**১০ই আগস্ট ১৯৯৭**

ফলাফল ছাড়াই ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধিদলের প্রত্যাবর্তন

**পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফেরার**
**পরবর্তী তারিখ ঠিক হয়নি**

**সানাউল্লাহ:** ভারতের ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফেরার কোনো দিনক্ষণ ঠিক না করেই সরকারি

প্রতিনিধিদল গতকাল শনিবার দেশে ফিরে এসেছে। শরণার্থী নেতাদের অস্বাভাবিক অনড় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রত্যাবাসনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি বলে জানা যায়।

পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসন সংক্রান্ত সরকারি টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের সরকারি প্রতিনিধিদল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দুদিন আলোচনা করে গতকাল শনিবার রাতে ঢাকা ফিরে এসেছেন। শরণার্থী নেতাদের আচরণে সরকারি প্রতিনিধিরা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়। শরণার্থী নেতারা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের সমস্যার সমাধান হলে তবেই তারা সিদ্ধান্ত নেবে দেশে ফিরবে কিনা।

সরকারি প্রতিনিধিদল গত বৃহস্পতিবার আগরতলা যায়। সেদিন এবং পরদিন শুক্রবার সারাদিনই তারা উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে আগরতলা সার্কিট হাউসে আলোচনা করেন। আলোচনায় শরণার্থী নেতারা শরণার্থী পুনর্বাসনে সরকারের বিরুদ্ধে সারাক্ষণই ঢালাও ব্যর্থতার অভিযোগ আনছিলেন। তারা বলেন, সরকার তাদের দেওয়া ওয়াদা রাখেনি। ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবের কিছুই পূরণ করেনি।

জবাবে সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল হিসাব দিয়ে জানান, গত মার্চ-এপ্রিলে দেশে ফিরে আসা ১ হাজার ২৪৮টি শরণার্থী পরিবারের ৬ হাজার ৭০৩ জন সদস্যের সকলেই নিজ নিজ ভিটা-মাটিতে পুনর্বাসিত হয়েছে। যাদের কৃষিজমি আছে তারা হালের বলদ এবং ভূমিহীনরা গাভী অথবা এর জন্য টাকা, গৃহনির্মাণের জন্য টিন, অর্থ, কাঠের পারমিট পেয়েছে। ১ হাজার ১৮৮টি পরিবারের সবাই জমিজমা ফেরত পেয়েছে। বাকি ৬০টি পরিবারের জমিজমার মালিকানা ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা থাকায় এখনো কিছু জমি আটকে আছে। তবে সরকার তাও দ্রুত সমাধান করে তাদের জমি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছে। ২৩ জন তাদের ছেড়ে যাওয়া সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করেছিল, ২১ জন ইতিমধ্যেই তা ফিরে পেয়েছে। বাকি ২ জনের ১ জন পুলিশ কনস্টেবল, তারও এ সপ্তাহের মধ্যে চাকরি হবে। বাকি ১ জন সমাজকল্যাণের যে প্রকল্পে চাকরি করতেন সে প্রকল্প শেষ হয়ে গেছে। তবে তাকে নতুন প্রকল্পে চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

এক পর্যায়ে শরণার্থী নেতারা বলেন, প্রত্যাবাসনকারী শরণার্থী পরিবারগুলোকে ১ বছর রেশন দিতে হবে। সরকারি নেতারা জানান, ২০ দফা চুক্তিতে ৯ মাসের কথা রয়েছে। তারপরও সরকার তা আরো ৩ মাস বাড়ানোর চেষ্টা করছে। শরণার্থী নেতারা বিভিন্ন সময় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত ৮০



জন পাহাড়ির শেষকৃত্যের জন্য টাকার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এটা এখনো দেওয়া হয়নি। সরকারি নেতারা জানান, সরকার ওয়াদা করেছে ৭ হাজার টাকা করে দেবে প্রত্যেকের শেষকৃত্যের জন্য। সেটা অবশ্যই দেওয়া হবে। শরণার্থী নেতারা ’৯৪ সালে কালাধন নামে এক প্রত্যাবাসিত শরণার্থীর বিরুদ্ধে এখনো মামলা তুলে নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু সরকারি প্রতিনিধিরা জানান, তাদের তথ্য সঠিক নয়। কালাধনের বিরুদ্ধে মামলা ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এভাবে আলোচনার এক পর্যায়ে শরণার্থী নেতারা ২০ দফার বাইরে নতুন ৫ দফা দাবি তোলেন। সেখানে তারা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন ইউএনএইচসিআর’কে জড়িত করার দাবি তোলেন। কিন্তু সরকারি প্রতিনিধিরা নতুন দাবি মেনে নিতে অপারগতা জানান। তারা বলেন, সরকার যা অঙ্গীকার করেছে তা করবে। তবে নতুন দাবি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইউএনএইচসিআর প্রসঙ্গে সরকারি নেতারা জানান, শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য ত্রাণসামগ্রী যেখানে সরকার দিচ্ছে সেখানে ইউএনএইচসিআর-এর প্রয়োজন কি? তাছাড়া শরণার্থী সমস্যার গত এক দশকে ভারত সরকারও তাদের জড়িত করেনি।

এভাবে শুক্রবার এক পর্যায়ে শরণার্থী নেতারা বৈঠক চালিয়ে যেতে অপারগতা জানান। তারা এমনকি একসঙ্গে প্রেসব্রিফ করতেও অস্বীকৃতি জানান। সরকারি সূত্রে জানা যায়, তারা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান। শরণার্থী নেতারা একতরফাভাবেই আরো বলেন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যেসব সমস্যা ঝুলে আছে তা সমাধান হলে পরের দফার শরণার্থীরা দেশে ফিরবেন কিনা সেটা তখন তারা ভেবে দেখবেন।

পরে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি প্রতিনিধিদল পৃথক পৃথকভাবে আগরতলায় প্রেসব্রিফিং করেন। আর সরকারি প্রতিনিধিরা গতকাল শনিবার শরণার্থী ক্যাম্প সফর না করে আখাউড়া চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। মূল কর্মসূচি অনুযায়ী তাদের গতকাল শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করে খাগড়াছড়ির রামগড় সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরার কথা ছিল।

এ ব্যাপারে গত রাতে প্রতিনিধিদলের নেতা ও টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শরণার্থী নেতারা অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর দাবি তুলছিলেন। কিন্তু কোনো সন্দেহ-অবিশ্বাস থাকলে তাদের আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরে দেখতে বলেছি। তারা তাতেও রাজি নন। কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, পুনর্বাসনের দায়িত্ব আমাদের ঠিকই। কিন্তু তাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। শরণার্থী পুনর্বাসনে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই উল্লেখ করে তিনি আশাবাদী সুরেই

বলেন, বাকি যেসব জমিজমা, চাকরি ইত্যাদির সমস্যা আছে তা দ্রুততই সমাধান করে ফেলবো। সকল শরণার্থীকে নিজ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করে যাবো।

**ভোরের কাগজ**
**১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## কাল সরকার-জনসংহতি বৈঠক সমঝোতা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি জটিল রূপ নেবে

**হরি কিশোর চাকমা রাঙ্গামাটি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল রূপ নিচ্ছে। আগামীকাল রোববার সরকার ও সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠেয় ষষ্ঠ বৈঠকে সমঝোতা না হলে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা আবারো সঙ্কটের মুখোমুখি হবে। এদিকে আগামীকাল ঢাকায় অনুষ্ঠেয় বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়ি আসতে শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠকে সরকার পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা। অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে সরকারি জাতীয় কমিটি একটি রূপরেখা তৈরি করেছে বলেও সূত্র জানান ।

এদিকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠেয় বৈঠকের ফলাফলের ওপর পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করছে বলে জানা গেছে। গত ৪ আগস্ট হাইকোর্ট রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদে 'অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ' গঠনের পক্ষে রায় প্রদান করলেও ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এ সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ প্রদান করেন। ৫ আগস্ট হাইকোর্টের রায় পাওয়ার পরপরই তিন পার্বত্য জেলায় সরকার 'অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ' গঠন করে। এ পরিষদসমূহের ৩৭টি কার্যদিবস অতিবাহিত হলেও সরকার এখনো নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ



করেনি। আগামীকালের বৈঠকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমঝোতা না হলে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা কম বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। অপর দিকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে 'অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ' গঠনের বিরোধিতাকারীরা আবারো সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন বলে জানা গেছে।

এদিকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুটি গ্রুপ পরস্পরের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে এ সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কয়েক দফা সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার খাগড়াছড়ি জেলা পাহাড়ি, পেশাজীবী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি টাউন হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবীণ শিক্ষাবিদ নবীন কুমার ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উভয় পক্ষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে ছাত্র পরিষদ এ আহ্বানে সাড়া দেবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকালের ঢাকা বৈঠকে যোগ দিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার দুদুকছড়ি এলাকায় আসতে শুরু করেছেন। ভোরের কাগজ-এর খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জানান, গতকাল শান্তিবাহিনী নেতা সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা দুদুকছড়ি পৌঁছেছেন। আজ সন্তু লার্মাসহ অন্য নেতারা এসে পৌঁছবেন। সরকারি পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ৮টি সেবা ক্যাম্প সাময়িকভাবে প্রত্যাহার ও ৫টি ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। আগামীকাল সকালে জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার ও বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াৎ হোসেন সামরিক হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ি থেকে সমিতির নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় নিয়ে যাবেন।

**ভোরের কাগজ**
**১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রতিনিধিদল ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুঘন্টা বৈঠক করেছেন উপেন্দ্র লাল চাকমা

উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে উপজাতীয় শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছে। ঢাকার তেজগাওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রায় দুঘন্টার বৈঠকে তারা বিভিন্ন

বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ বৈঠকে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জাতীয় কমিটির অন্য কাউকে বৈঠকের খবর জানানো হয়নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুএকজন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যদের কাউকে বৈঠক সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি। বিবিসি।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। অন্যদিকে জাতীয় কমিটির একজন সদস্য জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে উপেন্দ্র লাল চাকমা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি আরো জানান, আগামীকাল রোববার ঢাকায় উপজাতীয়দের সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের জাতীয় কমিটির মধ্যে বৈঠক হতে যাচ্ছে।

উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ প্রতিনিধিদলটি কোত্থেকে ঢাকায় এসেছে এবং তাদের এ সফর কতোদিনের হবে সে সম্পর্কে ঐ সদস্য কোনো মন্তব্য করেননি।

এর আগে গত সপ্তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ কমিটির প্রধান চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ উপেন্দ্র লাল চাকমার সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করেন। এরপরই উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের জন্য ঢাকা যান। উপেন্দ্র লাল চাকমা এবং আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর মধ্যেকার এ বৈঠক বেশ গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে আবদুল্লাহর সঙ্গে আলোচনার আগে উপেন্দ্র লাল চাকমা দিল্লি গিয়েছিলেন। সেখানে তার সঙ্গে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে আলোচনার ব্যাপারেও উপেন্দ্র লাল চাকমা মুখ খোলেননি আর ভারত সরকারও কিছু বলেনি তবে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার মতে উপেন্দ্র চাকমার ওপর ভারত সরকার ত্রিপুরায় অবস্থানরত উপজাতিদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে। তার পরপরই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে উপেন্দ্র চাকমার বৈঠকের ফলে এ ধারণা তৈরি হয় যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধেই ভারত সরকার উপজাতি শরণার্থীদেরকে তাদের আবাস ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির আলোচনা এ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি তাই সম্ভবত বাংলাদেশ সরকার রাজনৈতিক সমাধান ছাড়াই শরণার্থী সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

ভোরের কাগজ-এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি পীযুষ কান্তি আচার্য জানান, উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রশাসন



তাদের আগমনকে গোপন রাখে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আজ শনিবার প্রতিনিধিদলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশে রওয়ানা দেবে বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

**ভোরের কাগজ**
**১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**
**সরকার-জনসংহতি**
**সমিতির বৈঠক**
**আজ ঢাকায় শুরু**

**বিশেষ প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ বৈঠক আজ রোববার শুরু হচ্ছে। ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিতব্য এ বৈঠকে উভয় পক্ষের সর্বশেষ অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

উভয় পক্ষের সূত্রগুলো জানিয়েছে, এবারের বৈঠকে সমঝোতার একটি পথ বেরিয়ে আসতে পারে। তবে শরণার্থী সমিতির নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গত শুক্রবারের বৈঠকের পর জনসংহতি নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের জন্য তাগিদ আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন ।

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ এবং সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আজ সকালে তেজগাঁও পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)সহ অন্যদের স্বাগত জানাবেন। চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী জনসংহতি সমিতির নেতাদের খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়ি গ্রাম থেকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসবেন।

**ভোরের কাগজ**
**১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**
**সরকার-জনসংহতি ষষ্ঠ দফা বৈঠক শুরু**
**অক্টোবরের প্রথমার্ধে আরো পাহাড়ি**
**শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে**

**সানাউল্লাহ :** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি শরণার্থীদের পরবর্তী একটি দল আগামী মাসের প্রথমার্ধে দেশে ফিরতে পারে। গতকাল রোববার নগরীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু

হওয়া সরকার ও জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ বৈঠকে এরকম সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। সভার সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, শরণার্থীদের দেশে ফেরার জন্য তাগিদ দিতে সরকারি জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতির নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাহাড়ি জনগণের গোপন সশস্ত্র রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গতকাল দুপুর পৌনে ১টায় অতিথি ভবন পদ্মায় এসে পৌছান। পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার ভারতীয় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রাম দুদুকছড়ি থেকে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে পাহাড়ি নেতাদের ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী দুদুকছড়ি থেকে পাহাড়ি নেতাদের ঢাকায় নিয়ে আসেন। ঢাকার তেজগাঁও পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাডে জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাসহ (সন্তু লারমা) পাহাড়ি নেতাদের স্বাগত জানান। অতিথি ভবন পদ্মায় দুপুরের খাবারের পর বিকেল ৩টায় উভয়পক্ষের আলোচনা শুরু হয় বলে জানা যায়। প্রায় ঘন্টাখানেক স্থায়ী এ বৈঠকে জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা উভয়পক্ষের নেতৃত্ব দেন। এ ছাড়া জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, দীপংকর তালুকদার, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার, চট্টগ্রাম বিভাগের সাবেক কমিশনার আলী হায়দার খান এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এসএস চাকমা ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা এবং রক্তোৎপল ত্রিপুরা বৈঠকে অংশ নেন ।

বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন ও খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলও বৈঠকে ছিলেন।

জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী হেলিকপ্টারে করে পাহাড়ি নেতাদের ঢাকায় নিয়ে এলেও জরুরি কাজ থাকায় চট্টগ্রাম ফিরে যান। ঢাকার বাইরে থাকায় সংসদে জাতীয় পার্টির হুইপ এডভোকেট ফজলে রাব্বী এবং দেশের বাইরে থাকায় সাংসদ বীর বাহাদুর বৈঠকে ছিলেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানে উভয়পক্ষের এবারের বৈঠকটি ৪ থেকে ৫ দিন স্থায়ী হতে পারে। গতকাল শুরুতে উভয়পক্ষের সকলের উপস্থিতিতে ঘন্টাখানেকের বৈঠকের পর উভয়পক্ষের মোট ৬ নেতা



পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। জাতীয় কমিটির আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা এ বৈঠকে উভয়পক্ষে অংশ নেন। পরে রাতে এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, বৈঠক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সূত্র জানায়, গতকালের বৈঠকে পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়। সরকারি নেতারা শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে জনসংহতি সমিতির সহায়তা কামনা করেন। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির নেতারা বলেন, তাদের সঙ্গে শরণার্থীদের যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। তারা থাকেন জঙ্গলে, গোপনে। তা ছাড়া শরণার্থীদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারের আলোচনা, কথাবার্তা, সাক্ষাৎ হচ্ছে। জবাবে জাতীয় কমিটির নেতারা বলেন, সরকার জানে এবং মনে করে এ ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে।

সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে জাতীয় কমিটির একজন নেতা দিন তিনেক আগে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার বৈঠকের কথা জানান ।

জানা যায়, শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কথাবার্তার প্রেক্ষাপটে সরকার আশা করছে আগামী মাসের শুরুতে শরণার্থীদের একটি দল ত্রিপুরা থেকে দেশে ফিরতে পারে।

এবারের বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অথবা জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। সরকারি একটি সূত্র বলেন, আরো দুই একদিন না গেলে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যাবে না ।

গতকালের বৈঠকে গত ১৪-১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত উভয়পক্ষের পঞ্চম বৈঠকের আলোচনার ফলাফল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাহাড়িদের ভূমি সমস্যা, বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের ইস্যু, আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদা এবং তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অবস্থান নিয়ে এবারের বৈঠকেও আলোচনা হবে বলে জানা যায়। আজ সোমবার সকাল ১০টায় বৈঠক আবার বসবে।

**ভোরের কাগজ**
**১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## সরকার-জনসংহতির বৈঠক দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত
## ভূমি সমস্যা এখনো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু

**বিশেষ প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সরকার ও জনসংহতি সমিতির আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায়

বিদ্রোহী জনসংহতি সমিতি এবং পাহাড়ি জনগণের জন্য সরকার যে প্যাকেজ সুবিধা দিচ্ছে তাও পুরোপুরি চিহ্নিত হয়ে গেছে। তবে এখনো সবচেয়ে জটিল বিষয় ভূমির সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলোচনা চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছেন, এবার সম্ভব না হলেও আগামী বৈঠকে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ বৈঠকের দ্বিতীয় দিন ছিল গতকাল সোমবার। গতকাল সকাল-সন্ধ্যা সারাদিনই বৈঠক হয়েছে উভয় পক্ষের ৩ জন করে ৬ নেতার মধ্যে।

জাতীয় কমিটির আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমার মধ্যে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ১৯০০ সালের হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়। সকালের দিকে চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বৈঠকে কিছুক্ষণের জন্য অংশ নেন। ম্যানুয়েলে পাহাড়ি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রাজা, হেডম্যান, কারবারী এদের ভূমিকার কথা রয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদের কার কি ভূমিকা, অবস্থান ও ক্ষমতা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়া প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক, অবস্থান নিয়ে উভয়পক্ষ আলোচনা করেন।

বর্তমানে ১৯০০ সালের এই ম্যানুয়েল সক্রিয় রয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে এর প্রচুর সংশোধনও হয়েছে। উভয়পক্ষ এই ম্যানুয়েলের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর ব্যাপারেও একমত হয়েছেন।

পাহাড়ি জমিজমার মালিকানা নিয়ে উভয়পক্ষে এখনো আলোচনা অব্যাহত আছে। শান্তি চুক্তির পর জমিজমার মালিকানা কি দাঁড়াবে, বিশেষ করে সরকারি জমি, খাস জমি চিহ্নিত করা, এসব কোনটা সরকারের হাতে, কোনটা আঞ্চলিক পরিষদ বা স্থানীয় সরকারের হাতে থাকবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া ইতিমধ্যে অধিগ্রহণকৃত সরকারি জমির অবস্থা চুক্তির পর কি হতে পারে তাও আলোচনায় স্থান পায়।

তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষমতা নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। বিশেষ করে সরকারি প্রশাসন অর্থাৎ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সরকার নাকি স্থানীয় সরকার, কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নিয়ে আলোচনা হয়।

সূত্র জানায়, এর বাইরে আঞ্চলিক পরিষদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদের বিষয়গুলো সম্পর্কে উভয়পক্ষের মধ্যে বড়ো কোনো মতবিরোধ নেই ।



বৈঠক আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় আবার বসবে। এদিকে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি গ্রামে গত রোববার শান্তিবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বিডিআর সদস্যদের মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা গেছে। সেদিন সকালে সন্তু লারমাসহ জনসংহতি সমিতির নেতারা ঢাকায় চলে আসার পর বিডিআর সদস্যদের কিছু আচরণে শান্তিবাহিনী আপত্তি জানায়। জানা যায়, বিডিআর সদস্যরা সেখানে অনুশীলন করছিল। যোগাযোগ কমিটির নেতা হংসধ্বজ চাকমা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ঢাকায় জানালে বিশেষ কার্যাদি বিভাগ খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়। জেলা সদর থেকে বিডিআর-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

**ভোরের কাগজ**

**১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭**

## <u>সরকার-জনসংহতি বৈঠক অব্যাহত</u>
## আলোচনায় অগ্রগতির আভাস পাওয়া গেছে

**বিশেষ প্রতিনিধি :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির আলোচনায় কিছু অগ্রগতির আভাস পাওয়া গেছে। বিভিন্ন বিষয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনায় উভয়পক্ষ নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানা গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় শান্তি ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ দফা আলোচনার তৃতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকালে ও বিকেলে দুই দফায় মিলিয়ে প্রায় ৭ ঘন্টা আলোচনা চলে। বিশেষ করে পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি সমস্যার ব্যাপারে উভয়পক্ষ সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সূত্র জানান, গতরাতে বৈঠকের পর পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির নেতাদের বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

গতকাল দুপুরে প্রথম দফা বৈঠক শেষে সরকারি জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বৈঠকস্থল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা থেকে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আলোচনার বিস্তারিত নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

বৈঠকে বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ বিস্তারিত আলোচনা চলছে। শান্তি চুক্তির পর জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ এবং তাদের পুনর্বাসন নিয়েও গতকাল বিস্তারিত আলোচনা চলে। এছাড়া ভূমির সমস্যা, বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়।

উভয়পক্ষের এই বৈঠক গত রোববার ঢাকায় শুরু হয়। আজ বুধবার সকাল ১০টায় বৈঠক আবার বসবে। গতকালের আলোচনায় সরকারের পক্ষে জাতীয় কমিটির প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে তাদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা অংশ নেন।

**ভোরের কাগজ**

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

**সরকার ও জনসংহতি সমিতির বৈঠক সফল– দুই যুগের সংঘাত ও রক্তক্ষয়ের অবসান ঘটতে যাচ্ছে**

**আগামী মাসে পার্বত্য শান্তিচুক্তি**

**সানাউল্লাহ :** দীর্ঘ দুই যুগের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটাতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় উভয় পক্ষের আগামী মাসের বৈঠকে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। দেশের সংবিধানের আওতায় সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গড়ে তোলা, পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশনাল' তৎপরতা থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, সশস্ত্র শান্তিবাহিনী সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ ও তাদের যথাযথ পুনর্বাসন, পাহাড়িদের ভূমির অধিকার রক্ষাসহ একটি প্যাকেজ প্রস্তাব সরকার ও জনসংহতি সমিতি এ পর্যন্ত ৬ দফা বৈঠকে বসে তৈরি করেছে। এই শান্তিচুক্তি দেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় স্থায়ী শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে সকলেই আশা করছে।

গতকাল বুধবার টানা চতুর্থ দিনের বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সাংবাদিকদের বলেন, 'খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছি।' রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার গাড়ি বারান্দায় গত রাতের এই সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংকালে সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন। তবে তিনি কোনো কথা বলেননি। সন্তু লারমা আগেই জানিয়েছিলেন উপরের বক্তব্য তাদের উভয়ের মত।

ব্রিফিংকালে সন্তু লারমা পরবর্তী বৈঠকের তারিখ এবং স্থান সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকটি আগামী মাসের (অক্টোবর) দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকায় হবে।



এ দফা বৈঠকের শেষদিনের এই ব্রিফিঙে সন্তু লারমা আরো জানান, উভয়পক্ষ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়েছে। ব্রিফিংকালে জাতীয় কমিটির প্রধান ছাড়াও দুই সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির নেতা রক্তোৎপল ত্রিপুরা ছিলেন। গতকাল অবশ্য উভয়পক্ষ বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৩ ঘন্টা এক দফাই বৈঠক করেন। সকালে জনসংহতি সমিতির নেতারা পদ্মায় নিজেরা বৈঠক করেছেন বলে জানা যায়।

গত রোববার শুরু হওয়া বৈঠকটির সফল সমাপ্তির পর আজ বৃহস্পতিবার সকালে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সামরিক হেলিকপ্টারে করে ঢাকা ছেড়ে পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়ি ফিরে যাবেন। সন্তু লারমার সঙ্গে অন্যান্য বারের মতো এবারো বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য গৌতম চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা ঢাকা এসেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়েছিল। পরের বছরই জনসংহতি তাদের সশস্ত্র গোপন সংগঠন শান্তিবাহিনী গড়ে তোলে। এরপর গত দুই যুগে শান্তিবাহিনী এবং কখনো কখনো পাহাড়ি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সরকারের সামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশবাহিনী এবং বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের সংঘাতে উভয় জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০ হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুর প্রাণহানি ঘটেছে ।

সশস্ত্র সংঘাতের এ অবস্থার অবসানে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। সরকারের পক্ষ থেকে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সে সময় ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মোট ৬ দফা বৈঠক হয়। পরে বিএনপি সরকারের আমলে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির সঙ্গে মূল কমিটি ও সাব কমিটির সঙ্গে ১৯৯৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১৩ দফা বৈঠক হয়। তবে এসব কোনো বৈঠকই শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক ফল বয়ে আনেনি ।

অবশেষে বর্তমান সরকারের আমলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়িতে প্রথম বৈঠক শুরু হয় গত বছরের ২১ ডিসেম্বর। জানুয়ারি '৯৭-তে পরের বৈঠক স্থানান্তরিত হয় রাজধানী ঢাকায়। মে মাসে চতুর্থ বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে প্রথম আশাবাদ ব্যক্ত করে। তবে এ পর্যন্ত মোট ৬ দফায় ২০ দিনের আলোচনা শেষে খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে বলে গতকাল জানানো হয়।

অন্যদিকে ১৯৯২ সালের ১ আগস্ট শান্তিবাহিনী একতরফাভাবে প্রথম অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। পরপর দুই সরকারের আমলে মোট ৩৫ দফায় উভয়পক্ষ টানা ৫ বছর ধরে অস্ত্রবিরতি রক্ষা করছে। যদিও উভয়পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার তা লজ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উভয়পক্ষ তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে সম্মত হয়েছে। এই আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনিক, ভূমি সম্পর্কিত এবং উন্নয়ন কাজের সমন্বয় করবে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট সংখ্যা প্রাধান্যের এ সংস্থার প্রধান নির্বাহী একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা পাবেন।

তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদকে আরো কার্যকর ও ক্ষমতাসম্পন্ন করতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়েছে।

বিদ্রোহী তৎপরতা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলা হবে। তবে সেনানিবাস বা স্থায়ী ক্যাম্পগুলো দেশের অন্যান্য স্থানের মতোই থাকবে।

বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার না করতেও উভয়পক্ষ রাজি হয়েছে বলে জানা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি অপাহাড়িদের কাছে হস্তান্তরে বিধিনিষেধ আরোপেও উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করা, তাদের অস্ত্র উদ্ধার এবং যথাযথ পুনর্বাসনে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

দুদুকছড়িতে ফিরে সন্তু লারমা

**চূড়ান্ত চুক্তি আসন্ন, জনসংহতি নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখুন**

**আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে:** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি পরিষদ নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, পার্বত্য সমস্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি অত্যাসন্ন। তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতি পার্বত্যাঞ্চলে পাহাড়িদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালাচ্ছে, আপনারা এর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখুন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী শান্তি সংলাপ শেষে গহীন অরণ্যবেষ্টিত দুদুকছড়িতে ফিরে গতকাল বৃহস্পতিবার সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সন্তু লারমা বলেন, আমরা যে খসড়া চুক্তি করেছি তাতে স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা করা ঠিক হবে না। আমরা বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি স্থায়ী



রাজনৈতিক সমাধান পেতেই এই চুক্তি করতে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই।

জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত শান্তিবাহিনী সদস্যের বেষ্টনীর মধ্য থেকে সন্তু লারমা আরো বলেন, সরকার যদিও বসতিস্থাপনকারীদের প্রত্যাহারের ব্যাপারে এক মত হয়নি তবুও পাহাড়িদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাহাড়িদের জমি পাহাড়িদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এ সমস্যা সমাধানে অতীতের সরকারগুলোর চাইতে বর্তমান সরকার আন্তরিক।

সন্তু লারমার ফেরার খবর শুনে সকাল থেকে দুদুকছড়িতে প্রচুর পাহাড়ি সমবেত হতে থাকে। হেলিকপ্টারে করে নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়িতে পৌঁছলে জনতা উল্লাস প্রকাশ করে। এ সময় হাস্যোজ্জ্বল সন্তু লারমা জনতাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান।

এদিকে খসড়া চুক্তি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে বিএনপি শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে মিছিল সমাবেশ করেছে। বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ এ চুক্তিকে অসম ও বৈষম্যমূলক চুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। বিএনপির নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভুইয়া অদুদ বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। দেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। দেশের স্বার্থবিরোধী এ অসম চুক্তিকে কালো চুক্তি বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় তেজগাঁও পুরোনো বিমানবন্দরের হেলিপ্যাড থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে পাহাড়ি নেতারা দুদুকছড়ি রওয়ানা হন। জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান কায়সার তাদের সঙ্গে যান। এর আগে পদ্মা থেকে জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ পাহাড়ি নেতাদের নিয়ে হেলিপ্যাডে যান এবং সেখানে তাদের বিদায় জানান। এ সময় সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও দ্বীপঙ্কর তালুকদারও সেখানে ছিলেন।

**ভোরের কাগজ**

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

দুদুকছড়ি থেকে আস্তানায় ফিরে গেছেন সন্তু লারমাসহ সবাই

**শান্তিচুক্তি নিয়ে শান্তিবাহিনীতে কোনো দ্বিমত নেই**

**হরি কিশোর চাকমা, দুদুকছড়ি থেকে ফিরে :** জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমাসহ জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নেতাকর্মীরা সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব আস্তানায় ফিরে গেছেন। শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার ঊষাতন

তালুকদার জানিয়েছেন, শান্তি চুক্তির ব্যাপারে তাদের মধ্যে 'কথিত' কোনো দ্বিমত নেই।

গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠক শেষে সন্তু লারমা ও তার সহকর্মীরা দুদুকছড়িতে ফিরে আসার পর হাজার হাজার ছাত্র জনতার সঙ্গে কথা বলেছেন। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে দুদুকছড়ি এলাকা হয়ে উঠেছিল মিলনমেলা। চরম ক্লান্তি নিয়েও সন্তু লারমা কখনো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে, কখনো পেশাজীবীদের সঙ্গে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, এলাকার লোকজনের সঙ্গে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করেছেন। গত শুক্রবার নিজ আস্তানায় চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রায় এক ঘন্টা কথা বলেছেন যোগাযোগ কমিটির সঙ্গে। সন্তু লারমার সঙ্গে ছিলেন জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র ক্যাডার শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার (এফসি) ঊষাতন তালুকদার (সমীরণ ওরফে মলয়)। বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করলেও সবাইকে প্রায় একই কথা বলেছেন সন্তু লারমা।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি পার্বত্য সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। জাতীয় পার্টি, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিক বর্ণনা করে সন্তু লারমা বলেন, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মনোভাব বোঝা গেছে। তারা সবাই সংবিধানের আওতায় পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। আওয়ামী লীগ সরকারকে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে আন্তরিক বলে উল্লেখ করে সন্তু লারমা বলেন, পরস্পর ছাড় দেওয়ার ভিত্তিতে চুক্তির খসড়া প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। চুক্তির খসড়ার বিস্তারিত উল্লেখ না করে তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকার পাহাড়িদের দাবি আদায়ের যে লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘ দুই যুগ ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি, সেই বিশ্বাস থেকে জনসংহতি সমিতির প্রতি আস্থা রাখার জন্য জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। আসন্ন শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে সন্তু লারমা বলেন, স্বার্থান্বেষী মহল এ ব্যাপারে অপপ্রচার চালাতে পারে। ঘটাতে পারে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা।

পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের 'প্রসিত-সঞ্চয়' গ্রুপের শান্তি চুক্তির বিরোধিতার ব্যাপারে সন্তু লারমা ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার সময় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। তবে শান্তি চুক্তির ব্যাপারে ছাত্র-জনতার তাৎক্ষণিক সমর্থনদানে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে শান্তিবাহিনীর এফসি ঊষাতন তালুকদার শান্তি আলোচনা উপলক্ষে প্রথমবারের মতো দুদুকছড়িতে এসেছেন বলে জানা যায়। 'শান্তি



আলোচনার' বিরোধী বলে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের কারণে জনগণ যেন শংকাবোধ না করেন সে সম্পর্কে তিনি জনগণকে নিশ্চিত করেছেন। আসন্ন শান্তি চুক্তির ব্যাপারে শান্তিবাহিনীর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই বলে জানিয়েছেন ঊষাতন তালুকদার। সন্তু লারমা ও তার চার সহকর্মী যখন ঢাকায় শান্তিচুক্তির খসড়া প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন তখন ঊষাতন তালুকদার দুদুকছড়িতে ব্যস্ত ছিলেন জনসংযোগে। গত বৃহস্পতি ও শুক্রবারও তিনি আলোচনায় সহযোগিতা করেছেন সন্তু লারমাকে।

দুদুকছড়িতে আসা জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর মধ্যম সারির কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা করেও তাদের ফিল্ড কমান্ডারের অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া গেছে। তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, দীর্ঘদিন সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়েছি, এখন দেশ গড়ার আন্দোলন চালাতে হবে। শান্তিবাহিনী এখন 'ক্ষমা করার নীতি' অবলম্বন করার কথা উল্লেখ করে তারা বলেন, এবারে শান্তিবাহিনী থেকে অতীতে বিদ্রোহ করে আবার সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা অনেকে দেখা করতে এসেছেন।

**ভোরের কাগজ**

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

জনসংহতি সমিতি প্রচার ও সদস্য তালিকাভুক্তি চালিয়ে যাচ্ছে

**পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর নভেম্বরে**

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** বহু প্রতীক্ষিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' অক্টোবর মাসের পরিবর্তে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বাক্ষরিত হবে। এ লক্ষ্যে জনসংহতি ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের সদস্য-সদস্যাদের তালিকাভুক্তি এবং শান্তিচুক্তির স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চলছে বলে জানা গেছে।

গত ১৪ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠক শেষে উভয় পক্ষ দীর্ঘ দুই যুগব্যাপী সশস্ত্র সংঘাত বিক্ষুব্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা দেওয়ার পর কিছু উগ্রপন্থী পাহাড়ি ও বাঙালি নিজেদের স্বার্থহানীর আশঙ্কায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও সাধারণ জনগণের মনে শান্তির সুবাতাস বইছে। সবাই আশা করছে অতি শিগগির 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে খসড়া 'শান্তিচুক্তির' খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সরকারের পক্ষে

যেমন সম্ভব হবে না তেমনি জনসংহতি সমিতির পক্ষেও পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সদস্য-সদস্যাদের তালিকা প্রণয়ন, মজুদ অস্ত্রের হিসাব ইত্যাদি গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ১০ নভেম্বরকে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পাহাড়ি জনগণ শোকাবহ দিন হিসেবে পালন করে থাকে। ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শান্তিবাহিনীর অন্তর্কলহে প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে ৮ জন সহকর্মীসহ নিহত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে অক্টোবর মাসের মধ্যে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর সম্ভব হবে না বলে জানান। তিনি বলেন, সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়েই খুবই সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু যাচাই বাছাই করছে। কোনোরকম ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা পরবর্তী সময়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে বলে হংসধ্বজ চাকমা অভিমত ব্যক্ত করেন। হংসধ্বজ চাকমা আরো জানান, তাঁর অসুস্থতার কারণেও সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বেশ কয়েকদিন যোগাযোগ বন্ধ থাকতে পারে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চিকিৎসার্থে তিনি কলকাতা যাবেন বলেও জানান। গতকাল শুক্রবার হংসধ্বজ চাকমা ঢাকায় পৌঁছেছেন। কলকাতা যাওয়ার আগে তিনি আসন্ন 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

এদিকে 'শান্তিচুক্তির' স্বপক্ষে জনমত গঠন ও মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানা গেছে। জনসংহতি সমিতির অঙ্গসংগঠন যুব সমিতি (যুস), গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রাপ) ও সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন এলাকার পাহাড়িদের সঙ্গে আসন্ন শান্তিচুক্তির ব্যাপারে নিরলসভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ পাহাড়িরাও 'শান্তিচুক্তির' ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক সাড়া দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

অপরদিকে দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের 'থোয়াই অং মারমা-পলাশ খীসা-মৃগাংক খীসা' গ্রুপও 'শান্তিচুক্তির' স্বপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। 'প্রসিত-সঞ্চয়' গ্রুপের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা 'শান্তিচুক্তির' পক্ষে-বিপক্ষে



কোনোকিছুই জোরালোভাবে বলছে না। তবে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে 'আসন্ন শান্তিচুক্তির' স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য 'প্রসিত-সঞ্চয়' গ্রুপের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা অক্টোবর ১৯৯৭

## পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে আরো এক মাস লাগতে পারে

*ভূমি সমস্যার জট পুরো খোলেনি ❑ ২ নভেম্বর বৈঠকের সম্ভাবনা*

**সানাউল্লাহ :** আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক হতে যাচ্ছে। এই বৈঠকেই উভয়পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে।

এক মাস পর আগামী ২ নভেম্বর এই বৈঠক অনুষ্ঠানের চিন্তা ভাবনা করছে উভয়পক্ষ। তবে তারিখটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে বলে জানা যায়।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পর্ক রক্ষাকারী যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা এখন ঢাকায় রয়েছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য আগামী সপ্তাহে কলকাতা যেতে পারেন। গত বুধবার রাতে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উভয় পক্ষের পরবর্তী বৈঠক হবে। তবে বৈঠকে চুক্তি হবে কিনা তা তিনি নিশ্চিত করে বলেননি। হংসধ্বজ চাকমা বলেন, এখনো কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার ওপরই আগামী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি নির্ভর করছে বলে তিনি জানান।

জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) আগামী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনার কথা গত ১৭ সেপ্টেম্বরের প্রেসব্রিফিঙে জানালেও একাধিক সূত্রে জানা যায়, বিশেষ করে ভূমি সমস্যা নিয়ে এখনো উভয় পক্ষের মধ্যে পুরো সমঝোতা হয়নি। শান্তিচুক্তির পর পাহাড়ের ভূমির ব্যবস্থাপনা কি হবে, খাস জমির বন্দোবস্ত কে দেবে, সরকারি জমি কিভাবে চিহ্নিত হবে এবং ভূমি হস্তান্তরের বিষয়টি কি প্রক্রিয়ায় হবে–এসব বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আরো আলোচনা প্রয়োজন বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভূমি সমস্যার বিষয়টি উভয় পক্ষের গত ৩/৪ দফা বৈঠকে আলোচনার প্রধান ইস্যু হিসেবে চলে আসছে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী পার্বত্য

চট্টগ্রামের ভূমির মালিকানা থেকে ক্রমেই উচ্ছেদ হওয়ার ধারণায় শঙ্কিত। তাদের দুই যুগের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামেরও প্রধান একটি ইস্যু ভূমির ব্যবস্থাপনা।

জানা যায়, ২ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী বৈঠকে প্রথমে আলোচনা এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে তারপর চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সম্পন্ন হবে। আগামী ১০ নভেম্বর জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুদিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে তাদেরই একটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর হাতে জনপ্রিয় এই পাহাড়ি নেতা নিহত হন। মানবেন্দ্র লারমার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নভেম্বর মাসেই চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সম্পন্ন করতে চায় জনসংহতি সমিতি। তাই আগামী বৈঠকেই চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা বেশি।

অন্যদিকে শান্তিচুক্তির একটা খসড়া তৈরির জন্য সরকার পক্ষ কাজ অব্যাহত রেখেছে বলে জানা যায়। উভয় পক্ষের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমাধান বেরিয়ে এসেছে তাকে চুক্তির আকারে নিয়ে আসতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং বেসামরিক বিমান, পর্যটন ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর বেশ কয়েক দফা বসে কাজ করেছেন। সূত্র জানায়, চিফ হুইপের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ হয়েছে। তিনি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দেশে ফিরে আসবেন। খসড়া চুক্তিটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিশেষ করে আইন মন্ত্রণালয় এখন পরীক্ষা করে দেখছে। সরকারের কাছ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পরই তা উভয়পক্ষের পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপিত হবে।

**ভোরের কাগজ**
৩রা অক্টোবর ১৯৯৭
বিশেষ সাক্ষাৎকার

**বিরোধী দলীয় নেত্রী এভাবে কথা বললে আমরা কোথায় যাবো**
**–হংসধ্বজ চাকমা**

হংসধ্বজ চাকমা। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক। গত সাড়ে ৫ বছর ধরে তিনি আত্মগোপনকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। উভয়পক্ষকে বৈঠকে বসানোর মতো কাজের দায়িত্ব তার। এজন্য নিয়মিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে যেতে



হয়। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সরকার এবং জনসংহতি সমিতি উভয়কে দেখেছেন, জেনেছেন। ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সানাউল্লাহ**।

**ভোরের কাগজ :** পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই যুগের সমস্যা অবশেষে সমাধানের পথে যাচ্ছে। আগামী বৈঠকে সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে বলে ঘোষণা করেছে। উভয়পক্ষের আলাপ-আলোচনার এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পেরে এখন আপনার অনুভূতি কি?

**হংসধ্বজ চাকমা :** আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। খুব ভালো লাগছে। দেশের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে একটি কিছু করতে পেরেছি যা সাফল্যের দিকে এগুচ্ছে। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সেই ১৯৯২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ বছর আমি কাজ করেছি। সরকারের বক্তব্য জনসংহতি সমিতির কাছে পৌঁছানো, আর জনসংহতি সমিতির বক্তব্য সরকারের কাছে পৌঁছানো, কেবল এই কাজই নয়, সময়ে সময়ে একেক বিষয়, সমস্যা অপরকে বোঝানো–এসবও করতে হয়েছে। উভয়পক্ষের এই যোগাযোগ রক্ষার প্রক্রিয়ায় আমি বিপদেও পড়েছি। ৬ বার দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি। এই বয়সে এতো দৌড় ঝাঁপ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি শারীরিকভাবে। আমার স্ত্রী কদিন আগে মারা গেছেন। এক রকম সুষ্ঠু চিকিৎসার অভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিজের সমস্যাও কম নয়। উদ্বাস্তু হয়ে আছি প্রায় এক যুগ ধরে। খাগড়াছড়ি শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ি। নিরাপত্তা সমস্যায় ১৯৮৪ সালে বাড়িঘর ছেড়ে শহরে এসে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছি। ফলে চাষবাস বন্ধ, আয় নেই। এতো কিছুর পরেও আমি ভীষণ খুশি। নিজেকে এমন একটা কাজে জড়িত রাখতে পেরে আমি গর্ভবোধ করি।

**ভো. কা. :** একটু পিছনে যাই। আচ্ছা, এই যোগাযোগের কথাটা শুরু হয়েছিল কিভাবে?

**হ. চাকমা :** সেটা ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। খাগড়াছড়ি থেকে তৎকালীন জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে যায়। আমিও সেই দলের একজন সদস্য ছিলাম। ত্রিপুরায় বৈঠককালে শরণার্থী নেতারা আমাদের প্রতিনিধিদলের কাছে একটা স্মারকলিপি দেয়। আমাদের দলনেতা সেই স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করেন। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে এ

রকম কিছু গ্রহণ করতে মানা করা হয়েছিল। সেই অবস্থায় শরণার্থী নেতারা তাদের স্মারকলিপিটি আমাদের সামনে পড়ে শোনান। সেটার এক স্থানে বলা হয়েছিল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা হলে শরণার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে। বিষয়টি আমার মনে দাগ কাটে। পরে দেশে ফিরে এ বিষয়ে সরকারের কারো কারো সঙ্গে আলোচনা হয়। আলোচনা করি খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর তৎকালীন ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজের সঙ্গে। সেখানেই একটা ধারণা হয় যে, জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি দেওয়া হবে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে। কিন্তু আমরা তো জনসংহতি সমিতির সভাপতি কোথায় থাকেন জানি না। তাহলে কি করা হবে? তখন আমার স্বাক্ষরে আলোচনার জন্য একটা চিঠি লিখে সেটা অনেকগুলো কপি করে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা ধারণা করেছিলাম এভাবে অন্তত একটি চিঠি হয়তো জনসংহতি সমিতির হাতে গিয়ে পড়বে। অবশেষে ২০ দিন পর সেই চিঠির একটা জবাব পেলাম রূপায়ন দেওয়ানের স্বাক্ষরিত। সে চিঠিতে তিনি জানান, জনসংহতি সমিতি আলোচনার জন্য রাজি। তারা সরকার ও জনসংহতি সমিতির কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মতিক্রমে একটি যোগাযোগ কমিটি গঠনের প্রস্তাবও দেন সেই চিঠিতে। সেই যোগাযোগ কমিটি গঠন করা নিয়েও অনেক টানাহেঁচড়া হয়। কোনো নাম সরকারের পছন্দ হলে জনসংহতি সমিতির হয় না। আবার জনসংহতি সমিতির পছন্দ হলে সরকারের হয় না। অবশেষে উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৬ সদস্যের একটি যোগাযোগ কমিটি হয়। এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয় আমাকে।

**ভো. কা. :** একটা শান্তি চুক্তির ব্যাপারে সবাই আশাবাদী। কিন্তু এই চুক্তি কি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দেবে?

**হ. চাকমা :** এ প্রশ্নটা কেবল আপনার নয়, সবারই। চুক্তি কি কখনো গ্যারান্টি দিতে পারে? আসলে চুক্তি সম্পাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়ের সদিচ্ছা প্রয়োজন। তবে সেটা সরকাররেরই থাকতে হবে বেশি করে। কারণ চুক্তির পক্ষ হিসেবে সরকার হচ্ছেন দাতা। তাই তারা যেটা অঙ্গীকার করবেন বা প্রতিশ্রুতি দেবেন সেটা তাদেরই পূরণ করতে হবে। আর তাছাড়া যে শান্তি চুক্তির কথা বলছেন, সে সম্পর্কে এখনো বলি আমরা চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছি কেবল, উভয়পক্ষ ঐকমত্যের কাছাকাছি রয়েছে এই মুহূর্তে। তবে চুক্তি হওয়াটা নির্ভর করছে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার ওপর। শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত এই চুক্তি। চুক্তির পর তার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।



**ভো. কা. :** কিন্তু পাহাড়ি-বাঙালি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত বন্ধ হবে কি করে?

**হ. চাকমা :** আসলে অতীত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার হয় কেন সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। কেউ যদি উস্কানি না দেয় তাহলে এসব কিছু হবে না, এটা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। ১৯৪৭ সালে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৫ শতাংশ ছিল বাঙালি। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরও বাঙালি জনসংখ্যা ছিল নগণ্য। বিএনপির সময় ১৯৭৯ সাল থেকে পাহাড়ে ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসন হয়েছে। সেই সরকার এক সম্প্রদায়কে দমন করতে অন্য সম্প্রদায়কে ব্যবহার করেছিল। সেই থেকে পাহাড়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের উদ্ভব হয়, অথচ এই বাঙালিদের কি পুনর্বাসন হয়েছে দেখুন। '৭৯ থেকে '৯৭ পর্যন্ত এতো বছর ধরে তারা গুচ্ছগ্রামে আছে, সরকারি রেশন পাচ্ছে। পুনর্বাসনই যদি হলো তাহলে এখনো এটা হয় কি করে? আসলে একটা অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করা, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের সেখানে নেওয়া হয়েছিল।

**ভো. কা. :** তো, প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি কি বাঙালি-পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ হবে?

**হ. চাকমা :** অবশ্যই পারবে। অনাদিকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। পাহাড়ে আমাদেরই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ছিল না। যখন জিয়াউর রহমান সাহেব মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সমতল থেকে বসতিস্থাপনকারীদের নিয়ে আসেন, তখনই বিরোধ দেখা দিলো। কারণ এতে পাহাড়িদের শান্তি, স্থিতি সবই নষ্ট হয়েছিল। আর যে চুক্তি করতে যাচ্ছে, সেটা যদি সরকার সদিচ্ছা নিয়ে বাস্তবায়ন করে তাহলে অবশ্যই পাহাড়িরা তাদের হারানো অধিকার ফিরে পাবে। আর শান্তিও ফিরে আসবে পাহাড়ে।

**ভো. কা. :** আপনি বার বার সরকারের সদিচ্ছার কথা বলছেন। তার মানে এটা নিয়ে সন্দেহ আছে নাকি?

**হ. চাকমা :** বিষয়টি কেন বলি, তা একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। বর্তমান সরকারের আমলে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এই সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৯ মাসে মাত্র ৬টা বৈঠকে উভয়পক্ষের আলোচনায় যে অগ্রগতি হয়েছে তার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে। অন্যদিকে সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৩ বছরে ১৩টি বৈঠকে বিন্দুমাত্র অগ্রগতিও হয়নি। শুনলে অবাক হবেন, সেসব বৈঠকে এমনকি কোনো ইস্যুভিত্তিক আলোচনাও হয়নি।

**ভো. কা. :** কিন্তু এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনসংগতি সমিতির সদিচ্ছাও তো একটা বড়ো বিষয়। তাদের কি সেটা আছে?

**হ. চাকমা :** নিশ্চয়ই জনসংহতি সমিতির সদিচ্ছা আছে। আর তারা তার প্রমাণও রেখেছে। তারা আন্তরিক এবং সমস্যার সমাধান চায় বলেই ৫ দফা দাবিতে কিছু ছাড়ও দিয়েছে। কারণ তারা মীমাংসা চায়। চায় পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসুক।
এখানে সবাই সংবিধানের ভিতরে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের কথা বলেন। আজকের বিরোধীদলীয় নেত্রীও সেটা বলেন। কিন্তু আমাকে বলুন, সংবিধানের কোথায় আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে সেনাবাহিনী থাকবে? এমনকি যখন জরুরি অবস্থা থাকবে না তখনো গোটা পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেনাবাহিনী থাকবে? বাংলাদেশের আর কোথায় এভাবে সেনাবাহিনী আছে? অথচ দেশের অন্য অনেক স্থানেই নানা সমস্যা, সন্ত্রাস আছে। একজন নেত্রী, যিনি এখন বিরোধীদলীয় নেত্রী, কদিন আগেও তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি যদি এভাবে কথা বলেন তাহলে আমরা কোথায় যাবো? দেশটা কিভাবে চলবে?

**ভো. কা. :** কিন্তু প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি নিয়ে পাহাড়িদের মধ্যে কিছু বিরোধিতার কথা শোনা যাচ্ছে।

**হ. চাকমা :** আসলে তেমন কোনো বিরোধিতা নেই। দুই-একজন নানা কথা বলতে পারে। আর যারা এসব বলছে বা করছে তাদের পিছনে লোক বা সংগঠন নেই।

**ভো. কা. :** পাহাড়ি গণপরিষদ, ছাত্র পরিষদের একাংশ বিরোধিতা করছে।

**হ. চাকমা :** না, আমি আগেই বলেছি, যারা নানা বিরোধিতার কথা বলছে তাদের সঙ্গে সংগঠন নেই। আর পাহাড়ি গণপরিষদ, ছাত্র পরিষদ তারা তো শান্তি চুক্তির পক্ষে লোকজনকে জানানো, বোঝানোর জন্য গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করছে। বিরোধিতা করছে কোথায়?

**ভো. কা. :** জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর মধ্যেও বিরোধিতার কথা শোনা যাচ্ছে।

**হ. চাকমা :** এটাও ঠিক নয়। শান্তি চুক্তি নিয়ে শান্তিবাহিনীর মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। আসলে এসব অপপ্রচার। কেউ কেউ বলতেন ঊষাতন তালুকদার (শান্তিবাহিনীর প্রধান, ফিল্ড কমান্ডার) শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করছেন। নিজের দলবল নিয়ে বান্দরবান চলে গেছেন। এসব কথাও শোনা গেছে। কিন্তু আপনাদের হরিকিশোর (হরিকিশোর চাকমা, ভোরের কাগজ-এর রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি) তো এবার দুদুকছড়ি গিয়ে ঊষাতনের সঙ্গে কথাও বলেছে। সে সংবাদ আপনাদের পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। এ রকম এর আগে রূপায়ন দেওয়ানকে নিয়ে কথা হয়েছে। নানা কানাঘুষা হয়েছে। এসব আসলে ঠিক নয়।



**ভো. কা. :** কিন্তু জনসংহতি সমিতি যে তাদের মূল দাবি থেকে সরে এসেছে, সেটা পাহাড়ের মানুষ কিভাবে নেবে?

**হ. চাকমা :** আসলে দাবি থেকে সরে এসেছে বা অবস্থান পরিবর্তন করেছে এ রকম ধারণা ঠিক নয়। ১৬ আনা দাবির মধ্যে ১২ আনা দাবি আদায় হয়েছে বলা যায়। আর আলাপ-আলোচনার মধ্যে সমাধানে সকল পক্ষকেই তো ছাড় দিতে হয়। নইলে আলোচনা হয় না, সমাধান হয় না। তাই কিছুটা ছাড় দিয়ে সমাধান হয়েছে। আর এ সবটাই হয়েছে শান্তির স্বার্থে, ঐকমত্যের জন্য। বাস্তবতা মেনে নিয়েই এটা হয়েছে।

**ভো. কা. :** শেষ প্রশ্নটা করি। শান্তি চুক্তি কবে নাগাদ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

**হ. চাকমা :** আসলে নভেম্বর মাস পাহাড়িদের কাছে ভিন্ন গুরুত্ব নিয়ে আসে। এ মাসের ১০ তারিখ পাহাড়িদের প্রিয় নেতা, জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নিহত হয়েছিলেন। পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষা, অধিকার আদায়ে তিনি কাজ করেছেন আমৃত্যু। জনসংহতি সমিতিও চায় তাদের নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নভেম্বর মাসেই চুক্তি হোক। সে কারণে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী বৈঠক এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

**ভোরের কাগজ**
**১১ই অক্টোবর ১৯৯৭**

চেয়ারম্যান হেডম্যানদের সমাবেশে কল্পরঞ্জন চাকমা

## পার্বত্য অঞ্চল থেকে কোনো বাঙালিকে বহিষ্কার করা হবে না

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আসন্ন শান্তিচুক্তির প্রাক্কালে সকল ধর্ম-বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আর হিংসা হানাহানি নয়, সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত পার্বত্য সমস্যার সমাধানের গৌরব ভাগাভাগি করে নিতে হবে। গতকাল খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত চেয়ারম্যান-হেডম্যানদের এক সমাবেশে শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি একথা বলেন।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, পার্বত্য সমস্যা কোনো সরকার বিশেষের সমস্যা নয়। এটি একটি জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা। সরকারের দেশপ্রেম, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতায় সমস্যা সমাধানের পথ অনেক দূর এগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলো ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, জাতীয় কমিটিতে বিএনপির ২ জন সদস্য রাখা হলেও এ পর্যন্ত কোনো বৈঠকেই তারা অংশগ্রহণ করেননি। অথচ বিএনপি সরকারের সময় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পরও আমরা আলোচনায় অংশ নিয়েছি। তিনি বলেন, চলমান শান্তি সংলাপ বানচাল করার জন্য বিরোধীদল গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ও হানাহানি সৃষ্টি করছে।

সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা বিরোধী দলকে জাতীয় কমিটির বৈঠকে ও সংসদের আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। বাঙালিদের বাদ দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি আসবে না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোনো বাঙালিকে প্রত্যাহার করা হবে না। তিনি মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ আমিনুল ইসলাম, পৌর চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লেহাজ উদ্দিন, পরিষদ সদস্য জাহেদুল আলম, প্রেসক্লাব সভাপতি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি নুরুন্নবী চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান এম কে আজাদ, খগেশ্বর ত্রিপুরী ও হেডম্যান বি কে রোয়াজা।

**ভোরের কাগজ**

**১৩ই অক্টোবর ১৯৯৭**

**শান্তি চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে প্রচারণায় খাগড়াছড়ি উত্তপ্ত**

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মহলের সভা-সমাবেশ-মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে খাগড়াছড়ির রাজনৈতিক অঙ্গন।

শান্তি চুক্তির পক্ষে রয়েছে সরকার সমর্থিত পাহাড়ি পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ। আর বিপক্ষে রয়েছে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। শান্তি চুক্তিতে পার্বত্যবাসীর সমানাধিকারের দাবিতে স্থানীয় শাপলা চত্বরে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আগামী ১৫ অক্টোবর মহাসমাবেশ ডেকেছে। মহাসমাবেশকে সফল কার লক্ষ্যে গতকাল থেকেই শহরে মাইকিং শুরু হয়েছে।



অন্যদিকে আগামী ১৮ অক্টোবর শান্তি চুক্তির সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে পাহাড়ি পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ খাগড়াছড়ি শহরে মিছিল সমাবেশের আয়োজন করেছে। পাশাপাশি জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে চুক্তির পক্ষে সভা সমাবেশ চলছে প্রতিদিন।

গতকালও কল্পরঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে স্থানীয় সার্কিট হাউসে এক সভায় চলমান শান্তি প্রক্রিয়ায় পার্বত্যবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে আহ্বায়ক, হাজী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও পুরুষোত্তম চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং জাহেদুল আলমকে সদস্য সচিব করে গঠিত ২১ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

**ভোরের কাগজ**

**১৫ই অক্টোবর ১৯৯৭**

<u>বৌদ্ধ প্রতিনিধিদের উদ্দেশে হাসিনা</u>

**পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছে একটি মহল**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে একটি স্বার্থানেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধিদল তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'প্রবারণা পূর্ণিমা' উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাতে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। বাসস।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাফল্য সম্পর্কে পূর্ণ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা একটি সমঝোতায় পৌঁছেছি। আল্লাহর রহমতে সেখানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য জেলাসমূহের উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং গর্ব। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিচিতি রয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির জন্য বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

## ভোরের কাগজ
## ১৬ই অক্টোবর ১৯৯৭
## ১৬ নভেম্বর সরকার-জনসংহতির বৈঠক, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে

**সানাউল্লাহ :** আগামী ১৬ নভেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির পরবর্তী বৈঠক হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের সংঘাত, রক্তক্ষয় বন্ধ করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠেয় এই বৈঠকেই সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করবে। গতকাল বুধবার খাগড়াছড়ি ও ঢাকায় যোগাযোগ করে বৈঠকের তারিখ সম্পর্কে জানা গেছে।

গতকালই জনসংহতি সমিতি আগামী বৈঠকের এই তারিখ সম্পর্কে জানায়। জানা যায়, সরকার অবশ্য এ মাসের ২৬ তারিখ অথবা নভেম্বর মাসের ২ তারিখ পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠানে আগ্রহী ছিলেন। সরকারের এই আগ্রহের কথা জনসংহতি সমিতিকেও জানানো হয়েছিল।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে শান্তি চুক্তির একটা খসড়া ইতিমধ্যে জনসংহতি সমিতিকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনো তা দেওয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এই খসড়াটির কারণেই বৈঠকের তারিখ এতোটা বিলম্বে ঠিক করা হয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে খসড়া চুক্তির কপি জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানো হলে বৈঠকে বসার সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। তা না হলে প্রথমে উভয়পক্ষ বৈঠক করে তারপর চুক্তি স্বাক্ষর করবে। সেক্ষেত্রে বৈঠকে একাধিক দিন লেগে যেতে পারে।

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তির খসড়া তৈরির যে কাজ চলছিল তা আপাতত স্থগিত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। তিনি আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা ফিরবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, জাতীয় কমিটির অপর সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এই খসড়া তৈরির কাজে যুক্ত রয়েছেন।

জানা যায়, বেশ গোপনীয়তার মধ্যে এই খসড়া চুক্তি প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে। এমন কি এই চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন, স্থানীয় সরকার, অর্থ, স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিশেষ কার্যাদি বিভাগ কেউই চুক্তির সম্ভাব্য কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিত নয়।

পাশাপাশি প্রস্তাবিত চুক্তি অনুষ্ঠান এবং তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকার এখনো কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ



হাসিনাসহ মন্ত্রিসভার সদস্য, কূটনীতিক, রাজনীতিবিদগণ থাকতে পারেন। ঢাকায় চুক্তিটি হলেও ঠিক কোথায় সে অনুষ্ঠান হবে তাও এখনো ঠিক হয়নি। অবশ্য সরকার ও জনসংহতি সমিতির এ বছরের জানুয়ারি থেকে গত ৫টি বৈঠক নগরীর রমনা থানা সংলগ্ন এলিফ্যান্ট রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা ও মেঘনায় হয়েছে।

তাছাড়া চুক্তির পরপরই ২১ নভেম্বর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে ফেরা শুরু হবে। ধারণা করা হচ্ছে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি হবে না। বরং একবারে ৪০ থেকে ৪৪ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে। সেক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী পুনর্বাসনের মতো বিশাল প্রস্তুতির বিষয় রয়েছে।

অন্যদিকে চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যায়ে ২ থেকে ৪ হাজার সশস্ত্র শান্তিবাহিনী সদস্যের নিরস্ত্রীকরণ, তাদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, পার্বত্য তিন জেলার বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে আশ্রয়গ্রহণকারী ২৮ হাজার বাঙালি পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতরে পাহাড়ি আরো কয়েক হাজার পরিবার যারা অভ্যন্তরীণ শরণার্থী বলে চিহ্নিত তাদের পুনর্বাসনের মতো বিশাল কাজের চাপ রয়েছে। এসব কাজের জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে। পার্বত্য তিন জেলা ও থানাসমূহের বর্তমানে প্রশাসনিক যে শক্তি বা লোকবল আছে তা দিয়ে এই কাজ সম্ভব হবে না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

এ ছাড়া চুক্তির অন্যান্য বিষয় যেমন স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন, আঞ্চলিক পরিষদ, ভূমি কমিশন গঠন, সরকারি, খাস, ব্যক্তির জমি চিহ্নিত করা ইত্যাদি কাজও রয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, সামগ্রিক তৎপরতা এবং এর প্রস্তুতির বিষয়টি নিয়ে সরকারের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আজ দেশে ফেরার পর এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রস্তুতি শুরু হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ঢাকার একাধিক সূত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত চুক্তি, এর বাস্তবায়ন ও প্রস্তুতির বিষয় নিয়ে জনসংহতি সমিতি ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু করেছে। তবে তাদের কংগ্রেস হয়েছে বলে ঢাকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক নয় বলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ খাগড়াছড়ির একটি সূত্র জানিয়েছে। ঐ সূত্র বলে, জনসংহতি সমিতির কংগ্রেসের কোনো নির্ধারিত বা অনির্ধারিত এজেন্ডা নেই। তবে জনসংহতি সমিতি স্বাভাবিকভাবেই চুক্তি ও এই সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলছে। ঐ সূত্র জানায়, গত মাসে এবং চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতি এ ধরনের তিনটি বৈঠক করেছে।

**ভোরের কাগজ**
**১৬ই অক্টোবর ১৯৯৭**
খাগড়াছড়িতে সমাবেশ

### খসড়া শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে ৩ পার্বত্য জেলায় অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বলেছেন বর্তমান সরকার ভারতকে খুশি করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে এক চুক্তি করতে যাচ্ছে যা বৈষম্যমূলক। চুক্তি হবে সত্যিই, তবে পাহাড়ে শান্তি আসবে না। বাঙালিদের অধিকার বঞ্চিত করে পার্বত্য সমস্যার সমাধান করতে চাইলে পার্বত্যবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈষম্যমূলক খসড়া চুক্তি বাতিল ও সমঅধিকারের দাবিতে গতকাল খাগড়াছড়ির শাপলা চত্বরে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক মন্ত্রী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি একথা বলেন।

পার্বত্য ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ শাহাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২৬ অক্টোবর সড়ক অবরোধ এবং ২৯ অক্টোবর ও যে দিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে সেদিন তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা করা হয়।

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী আরো বলেন, দেশে বর্ণবাদের স্থান নেই। কিন্তু সরকার অসম অধিকারের ভিত্তিতে বর্ণবাদ সৃষ্টির পায়তারা চালাচ্ছে। শান্তি চুক্তির নামে বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পাহাড়িদের অধিকারের পাশাপাশি বাঙালিদেরকেও সমঅধিকার দিতে হবে।

ভোরের কাগজ
১৭ই অক্টোবর ১৯৯৭

### ৩১ অক্টোবরের মধ্যে খসড়া চুক্তি চেয়ে পাঠিয়েছে জনসংহতি সমিতি

*সময়মতো না পেলে চুক্তি স্বাক্ষর বিলম্বিত হতে পারে*

**সানাউল্লাহ/আজিম উল হক :** আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির খসড়াটি চেয়ে পাঠিয়েছে জনসংহতি সমিতি। চুক্তির খসড়াটি যথাসময়ে না পেলে আগামী ১৬ নভেম্বরের বৈঠকে সরকারের সঙ্গে



জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষর হবে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ককে লেখা জনসংহতি সমিতির এক চিঠিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

চিঠিতে বলা হয়, গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত উভয় পক্ষের ষষ্ঠ বৈঠকেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের একটা চেষ্টা সরকার করেছিল। কিন্তু কিছু বিষয়ে সরকারের প্রস্তাব জনসংহতি সমিতির দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তারা সেসময় চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অমীমাংসিত বিষয়গুলো এখনো পুরো নিষ্পত্তি হয়নি বলে জানা যায়।

আগামী ১৬ নভেম্বর সপ্তম বৈঠকে বসার সম্মতি জানিয়ে গত ১১ অক্টোবর জনসংহতি সমিতির নেতা ঊষাতন তালুকদার যোগাযোগ কমিটির কাছে এক চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি গত বুধবার খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার হস্তগত হয়।

হংসধ্বজ চাকমার মাধ্যমে গতকাল বৃহস্পতিবার সরকারের কাছে চিঠিটি পৌঁছে। তাতে বলা হয়, অমীমাংসতি বিষয়গুলো সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাব তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে এ ব্যাপারে সরকারের নতুন বা পরিবর্তিত চিন্তা-ভাবনা জানা দরকার।

উল্লেখ্য, গত বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে পরবর্তীকালে চুক্তির খসড়া পাঠানো হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সে অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির কাছে সেটা এখানো পৌঁছেনি।

বেশ কিছু বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত হলেও এখনো কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসক পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের কি ভূমিকা রাখবেন তা এবং ১৯০০ সালের হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের কিছু সংশোধনী বিষয়ে পক্ষ দুটি সমঝোতায় পৌঁছুতে পারেনি।

এদিকে গত কয়েকদিনে একাধিক জাতীয় দৈনিক ও বিদেশী গণমাধ্যমে জনসংহতি সমিতির কংগ্রেস অনুষ্ঠান এবং তাতে খসড়া চুক্তি অনুমোদনের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার কোনো আভাস জনসংহতি সমিতির চিঠিতে পাওয়া যায় না। কারণ জনসংহতি সমিতি বলেছে, তারা খসড়া চুক্তির কপিই পায়নি।

গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ বৈঠক শেষ হওয়ার পর পরই সরকার পক্ষ খসড়া চুক্তি প্রণয়নের কাজ শুরু করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ায় গত দুই সপ্তাহ ধরে এ কাজ বন্ধ ছিল। জাতীয় কমিটির প্রধান গতকাল দুপুরে দেশে ফিরে এসেছেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

**ভোরের কাগজ**
**১৮ই অক্টোবর ১৯৯৭**
প্রথম ধলেশ্বরী সেতু উদ্বোধন
## পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কখনোই সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোর দিয়ে বলেছেন, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কখনোই সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে বলে যে প্রচারণা ছড়িয়ে পড়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গতকাল মুন্সীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ১নং ধলেশ্বরী সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। অন্যান্যের মধ্যে যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলওয়ে বিভাগের সচিব সৈয়দ রেজাউল হায়াত জনসভায় বক্তৃতা করেন। কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাংসদবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। জনসভার আগে প্রধানমন্ত্রী ২৬২ মিটার দীর্ঘ সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বাসস ও ইউএনবি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর একটি খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর যেসব বাংলাদেশী বিদেশে বসবাস করছে তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারবে।

তিনি বলেন, একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য তাঁর সরকার যখন উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছে তখন বিরোধী দল সমস্যা সৃষ্টি করছে। শরণার্থীরা যদি দেশে ফিরে আসে তাহলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে বলে বিরোধী দলের মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, কোনো দেশের নাগরিক যদি তার মাতৃভূমিতে ফিরে আসে তাহলে কিভাবে সে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়?

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার বাংলাদেশের মাটিতেই উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকার বাংলাদেশে নয় বরং ভারতের মাটিতে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধী দলের নেত্রী যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কখনোই ভারতের সমালোচনা করেননি। 'যখন আপনি ক্ষমতায় থাকবেন তখন ভারতের পক্ষে থাকবেন আর যখন বিরোধী দলে থাকবেন তখন ভারতের সমালোচনা করবেন, এ অভ্যাস চলতে পারে না।'



শেখ হাসিনা বলেন, 'বিরোধী দলের নেত্রী জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চান। স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি, দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা আবার রক্ত দেবো।'

প্রধানমন্ত্রী সংসদে যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা অথবা যেকোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য বিরোধী দলের নেত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে বিএনপির অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রীর উদ্দেশে বলেন, সংসদে আসুন, আলোচনায় অংশ নিন এবং আপনার যা খুশি জিজ্ঞেস করুন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রধান বিরোধী দলকে সংসদে কথা বলতে দেওয়া হয় না এটা সত্যি নয়। 'তারা যে বিষয়ই উত্থাপন করতে চেয়েছেন, আমরা সে বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ তাদেরকে দিয়েছি।'

তিনি উল্লেখ করেন যে, জ্বালানি নীতি, শিল্পনীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংসদে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের নেত্রী কোনো বিষয়েই আলোচনায় অংশ নেননি।

শেখ হাসিনা বলেন, সংসদ নেত্রী হিসেবে আমি প্রতি সপ্তাহে প্রশ্নের উত্তর দেই কিন্তু বিরোধী দলের নেত্রী কোনো প্রশ্ন করেননি।

**ভোরের কাগজ**
**১৯শে অক্টোবর ১৯৯৭**
খাগড়াছড়িতে কৃষিমন্ত্রী
## সরকার পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, পার্বত্যাঞ্চল থেকে সকল ভয়ভীতি, হিংসা, হানাহানি এবং রক্তপাত চিরতরে বন্ধ করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। পাহাড়ের মানুষ আজ শান্তি চায়।

গতকাল খাগড়াছড়ি শাপলা চত্বরে এক বিশাল শান্তি সমাবেশে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। পাহাড়ি পেশাজীবী ঐক্য কমিটি ও নাগরিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পাহাড়ি নেতা নবীন কুমার ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এ শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি সমাবেশের আগে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানের নেতৃত্বে পাহাড়ি বাঙালিদের এক বিশাল শান্তি র‍্যালী খাগড়াছড়ি প্রদক্ষিণ করে, এ সময় সাংসদ দীপংকর তালুকদার, নাগরিক কমিটির ও পেশাজীবীর নেতারা র‍্যালিতে অংশ নেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন, টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটির সাংসদ দীপংকর তালুকদার, নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সদস্য উহ্লাপ্রু চৌধুরী, প্রবীণ চাকমা, নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল আলম, পেশাজীবী ঐক্য কমিটির সদস্য সচিব সৌখিন চাকমা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাজি দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি নুরন্নবী চৌধুরী।

**ভোরের কাগজ**

২৪শে অক্টোবর ১৯৯৭

**শান্তিচুক্তিতে পাহাড়ি-বাঙালি সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হবে : দীপঙ্কর তালুকদার**

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার বলেছেন, আসন্ন শান্তিচুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। যারা অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার কথা বলে তারা শান্তি চায় না। পার্বত্য এলাকার স্বার্থান্বেষী মহল সামান্য ঘটনা নিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেন শান্তিচুক্তি পিছিয়ে যায়। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিক তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চুক্তি করতে চাই।

**ভোরের কাগজ**

২৫শে অক্টোবর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকারের ষড়যন্ত্রে দেশের এক দশমাংশ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে –মান্নান ভুঁইয়া**

**কাগজ প্রতিবেদক :** বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকার যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের এক দশমাংশ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তিনি সরকারের প্রতি তীব্র হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিরোধী এ ধরনের কোনো চুক্তি করা হলে দেশবাসীকে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।



আবদুল মান্নান ভুঁইয়া গতকাল তার নির্বাচনী এলাকায় দিনব্যাপী সফর শেষে শিবপুরে থানা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপি প্রথম থেকেই সংসদকে কার্যকর এবং তাকে সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই সংসদকে অকার্যকর করেছে। বিরোধীদলীয় সদস্যরা জনগণের পক্ষে সংসদে কোনো কথা বলতে পারে না। বিএনপি মহাসচিব বলেন, কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করা হয় না। সংসদ এবং জনগণকে এড়িয়ে সরকার একের পর এক দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ও চুক্তি করে চলেছে। সংসদকে আজ রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করা হচ্ছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সরকারের বিভিন্ন কারণেই বিএনপি সংসদের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে। আজ সরকারবিরোধী দলকে সংসদে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। একই সঙ্গে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিয়ে, আক্রমণ চালিয়ে, গুলি, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শিবপুর থানা বিএনপি সভাপতি আবুল হারিছ রিকাবদার ঐ কর্মিসভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া গতকাল সকালে শিবপুর থানার সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয় ডাকবাংলোতে এক বৈঠক করেন। থানার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বিএনপি মহাসচিব গতকাল দুপুরে শিবপুর থানার মাসিমপুর ইউনিয়নের ধানুয়া প্রাইমারি স্কুলে সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির ধানুয়া দক্ষিণ ব্লকের এক ও দুই নং কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

**ভোরের কাগজ**

২৬শে অক্টোবর ১৯৯৭

জনসংহতির কাছে এখনো খসড়া পৌঁছেনি

**১৬ নভেম্বরের বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে**

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আগামী ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তির স্বাক্ষর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তির খসড়াটি এখনো জনসংহতির কাছে না পাঠানোয় এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ও যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা উদ্বিগ্ন অবস্থায়

রয়েছেন। এদিকে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণায় পার্বত্যবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকার সূচিত জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ পর্যন্ত ৬টি বৈঠক করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠকে উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছার ঘোষণা দেন। পরবর্তীসময়ে গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রেস ব্রিফিঙে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন। গত ১৬ অক্টোবর সরকারের কাছে পাঠানো জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা উষাতন তালুকদার স্বাক্ষরিত এক পত্রে আগামী ১৬ নভেম্বর পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। পত্রে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তির’ খসড়াটি জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানোর দাবি জানানো হয় সরকারের কাছে। এ সময় শেষ হওয়ার আর মাত্র ৫ দিন বাকি থাকলেও শান্তিচুক্তির খসড়াটি পাঠানোর ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এ ব্যাপারে যোগাযোগ কমিটিকেই উদ্যোগ নিতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রোববার যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে বলেন, এ ব্যাপারে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বৈঠক ও শান্তিচুক্তির খসড়া পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করা হয়নি বলে হংসধ্বজ চাকমা জানান। আজ ঢাকায় গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহসহ কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া পাঠানো ও বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আসবেন বলেও তিনি জানান। দুএকদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলেও হংসধ্বজ চাকমা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রমতে, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যদি শান্তিচুক্তির খসড়া জনসংহতি সমিতির কাছে না পৌঁছায় তাহলে ১৬ নভেম্বরের বৈঠকে ‘চুক্তি স্বাক্ষর’ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে অথবা আরো একটি বৈঠকের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।



## ভোরের কাগজ

২৭শে আক্টোবর ১৯৯৭

## জনসংহতির কাছে এখনো খসড়া পৌঁছেনি ১৬ নভেম্বরের বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আগামী ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তির খসড়াটি এখনো জনসংহতির কাছে না পাঠানোয় এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ও যোগাযোগ কমিটির সদস্যরা উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। এদিকে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণায় পার্বত্যবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকার সূচিত জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ পর্যন্ত ৬টি বৈঠক করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠকে উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছার ঘোষণা দেন। পরবর্তীসময়ে গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রেস ব্রিফিঙে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তি’ স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন। গত ১৬ অক্টোবর সরকারের কাছে পাঠানো জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা উষাতন তালুকদার স্বাক্ষরিত এক পত্রে আগামী ১৬ নভেম্বর পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। পত্রে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তির’ খসড়াটি জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানোর দাবি জানানো হয় সরকারের কাছে। এ সময় শেষ হওয়ার আর মাত্র ৫ দিন বাকি থাকলেও শান্তিচুক্তির খসড়াটি পাঠানোর ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এ ব্যাপারে যোগাযোগ কমিটিকেই উদ্যোগ নিতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রোববার যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে বলেন, এ ব্যাপারে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বৈঠক ও শান্তিচুক্তির খসড়া পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করা হয়নি বলে হংসধ্বজ চাকমা জানান। আজ ঢাকায় গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয়

কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহসহ কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া পাঠানো ও বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আসবেন বলেও তিনি জানান। দুএকদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলেও হংসধ্বজ চাকমা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র মতে, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যদি শান্তিচুক্তির খসড়া জনসংহতি সমিতির কাছে না পৌঁছায় তাহলে ১৬ নভেম্বরের বৈঠকে 'চুক্তি স্বাক্ষর' অনিশ্চিত হয়ে পড়বে অথবা আরো একটি বৈঠকের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

সূত্র মতে, 'শান্তিচুক্তির খসড়া' জনসংহতি সমিতির কাছে পৌঁছার পরও সিদ্ধান্ত নিতে ১০/১৫ দিন সময়ের প্রয়োজন হবে। কারণ জনসংহতি সমিতির নীতি নির্ধারকদের মধ্যে অধিকাংশই এখন বিভিন্ন স্থানে শান্তিচুক্তির সপক্ষে প্রচারণায় ব্যস্ত রয়েছেন। তাদের একত্রিত হওয়াও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

এদিকে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণায় পার্বত্য এলাকার জনগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে সংঘর্ষের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ এখন শঙ্কিত। গত ২৩ অক্টোবর ঘিলাছড়ি ও কুতুকছড়ির দুটি সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদারও বলেছেন, শান্তিচুক্তির বিরোধীরা সামান্য ঘটনা নিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে, যেন শান্তিচুক্তি পিছিয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক মহলের মতে, শান্তিচুক্তি যতো পিছিয়ে যাবে ততো পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে পড়বে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক রাজনৈতিক নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিস্ফোরন্মুখ বলে অভিহিত করেছেন।

বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টি (জা-মো) সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আজ রাঙ্গামাটিতে 'শান্তিচুক্তির' বিরুদ্ধে মহাসমাবেশ ডেকেছে। তাদের ভাষায় বাঙালি উচ্ছেদ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, বৈষম্যমূলক আঞ্চলিক পরিষদ গঠনসহ ৩০ হাজার বাঙালি হত্যাকারী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংবিধান, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ও বাঙালি স্বার্থবিরোধী গোলামি চুক্তির প্রতিবাদে এ মহাসমাবেশ আহ্বান করা হয়েছে। এ মহাসমাবেশে জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী থাকবেন বলে জানা গেছে।



**ভোরের কাগজ**
২৭শে অক্টোবর ১৯৯৭

## খাগড়াছড়িতে পার্বত্য ঐক্য পরিষদের অবরোধ শান্তিপূর্ণভাবে পালন

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** গতকাল রোববার খাগড়াছড়িতে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আহূত সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে দূরপাল্লার যানবাহন না ছাড়ায় যাত্রী সাধারণ দুর্ভোগের শিকার হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সমঅধিকারের এবং শান্তিচুক্তি জাতীয় সংসদে ও জনসমক্ষে প্রকাশের দাবিতে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ এই সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছিল।

**ভোরের কাগজ**
২৮শে অক্টোবর ১৯৯৭
সিডেক জরিপের ফলাফল

## ৩ পার্বত্য জেলার ৯০ ভাগ মানুষ শান্তিচুক্তি সমর্থন করে

**কাগজ প্রতিবেদক :** তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ নাগরিক সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আসন্ন শান্তি চুক্তি সমর্থন করেন। সম্প্রতি সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমুনিকেশন (সিডেক) পরিচালিত এক জরিপে এ মতামত জানা গেছে।
সিডেক পরিচালিত এ জরিপে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের ২৫০ জন করে মোট ৭৫০ জনের মতামত নেওয়া হয়। জরিপে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, গৃহিণী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত নেওয়া হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের অনুপাত ছিল ৩ঃ২।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৫ ভাগ শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী একজন বলেছেন, শান্তি চুক্তিতে কি কি শর্ত থাকবে, খসড়া চুক্তিতে কি আছে–এসব বিষয়ে নজিরবিহীন গোপনীয়তা রক্ষা করায় পার্বত্য এলাকায় সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য একজন বাংলাভাষী শিক্ষক বলেছেন, জাতীয় স্বার্থেই গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দল অপব্যাখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিচালিত জরিপে প্রায় ৮৩ ভাগ মানুষ শান্তি চুক্তির ... করে আগামী ২৯ অক্টোবর আহূত হরতালের বিপক্ষে মত দিয়েছেন। হরতালের পক্ষে বলেছেন ১০ ভাগ মানুষ। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন খসড়া চুক্তি প্রকাশিত হওয়ার আগে শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি দেওয়া ঠিক নয়। রাঙামাটিতে একজন মার্মা কলেজ শিক্ষক বলেন, জামাত শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করলে আমরা বিস্মিত হই না। কারণ তারা অতীতেও এর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু বিএনপির বিরোধিতায় বিস্মিত না হয়ে পারি না। কারণ ক্ষমতায় থাকার সময় বিএনপিও জনসংহতি সমিতির সঙ্গে শান্তি আলোচনা করেছে।

পরিচালিত জরিপে প্রায় ৮২ ভাগ মানুষ আশা করেন চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। ১০ ভাগ মানুষ অবশ্য এমনটি মনে করছেন না। তাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র শান্তিচুক্তিই পার্বত্য এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে পারে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন চুক্তির শর্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন।

**ভোরের কাগজ**
২৯শে অক্টোবর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
**শান্তির পথে**

আজ তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল ডেকেছে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। সম্ভাব্য পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে তাদের এই হরতাল। ১১ নভেম্বর চট্টগ্রামে তারা মহাসমাবেশও করবে।

কারা এই পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ? সম্প্রতি রাঙ্গামাটিতে এদের মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামাতে ইসলামীর মতিউর রহমান নিজামী আর বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী।

বিএনপি, জামাত ছাড়াও আছে জাতীয় পার্টি (জা-মো)। বিএনপির মতো একটি দল, যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল, সংসদে যাদের অবস্থান এখন বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে–পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিচ্ছে–এটাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়। পার্বত্য শান্তি চুক্তির দিকে যেতে উভয়পক্ষকে যে দীর্ঘপথ পরিক্রমণ করতে হয়েছে, তাতে বিএনপিরও অবদান আছে। বেগম জিয়ার শাসনামলেও উভয়পক্ষে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, এরশাদ সরকারের সময়েও হয়েছে। আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। সহিংসতার মাধ্যমে শান্তি আসে না। আলাপ-আলোচনা সমঝোতাই শান্তির একমাত্র পথ।



শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতাও কম। বলা হচ্ছে, চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকবে না। কিন্তু সরকার পক্ষ বলছে, পার্বত্য এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট থাকবে।

এদিকে ভোরের কাগজে বেরিয়েছে আরেক খবর। সরকারের পক্ষ থেকে শান্তি চুক্তির খসড়াটি এখনো জনসংহতির কাছে পৌছানো হয়নি, ফলে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমরা চাই পার্বত্য এলাকায় শান্তি আসুক। সে লক্ষ্যে একটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক, তা বাস্তবায়িত হোক। মানবতার স্বার্থে, কল্যাণের স্বার্থেই তা জরুরি। সরকারের কোনো দীর্ঘসূত্রতা যেন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকে পিছিয়ে না দেয়।

এর আগেও আমরা বলেছি, সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টায় যেন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়। চুক্তিতে কী থাকছে, না থাকছে–তা উন্মুক্ত রাখা হোক। জাতীয় সংসদে এ নিয়ে আলোচনা হোক। বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদে এ নিয়ে অবাধ আলোচনা করুন। তাদের কোনো আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে সংসদে তা আলোচিত হোক।

সরকারের দিক থেকে সর্বোত্তম হবে যদি শান্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধীদের যুক্ত করা যায়। এদিকে চিহ্নিত ডানপন্থীদের শান্তিবিরোধী তৎপরতায় পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিকামী সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।

অন্যদিকে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন নামে এক সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ শান্তি চুক্তির পক্ষে। এ প্রস্তাবিত চুক্তির বিপক্ষে মাত্র (প্রায়) ৪ শতাংশ মানুষ। জরিপে জানানো হয়, কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, যেকোনো সুস্থ মানুষই শান্তি চুক্তির পক্ষে থাকবেন। এই চুক্তির বিরোধিতা করার কোনো যুক্তি নেই। উত্তরদাতাদের শতকরা ৮২ জন হরতালেরও বিপক্ষে।

রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের এই চাওয়াকে মূল্য দেবে, শান্তির পক্ষে মানুষের সাধারণ যে অবস্থান তাকেই সমর্থন করবে, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেবে মানবতাকে, শান্তিকে, মানুষের স্বস্তিকে, শিশুর হাসিকে–এই আমাদের প্রত্যাশা।

**ভোরের কাগজ**
**২৯শে অক্টোবর ১৯৯৭**
বান্দরবানে সমাবেশ

### শান্তিচুক্তি প্রতিরোধে 'অশান্তি বাহিনী' গড়ে তোলা হবে —সা. কা. চৌধুরী

**বান্দরবান প্রতিনিধি :** সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী এমপি বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার যদি শান্তি বাহিনীর সঙ্গে অসমচুক্তির মাধ্যমে বাঙালিদের অধিকার পদদলিত করার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে সমধিকার প্রতিষ্ঠা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সারাদেশে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। প্রয়োজনে শান্তিচুক্তির প্রতিরোধে 'অশান্তিবাহিনী' গড়ে তুলতে আমরা বাধ্য হবো।

গতকাল মঙ্গলবার বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বরে জামাত, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি (জা-মো) সমর্থিত পার্বত্য জেলা সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের আয়োজিত মহাসমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী বলেন, আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর কিংবা শেখ হাসিনার অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে বসবাস করি না। বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে বসবাসের নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করি।

সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ নেতা জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপার (জা-মো) মৃদুল গুহ, জামাতকেন্দ্রিক নেতা মোমিনুল হক ও ডাঃ নাসিম বিশ্বাস।

**ভোরের কাগজ**
**৩০শে অক্টোবর ১৯৯৭**

### সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে ৩ পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন

**কাগজ ডেস্ক :** বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টি (জা-মো)-র সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকে গতকাল বুধবার রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহে সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে অসম চুক্তির প্রতিবাদে এবং শান্তি চুক্তি সংসদে উত্থাপনের দাবিতে ঐক্য পরিষদ এই হরতাল আহ্বান করে।



আমাদের রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি জানান, হরতালের সময় রাঙ্গামাটিতে যানবাহন এবং লঞ্চ চলাচল করেনি। স্কুল-কলেজ ও দোকানপাট বন্ধ ছিল। অফিস-আদালত, ব্যাংকসমূহে উপস্থিতি ছিল কম।

পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি এএসএম শহীদুল্লাহ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, হরতাল প্রমাণ করেছে সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বাঙালি স্বার্থ বিরোধী যে গোপন চুক্তি করতে যাচ্ছে তা পার্বত্যবাসী মেনে নেবে না।

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জানান, হরতাল চলাকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরসহ জেলার সর্বত্র দোকানপাট এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। দূরপাল্লার কোনো যানবাহন চলেনি।

বান্দরবান প্রতিনিধি জানান, হরতাল চলাকালে জেলা সদরের সঙ্গে সারাদিন সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ এবং কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। অফিস আদালত খোলা থাকলেও লোকজনের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

**ভোরের কাগজ**
**৩০শে অক্টোবর ১৯৯৭**

### ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসা শরণার্থীরা ইউপি নির্বাচনে ভোটার হবেন

**কাগজ প্রতিবেদক :** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ফিরে আসা উপজাতি শরণার্থীদের আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে।

জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া তালিকার ভিত্তিতে ফিরে আসা শরণার্থীদের জরুরি ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভোটার তালিকায় আন্তর্ভুক্ত শরণার্থীরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান বা মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য প্রয়োজনে তিন পার্বত্য জেলায় কিছুটা বিলম্বে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

**ভোরের কাগজ**
**৩১শে অক্টোবর ১৯৯৭**
**জুলুম থেকে বাঁচাও! শান্তি দাও!**
কথা কার্টুন
**-আনিসুল হক**

পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। সবুজ। ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে, কল্লোল তুলে। সবুজ পাহাড়ের গায়ে খেলছে একদল মানবশিশু। তাদের মুখে হাসি। শিশুর ঠোঁটে যে হাসি লেগে আছে শিশিরের মতো, তাতে কোনো মালিন্য নেই।

ঢাকায় বসে দুজন লোক সিঙ্গাড়া খাচ্ছে। তাদের ঢেঁকুর উঠলো। ঢেঁকুর তোলা হলে, তাদের মনে হলো, নাহ, একটা কিছু করা দরকার।

দিল্লিতে বসে দুজন লোক রুটি খাচ্ছে। রুটি খেতে গিয়ে তাদের পাঞ্জাবিতে ঝোল লেগে গেলো। তাদের মনে হলো, একটা কিছু করা দরকার।

কী করা যায়, বলো তো। ঢাকার লোক দুটো চিন্তা করতে করতে দুটো বাথরুমে ঢুকলো। বাথরুমে গেলে চিন্তার বন্ধদুয়ার খুলে যায়।

লোক দুটো দেখলো, বাথরুমের দেয়ালে পিঁপড়ে লাইন ধরে যাচ্ছে। মনের খেয়ালে দুটো লোক বদনার নলে বইয়ে দিলো পানির ধারা। পিঁপড়েগুলো ভেসে গেলো।

পিঁপড়ের জীবন হলো পিঁপড়ের জীবন। ভেসে গেলে কী এসে যায়।

দিল্লির লোক দুটো চিন্তা করতে করতে গেলো বারান্দায়। লাইন দিয়ে পিঁপড়ে যাচ্ছে। লাইনের একটা জায়গা ভেঙে দিলে কী হয়! লোক দুটো জুতোর তলায় পিষে মারলো কতোগুলো পিঁপড়ে।

পিঁপড়ের কান্না মানুষের কানে পৌঁছয় না।

পাহাড়ের গায়ে অরণ্যের বুকে কতোগুলো শিশু খেলছে। সহসা গুলির শব্দ। দাউ দাউ জ্বলে উঠছে অরণ্যকুটিরগুলো। শিশুর মুখের হাসিটুকু নিভে গেলো। ভয় আর ভয় শুধু তাদের মুখজুড়ে। কান্না আর আর্তনাদ আর বিলাপ।

গুলির শব্দ আসছেই।

মানুষ মারা যাচ্ছে।

গুলি এসে বিদ্ধ করছে শিশুর বুক, নারীর বুক। পালাও, পালাও। বনপোড়া হরিণীর মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে মানুষ। ওরা পিঁপড়ে নয়। ওদের কান্না নিঃশব্দতায় হারিয়ে যায় না।

সবে বিয়ে হয়েছে এই তরুণীটির। হাতে তার মেহেদীর রঙ। পত্রিকা দেখে হাতের তালুতে মেহেদীর আলপনা আঁকা হয়েছে। এতো সুন্দর হয়েছে এই সাজ, যে, মনে হচ্ছে, আহা, এই রকমভাবেই যদি হাতটা রেখে দেওয়া যেতো। চিরদিন।



বেড সাইড টেবিলে একটা ডাবল ফটোফ্রেম। নবদম্পত্তির ছবি। তরুণীটি তাকিয়ে দেখে। তার বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। স্বামীটি এখন তার পাশে নেই। বর গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। যুদ্ধে।

পোশাক খুলে ফেললে সৈনিকটি আর সৈনিক থাকে না। আমরা তাকে চিনতে পারি একজন হৃদয়বান মানুষ বলে। সেও মরতে চায় না। মারতে চায় না।

বহু বধূ হারিয়েছে তার স্বামীকে।

সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে গেছে অনেক রক্ত।

বাঙালি রমণী হারিয়েছে তার বাঙালি স্বামীটিকে।

পাহাড়ি রমণী হারিয়েছে তার পাহাড়ি স্বামীটিকে।

কে আছে এ পৃথিবীতে, শান্তি চায় না!

জিজ্ঞেস করুন আপনার বৃদ্ধা মাকে, তার ধবধবে শাদা চুল, চোখ কোটরাগত, চোখের চশমা খুলে আপনার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তিনি বললেন, শান্তিই তো চাই বাবা।

জিজ্ঞেস করুন আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে, সে শান্তি চায় কিনা! মাথায় দুটো বেণী, শাদা ফিতা, আঙুলের ডগায় জামার কোনা পেঁচাতে পেঁচাতে সে বলবে, হ্যাঁ, আমি শান্তি চাই বাবা ।

চিন্তা করতে পারেন, আপনার ছেলের লাশ কবরে নামাতে হচ্ছে আপনাকে, চিন্তা করতে পারেন রেপ্ড হচ্ছে আপনার স্ত্রী! বোন! কন্যা!

পিঁপড়ের কান্না মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না, কিন্তু মানুষের কান্নাও কি পৌঁছবে না মানুষের কানে!

হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন/ কান্ডারী বলো মরিছে মানুষ সন্তান মোর মার।

বাঙালি না পাহাড়ি, কে ওই প্রশ্ন তোলে? মানুষ, তুমি বলো, আমার মায়ের সন্তান মারা গেলে আমি কাঁদি।

গাছের গোড়া কেটে অন্যত্র তাকে পোঁতা হলে সে বাঁচে না।

লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করে অন্যত্র শরণার্থী শিবিরে রাখা হলে তাদের কী হয়? সবাই ভালোবাসে তার নিজস্ব বাসভূমিটুকুকে!

আমরা বাঙলার কৃষক আমরা শান্তি চাই।

আমরা বাঙলার শ্রমিক আমরা শান্তি চাই

আমরা বাঙলার সৈনিক আমরা শান্তি চাই।

আমি ঢাকার রিকশাঅলা, আমি শান্তি চাই।

আমি বরিশালের মাঝি, আমি শান্তি চাই।

শান্তি কে চায় না?

'জরিপে দেখা গিয়াছে, রাঙামাটি জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ৮৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ শান্তি চুক্তির পক্ষে। খাগড়াছড়িতে এই সংখ্যা ৯২ দশমিক ৩৪ শতাংশ, এবং বান্দরবানে ৮৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ। জরীপে জানান হয়, অনেকে বলিয়াছেন যে কোনো সুস্থ প্রকৃতির মানুষই শান্তি চুক্তির পক্ষে থাকিবেন। এবং এই চুক্তির বিরোধিতা করার কোনো যুক্তি নাই।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ অক্টোবর ১৯৯৭)

সবাই কি শান্তি চায়?

নিয়ামুদ্দীন কী বলেন?

"আমি ধরা পড়ি ৫ জুলাই (১৯৭১)। আমাকে ফজলুল কাদেরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফজলুল কাদেরের পুত্র সালাউদ্দিন (সা. কা, চৌধুরী), অনুচর খোকা, খলিল ও ইউসুফ বড়ো লাঠি, বেত প্রভৃতি হাতে আমাকে পিটাতে থাকে। পাঁচ ঘন্টা মারের চোটে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৬ জুলাই রাত্রি সাড়ে ১১টায় আমাকে স্টেডিয়ামে চালান দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, পানি পর্যন্ত না। পানি খেতে চাইলেও বলা হয়েছে : 'তুই শালা হিন্দু হয়ে গেছিস, তোকে পানিও দেওয়া হবে না।' ১৩ই জুলাই আমাকে জেলখানায় সোপর্দ করা হয়।"

(বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, মাহবুব উল আলম, পৃষ্ঠা ৬৯)।

এ বইয়ে আরো বলা হয়েছে, ১৩ এপ্রিল তারিখেই সালাউদ্দিন কাদেরের নেতৃত্বে ফকা চৌধুরীর গুণ্ডাবাহিনী গহিরার চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে তার পুত্র কলেজ ছাত্র ও ছাত্রকর্মী দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে ফেলে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৯৭ সালে এই সাকা চৌধুরী কী বলছেন?

'শান্তি চুক্তি প্রতিরোধে প্রয়োজনে অশান্তিবাহিনী গড়ে তোলা হবে'

-সা. কা. চৌধুরী (ভোরের কাগজ, ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭)

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে রাঙামাটির হুইপ মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আর বিশেষ অতিথি ছিলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী।

নিজামী বলেছেন, 'সরকারকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ববিরোধী পার্বত্য চুক্তি থেকে বিরত রাখতে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দলীয় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।' (ভোরের কাগজ, ২৮ অক্টোবর ১৯৯৭)

কে এই নিজামী? হ্যাঁ, ইনিই সেই আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর সংগ্রাম পত্রিকায়। তিনি লিখেছিলেন 'বদর দিবস, পাকিস্তান ও আলবদর' শীর্ষক এক রচনা। প্রায় একই রকম ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন সেই লেখাতেও।



'আলবদরের যুবকেরা এবার বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচি দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে।'

মতিউর রহমান নিজামীর সর্বাধিনায়কত্বে আলবদর '৭১-এ কী করেছিল?

১০ ডিসেম্বর '৭১ থেকে শুরু হয় বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ। কার্ফু ও ব্লাক আউটের মধ্যে আলবদররা দিনরাত বুদ্ধিজীবীদের বাড়িবাড়ি হানা দেয় কাদামাখা বাসে। বাসবোঝাই বুদ্ধিজীবীসহ বন্দিদের নেওয়া হয় মোহাম্মদপুরের ফিজিকাল ট্রেনিং সেন্টারে। সেখান থেকে, সবশেষে, তাদের নেওয়া হয় রায়েরবাজার ইটখোলায়।

মোহাম্মদপুর ও মীরপুর এলাকার বধ্যভূমিতে পড়ে থাকেন বুদ্ধিজীবীরা, চোখ বাঁধা, হাত মোড়ানো, লাশ হয়ে। পড়ে থাকেন সেলিনা পারভীন, সিরাজউদ্দিন হোসেন, মুনীর চৌধুরী। ডাঃ রাব্বী। ইয়াকুব আলী। ডাঃ আলিম চৌধুরী।

সা. কা. চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি- একই মঞ্চের। এরা গড়ে তুলতে চান অশান্তি বাহিনী।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে জালেমের জুলুমের থাবা থেকে রক্ষা করো।

**–আনিসুল হক : কবি, সাংবাদিক ও লেখক।**

**ভোরের কাগজ**
**৩১শে অক্টোবর ১৯৯৭**

## শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়িদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে

**–রাজা দেবাশীষ রায়**

ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সবচেয়ে বড়ো সম্প্রদায় চাকমাদের রাজা। পাহাড়ি জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় সবসময় তিনি উচ্চকণ্ঠ। পার্বত্য সমস্যার সমাধানে আগামী কিছুদিনের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি হতে যাচ্ছে তার প্রেক্ষাপটে পাহাড়ি-বাঙালিদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে তাঁর কথা হয়। নিজের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *সানাউল্লাহ*।

**ভোরের কাগজ :** সরকার ও জনসংহতি সমিতি আর কিছুদিনের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি করতে যাচ্ছে। যতোটুকু জেনেছেন তাতে কি পাহাড়িদের স্বার্থরক্ষা হচ্ছে বলে মনে করেন?

**দেবাশীষ রায় :** আসন্ন শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে স্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন বা পুনঃ প্রবর্তন হতে যাচ্ছে তার মাধ্যমে পাহাড়িদের কতোখানি স্বার্থরক্ষা হবে তা নির্ভর করবে পার্বত্য অঞ্চলের পরিষদসমূহের কাছে যে সব প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তার প্রকৃতি ও মাত্রার ওপর। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, আসন্ন চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়িদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

**ভো. কা. :** পাহাড়িদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন। এ রকম একটা ব্যবস্থা ছাড়া চুক্তি হলে পাহাড়িদের স্বার্থরক্ষা হবে না এমনও বলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এদের কেউ কোটি জনসংহতি সমিতিকে বিশ্বাসঘাতকও বলছে। বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

**দে. রায় :** রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে। ''পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন'' আকাঙ্ক্ষা করা ও বাস্তবায়ন করার মধ্যেও অনেক তফাত থাকতে পারে। চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বশাসন ব্যবস্থা পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে বেসরকারিভাবে জানা গেছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন পার্বত্য স্বশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে যে পাহাড়ি জনগণ খুশি হতো তা অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও পাহাড়ি সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ, তথা পার্বত্য অঞ্চলের সাংসদ থেকে শুরু করে হেডম্যান, বিভিন্ন পেশাজীবী, যুবক, ছাত্র বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়াকে জোরদারভাবে সমর্থন করছে। এ অবস্থায়, বাংলাদেশ সরকার এবং জনসংহতি সমিতি উভয়েই পাহাড়ি জনগণের মতামতকে শ্রদ্ধা করবে বলে সকলেই মনে করেন। এছাড়া পাহাড়ি জনগণ বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে শান্তি আলোচনার জন্য যথার্থ সময় বলেও মনে করে। সুতরাং সে জনমতকে শ্রদ্ধা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

**ভো. কা. :** প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির কারণে পাহাড়ে বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ-অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক দল এটাকে ইস্যু করছে। কতোটা যথার্থ এই অসন্তোষ?

**দে. রায় :** পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক চলমান শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বেশ সন্দিহান বলে শুনেছি। কিন্তু এই শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে কিছুদিন আগে খাগড়াছড়িতে হাজার হাজার বাঙালি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহা-শান্তি সমাবেশে যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে, তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালি জনগণ এই শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করছে। তাছাড়া বর্তমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তো আর একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার সমপরিমাণ ক্ষমতা পার্বত্য পরিষদসমূহের



কাছে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে না। কাজেই বর্তমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালিরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে–এরকম ধারণার কোনো ভিত্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

**ভো. কা. :** পাহাড়িদের সবচেয়ে বড়ো গোষ্ঠী চাকমা সম্প্রদায়ের রাজা হিসেবে শান্তিচুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

**দে. রায় :** আমি আশাবাদী যে, আসন্ন শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটা সুগম হবে। তবে পাহাড়িদের সব সমস্যা রাতারাতি সমাধান হবে না। পাহাড়িদের অনেক মৌলিক সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে হলে সময়ের প্রয়োজন এবং সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পার্বত্য অঞ্চলের ও পাহাড়ি জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না পাওয়ার সমস্যা এবং পাহাড়িদের ভূমি বেদখলের সমস্যা। তবে পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি ও বাঙালি বাসিন্দাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দায়িত্বশীলভাবে নেতৃত্ব দিতে পারলে এবং দেশের উদারপন্থী জনগণ একতাবদ্ধ হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যা অচিরেই সমাধান না হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।

**ভো. কা. :** রাজার ভূমিকা দিন দিন কমে আসছে। চুক্তিতে আপনি বা অন্য সম্প্রদায়ের রাজাদের অবস্থান কি হবে পরিষ্কার নয়। চাকমা রাজা হিসেবে আপনি কিভাবে বিষয়টি দেখছেন?

**দে. রায় :** সমাজ নিয়েই রাজা। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের কার্যপরিধি ও কার্যপন্থার বিবর্তন হওয়াটাও স্বাভাবিক। তা না হলে রাজাদের ও তাদের অঞ্চলের জনগণের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। আমি মনে করি, রাজাদের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে না। কেবল তাদের ভূমিকার পরিবর্তন হচ্ছে। পার্বত্য শাসনবিধি, ১৯০০ (Hill Tracts Manual)- এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপারে রাজাদের পরামর্শ প্রদানের বিধান। আমার জানা মতে, আসন্ন স্বশাসন ব্যবস্থায় তাদের পরামর্শ দেওয়ার বিধান বহাল থাকবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পুনঃসংজ্ঞায়িত হবে। তবে এই মতামতটা কেবল আমার ব্যক্তিগত। কারণ, আইনগত জটিলতার কারণে পার্বত্য অঞ্চলের অপর দুই রাজার আসন এখনো শূন্য রয়েছে।

**ভো. কা. :** ক'দিন আগে আপনার পিতা ত্রিদিব রায়ের একটি সাক্ষাৎকার পাকিস্তানের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার একটি পত্রিকায় তা অনূদিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখানে তিনি শান্তি প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আপনার কি মনে হয় ওনার সে সুযোগ আছে?

**দে. রায় :** আমার পিতা চাকমা রাজা হওয়া ছাড়াও সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক এবং জাতীয় পরিষদে তিনবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি যে তখন পার্বত্য এলাকার জনগণের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন, তা অনস্বীকার্য এবং আমার জানা মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ওনার এখনো অনেক প্রভাব রয়েছে। সুতরাং, পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা থাকলে ভালো হবে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন এবং আমিও তাদের সঙ্গে একমত। তবে এ প্রক্রিয়ায় সেই সুযোগ হবে কিনা আমি বলতে পারবো না।

**ভো. কা. :** দেখা যাচ্ছে ভূমি সমস্যা সমাধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতি এখনো একমত হতে পারেনি। সমস্যাটির গ্রহণযোগ্য সমাধান কিভাবে হতে পারে?

**দে. রায় :** পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিষয়ক সমস্যা ন্যায্যভাবে সমাধান করতে গেলে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভূমি অধিকারসমূহের (লিখিত আইনে ও প্রথাভিত্তিক আইনে) পূর্ণ স্বীকৃতি ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন। এই মর্মে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ব শ্রম সংস্থার আদিবাসী ও উপজাতীয় বিষয়ক ১৯৫৭ সালের ১০৭ নং Convention- এর দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পার্বত্য অঞ্চলকে ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত করার পর ১৮৭০-এর দশক থেকে পার্বত্য অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশকে সংরক্ষিত বন হিসেবে চিহ্নিত করে সেই অঞ্চলসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পাহাড়িদের আওতা ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৯৬০ সালে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে একটি বিশাল উপত্যকা অঞ্চলকে স্থায়ীভাবে জলমগ্ন করে হাজার হাজার পাহাড়িকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। এরপর ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু করে ৮০-র দশকের প্রথমার্ধে সমতল জেলা থেকে পার্বত্য অঞ্চলে সরকারিভাবে অভিবাসী পুনর্বাসিত করার ফলে হাজার হাজার পাহাড়ি জনগণের বাস্তুভিটা, ধান্যজমি, বন বাগান ও ফল বাগান দখলচ্যুত হয়। এ অবস্থায় ঐতিহাসিকভাবে পাহাড়িদের ভূমি হরণের প্রক্রিয়ার দিক পরিবর্তন করতে হলে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। তবে বর্তমানে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণ দ্বারা সমষ্টিগতভাবে ব্যবহার্য ও ব্যবস্থিত বনভূমি, জুমভূমি, পশুচারণভূমি, শ্মশানভূমি ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানায় যাতে না যায় তার জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।



**ভো. কা. :** চুক্তি সম্পাদনের পর বাস্তবায়নের প্রশ্ন আছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এক্ষেত্রে নানা সমস্যা তৈরি হয়। বিষয়টিকে ভালোভাবে তদারকি এবং সম্পাদনের জন্য কি করা উচিত?

**দে. রায় :** বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চুক্তিকে নিরপেক্ষভাবে Monitor ও Supervise করার অভাবে অনেক চুক্তি বিফল হয়ে গেছে ও বর্তমানেও যাচ্ছে। এ ব্যাপারে অনুষ্ঠিতব্য শান্তিচুক্তি সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য নিরপেক্ষ একটি তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নেওয়ার জন্য যারা যথাযোগ্য হবে বলে মনে করি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন বা তার অঙ্গ সংগঠন এবং জাতীয় ক্ষেত্রে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

**ভো. কা. :** আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

**দে. রায় :** আপনাকেও ।

**ভোরের কাগজ**
১লা নভেম্বর ১৯৯৭
পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণা জোরদার হচ্ছে

## পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া জনসংহতির কাছে পৌঁছেনি

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** সরকারের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির কাছে গতকাল ৩১ অক্টোবরের মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির খসড়া' পাঠানোর কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা পাঠানো হয়নি। তবে আগামী ১৬ নভেম্বর সরকার জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠেয় বৈঠক যথাসময়ে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পক্ষে বিপক্ষে প্রচারণা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির বৈঠক শেষে জনসংহতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রেস ব্রিফিংয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর করার ঘোষণা দেন। ঐ বৈঠকে সরকারের তরফ থেকে শান্তিচুক্তির খসড়া জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ১৬ অক্টোবর সরকারের কাছে পাঠানো সমিতির উর্ধ্বতন নেতা ঊষাতন তালুকদার স্বাক্ষরিত পত্রে ১৬ নভেম্বর পরবর্তী বৈঠক এবং ৩১ অক্টোবরের মধ্যে 'শান্তিচুক্তির খসড়া' পাঠানোর কথা বলা হয়।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। গতকাল শুক্রবার টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে হংসধ্বজ চাকমা জানান, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির খসড়া' এখনো তাকে দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি তিনি জানাতে অস্বীকার করেন। তবে ১৬ নভেম্বর পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে হংসধ্বজ চাকমা নিশ্চিত করেন।

এদিকে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির' পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামগুলোতে প্রতিদিন সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ–গণপরিষদ, জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গ সংগঠন গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রাপ), যুব সমিতি (যুস), পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতাকর্মীরা 'শান্তিচুক্তির' পক্ষে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন। অপরদিকে বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টি (জা-মো) সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ 'শান্তিচুক্তির' বিপক্ষে ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা সদরে সমাবেশ করেছে। আগামী ১১ নভেম্বর চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামের মহাসমাবেশে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও থানা পর্যায়ে সমাবেশ করার জন্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আগামী ৮ নভেম্বর রাঙ্গামাটিতে 'শান্তি সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা নাগরিক কমিটির আহ্বানে গতকাল স্থানীয় শিশু একাডেমি মিলনায়তনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা, সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, সাবেক মহিলা সাংসদ সুদীপ্তা দেওয়ান, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান, জাতীয় পার্টি জেলা সভাপতি মাওলানা শাহজাহানসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, যুব ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংঠনের নেতৃবৃন্দ এবং গ্রাম প্রধান কার্বারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার চলমান শান্তি সংলাপ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য রাঙ্গামাটির বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, ছাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেছেন। রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আজ বিকাল ৪টায় এ সভা অনুষ্ঠিত হবে।



**ভোরের কাগজ**

২রা নভেম্বর ১৯৯৭

**প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তি নিয়ে পাহাড়ি**
**বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক আশাবাদ**

**ইব্রাহিম আজাদ/আজিম উল হক, খাগড়াছড়ি থেকে :** সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির লক্ষ্যে আগামী ১৬ নভেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির পরবর্তী বৈঠক নিয়ে পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ প্রস্তাবিত এই শান্তিচুক্তির বিপক্ষে বাঙালিদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এজন্য আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন বয়কট করার বিষয়টি ঐক্য পরিষদ চিন্তাভাবনা করলেও নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহের কারণে তা বাদ দেওয়া হয়।

আগামী ১৬ নভেম্বর সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের বহুল প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গত ৩১ অক্টোবরের মধ্যে খসড়া শান্তিচুক্তির কপি জনসংহতি সমিতির কাছে না পৌঁছায় এ চুক্তি সম্পাদনের বিলম্বও হতে পারে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে সকলের ধারণা এবার অবশ্যই শান্তিচুক্তি হবে। তা ১৬ নভেম্বর বা পরবর্তীকালে অন্য কোনো বৈঠকেই হোক না কেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, প্রথম দিকে এ শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একটি অংশ অবস্থান নিলেও বর্তমানে তারাও এর পক্ষে অবস্থান নিয়ে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। শান্তিবাহিনী, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ পাহাড়িদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এখন এজন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ পাহাড়িরাও এ শান্তিচুক্তির পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে। খাগড়াছড়িতে ইতিমধ্যে পাহাড়ি-বাঙালি যৌথ শান্তি সম্মেলন হয়েছে। আগামী ৮ নভেম্বর রাঙ্গামাটিতেও এ ধরনের শান্তি সম্মেলন হবে।

এদিকে বাঙালিদের মধ্যে এ ব্যাপারে এক ধরনের বিভ্রান্তি ও শঙ্কা সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিচুক্তির বিপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ। এ পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্থানীয় বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ।

খাগড়াছড়িতে ৮৮টি গুচ্ছগ্রামে ২৬ হাজার পরিবারের ১ লাখ ২৫ হাজার বাঙালি বসতি স্থাপনকারী বাস করে। নিরাপত্তার কারণে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন স্থানের বাঙালিদেরকে এই গুচ্ছগ্রামে এনে রাখা হয়। তাদের পরিবারকে প্রতি মাসে ২১ কেজি করে গম দেওয়া হয়। শান্তিচুক্তি হলে এই গম দেওয়া বন্ধ

হয়ে যাবে এরকম বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা থেকেও এই বাঙালিদের অনেকে শান্তিচুক্তির ব্যাপারে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাছাড়া শান্তিচুক্তি হলে বাঙালিদেরকে একেবারে উচ্ছেদ করা হবে, সেনাবাহিনীও রাখা হবে না। এরকম প্রচারণায় এসব বাঙালিদের আতঙ্কিত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শান্তিচুক্তিতে কি আছে তা না জেনেই জাতীয় রাজনৈতিক কারণে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ এর বিরোধিতায় নেমেছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।

এদিকে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বয়কট করারও চিন্তাভাবনা করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। কিন্তু দেখা যায় সাধারণ মানুষ এ নির্বাচন নিয়ে তুমুল উৎসাহী। এজন্য ঐক্য পরিষদ এ বয়কটের চিন্তা বাদ দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসন মোহাম্মদ ঈসমাইল বলেন, শান্তি প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা খুবই ভালো। যখন এ প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন এতোটা ভালো ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষ নানা ধরনের অপপ্রচারণা প্রত্যাখ্যান করে শান্তিচুক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

**ভোরের কাগজ**

৩রা নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তি ❑ মুক্ত আলোচনায় অভিমত

**বিএনপি সরকারই পার্বত্য এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল**

**কাগজ প্রতিবেদক :** জনসংহতি সমিতির দাবির প্রেক্ষিতে বিএনপি সরকারই পার্বত্য এলাকা থেকে অস্থায়ী সামরিক ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চ আয়োজিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে এক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এই তথ্য দিয়ে বলেন, এখন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের বিরোধিতা করে তারা সবিরোধিতারই পরিচয় দিচ্ছে।

মুক্ত আলোচনায় বলা হয়, যখন বিরোধিতাকারীরা শান্তিচুক্তি হলে দেশের সার্বভৌমত্ব চলে যাবে এই হাস্যকর যুক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন তখন মনে হয় এরাই একাত্তরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজাকার-আলবদর তৈরি করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সূত্রপাতের ইতিহাস উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ব্রিটিশরা বা পাকিস্তানিরা যা করেছিল–আমরাও তাই করেছি। দেশের ১০ শতাংশ ভূখণ্ডের এক শতাংশ মানুষের হৃদয়ের কথা বুঝতে চেষ্টা করিনি।



বিশ শতকের শেষ ভাগে যখন বিশ্ব সংঘাতের পথ থেকে সরে আসছে তখন বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশ দৈনিক এক কোটি টাকারও বেশি খরচ করছে পার্বত্য এলাকায় সামরিক ব্যয় নির্বাহে। বক্তারা বলেন, যারা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেন তাদের জবাব দিতে হবে তারা এই খরচ অব্যাহত রাখতে চান কিনা? বিরোধিতাকারীরা যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারেন সেজন্য শান্তিচুক্তির অগ্রগতি জনসাধারণকে অবহিত করে খোলামেলা আলোচনার আহ্বান জানান তারা।

শান্তিচুক্তিকে শান্তি প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে বর্ণনা করে মুক্ত আলোচনায় বলা হয় এর যথার্থ বাস্তবায়ন করতে হলে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা দরকার। এজন্য প্রয়োজনে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

বক্তারা বলেন, '৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড যেমন বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে কালিমা লেপন করেছে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাও বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি স্থায়ী কলঙ্ক হিসেবে বিরাজ করছে। বক্তারা বলেন, অল্প কিছু লোক ছাড়া পাহাড়ি বাঙালি নির্বিশেষে সবাই শান্তির পক্ষে, শান্তিচুক্তির পক্ষে। সুতরাং পার্বত্য জেলাগুলোয় শান্তি অনিবার্য।

স্থপতি মাজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ড. আতিউর রহমান, শাহরিয়ার কবির, ড. ওশকত আরা হোসেন ও আবদুল কাইয়ুম। কাজী আরেফ আহমেদ আলোচনার সূত্রপাত করেন।

**ভোরের কাগজ**

৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৭

**শান্তিচুক্তি নিয়ে রাঙ্গামাটিতে বাঙালিদের মধ্যে অপপ্রচার, আতঙ্ক**

**ইব্রাহিম আজাদ/হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** শান্তিচুক্তি হলে বাঙালিদের উচ্ছেদ করা হবে, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার থাকবে না, শান্তিবাহিনীর সমস্ত সদস্যকে পুলিশে নিয়োগ দেওয়া হবে–এ ধরনের নানা প্রচার প্রচারণা চলছে রাঙ্গামাটিতে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যেও। এতে বাড়ছে আতঙ্ক এবং শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি। এ অবস্থা নিরসনে প্রশাসনিকভাবে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এদিকে প্রায় ৩০ হাজার অভ্যন্তরীণ উপজাতি শরণার্থীর পুনর্বাসন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

গতকাল সোমবার ঢাকা থেকে আগত জাতীয় দৈনিকের একদল সাংবাদিকের সঙ্গে এই প্রতিবেদকদ্বয়ও খাগড়াছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি যান। রাঙ্গামাটিতে স্থানীয় প্রশাসন, চাকমা রাজা, স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান এবং শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কথা হয়। এতে দেখা যায়, প্রায় সবাই শান্তির পক্ষে। তবে শান্তিচুক্তিতে কি কি থাকবে সে বিষয়ে বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এদিকে পাহাড়িদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি থাকলেও তা প্রবল নয়।

সরকারপ্রধান যেখানে বাঙালি উচ্ছেদ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেখানে কেন শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছেন সে প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটি জেলা জামাতের আমীর ও সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি এ এস এম শহীদুল্লাহ বলেন, আমরা অবশ্যই শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটাই মুখ্য। কারণ আমরা শুনতে পেয়েছি, শান্তিচুক্তি হলে বাঙালিদের উচ্ছেদ করা হবে। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। এখানে আসতে বাঙালিদের পাসপোর্ট ভিসা লাগবে ইত্যাদি।

রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জহির আহমদও এটাই সন্দেহের কারণ পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমরাও শান্তি চাই তবে কিভাবে শান্তিচুক্তি হবে সেটাই প্রশ্ন। অবশ্য তিনি সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য কেন্দ্র থেকে দলীয় নির্দেশের কথাও স্বীকার করেন।

রাঙ্গামাটি চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, সম্ভাব্য শান্তিচুক্তিতে বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে–এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এজন্য আমার কোনো সন্দেহ বা আতঙ্ক নেই।

রাঙ্গামাটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ বড়ুয়া বলেন, স্থানীয় সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বে প্রত্যেক থানায় শান্তির সপক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তবে তিনি অভিযোগ করেন, স্থানীয় কিছু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক তারা এ চুক্তির বিপক্ষে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা বলেন, আমরা শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছি।

শন্তিচুক্তির বিপক্ষে রাঙ্গামাটিতে গঠিত সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদে এরশাদের জাতীয় পার্টি নেই। এ সম্পর্কে জেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি মাওলানা শাহজাহান বলেন, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নির্দেশ না থাকায় সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদে যোগ দেব না।



রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দেওয়ান বলেন, আমি এক সময় শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্য ছিলাম। শান্তি চুক্তি হলে সেনাবাহিনীর পিছনে বর্তমানে যা ব্যয় হচ্ছে তা সাশ্রয় করে জাতীয় উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। রাঙ্গামাটির ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রাজ্জাক শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সরকারি বিভিন্ন প্রচারের বিষয়ে বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে সরকারের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তবে এ ব্যাপারে কেউ আমাদের সহযোগিতা চাইলে তা আমরা দিচ্ছি।

এদিকে ত্রিপুরা থেকে আগত উপজাতি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও অভ্যন্তরীণ প্রায় ৩০ হাজার উপজাতি পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ নেই। জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে বাঙালি-পাহাড়ি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজাতীয়রা পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নিলেও রাঙ্গামাটির দিকের প্রায় ৩০ হাজার উপজাতীয়রা ভারতে যায়নি। কাছাকাছি সীমান্ত না থাকায় তারা আরো গভীর জঙ্গলে রিজার্ভ ফরেস্টে চলে যায়। এখন তারা অসহায়ভাবে লংগদুদ, কাচালং রিজার্ভ ফরেস্টসহ বাগাইছড়ির প্রত্যন্ত এলাকা, সাজেক ভ্যালির গহিন অরণ্যে বসবাস করছে।

এ ব্যাপারে চাকমা রাজা দেবাশীষ বলেন, খাগড়াছড়ির সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে গঠিত শরণার্থী পুনর্বাসন টাস্কফোর্সে অভ্যন্তরীণ এই প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। আমি আশা করি সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা দেবেন।

**ভোরের কাগজ**

৮ই নভেম্বর ১৯৯৭

**পাহাড়ি-বাঙালিদের স্বার্থ অভিন্ন, সবাই এখন শান্তি চায় : সমীরণ**

**খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি :** খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান বলেছেন, পাহাড়ে অবস্থানরত পাহাড়ি ও বাঙালিদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। সকলেই এখন স্থায়ী শান্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর শান্তিকামী পার্বত্যবাসী শান্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এ মুহূর্তে আর কোনো সংঘাত নয়, ভুল বোঝাবুঝি নয়, প্রয়োজন অসীম ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা।

গতকাল দীঘিনালা থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চোংড়াছড়িতে এক শান্তি সভায় চেয়ারম্যান এ কথা বলেন। পাহাড়ি ও বাঙালিরা প্রমাণ দিয়েছে তারা শান্তিতে বাস করতে চায়।

## ভোরের কাগজ
## ৯ই নভেম্বর ১৯৯৭
## শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত

গতকাল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সরকার ঘোষিত ২০ দফা সুযোগ সুবিধা প্যাকেজের আওতায় ইতিপূর্বে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা এবং আগামী ২১ নভেম্বর যে সব উপজাতীয় শরণার্থী বাংলাদেশে আসছে, তাদের পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। তথ্য বিবরণী।

কমিটির চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং অন্যান্যের মধ্যে সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, খাগড়াছড়ির স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, রফিকুল আনোয়ার, বীর বাহাদুর, বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশনের মহাপরিচালক এম মোবাইদুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, টাস্ক ফোর্সের সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে চিফ হুইপ বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

## ভোরের কাগজ
## ৯ই নভেম্বর ১৯৯৭
## আজ রাঙ্গামাটিতে শান্তি সমাবেশ

**রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান শান্তি প্রক্রিয়ার সমর্থনে আজ রাঙ্গামাটিতে শান্তি সমাবেশ হচ্ছে। আসন্ন শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারের কারণে জনমনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের শান্তি সমাবেশের সমর্থনে শহর এলাকাসহ বিভিন্ন গ্রামে গত কয়েকদিন ধরে মাইকযোগে প্রচার ও মিছিল চলছে অব্যাহতভাবে। বিএনপি, জামাতের শান্তিচুক্তি বিরোধী তৎপরতার কারণে যে লোকজনের মনে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল তাদের অনেকেই এখন শান্তিচুক্তির সপক্ষে মিছিল



করছেন। শান্তির পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করতে প্রতিদিন লোকজন আসছেন নাগরিক কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে। রাঙ্গামাটি জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মাওলানা মোঃ শাহজাহান এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক উদয়ন বড়ুয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজকের শান্তি সমাবেশ সফল করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। রাঙ্গামাটি পুরাতন কোর্টি বিল্ডিং ময়দানে আজকের 'শান্তি সমাবেশে' প্রধান অতিথি থাকবেন ডাক, তার ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী মোঃ নাসিম। বিশেষ অতিথি থাকবেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, কল্প রঞ্জন চাকমা এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, মোশাররফ হোসেন এমপি, আতাউর রহমান খান কায়সার, জাতীয় পার্টির এমপি ফজলে রাব্বী, তিন জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, চিং কিউ রোয়াজা, থোয়াই চপ্রু মাস্টার ও চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান। এছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুব ইউনিয়ন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন।

## ভোরের কাগজ
## ১০ই নভেম্বর ১৯৯৭
## রাঙ্গামাটিতে হাজার হাজার মানুষের উৎসবমুখর শান্তি সমাবেশ
## পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বাঙালি সবাই থাকবে, সেনাবাহিনীও থাকবে : নাসিম

**প্রণব সাহা, রাঙ্গামাটি থেকে ফিরে :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আগামী ১৬ নভেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাব্য পটভূমিতে গতকাল রোববার রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত বিশাল শান্তি সমাবেশে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই চুক্তি হবে।

শান্তি সমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে টেলিযোগাযোগ ও পূর্তমন্ত্রী মোহম্মদ নাসিম বলেন, চুক্তি হলে বাংলার মানুষের উপকার হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি থাকবে, বাঙালি থাকবে, সেনাবাহিনীও থাকবে। অপ্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হবে না।

কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অভাবে বিএনপি শান্তি আনতে পারেনি। যাদের বুকে গুলি লাগে না তারাই আজ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে। রাঙ্গামাটি শহরের পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং মাঠে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

নাগরিক কমিটি। হাজার হাজার পাহাড়ি বাঙালি নর-নারীর উপস্থিতিতে আনন্দ উৎসব সুখ-শান্তি সমাবেশে মোহম্মদ নাসিম বিএনপির উদ্দেশে বলেন, সংসদে আসুন, প্রশ্ন করুন, শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সাংসদগণ জবাব দিবেন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে কি আলোচনা হচ্ছে। চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতেও আমাদের আপত্তি নেই।

নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য জাতীয় পার্টির হুইপ এডভোকেট ফজলে রাব্বী, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা, চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ বড়ুয়া, রাঙ্গামাটি জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মওলানা শাহজাহান, বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রহিম চৌধুরী, খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল আলম, যুব ইউনিয়ন নেতা দিলীপ দে, ইসলামী ফ্রন্টের নেতা বোরহান উদ্দিন, খোয়াই সংপ্রু প্রমুখ।

সমাবেশে মোহাম্মদ নাসিম আশা ব্যক্ত করে বলেন, চুক্তির পর শান্তির নীড় হবে পার্বত্য জেলাগুলো। সকলেই শান্তি চায়, শুধু শান্তি চায় না স্বাধীনতার বিরোধীরা।

তিনি বলেন, শান্তিচুক্তি হলে উপকার হবে বাংলাদেশের আর শত বছরের ঐতিহ্য নিয়ে পাহাড়ি বাঙালি বাস করবে পাশাপাশি। একই সঙ্গে পাহাড়িদের সংগ্রামের প্রতিও আমরা মর্যাদা দেবো। সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য বিএনপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রয়োজনে আগামীকালই জাতীয় কমিটির বৈঠক ডাকা হবে, সেই কমিটির বিএনপি দলীয় সদস্য আমির খসরু মাহামুদ ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম বৈঠকে উপস্থিত হলেই জানতে পারবেন কি ধরনের চুক্তি হতে যাচ্ছে। কমিটিতে না এসে, দায়িত্ব পালন না করে মাঠে বক্তৃতা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। দেশপ্রেম কারো একচেটিয়া নয় ।

সমাবেশে মতিয়া চৌধুরী বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে কর্নেল অলি ত্রিপুরায় গিয়ে সন্তু লারমাও শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যখন আলোচনা করেছেন তখনতো দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়নি, তবে এখন কেন সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে? তিনি বলেন, পাহাড়ি বাঙালি সবাই এই দেশের মানুষ, তারা সবাই শান্তি চায়। শান্তিচুক্তি এ দেশের মাটিতেই হবে, ভারতে নয়। মতিয়া চৌধুরী বলেন, আমরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পরও শান্তি



প্রক্রিয়া থেকে সরে যাইনি। কিন্তু বিএনপির দুজন এমপি জাতীয় কমিটিতে থাকা সত্ত্বেও কোনো বৈঠকে যোগ দেননি।

শান্তিচুক্তিকে সামনে রেখে গতকালের শান্তি সমাবেশ উপলক্ষে পাহাড়ঘেরা লেক বুকে ধারণ করা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ জনপদ রাঙ্গামাটিতে গতকাল ছিল একটি উৎসবের আমেজ। লঞ্চ, বাস, ট্রাকে করে তিনটি পার্বত্য এলাকা থেকে পাহাড়ি বাঙালিরা শান্তি সমাবেশে যোগ দেয়। মিছিলগুলোতে শ্লোগান ছিল পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই, শান্তিতে থাকতে চাই। মাঠের পাশে অবস্থিত গ্যালারিতে শাড়ি ও পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে নারীরা ছিলেন, পুরো মাঠ ভরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ঢালে বসে হাজার হাজার মানুষ শান্তি সমাবেশের বক্তাদের কথা শুনেছেন আগ্রহের সঙ্গে।

টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সমাবেশে বলেন, শুধুমাত্র তিনটি পার্বত্য জেলার টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তুমুল করতালির মধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলায় অবিলম্বে আইএসডি কার্ডফোন স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, উন্নয়ন সবই হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পাহাড়ি বাঙালি উভয়ই বুকের রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে আর আজ স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ দেখায় স্বাধীনতা বিরোধী নিজামী আর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী।

**ভোরের কাগজ**

**১১ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করা যুদ্ধাবস্থা ডেকে আনার শামিল : প্রধানমন্ত্রী**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখানকার উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে অচিরেই একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে। তিনি বলেন, স্বাক্ষর হওয়ার আগে সাধারণত কোনো শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয় না, আর কোনো শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করা যুদ্ধাবস্থা ডেকে আনার শামিল। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম সেনানিবাসে রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসারদের এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঐ কথাগুলো বলেন। বাসস ও ইউএনবি।

সম্মেলনে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি)-এর রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসার এবং অন্য উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সংহতি

ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে এবং ইনশাল্লাহ খুব শিগগিরই সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে যখন একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পথে, ঠিক তখন একটি বিশেষ মহল সেটা বানচালের চেষ্টা করছে। তারা নানা রকম অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে।

তিনি বলেন, এ রকম একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য বিগত সরকার ভারতে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি ১৩টি বৈঠক করেছে। তিনি বলেন, কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি ছিল। তারা কখনো শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেনি। বর্তমান কমিটিতেও বিরোধীদলীয় সদস্য রয়েছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তি সম্পর্কে রিরোধী দলের কিছু জানার থাকলে, তাদের সদস্যদের কাছ থেকেই তা জেনে নিতে পারেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হলেই কি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়? তাহলে কি গোলযোগ-সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলেই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকে?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ সংঘর্ষ ও আত্মঘাতী যুদ্ধের অবসান চায়। আমরাও চাই না আর কোনো ভাইয়ের রক্তে পাহাড়ি মাটি রঞ্জিত হোক। আমরা চাই, এখানকার পাহাড়ি-অপাহাড়ি, উপজাতি-অউপজাতি–সকল অধিবাসী মিলেমিশে থাকুক।' পার্বত্যাঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী পুনরুল্লেখ করেন। পার্বত্য এলাকার অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ এলাকার উন্নয়নের জন্য এসব সম্পদ ব্যবহার করা হবে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরই এখানে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের মতো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জোয়ার বয়ে যাবে। এর পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচিগুলোও বাস্তবায়ন করা হবে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম সেনানিবাসের প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছলে তাকে অভ্যর্থনা জানান সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমান, চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আব্দুল মতিন ও ইবিআরসি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহাঙ্গীর কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীবর্গ, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র, সংসদ সদস্যগণ, বিমানবাহিনীর প্রধান, উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পরে প্রধানমন্ত্রী মেজর কে এ খালেক চত্বরে তার সম্মানে আয়োজিত এক 'প্রীতি ভোজে' ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দেন।



**ভোরের কাগজ**

**১১ই নভেম্বর ১৯৯৭**

## পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনে স্বচ্ছতাই একে সবার গ্রহণযোগ্যতা দিতে পারে –রাশেদ খান মেনন

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি নিয়ে ধুন্ধুমার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। না, অস্ত্রের যুদ্ধ নয়। গত ছয় বছর যাবৎ শান্তিতে অভ্যস্ত পাহাড়ি-বাঙালি কেউই আর পূর্বের সংঘাত-আর সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে চায় না। বিভিন্ন জনমত জরিপে যে কেবল এর প্রতিফলন ঘটছে তাই নয়, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি-উপজাতি নির্বিশেষে যে কোনো নাগরিকের সঙ্গে আলাপ করলেই এ সত্যটি পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসবে। বরং পার্বত্য অধিবাসী সবাই নিদারুণভাবে উৎকণ্ঠিত কোনো কারণে যাতে এই শান্তি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন না ঘটে। এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই নয়, অন্যদের অভিজ্ঞতাও তাই-ই।

কিন্তু তারপরও পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে বেশ ভালোভাবেই উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং এই পার্বত্য সম্যসার মূল কেন্দ্রভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা, বিশেষ করে খাগড়াছড়িতে এই উত্তাপ বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই তিন জেলায় বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টির দলছুট অংশ-এর উদ্যোগে 'সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ' গঠন করে হরতাল, অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির সমাবেশে মুসলিম লীগ-টার্নড জাতীয় পার্টি-টানর্ড-বিএনপি নেতা সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী 'শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অশান্তিবাহিনী' গঠনের হুমকি দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বোঝা যায়। কিন্তু '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি নতুন করে এই শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করলেও তারাই এখন ঐ শান্তি প্রস্তাব, এমনকি শান্তি প্রক্রিয়ার চরম বিরোধিতা করছে এই বলে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা হলে দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়ে যাবে। কেবল তাই নয়, বেগম খালেদা জিয়া নিজ মুখে বলেছেন, এই শান্তি চুক্তির খসড়া ভারতে হয়েছে। সুতরাং এই চুক্তি তারা মানবে না। ১১ নভেম্বর চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়াম থেকে ঐ চুক্তি সম্পাদন বন্ধ করার লক্ষ্যে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জামাতের গোলাম আজমও বিএনপির মতো একই ভাষায় বলেছে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদন হলে দেশের অখণ্ডতা নষ্ট হবে। বিএনপি শাসনামলে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও শান্তি আলোচনা

সুনির্দিষ্ট করণের জন্য গঠিত উপ-কমিটিতে জামাতে ইসলামির সাংসদ শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

জাতীয় পার্টির নেতা জেনারেল এরশাদ একইভাবে বলেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হলে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে এবং জাতীয় পার্টি ঐ প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করবে।

পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে এরশাদের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। কারণ তার সময়কালেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে চূড়ান্তভাবে সামরিকীকরণ করা হয়। তার পরিচালিত সামরিক সমাধানের ফলশ্রুতিতে মধ্য-আশিতে বিপুল সংখ্যক পার্বত্যবাসী চাকমা অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তা দেশ ছেড়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত জাতীয়-আন্তর্জাতিক চাপে পার্বত্য তিনটি জেলায় 'স্থানীয় সরকার' গঠন করার মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকার ঐ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান এভাবে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলেও, জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্যবাসীদের সেটা মানাতে পারেনি। বরং তার উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সাবেক সাংসদ উপেন্দ্রলাল চাকমা এর পরপরই দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন এবং তার সঙ্গে আরো বিপুল সংখ্যক পার্বত্যবাসী ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। এই উপেন্দ্রলাল চাকমাই ভারতে বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানকারী শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার বিরাগ থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া বিএনপি শাসনামলে গঠিত জাতীয় কমিটিতে তাদের দলের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কিন্তু বর্তমান কমিটিতে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিত্ব রয়েছেতো বটেই, তদুপরি তার দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের 'জাতীয় ঐকমত্যে'র সরকারেরও অংশীদার। সুতরাং অন্যরা কেউ না জানলেও বর্তমানে শান্তি চুক্তি কি হচ্ছে সেটা এরশাদের জানার কথা। আর সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার বা বাঙালিদের বিতাড়ন করা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণার পরও তার এই বিরোধিতার অন্য উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।

এদিকে সরকার পক্ষও চুপ করে বসে নেই। সরকারি দলের তরফ থেকে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির সপক্ষে প্রচার করা হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার যুক্তরাজ্য সফরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি সম্পাদনকে তার সরকারের অন্যতম সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এর বিরোধিতা করার দরুন বিরোধী বিএনপিকে অভিযুক্ত করেছেন।

কিন্তু এই শান্তি চুক্তির মধ্যে কি আছে, দেশের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো বিধি আছে কি না, এবং সর্বোপরি, এই শান্তি চুক্তি পার্বত্যবাসী সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রত্যাশা পূরণ ও সেখানে দীর্ঘদিন



যাবৎ বসতকারী বাঙালিদের স্বার্থ বিশেষ করে নিরাপত্তার স্বার্থ পূরণ করবে কি না, এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। যারা এই শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের যুদ্ধংদেহি অবস্থান নিচ্ছে তারা কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলছে, অথবা যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান আন্তরিকভাবে চান তারাই বা কোন ভিত্তিতে এটা সমর্থন করতে পারেন সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। কারণ কাউকে কিছু জানানো হচ্ছে না। তাহলে না জেনে হাওয়ার ওপর এই গদা ঘোরানো কেন? তাছাড়া বিএনপি বিশেষ করে এই শান্তি প্রক্রিয়া ও শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারে না এ কারণে যে, বিএনপি শাসনামলেই এই শান্তি প্রক্রিয়ার শুরু এবং দীর্ঘ দেড় দশক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর ঐ শাসনামলেই উভয়পক্ষের অস্ত্র সংবরণের মধ্য দিয়ে ঐ সংঘাতের অবসানের এই সূত্রপাত ঘটে। বস্তুত বিএনপি শাসনের যেটুকু সাফল্য রয়েছে তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত বন্ধ করে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করা অন্যতম। এটা ঠিকই বিএনপি সরকারের মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি শান্তি আলোচনাকে শান্তি চুক্তিতে রূপ দিতে পারেনি, কিন্তু প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি না দেখেও বলা যায়, ঐ আলোচনার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হতে চলেছে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক ঐ জাতীয় কমিটি ও উপ-কমিটির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নিবিড় আলোচনার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে সূত্রগুলো নির্ধারণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে–(১) পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী সংখ্যালঘু জাতসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের স্বকীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের প্রশ্ন, (২) পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন ও সমগ্র ব্যবস্থার বেসামরিকীকরণ এবং স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকারসমূহকে প্রকৃত অর্থেই রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর (devolution), (৩) পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণের ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও (৪) ১৯৭৯-এর পর বিদ্রোহ দমন পরিকল্পনায় (কাউন্টার ইনসারজেন্সি স্ট্রাটেজি) বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের সম্পর্কে সমঝোতায় উপনীত হওয়া।

এই সমাধান সূত্র অনুসারে একটি শান্তি ব্যবস্থায় উপনীত হলে শান্তিবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে এবং সেনাবাহিনী যুদ্ধাবস্থা থেকে শান্তি অবস্থায় রুটিন কাজে ফিরে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র বাহিনী অর্থাৎ শান্তিবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হবে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ক্যাম্পসমূহও থাকবে না। এই সহজ-সরল সত্যটি যে ঐ শান্তি চুক্তি কার্যকর করা ও বাস্তবায়নের আবশ্যিক শর্ত, সেটা না বোঝার মতো বোকা কেউ নয়।

সুতরাং এক নিঃশ্বাসে বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করার কথা বলা, আর অন্য নিঃশ্বাসে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা যাবে না' বলে চিৎকার–একেবারেই স্ববিরোধী। বিশেষ করে যখন কেউ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ক্যান্টনমেন্ট সরিয়ে আনতে বলছে না। আর ক্যান্টনমেন্টের প্রশ্নই যদি ওঠে তাহলে সামরিক খাতে ব্যয় কমানোর জন্য সারা দেশে সেনাবাহিনী ও সেনাছাউনী কমিয়ে আনার কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। সে দাবি তোলার রাজনৈতিক সাহস এসব দলের নেই। বরং সেনাবাহিনীকে কিভাবে খুশি রাখা যাবে সেটাই তাদের চিন্তা। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনার যে কথা বলা হচ্ছে তা ক্যান্টনমেন্টকেন্দ্রিক রাজনীতিকেই কেন্দ্র করে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ঐ একই লক্ষ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না বলে সবাইকে আশ্বস্ত করছে।

আসলে এ দেশের বড়ো লোকের দলগুলো জন ও জাতীয় জীবনের মূল ইস্যুসমূহ বাদ দিয়ে এ ধরনের হাওয়াই কথা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের ক্ষমতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। সে কারণে দেখা গেছে যে, বিএনপি শাসনামলে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি অংশ নিলেও এমনকি সংসদে ঐ অঞ্চল থেকেই তাদের দল থেকে তিনজন সাংসদ থাকলেও, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা কি হবে এ সম্পর্কে বারবার মত জানতে চেয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। আজকের প্রধানমন্ত্রী এবং সেদিনের বিরোধী দলের নেত্রীর সংসদে অথবা বাইরে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান কেউ দেখাতে পারবে না। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার নির্বাচন ঐ আলোচনার স্বার্থে স্থগিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন চেয়ে বিএনপি সরকার কর্তৃক সংসদে আনীত বিলের আলোচনার কার্যবিবরণী (সংসদ প্রসিডিংস) দেখলে দেখা যাবে, আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা–যাদের মধ্যে বর্তমানের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও রয়েছেন–তারা শান্তিবাহিনীকে ভারত-আশ্রিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল বলে আজকের বিএনপির মতো একই ভাষায় অভিযুক্ত করেছে এবং তাদের মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা ও অপারগতার তীব্র সমালোচনা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম সূত্র অর্থাৎ পার্বত্যবাসী সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান সম্পর্কে সে সময়কার বিরোধী দল আওয়ামী লীগ কোনো কথা বলতে রাজি ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ঐ মর্মে সংবিধান সমাধানের জন্য যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন তা বিএনপির না থাকায় এ বিষয়টি



তারা ঐ অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। বর্তমান শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়ায় এই প্রশ্নে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি একই কারণে শান্তি চুক্তিতে বিধিবদ্ধ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং এই শান্তি চুক্তির যদি বিরোধিতা আসতে হয় তবে আসতে হয় পাহাড়িদের তরফ থেকে। তারা বরং বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি মেনে নিয়েছে বলেই মনে হয়।

অবশ্য চুক্তিতে কি কি বিষয় আছে সেটা আমার জানা নেই। অন্যদেরও জানা নেই। আসলে যদি এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি উত্থাপন করতে হয় সেটা করতে হয় শান্তি চুক্তি নিয়ে এই ঢাক-গুড়গুড় করা নিয়ে। এ ধরনের একটি জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে অজ্ঞ রেখে কোনো চুক্তি সম্পাদন করা ঠিক না। পরবর্তী সময়ে ঐ চুক্তি প্রকাশ করা হলেও চুক্তি সম্পর্কে পূর্ব-সৃষ্ট বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও আবিশ্বাস থেকেই যাবে। কেউ বিস্তারিত বিষয়ে যেতে চাইবে না। আর এ ধরনের একটি চুক্তি যদি দেশবাসী গ্রহণ না করে তাহলে কোনো সরকারের পক্ষ থেকে সেটা স্বাক্ষর করাই যথেষ্ট নয়। চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাও একই সময় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এ কারণে চুক্তির খসড়া প্রকাশ করা উচিত। বিশেষ করে সংসদের আলোচনা, প্রচারমাধ্যমসমূহে বিতর্ক ও সর্বোপরি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য এর মৌল বিষয়সমূহ প্রকাশ করতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

কিন্তু যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এর উল্টা কথা। তিনি বলেছেন, শান্তি চুক্তি আগে প্রকাশ করা হলে জটিলতা সৃষ্টি হবে। বাংলায় বলে–আগে তিতা, পরে মিঠা। জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে আগে হওয়াই ভালো। তাতে জটিলতা দূর করা সহজ হবে। কিন্তু শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর জটিলতা সৃষ্টি হলে সেটা সমগ্র শান্তি প্রক্রিয়াকেই বিপদগ্রস্ত করে ফেলতে পারে।

তাছাড়া এ ধরনের ইনসারজেন্সি বা কোনো জাতিসত্তা বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বশাসনের অধিকারের দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনা এই অঞ্চলে নতুন নয়। পাশের দেশ ভারতে বিভিন্ন সময় নাগা বিদ্রোহ, মিজো বিদ্রোহ, আসাম, পাঞ্জাব, দার্জিলিং-এর সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং এখনো করতে হচ্ছে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী ঐ সকল শান্তি আলোচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের মতামত নিয়েছে, ঐ আলোচনার অগ্রগতি রিপোর্ট করেছে, সংসদকে সব সময় অবহিত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময় পাঞ্জাব ও আসাম সমস্যার সমাধান নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তার ও তার সরকারের আলোচনার

খবর এ দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ও দেশের সংবাদপত্রসমূহ প্রস্তাবিত শান্তিসমাধানের মৌল বিষয় নিয়ে কেবল রিপোর্ট করেছে তাই নয়, তাদের পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্যও করেছে।

সুতরাং এখানেও বর্তমান শান্তি চুক্তি আলোচনার বিষয়বস্তু, তার অগ্রগতি দেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন ছিল। এটি আরো বিশেষভাবে প্রয়োজন এই কারণে যে, এ নিয়ে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ইতিমধ্যে শুধু আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে তাই নয়, এই ঘটনার রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কার্যকরভাবে হ্যাণ্ডেল করা না গেলে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নয়, সারা দেশের পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়বে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসনের একটা দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা এই দেশকে, তার লাভালাভের বিষয়টিকে তাদের নিজস্ব একার সম্পত্তি বলে মনে করে। দেশটা যে সবার এই সহজ-সরল সত্যটি তারা স্বীকার করতে চায় না। আর তাদের নিজেদের মঙ্গলকেই দেশের মঙ্গল বলে তারা বিবেচনা করে। দেশের বিভিন্ন অংশের মতামতকে আস্থায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা তাদের রীতিবিরুদ্ধ। বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সরকার নিজদের জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে দাবি করলেও বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ঐকমত্য সৃষ্টি করার কোনো উদ্যোগ গত ১৬ মাসের শাসনে গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সংক্রান্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও নয়। সরকার পক্ষের লোকরা অবশ্য দাবি করবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি আলোচনাবিষয়ক কমিটিতে বিরোধী দল বিএনপির প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে এবং তারা কোনো বৈঠকে উপস্থিত হয়নি। কথাটা সত্য নিঃসন্দেহে। আগেই বলা হয়েছে যে, শান্তি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত বিএনপির আমলে। সেই শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা দূরে থাক, বিএনপি এখন সেই শান্তি প্রক্রিয়াকেই বিরোধিতা করছে।

কিন্তু, এটাও সত্য যে, আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বিএনপি বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের এই সম্পর্কে মতামত একবারও জানতে চওয়া হয়নি। বর্তমানের পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক কমিটি পূর্বতন কমিটির কাছ থেকে তাদের জানতে চায়নি। আসলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ দেখাতে সচেষ্ট যে তাদের প্রচেষ্টাতেই শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হতে চলছে। সুতরাং এর সাফল্যের সবটুকু দাবিদার তারাই। কিন্তু এই সাফল্যের সঙ্গে যে অসাফল্যের ও অন্যান্য সকল অসুবিধার দায়ভারও বহন করতে হয় সেটা তারা ভুলে যায়। গঙ্গা চুক্তি করার সময়ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতামতকে আস্থায় নেয়নি। অথচ ভারত কেবল বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকেই নয় সংসদকেও সব সময় ঐ চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে অবহিত রেখেছে।



কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে যা পরিণতি লাভ করেছে তার আশু সমাধানই সকল সচেতন ও গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তির কাম্য হওয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাত-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি দেশের উপকারের চাইতে অপকারই করছে বেশি। তার চাইতে বড়ো কথা যে, বাঙালি জাতি তার নিজের জাতিসত্তার স্বীকৃতির জন্য, তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ ২৫ বছর আন্দোলন করেছে। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। স্বাধীনতার উষালগ্নেই তাদের উচিত ছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সেই দেশের সংবিধানে তার নিজ ভূমির সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া।

শুরুর সেই ভুল সামরিক শাসনের দীর্ঘদিনের শাসনের কারণে শোধরানো যায়নি। '৯০-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর সেই লক্ষ্যে যখন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তখন সবার উচিত তাকে একটি যোগ্য পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া। ক্ষমতায় কে ছিল বা আছে সেটা বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়, বিবেচ্য বিষয় একটাই–আমরা আমাদের দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবো। বাঙালি-সংখ্যালঘু জাতিসত্তা নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে বাস করবে। সেই শান্তি নিশ্চিত করতে, শান্তি প্রক্রিয়ায় জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আনতে কোনো কিছুই গোপন করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এটাই দাবি করে। ১৬ নভেম্বর যদি নাও হয় তারপরে হলেও এই শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে, এটা আশা করা বেশি না। এক্ষেত্রে ঐ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সেই শান্তি চুক্তিকেই দৃঢ় ভিত্তি দেবে।

৪.১১.৯৭

**রাশেদ মেননঃ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক; সাবেক সাংসদ**

**ভোরের কাগজ**

১২ই নভেম্বর ১৯৯৭

চট্টগ্রামে মহাসমাবেশে খালেদা জিয়া

**পার্বত্য শান্তিচুক্তি হলে সেই দিনই**
**সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল**

**চট্টগ্রাম অফিস :** পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সেই দিনই সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল হবে বলে ঘোষণা দেন সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ থেকে তিনি এ ঘোষণা দেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে 'রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব ও সংবিধান বিরোধী' বলে আখ্যায়িত করে এর প্রতিবাদে বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো এ সমাবেশ ডেকেছে।

উল্লেখ্য, চুক্তির লক্ষ্যে আগামী রোববার ঢাকায় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারি জাতীয় কমিটির চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈঠক শুরু হতে যাচ্ছে।

চট্টগ্রামবাসীকে উদ্দেশ্য করে সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে খালেদা জিয়া বলেন, জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন আমি আপনাদের কাছে এসেছি দেশরক্ষার জন্য। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে চট্টগ্রাম শহর, বন্দর, কাপ্তাই ও রাউজান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর আপনাদের হাতে থাকবে না।

শান্তি চুক্তির প্রক্রিয়াকে বিরোধীদলীয় নেত্রী 'ভারতের হাতে দেশ বিক্রি করার ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করে আরো বলেন, 'প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো পার্বত্য চট্টগ্রামকে রক্ষা করবো।' উপস্থিত শ্রোতাদের চুক্তি মানবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তারা সমস্বরে 'না' বলে জবাব দেয়।

সম্মিলিত বিরোধী দলের ব্যানারে আয়োজিত এ সমাবেশের উদ্যোক্তা বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো। নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ের পাশে আউটার স্টেডিয়ামে হাজার হাজার লোকের এ বিরাট সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি (জা-মো) কো-চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমেদ, জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, এনডিএ চেয়ারম্যান এএসএম সোলায়মান, বিএনপি'র কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহ আল নোমান, মঞ্জুর মোর্শেদ খান এমপি, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি প্রমুখ। এতে সভাপতিত্ব করেন মহানগর বিএনপি সভাপতি মীর নাছির।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'গোপন চুক্তি সম্পাদনের' অভিযোগ এনে খালেদা জিয়া আরো বলেন, ভারতের স্বার্থে তারা এসব চুক্তি করছে। ৩০ বছরের ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদন হলেও পানির ন্যায্য হিস্যা বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী না।

শেয়ার বাজারের ধস, গার্মেন্টস, চিংড়ি, চামড়া ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে খালেদা জিয়া আরো বলেন, এ মাটির প্রতি বর্তমান সরকারের কোনো দরদ নেই। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্য আমাদের সময়ে সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম। বর্তমান সরকার তুলা ও সুতাসহ সকল টেক্সটাইল পণ্যের ওপর নতুন করারোপ করেছে। বাংলাদেশের চিংড়ি এখন ভারত হয়ে বিদেশে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এ সরকার ভারতের তাঁবেদার সরকার।



হরতাল পালনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে খালেদা জিয়া বলেন, দেশ ও জনগণের স্বার্থে আমরা হরতাল দিয়েছি। এ পর্যন্ত আমরা ৪ বার হরতাল দিয়েছি আর আমরা ক্ষমতা থাকাকালে তৎকালীন বিরোধীদল হরতাল পালন করেছে ১৭৩ বার।

আগামী ১৬ তারিখে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরকার ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন খালেদা জিয়া। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর সকল স্থায়ী-অস্থায়ী ক্যাম্প তুলে না আনার কথাও বলেন এ সময়ে। সংবিধানের আওতায় শান্তিচুক্তি করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যথায় জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য ভবিষ্যতে আরো কঠিন কর্মসূচি দেবো। সমাবেশের বক্তব্যে জাতীয় ঐক্যের মঞ্চ আখ্যায়িত করে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী জাফর বলেন, ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে সরকার দেশ বিকিয়ে দিচ্ছে।

জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, শান্তিচুক্তি হলে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। এর ফলে বাংলাদেশের এক-দশমাংশ ভারতের হাতে চলে যাবে। এ চুক্তি আমরা মেনে নেবো না। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে যে কর্মসূচি দেবেন তা রক্ত দিয়ে বাস্তবায়ন করবো, প্রয়োজনে যুদ্ধ করবো।

**ভোরের কাগজ**

**১২ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**বান্দরবানে আজ**
**শান্তি সমাবেশ**

**বান্দরবান প্রতিনিধি :** পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার সপক্ষে বান্দরবানে আজ বুধবার শান্তি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে আয়োজিত এ মহাসমাবেশে প্রধান ও বিরোধী অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডাক, তার, টেলিযোগাযোগ, গৃহায়ণ ও পূর্তমন্ত্রী মোঃ নাসিম ও কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, চট্টগ্রামের মেয়র আলহাজ এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, খ ম জাহাঙ্গীর এমপি, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাংসদগণ।

## ভোরের কাগজ
## ১৩ই নভেম্বর ১৯৯৭
## স্বাক্ষরের পরে শান্তিচুক্তি সংসদে উত্থাপন করা হবে : নাসিম

*বান্দরবানে বাঙালি মারমা তঞ্চঙ্গা মুরং বোম পাংখোসহ বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের অভূতপূর্ব মিলনমেলা*

**হরি কিশোর চাকমা/বুদ্ধ জ্যোতি চাকমা, বান্দরবান থেকে :** ডাক তার, টেলিযোগাযোগ, গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা সংসদে উত্থাপন করা হবে। তখন দেশবাসী জানতে পারবেন চুক্তিতে কি আছে না আছে।

খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, '৭১-এর রাজাকার আলবদরদের দিয়ে বাঙালি স্বার্থ রক্ষা হবে না। পাহাড়ি-বাঙালি এক সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করলে উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হবে।

গতকাল বুধবার বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত পাহাড়ি-বাঙালির বিশাল শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রীদ্বয় এ কথা বলেন।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি জাতি বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাহাড়ি-বাঙালি, মারমা, তঞ্চঙ্গা, মুরং, বোম, পাংখোসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষ-মহিলা সকাল থেকে পাহাড় ঘেরা বান্দরবান শহরের দিকে উৎসবমুখর পরিবেশে স্রোতের মতো আসতে থাকেন। সবাই এক সঙ্গে স্লোগান দিয়েছেন 'পাহাড়ি-বাঙালি ভাই ভাই এক সঙ্গে থাকতে চাই', 'শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মানি না মানবো না।' এ সময় প্রেসক্লাব চত্বর, বাজার সড়ক ও সার্কিট হাউস সড়ক লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। আশপাশে বাড়ির ছাদ থেকেও লোকজন উপস্থিত নেতাদের দেখেন এবং বক্তব্য শোনেন।

বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে মন্ত্রী মোহাম্মদ নসিম আরো বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে পাহাড়ি-বাঙালি সেনাবাহিনী যার যার অবস্থানে থাকার ব্যবস্থা থাকবে। পাহাড়িরা অতীতে যে মর্যাদায় ছিলেন তা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিএনপি জামাতের শান্তিচুক্তির বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি যদি আসে তাহলে যারা অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে না, মাদকদ্রব্য, সোনা চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন তারাই শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে। মোহাম্মদ নাসিম আরো



বলেন, বাঙালি-পাহাড়ি শত বছর ধরে এই পাহাড়, সমুদ্র, বনাঞ্চলে এক সঙ্গে বসবাস করছেন। তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনবো। কারণ আমরা আর চাই না বাঙালির অস্ত্রে পাহাড়ি জীবন দিক, আর পাহাড়ির অস্ত্রে বাঙালি জীবন দিক। মন্ত্রী বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। অতীতে এরশাদ সরকার, বিএনপি সরকারকে করেছে। আমরা কয়েকদিনের মধ্যে শান্তিচুক্তি করবো। সবাই শান্তিতে বসবাস করবো।

খাদ্য, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী, আনোয়ার জাহিদ এখন বাঙালি স্বার্থের কথা বলছে। এরাই '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে। মা-বোনের ইজ্জত ছিনিয়ে নেওয়া পাক-হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকার গোপন চুক্তি করছে বলে বিএনপির অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মতিয়া চৌধুরী বলেন, বিএনপির দুজন সংসদ সদস্যকে কমিটিতে রাখা হলেও তারা একটি বৈঠকেও যাননি। বৈঠকে না গিয়েই বলছেন গোপন চুক্তি, এটাতো হয় না। তারা ইচ্ছে করলে এখনো বৈঠকে যোগ দিতে পারেন। আর শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা যদি সংবিধান বিরোধী হয় তাহলে আপনারা কেন আলোচনা করেছিলেন? খালেদা জিয়ার নাম উচ্চারণ করে মতিয়া চৌধুরী প্রশ্ন রাখেন, আপনার যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদতো ত্রিপুরায় গিয়ে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে এসেছেন। তখনতো সংবিধান লঙ্ঘন হয়নি। কেন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চেষ্টা করছেন? চট্টগ্রামে কেন দুজন পুলিশ ও একজন সাধারণ মানুষকে হত্যা করলেন? এ জন্য আপনার জবাব দিতে হবে। ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য রবি বাহাদুর এমপি, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান, রাঙ্গামাটি জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মাওলনা শাহজাহান প্রমুখ। সমাবেশের শুরুতে পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন নেয়াপতং ইউপি চেয়ারম্যান রাংলাই মুরুং, সোয়ালক ইউপি চেয়ারম্যান অংখোয়াই প্রু ও রাজভিলা ইউপি চেয়ারম্যান রুই প্রু অং।

## ভোরের কাগজ
## ১৩ই নভেম্বর ১৯৯৭
## পার্বত্য চট্টগ্রাম : বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা কার স্বার্থে
### –দীপংকর তালুকদার

রাজধানী ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার সর্বশেষ বা ৬ষ্ঠ বৈঠক (১৪-১৭ সেপ্টেম্বর) শেষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সাংবাদিকদের বলেছেন, 'খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। আগামী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।' এই বক্তব্যে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সারা দেশের শান্তিকামী মানুষ খুশি হয়েছে। সবার মধ্যে এ আস্থাবোধ দৃঢ় হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত দীর্ঘদিনের সহিংসতা, অসহায় সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের অবসান হয়ে স্থায়ী শান্তির অবস্থা ফিরে আসবে এবং সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্বসুলভ পরিবেশে যার যার ন্যায্য অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবে পুরোনো এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যারা ভাবেন তারা একে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোতেও অগ্রগতির সাফল্যকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের সঙ্কটকে পুঁজি করে যে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই মহলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুতে অর্জিত সাফল্যকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে বলে মনে হয় না। তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেই গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর সমর্থনে বৃহৎ বিরোধীদল বিএনপিসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল জাতিকে বিভ্রান্ত ও শান্তির প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে।

সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রায় সাড়ে ৩ বছর পর জেনারেল এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। '৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দেড় বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করতে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আওয়ামী লীগ দেশ শাসনে জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়ার মাত্র একশ দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করেছিল। এ ঘটনাও নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সরকারের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।

'জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ'র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা



শুরুর পর থেকে বিএনপি নানা অভিযোগ করে আসছে। তারা বলছে, তাদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালিদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, সেখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হচ্ছে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বিএনপির কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতা জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা করাটাকে সংবিধানের লংঘন বলেও চিহ্নিত করেছেন।

পার্বত্য সমস্যা একটি জাতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ইস্যু। সরকারের কার্যক্রমের ধারাবাহিক স্বাভাবিক নিয়মেই বর্তমান সরকারের কাঁধে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জেঃ এরশাদ স্থায়ী সমাধান দিতে না পারলেও অন্তত স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি বছর সংলাপ-সংলাপ, কানামাছি ভোঁ-ভোঁ খেলেছেন। আন্তরিকতা ছিল না বলে সমাধানে এক ইঞ্চিও এগুতে পারেননি। বর্তমান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ শাসনে জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়ার অনেক আগে থেকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী, শান্তিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছিলেন। যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনার দাবীও করা হয়েছিল। সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাস, যারা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তাদেরকেই পরবর্তীতে জাতীয় স্বার্থে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপে বসতে হয়েছিল। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা করাটা যদি অসাংবিধানিক হতো তাহলে জেঃ এরশাদ আলোচনায় বসতেন না, বেগম খালেদা জিয়াও সেই পথ মাড়াতেন না। অস্ত্র দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে রক্তপাত, সন্ত্রাসের বিভীষিকা দেখা গেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের মতো সমস্যাও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই সমাধানের পথে গেছে। সশস্ত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসেই সেই সমস্ত দেশের সরকার সমস্যার স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছে। আমাদের দেশেও তাই যখন জেঃ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কেউ তখন সেটিকে সংবিধানের লংঘন বলে অভিহিত করেনি। এখন বিরোধী দলের নেত্রী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া সম্পূর্ণ বিষয়টি বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন।

বিগত দিনের সরকার আর বর্তমান সরকারের মধ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে তাই মূল পার্থক্যটা বোঝা যায়। এটা হচ্ছে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার পার্থক্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি চেয়ারম্যান ও চীফ হুইপ আবুল

হাসনাত আবদুল্লাহর নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সমস্যা সমাধানে ঐকান্তিক দৃঢ়তা ও যোগ্যতার কারণে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি অর্জন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আশা করা যাচ্ছে আগামী বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। 'তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন'–এই নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে 'তুমি উত্তম তাই বলে আমি অধম হবো না কেন' এই বিকারে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি আজ আক্রান্ত।

বিএনপি সরকার কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে ৮ জুলাই, ১৯৯২। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই ঐ কমিটি গঠন করা হয়। এমনকি পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্বাচিত তিন সাংসদের কাউকে কমিটিতে সে সময় রাখা হয়নি। কিন্তু আলোচনা করা হয়নি, অথবা দাবী অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হয়নি এই অজুহাতে আওয়ামী লীগ তখন নিজেকে সেই প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি কিংবা বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তৎকালীন বিএনপি সরকারের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কমিটি গঠন সম্পর্কে তাদের কাছে মতামত ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন। এক পর্যায়ে কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদের নেতৃত্বে কমিটি কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়। অথচ প্রস্তাবিত দাবী অনুযায়ী কমিটি পুরো পুনর্গঠন না করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে আলোচনার প্রক্রিয়ায় সরকারকে সহায়তা করা উচিত বলে আওয়ামী লীগ মনে করেছিল। এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগের দুই সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী কমিটির প্রথম বৈঠক থেকে শুরু করে শেষ বৈঠক পর্যন্ত অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সকল বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করেন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এক পর্যায়ে বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। '৯৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর সংসদ থেকে পদত্যাগ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের এই দুই সাংসদ সরকারি এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়েই। পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সমাধানের লক্ষ্যে '৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির যে শেষ বৈঠকটি হয় তাতেও অত্যন্ত সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে তারা অংশগ্রহণ করেন। সেরকম একটা সময়েও আওয়ামী লীগ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আলোচনার প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিল।

অথচ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গঠিত কমিটিতে বিএনপির দুই সাংসদ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম ও আমীর খসরু



মাহমুদ চৌধুরীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তারা একটি বৈঠকেও অংশ নেননি। কেন নেননি, তার যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যাও তারা কিংবা আজকের প্রধান বিরোধী দলটি দেয়নি। বিএনপির পক্ষ থেকে কমিটি সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনো আপত্তি, সংশোধনী বা প্রস্তাব আসেনি। বিএনপির এই অসহযোগিতামূলক মনোভাবকে কেউ যদি উদ্দেশ্যমূলক এবং শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার অন্যায় কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করেন, তাহলে কি তা ভুল বলা হবে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কাউকে উচ্ছেদ করা হবে না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট এই বক্তব্যের পর, বাঙালিদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে, এরকম অপপ্রচারের কোনো সুযোগ কারো আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তারপরও এরকম প্রচারণা চলছে। বাসে-ট্রাকে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কেবল বাঙালিদের ঢাকায় এনে সমাবেশ করানো হয়েছে। ঢাকায় যখন শান্তি আলোচনা চলেছে, তখন পার্বত্য এলাকায় হরতাল ডাকা হয়েছে। উস্কানিমূলক এবং মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এমনকি বিরোধী দলের প্রধান নেতারাও দিয়েছেন। কিন্তু একটি বিষয় তাদের নজর এড়িয়ে গেলেও পাহাড়ের পাহাড়ি-বাঙালিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ৬ষ্ঠ বৈঠক শেষে ১৯ সেপ্টেম্বর '৯৭ দুদুকছড়িতে ফিরে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। পত্রিকার প্রকাশিত খবরে জানা যায়, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত পাহাড়ী ও বাঙালিদের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের ভিত্তিতে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আর সে কারণেই সম্ভবত বিরোধী দলের নেতিবাচক প্রচারণা এখন এমনকি পাহাড়ের বাঙালিদের মধ্যেও দাগ কাটছে না। বিরোধী দল পাহাড়ে পায়ের নিচে মাটি হারিয়ে ফেলেছে।

আজ থেকে দুই দশক আগে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর পরবর্তী শাসক গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে সহিংস সংঘাতে সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য প্রাণ দিয়েছেন। চরম প্রতিকূলতার মুখে সেনাবাহিনী সেখানে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবেই যে এর সমাধান করতে হবে সেকথা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থেকে গত এক দশক ধরেই বলা হচ্ছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হলে এবং সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা বা জরুরি অবস্থা থাকবে না। আর জরুরি অবস্থা না থাকলে সেনাবাহিনীর

অস্থায়ী এবং অপারেশনাল ক্যাম্পগুলো থাকার যৌক্তিকতাও থাকে না। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যেভাবে সেনানিবাসে সেনাবাহিনী থাকে সেভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামেও থাকবে। সেক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজন, তা দুর্যোগ হোক আর আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হোক বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে মিলে তারা কাজ করবে। সেখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কোনো প্রশ্নই এখানে নেই।

কিন্তু এখানেও বিএনপি চরম অসাধু ভূমিকা নিচ্ছে। তারা বলছে, সরকার নাকি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর সেনাবাহিনী না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাকি আর বাংলাদেশে থাকবে না, এমন কথাও বলছে। সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যকে ডাহা মিথ্যা বলা যায়। আর যে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের কথা তারা বলে সেটা ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এদেশের জনগণ চরম ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশেরই একটা অংশ। ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত যখন তেমনভাবে সেখানে সেনাবাহিনী ছিল না, তখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশেরই অংশ ছিল। আর আজ পাহাড়ে যেসব সেনানিবাস দেখা যায় তার অধিকাংশই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার হয় গঠন করেছিল, নয় গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছিল। সে ইতিহাসও এখন সবাই জানে। আর অপপ্রচার ও বিভ্রান্তকারীদের মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানও বর্তমান সরকার করবে।

এক শ্রেণীর উগ্রপন্থী বাঙালী যেমন এই অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে যে, খসড়া চুক্তিতে বাঙালিদের কোনো অধিকার থাকবে না, অন্যদিকে তেমনি উগ্রপন্থী কিছু পাহাড়ি বলার চেষ্টা করছে খসড়া চুক্তিতে পাহাড়িরা কিছুই পাচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও বাঙালি এই দুটি সম্প্রদায়কে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটানোর ষড়যন্ত্র আজ চলছে।

এটা এখন বাস্তব এবং শান্তিপ্রিয় সকল মানুষের কাছে স্বীকৃত যে আওয়ামী লীগ সরকারের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা এবং পার্বত্য সমস্যা সমাধানে তার অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ়তার কারণে সরকার ও জনসংহতি সমিতি একটি খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেছে। শিগগিরই উভয় পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর করলেই সমস্যার সমাধান হবে না তা বর্তমান সরকার জানে। কারণ চুক্তির মাধ্যমে যে ওয়াদা সরকার করবে তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পাহাড়ে স্থিতিশীলতা, শান্তি ফিরে আসবে। এই কঠিন কাজের ব্যাপারে সরকার যেমন সচেতন রয়েছে, তেমনি সতর্ক থাকতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং সারাদেশের সচেতন



মানুষকে শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে স্বার্থান্বেষী মহল তৎপর হতে পারে। সে আশঙ্কার কথা মনে রেখেই শান্তির দুর্গম পথে এগুতে হবে।
–দীপংকর তালুকদার : সংসদ সদস্য। সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী জাতীয় কমিটি

**ভোরের কাগজ**

**১৪ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**রোববার বৈঠক শুরু, পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে**

জনসংহতি নেতারা দুদুকছড়িতে আসতে শুরু করেছেন ❑ শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি স্থানীয় সরকার পরিষদ নেতাদের অকুণ্ঠ সমর্থন

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** আগামী ১৬ নভেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠেয় ৭ম বৈঠকে যোগদানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গত বুধবার দুদুকছড়ি এসে পৌঁছেছেন। জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা আজ শুক্রবার দুদুকছড়ি এসে পৌঁছুবেন। এ বৈঠকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

আগামী রোববার বৈঠকের দিন সকালে সামরিক হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ি থেকে পাহাড়ি নেতাদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। এ লক্ষ্যে শর্ত অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে দুদুকছড়ি এলাকার নিরাপত্তাবাহিনীর ৮টি ক্যাম্প সাময়িকভাবে প্রত্যাহার ও ৫টি ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র ক্যাডার শান্তিবাহিনীর সদস্যরা দুদুকছড়ি এলাকায় অবস্থান নিতে শুরু করেছেন।

এবারের বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি হতে পারে–এ আশায় সাধারণ পার্বত্যবাসী দিন গুনছেন। বিএনপি, জামাত এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদের প্রসিতসঞ্চয় গ্রুপের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভূমি সমস্যা ও জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে সমঝোতা হলে এবারের বৈঠকেই পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুপক্ষের সমঝোতার ওপর 'চুক্তি স্বাক্ষর' নির্ভর করছে। তবে সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির একটি সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি যেন স্বাক্ষরিত হয় সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এদিকে আসন্ন পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রাক্কালে রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যরা চুক্তির পক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে মাত্র একজন 'চুক্তি হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে কিনা'–সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজার উদ্যোগকে সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানে আয়োজিত এক সভায় আবেগঘন কণ্ঠে চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পরিষদ প্রতিষ্ঠা লগ্নে নানা বাধাবিপর্যয়ের কথা তুলে ধরেন।

উদ্যোক্তা চিংকিউ রোয়াজা জানান, শান্তিচুক্তির প্রাক্কালে 'স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা' প্রবর্তনে যে বাধাবিপত্তি সে সম্পর্কে মতবিনিময় ও সে প্রক্রিয়ায় প্রথম থেকে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সম্মান জানানোর জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়। সাবেক চেয়ারম্যান রবীন্দ্র লাল চাকমা, সদস্য ডা. শৈলা মং চৌধুরী, প্রকৌশলী রুবায়ে আক্তার আহমেদের সঙ্গে অন্য সদস্যরা প্রায় একই সুরে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮৯ সালে প্রবর্তিত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার সঙ্গে তারা জড়িত হয়েছিলেন। সে ব্যবস্থায় অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। সে ব্যবস্থাকে গতিশীল ও সত্যিকার গণপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের যে ধরনের সহযোগিতা দেওয়া উচিৎ ছিল বিগত সরকারগুলো তা দেয়নি। এবার যে শান্তিচুক্তি হতে যাচ্ছে তাতে এসব ভুলভ্রান্তি দূর করা হবে বলে সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিরোধী সংগঠন, পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি, জেলা জামাতের আমীর ও পরিষদের সাবেক সদস্য এএসএম শহীদুল্লাহ বলেন, 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে-তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

১৯৯২ সালের ২০ মে রাঙ্গামাটি শহরে পাহাড়ি-বাঙালি সহিংস ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসনের নীরব ভূমিকা পালনের প্রতিবাদে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগকারী গৌতম দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি সবাই শান্তি চায়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র এর বিরোধিতা করছে। তিনি বলেন, শান্তি এলে যদি সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়, অশান্তি থাকলে কি তা রক্ষা হয়? পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজে যুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করে গৌতম দেওয়ান বলেন, আমরা যারা জনপ্রতিনিধি ছিলাম, ট্রাডিশনাল লিডার হেডম্যান, কার্বারিসহ সকলে মনে করতাম অস্ত্র দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। সে অনুযায়ী শান্তিবাহিনীর নেতাদের বুঝাতে লোগাঙের গভীর অরণ্যে ঘুরতে হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।



গৌতম দেওয়ান বলেন, এরশাদ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতি আলোচনায় বসাতে সমর্থ হলেও দুঃখজনকভাবে তা ভেঙে যায় ৬টি বৈঠকের পর। পরে বিএনপি সরকার যে আলোচনা শুরু করেছে সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিষদ সদস্য অংশুচাইন চৌধুরী। সভায় শুরুতে সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পরিষদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয়।

**ভোরের কাগজ**
**১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭**
সৈয়দপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে এরশাদ

## বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছে

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ব্যাপারে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির নেতিবাচক ভূমিকার নিন্দা করে বলেছেন, ক্ষমতায় থাকাকালে পার্বত্য সমস্যার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়ে তারা এখন আওয়ামী লীগের উদ্যোগের চরম বিরোধিতা করছে। উত্তরাঞ্চলে তিনদিন সফর শেষে ঢাকা ফেরার আগে সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনাকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিএনপির একটি ইস্যু মাত্র। আসলে তারা যেকোনোভাবে সরকারের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে চায়। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির সরকারের আমলেই এই চুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সরকার এসে সেই শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। শান্তিচুক্তির প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, চুক্তি না হলে দেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অথচ বিএনপি এই চুক্তির উপাত্ত তথ্য না দেখে, না জেনেই দেশ বিক্রির অজুহাত তুলছে। এরশাদ রক্তপাত, নৈরাজ্য থেকে দেশকে মুক্তির লক্ষ্যে শান্তিচুক্তিটি জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপনের আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি।

**ভোরের কাগজ**

১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

স্থায়ী কমিটির বৈঠক

**পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়ার ওপর বিএনপি তীক্ষ্ণ নজর রাখছে**

**কাগজ প্রতিবেদক :** গতকাল শনিবার বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল আজ রোববার সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে যে আলোচনা শুরুর কথা ছিল তারই প্রেক্ষাপটে। হরতাল আহ্বানসহ শান্তিচুক্তির বিরোধিতার কৌশল পদক্ষেপ ছিল এজেন্ডা। কিন্তু ঐ বৈঠকের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় গতকাল আড়াই ঘন্টা ধরে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলেও সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

স্থায়ী কমিটির বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরে সরকারি তৎপরতার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, চুক্তি হলেই তার প্রতিবাদে হরতাল এবং তারপর কিছু কর্মসূচি পালন করা হবে।

জানা গেছে, বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এবং বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে সরকার পক্ষে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের এ যাবৎ যে যোগাযোগ ও আলাপ হয়েছে তা স্থায়ী কমিটির সদস্যদের অবহিত করা হয়। সদস্যবৃন্দ এ ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে গতকাল ২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, আবদুল মতিন চৌধুরী, চৌধুরী তানভির আহমদ সিদ্দিকী, ডঃ আর এ গণি, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমদ। সভা বেলা সাড়ে এগারটা থেকে শুরু হয়ে একটানা দুইটা পর্যন্ত চলে।

গতকাল বিএনপির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সভার এক প্রস্তাবে চট্টগ্রামে মহাসমাবেশে হামলার নিন্দা করা হয়। সাতদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। দেশের



সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরির দাবি জানানো হয়।

**৭ দলের বৈঠক**

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় ২৯, মিন্টো রোডে বিএনপি ও সমমনা অন্য ৬টি দলের এক ২৫ মিনিট স্থায়ী সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরে সরকারি তৎপরতা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, জামাতের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ কামারুজ্জামান, জাপা (জা-মো) মহাসচিব শামীম আল মামুন, জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, ডিএল সভাপতি অলি আহাদ, পিএনপি সভাপতি শেখ শওকত হোসেন নীলু, এনডিএ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

**ভোরের কাগজ**

১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭

২১ নভেম্বর পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু

**এবার দেশে ফিরবে ৬,৬৮৪ জন**

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিম-উল হক :** ভারতে আশ্রিত উপজাতীয় শরণার্থীদের চতুর্থ পর্যায়ের প্রত্যাবাসন আগামী ২১ নভেম্বর মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে শুরু হবে। বর্তমান সরকারের আমলে গত মার্চ-এপ্রিল মাসে তৃতীয় পর্যায়ের শরণার্থী প্রত্যাবাসনের পর শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ও সরকারের মধ্যে সৃষ্ট গত ৬ মাসের টানাপড়েনের পর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার জট অবশেষে খুলেছে। গত শনিবার রাতে তিন দিনের ত্রিপুরা সফর শেষে খাগড়াছড়ি ফিরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল এ তথ্য জানান।

২১ নভেম্বর শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে একটানা চলবে। জেলা প্রশাসক ১২১৬ পরিবারের ৬ হাজার ৬৮৪ জন শরণার্থীর তালিকা নিয়ে দেশে ফিরেছেন। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলাকালে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক আরো শরণার্থীর তালিকা পাওয়া যাবে। জেলা প্রশাসক জানান, শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার দিনক্ষণ, ট্রানজিট পয়েন্ট এবং কবে কতো পরিবার ফিরবে–তা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১২১৬ পরিবারের মধ্যে ৮২৪ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে মাটিরাঙ্গা থানায়। দিঘীনালায় ২২৫ পরিবার, রামগড়ে ৮৫ পরিবার, মনিকছড়িতে ১৩ পরিবার, বাঘাইছড়িতে ৭ পরিবার,

লংগদু থানায় ১০ পরিবার, পানছড়ি থানায় ৩৯ পরিবার ও খাগড়াছড়ি সদরের ১১ পরিবার এ দফায় ফিরবে। তিনি জানান, ভারতের আশ্রয় শিবিরে ৮ হাজার ১৫১ পরিবারের ৪৪ হাজার ৩৫৯ জন শরণার্থী অবস্থান করছে। এবার প্রত্যাগত শরণার্থী প্রতিটি পরিবারকে ট্রানজিট পয়েন্টে নগদ ২১ হাজার টাকা, এক বছরের রেশন সামগ্রী দেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল বলেন, ত্রিপুরা সফরকালে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার সঙ্গে প্রত্যাবাসন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বেশ কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্প তিনি পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭

**অবিলম্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে ৭০ বিপক্ষে ১৯ শতাংশের মত**

**কাগজ প্রতিবেদক :** জনমতের ৭০.৪১ শতাংশই অবিলম্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এর বিপরীতে ১৯.৪৭ শতাংশ মতামত রেখেছেন এই শান্তিচুক্তির বিপক্ষে। এ প্রসঙ্গে কোনো রকম মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ১০.১২ শতাংশ।

ভোরের কাগজ-এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী পরিচালিত সর্বশেষ 'চকিত জরিপ' থেকে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জরিপে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল–'আপনি কি অবিলম্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করেন?'

গত শনিবার থেকে সোমবার–এই ৩দিন সারা দেশে জরিপটি চালানো হয়।

ভোরের কাগজ-এর পক্ষ থেকে পরিচালিত এটি ছিল ২২শ 'চকিত জরিপ'। এতে 'দৈব চয়ন পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে দেশজুড়ে এর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। রাজনীতিবিদদের ভাবনা চিন্তার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যু নিয়ে দেশের সর্বস্তরের জনগণের ভাবনার মূল সুরটিকে যাচাই করার জন্যই এই জরিপের আয়োজন করা হয়।

জরিপের কূপন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ভোরের কাগজ-এর প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় মতামত সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং ফ্যাক্স, কুরিয়ার ও টেলিফোনের মাধ্যমে তা দ্রুত পাঠাতে থাকেন।



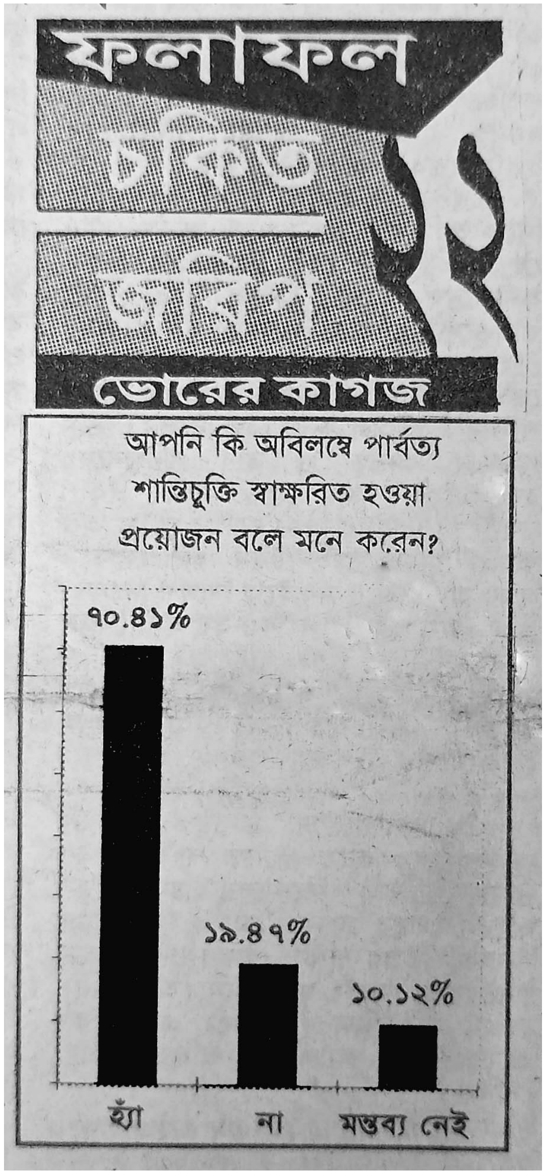

এবারের জরিপে জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো। ছাত্র রাজনীতি সংক্রান্ত অষ্টাদশ জরিপের পর এবারই অধিকসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর সমাবেশ ঘটেছে। চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা ও বিষয়টির গুরুত্বই এই ব্যাপক অংশগ্রহণের কারণ বলে ধারণা করা যায়।

জরিপের বিশ্লেষণকারীরা পার্বত্য অঞ্চলের জনসাধারণের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এলাকায় মোট ৮৬ জনের মধ্যে চালানো জরিপে দেখা গেছে–৭৯.০৭ শতাংশই সেখানে শান্তিচুক্তির পক্ষে। বিপক্ষে আছেন মাত্র ১১.৬৩ শতাংশ। মতামত দেননি ৯.৩০ শতাংশ। কিন্তু রাঙামাটির বাঙালিদের মধ্যে চালানো জরিপে দেখা গেছে, একেবারেই উল্টো ফলাফল। সেখানে ৮০ জনের মধ্যে ৬৩.৭৫ শতাংশ মত দিয়েছেন শান্তিচুক্তির বিপক্ষে। অন্যদিকে ৩১.২৫ শতাংশ রায় দেন চুক্তির পক্ষে। ৫ ভাগ কোনো মন্তব্য করেননি। তবে, সব মিলিয়ে সার্বিক যে চিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, 'বিপক্ষে' চেয়ে 'পক্ষের' পাল্লা ৩ গুণেরও বেশি ভারি।

এবারের জরিপে নিজস্ব প্রতিনিধিরা ছাড়াও 'ভোরের কাগজ পাঠক ফোরাম'-এর সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। পাঠকরাও টেলিফোন মারফত নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন। ভোরের কাগজ-এর পাঠক নন, এমন লোকজনও জরিপের কথা শুনে টেলিফোনযোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন।

ঢাকাসহ দেশের মোট ৪৪টি স্থানে এই জরিপ চালানো হয়। ঢাকার বাইরের এলাকাগুলো হচ্ছে–চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, যশোর, বান্দবান, খাগড়াছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ, বরগুনা, দিনাজপুর, জামালপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, ধামরাই, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার, নেত্রকোনা, শেরপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, উলিপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, ঝালকাঠি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শান্তাহার, সুনামগঞ্জ, কমলগঞ্জ, মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, গাজীপুর, হবিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, টঙ্গী, ফরিদগঞ্জ, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জ।

**মন্তব্যমালা**

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় একজন শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বলেন, শান্তিচুক্তিতে কি আছে তা না জেনে কিভাবে আমরা হ্যাঁ অথবা না বলি?

কুষ্টিয়ার একজন রিকশাচালক মন্তব্য করেন, নৌকায় ভোট দিলেই কি দেশ ভারত হয়ে যাবে? দেড় বছরেও যখন দেশ ভারত হলো না, তখন শান্তিচুক্তি হলেই দেশ ভারত হয়ে যাবে এ ধরনের কথা আর শুনতে চাই না।



চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সৈয়দ আহমদ বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তিচুক্তি হলেও এই চুক্তি মানবে না স্বয়ং শান্তিবাহিনী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যশোরের আওয়ামী লীগের একজন নেতা বলেন, 'স্বচ্ছতা ও জনমনে বিভ্রান্তি নিরসনে চুক্তির শর্ত প্রকাশ করা হোক।'

রংপুরে একজন ছাত্র মন্তব্য করেন, 'পাহাড়ি-বাঙালিরা শান্তি চায় ঠিকই কিন্তু বিএনপির রাজনীতিবিদরা তা কিছুতেই হতে দিতে চাচ্ছে না।'

রাজশাহীর একজন শিক্ষক বলেন, 'শান্তিচুক্তি চাই, তবে চুক্তির শর্ত না দেখে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে চাই না।'

সিলেটের একজন রাজনৈতিক নেতা মন্তব্য করেন, 'সরকার বিষয়টি নিয়ে আরো খোলামেলা আলোচনা করলে এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ থাকতো না।'

**বিস্তারিত ফলাফল**

- জরিপে অংশ নিয়েছেন মোট : ৬,০৭০ জন।
- শান্তিচুক্তির পক্ষে মত দিয়েছেন : ৪,২৭৪ জন (৭০.৪১%)।
- শান্তিচুক্তির বিপক্ষে মত দিয়েছেন : ১,১৮২ জন (১৯.৪৭%)।
- কোনো মন্তব্য করেননি : ৬১৪ জন (১০.১২%)।

**ভোরের কাগজ**

১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭

**শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধিতা ও সংসদ বর্জন করে বিরোধী দল দেশকে অশান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে –প্রধানমন্ত্রী**

**অশোক সেন, যশোর থেকে :** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধিতা এবং লাগাতারভাবে সংসদ বর্জনের মাধ্যমে দেশকে অশান্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল তারাই পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আর দীর্ঘদিন পর জনতার ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসে যখন সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি তখন বিরোধী দল সেই প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছে। তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। শান্তিচুক্তি হলে নাকি দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল দুপুরে ঝিকরগাছা বিএম হাইস্কুল মাঠে দলীয় জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। থানা আ. লীগ সভাপতি রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় হুইপ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামও বক্তৃতা করেন।

বিরোধী দলের দেশ বিক্রির অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময়ও বলা হয়েছিল, নৌকায় ভোট দিলে দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। বিগত সংসদ নির্বাচনের সময়ও বিএনপি বলেছিল, নৌকায় ভোট দিলে দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে না। তিনি জনতার কাছে জানতে চান দেশ কি বিক্রি হয়েছে? মসজিদে আজান কি শোনা যাচ্ছে না? হাজারো জনতা এসময় জানান, দেশ বিক্রি হয়নি। আজানের ধ্বনিও বন্ধ হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যারা দেশকে স্বাধীন করেছে তারা কোনোদিন দেশ বেচতে পারে না। তিনি বিরোধী দলের প্রতি সংসদ বাদ দিয়ে রাজপথে মিথ্যা প্রচার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের মানুষকে অশান্তিতে ঠেলে দেবেন না। মানুষ শান্তি চায়।

ঝিকরগাছার জনসভার পর প্রধানমন্ত্রী শার্শা থানার নাভারনে তার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত বেগম ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজের নামফলক উন্মোচন করেন। পরে তিনি কলেজ প্রাঙ্গণে জেলা ও থানা আ. লীগ আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। শেখ হাসিনা তার মায়ের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, নারী সমাজকে অবহেলায় রেখে সমাজকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। সে কারণে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।

সরকারের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতীতে যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তাদের কাজ দিতে চাই। তিনি বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে সরকারি পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। বিদ্যুৎ সঙ্কট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি প্রচার করছে যে তাদের আমলে নাকি বিদ্যুতের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিদ্যুতের যদি উন্নতিই হতো, তাহলে এখন সঙ্কট কেন! আসলে বিএনপি উন্নয়নের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটেপুটে খেয়েছে। যশোরবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর যশোর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

জেলা আ. লীগের সভাপতি তবিবর রহমান সরদারের সভাপতিত্বে নাভারনের জসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সাংসদ খান টীপু সুলতান, সাংসদ আলী রেজা রাজু, সাংসদ আলেয়া আফরোজ প্রমুখ। মঞ্চে অন্যদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী জেনারেল (অবঃ) মোঃ নূরুদ্দীন, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক, হুইপ মোস্তফা রশিদী মুজা, অধ্যাপক



রফিকুল ইসলাম, সাংসদ শাহ হাদীউজ্জামান, শেখ হেলাল, ফারুক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

**ভোরের কাগজ**

**১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭**

**২৬ নভেম্বর পার্বত্য শান্তি**
**আলোচনা শুরু হচ্ছে**

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিম-উল হক :** পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনার সপ্তম দফা আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হবে। সরকার ও জনসংহতি সমিতি বৈঠকের দিনক্ষণ নিয়ে পত্র চালাচালির পর গতকাল উভয়পক্ষ ২৬ নভেম্বর শান্তি বৈঠকে বসতে সম্মত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা গতকাল সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলসহ সারা দেশের সকল জল্পনা কল্পনা দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হলো।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর হঠাৎ করেই ১৬ নভেম্বরের নির্ধারিত বৈঠক জনসংহতি সমিতি পিছিয়ে ২৫ নভেম্বর করার প্রস্তাব করলে সারা দেশসহ পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি সংলাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা শোনা যায়। পরে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে এই নতুন তারিখ ঠিক হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এ বৈঠক টানা কয়েকদিন চলবে এবং এ বৈঠকেই চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এদিকে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের জন্য জনসংহতি সমিতির যে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র ক্যাডাররা খাগড়াছড়ি সীমান্তবর্তী দুদুকছড়িতে অবস্থান নিয়েছিল তারা এখনো সেখানে অবস্থান করছে। তাদের অবস্থানের কারণে দুদুকছড়ি এলাকার ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। ৮টি নিরাপত্তা ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। বর্তমানে শান্তিবাহিনীর দ্বিতীয় সারির নেতবৃন্দসহ সশস্ত্র সদস্যরা দুদুকছড়িতে অবস্থান করছে। এ দফায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুদুকছড়িতে অবস্থান করবে।

এদিকে গহীন অরণ্য দুদুকছড়ি মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন প্রত্যন্ত পাহাড়ি পল্লী থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিকটাত্মীয়রা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দুদুকছড়িতে ভিড় জমাচ্ছে। শান্তিবাহিনী সদস্যরা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের যাচাই বাছাই করে দেখা করতে দিচ্ছে।

## ভোরের কাগজ
## ১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭
## শান্তিচুক্তি হলে এবার সকল পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে

**সানাউল্লাহ :** প্রত্যাবাসনের চতুর্থ দফায় এবার ভারতে অবস্থানরত সকল পাহাড়ি শরণার্থী দেশে ফিরে আসতে পারে। ইতিমধ্যে যে ১২১৬টি পরিবারের ৬,৬৮৪ জন শরণার্থীর তালিকা তৈরি হয়েছে, সে অনুযায়ী ২১ নভেম্বর প্রত্যাবাসন শুরু হয়ে চলবে চলতি মাসের শেষ অব্দি। তবে আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সরকার ও জনসংহতি সমিতির বৈঠকে উভয়পক্ষে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হলে শরণার্থীদের দেশে ফেরা অব্যাহত থাকবে বলে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। ভারতে বর্তমানে ৪৪ হাজার বাংলাদেশী পাহাড়ি শরণার্থী রয়েছেন।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬টি শরণার্থী শিবিরে গত এক যুগ ধরে উদ্বার হয়ে আশ্রয় নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৬০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী। ১৯৯৪ সালে সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে নেওয়া উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে দুই দফায় ১০৬৩টি পরিবারের ৫১৮৬ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। কিন্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় শরণার্থী নেতাদের নানা আপত্তির কারণে সে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সরকারের সঙ্গে সে সময় শরণার্থী নেতাদের যে ১৬ দফা চুক্তি হয়েছিল, তা যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি বলে শরণার্থী নেতারা অভিযোগ করেছিলেন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতের আগরতলায় একাধিক আলোচনা বৈঠকের পর চলতি বছরের মার্চ এপ্রিল মাসে আরো ১২৪৭টি পরিবারের ৬৭০৮ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে শরণার্থী নেতাদের আবারো আপত্তি উঠায় এ প্রক্রিয়া বেশ কমাসের জন্য থেমে ছিল।

গত ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ বৈঠকের ফলে চতুর্থ পর্যায়ের এই প্রত্যাবাসন শুরু হচ্ছে। এ সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির সমর্থক নয়াদিল্লির 'পিস ক্যাম্পেন গ্রুপ' প্রকাশিত গতমাসের এক বুলেটিনে বলা হয়, যতোক্ষণ দেশে ফিরে আসা শরণার্থীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত থাকবে ততোক্ষণ প্রত্যাবাসন চলবে।

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির এ ঘোষণাকে সংশ্লিষ্ট সকলে বেশ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন। কারণ এ ধরনের ঘোষণা তারা আগে কখনো দেয়নি।



শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সূত্রে জানা যায়, শরণার্থী প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনের সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি সীমান্তে শরণার্থীদের স্বাগত জানাবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা, স্থানীয় দুই সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর ও বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমানও সেখানে থাকবেন।

শুক্রবার তবলছড়িতে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার মধ্যে ৬৬৮৪ জনের পরের শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা যায়। এছাড়া প্রত্যাবাসন নিয়ে শরণার্থী নেতাদের সঙ্গে টাস্কফোর্সের এক পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের তারিখ হয়ে আছে আগামী ৫ ডিসেম্বর। খাগড়াছড়িতে এ বৈঠক হবে।

## ভোরের কাগজ
## ২০শে নভেম্বর ১৯৯৭
## পাহাড়িয়া শান্তি চুক্তি এবং একটি 'বাম' মহলের দৃষ্টিকোণ
## –আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

রাশেদ খান মেনন একজন পুরোনো (এখনো প্রবীণ নন) রাজনীতিক, কিন্তু নতুন কলামিস্ট। তার এই প্রতিভার কথা আমার আগে জানা ছিল না। 'ভোরের কাগজ'-এর মাধ্যমে যখন জানলাম, তখন খুশি হয়েছি। অনেক ঝানু কলামিস্টের চেয়ে তার লেখা আকর্ষণীয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক। বক্তব্যকেও তিনি সহজভাবে সরল ভাষায় তুলে ধরতে জানেন। কিন্তু রাজনীতিক ও রাজনৈতিক কলামিস্টের ভূমিকার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রাজনীতিবিদরা সাধারণত দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেন। কলামিস্টরা কোনো দলের সমর্থক হলেও দলের মতটাকে নিজের স্বাধীন মতের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলে ধরেন এবং নিজেও একজন নিরপেক্ষ বিশ্লেষকের ভূমিকা নেন। কারণ, সংবাদপত্রে তার অডিয়েন্স শুধু তার দলের লোক নয়, দলমত নির্বিশেষে সাধারণ ও অসাধারণ পাঠকরাও। তাদের কাছেই নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা একজন কলামিস্টের বেশি প্রয়োজন।

গত ১১ নভেম্বর 'ভোরের কাগজ'-এ মেননের 'যে কথা বলতে হবে' কলামে 'পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনে স্বচ্ছতাই একে সবার গ্রহণযোগ্যতা দিতে পারে' শীর্ষক লেখাটি পড়ার পর উপরের কথাগুলো আমার মনে

হয়েছে। লেখাটি পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি পার্বত্য এলাকার আসন্ন শান্তি চুক্তির সরাসরি বিরোধিতা করতে চান না। আবার এই চুক্তির উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করতে চান। নিজের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঢেকে রাখার জন্য তিনি আলোচনায় কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে এনেছেন। যেমন সামরিক বাহিনীকে খুশি রাখার কথা। 'ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রিক' এই রাজনীতির আলোচনাতেও মেননের সমালোচনার আসল টার্গেট আওয়ামী লীগ সরকার। মেনন তার লেখায় ভাব দেখিয়েছেন, তিনি এই প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির সমর্থক (অন্যভাবে দেখলে তাকে বিএনপি ও জামাতের সঙ্গে কাতারবন্দি হতে হয়)। তবে 'এই শান্তি চুক্তির মধ্যে কি আছে, দেশের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো বিধি আছে কিনা, এবং সর্বোপরি, এই শান্তি চুক্তি পার্বত্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রত্যাশা পূরণ ও সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ বসতকারী বাঙালিদের স্বার্থ বিশেষ করে নিরাপত্তার স্বার্থ পূরণ করবে কিনা' এই ব্যাপারে কেউ কিছু না জানায় মেনন উদ্বিগ্ন। তিনি বলেছেন, 'যদি এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করতে হয়, সেটা করতে হয় শান্তি চুক্তি নিয়ে এই ঢাক গুড়গুড় করা নিয়ে। এ ধরনের একটি জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে অজ্ঞ রেখে কোনো চুক্তি সম্পাদন করা ঠিক নয়। পরবর্তী সময়ে এই চুক্তি প্রকাশ করা হলেও চুক্তি সম্পর্কে পূর্বসৃষ্ট বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকেই যাবে।'

মেননের উপরের বক্তব্য একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতার কৌশলী বোলচাল, না একজন কলামিস্টের পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, পাঠক, তা একটু ভেবেচিন্তে বলুনতো? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, কলামিস্টের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ; বিশ্লেষক প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির একজন আন্তরিক সমর্থক। কেবল, চুক্তির ধারাগুলোর মধ্যে সাপ না বিচ্ছু কি আছে, তা জানতে না পারাতেই তার এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব। কিন্তু একটু ভালোভাবে মেননের লেখার উদ্ধৃতাংশ পাঠ করলেই বোঝা যাবে, এটা একজন রাজনীতিকের পুরোনো রাজনৈতিক বক্তব্য অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে বলা হয়েছে এবং এই বক্তব্যের সঙ্গে বিএনপি ও জামাতের বক্তব্যের কোনো পার্থক্য নেই।

আমি বহুদিন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এককালের বেইজিংপন্থী বাম এবং কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল ডানের অবস্থানগত ঐক্য এবং বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির সতর্ক প্রয়াস লক্ষ্য করে মজা পেয়েছি। একাত্তর সালের আগে থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের প্রধান দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামাত, মুসলিম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল, পরবর্তীকালে সামরিক ছাউনিতে সৃষ্ট বিএনপির মূল অভিযোগ–আওয়ামী লীগ ভারতের সেবাদাস এবং ভরতের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিয়েছে। বেইজিংপন্থী বাম দলগুলো কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন এবং



সুযোগ পেলে এখনো বলেন। তাদের মতে, আওয়ামী লীগ 'আধিপত্যবাদী' ভারতের ক্রীড়নক। দুটি বক্তব্যেরই ভাষা ভিন্ন, অর্থ এক।

পার্বত্য এলাকার প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি সম্পর্কেও বাম রাজনীতিক-কাম-কলামিস্ট রাশেদ খান মেননের বক্তব্যের ভাষা ও বলার স্টাইল জামাত ও বিএনপির চেয়ে ভিন্ন; কিন্তু অর্থ ও উদ্দেশ্য একই। জামাত ও বিএনপিসহ ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক দলগুলো বলছে, 'শান্তিচুক্তি আমরাও চাই। কিন্তু এই চুক্তির দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে এবং দেশের এক-দশমাংশ ভারতের হাতে চলে যাবে। সুতরাং এই চুক্তি হতে দেওয়া যাবে না' (১৪ নভেম্বর নাটোরের জনসভায় খালেদা জিয়ার ভাষণ)। বাংলাদেশের বামফ্রন্টের অন্যতম নেতা 'ভোরের কাগজে' তার কলামে বলছেন, এই শান্তিচুক্তির মধ্যে কি আছে, দেশের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোনো বিধি আছে কিনা তা না জেনে, সে সম্পর্কে জনগণকে অজ্ঞ রেখে চুক্তি সম্পাদন করা ঠিক হবে না। খালেদা জিয়া হঠাৎ পাহাড়িয়া এলাকায় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের দরদী সেজেছেন এবং পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টিতে তাদের উস্কানি দিয়ে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে বাম-কলামিস্ট চুক্তিতে পাহাড়িয়া জনগণের 'জাতিসত্তার প্রত্যাশা' পূরণ হবে কিনা এই উদ্বেগ প্রকাশের আড়ালে 'বসতকারী বাঙালিদের স্বার্থ বিশেষ করে নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষিত হবে কিনা' এই আসল উদ্বেগটি ঢেকে রাখতে পারেননি।

সর্বশেষ খবর, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তি বৈঠক হচ্ছে ২৬ নভেম্বর এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এই বৈঠকেই। এই চুক্তির আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে–সেই বিএনপি সরকারের আমল থেকে চলছে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার এবং পাহাড়িয়াদের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন জনসংহতি সমিতির মধ্যে। চুক্তি স্বাক্ষরিতও হবে এই দুই পক্ষের মধ্যে। পার্বত্য এলাকার এক জনমত জরিপে দেখা যায়, জনসংখ্যার ৯০ ভাগই শান্তি চুক্তির পক্ষে। দুপক্ষের জনপ্রতিনিধিরাই যেখানে এই শান্তি আলোচনা চালাচ্ছেন, সেখানে চুক্তি সম্পাদনের ধারা সম্পর্কে জনগণকে অজ্ঞ রাখার অভিযোগটি ওঠে কিভাবে? মেনন নিজেই বলেছেন, 'এই শান্তিচুক্তির যদি বিরোধিতা আসতে হয়, তবে আসতে হয় পাহাড়িয়াদের তরফ থেকে। তারা বরং বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি মেনে নিয়েছে বলেই মনে হয়।' যদি পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলো এই শান্তি চুক্তি মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে বিরোধিতা করছে কারা? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি? মেনন খোঁজ নিলে পাহাড়িয়াদের মতো বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষরাও শান্তি চুক্তি সম্পর্কিত মনোভাব জানতে পারতেন। জানতে পারতেন, তারা এই চুক্তির সমর্থক এবং বিএনপি ও জামাতিদের অসত্য প্রচারণা ও উস্কানির ফাঁদে পা দিতে রাজি নয়।

মেনন তার লেখায় নিরপেক্ষতার ভাব দেখাতে গিয়ে বিএনপির কিছু কিছু সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, চুক্তিতে কি আছে না জেনেই বিএনপি 'হাওয়ার উপর গদা ঘোরাচ্ছে।' এই কাজটি কিন্তু মেনন নিজেও করেছেন। প্রস্তাবিত চুক্তিতে কি আছে না জানার আগেই তিনি চুক্তির মধ্যে দেশের সংহতি, অখণ্ডতা রক্ষা পাবে কিনা, বিশেষ করে বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের নিরাপত্তামূলক স্বার্থ রক্ষা হবে কিনা, বিএনপির এই ধুয়াগুলো নিজেও তুলেছেন। প্রথম কথা, এই চুক্তি দুটি দেশের মধ্যে নয় যে, এক দেশ এই চুক্তির বলে অন্য দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা ধ্বংস করে ফেলবে! এই চুক্তি একই দেশের জনগণের দুই অংশের মধ্যে। চুক্তি হবে শান্তিতে বসবাসের ও অস্ত্র সংবরণের। এর মাঝে সংহতি ও অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ধ্বংস হওয়ার প্রশ্নটি কোথা থেকে আসে? বিশেষ মতলবে, বিএনপি এই ধুয়া তুলতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিনের বাম রাজনীতিতে অভিজ্ঞ একজন কলামিস্ট কি করে এই ধরনের সন্দেহ পোষণ করেন এবং তা লেখায় প্রকাশ করেন?

বিএনপি সরকারের আমলেই পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলোচনার যে সূত্র নির্ধারণ করা হয়েছিল, রাশেদ খান মেনন তার লেখায় সেই তিনটি প্রধান সূত্র উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি না দেখেও বলা যায়, ঐ আলোচনার উপর ভিত্তি করেই শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হতে চলেছে।' তার এই বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে একই লেখায় তিনি কি করে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'ঢাক গুড়গুড় নীতি' অনুসরণের অভিযোগ তোলেন এবং বিএনপি ও জামাতিদের দাবিকে বৈধতা দানের জন্য বলেন, 'জনগণকে অজ্ঞ রেখে এই চুক্তি সম্পাদন করা ঠিক হবে না?' প্রস্তাবিত শান্তি আলোচনায় বা খসড়া চুক্তিতে দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু আছে কিনা তা জানার সবচেয়ে সোজা পথ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির বৈঠকে বিএনপির যোগদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ।

বিএনপির প্রতিনিধি এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। মেননই বলেছেন, 'তারা কোনো বৈঠকে উপস্থিত হয়নি।' বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে, আলোচনায় অংশ না নিয়ে, জনগণকে অজ্ঞ রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা এবং শান্তি চুক্তি বানচাল করার চেষ্টাকে জনগণ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধাবস্থার অবস্থান নেওয়া বলে অভিহিত করা কি চলে না? রাশেদ খান মেনন এ সম্পর্কে কি বলেন? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং বর্তমানের শান্তি চুক্তির বিরোধিতার মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত ব্যবধানটা কি? একাত্তরে 'ভারতীয় আধিপত্যবাদের' ধুয়া তুলে বেইজিংপন্থী বামপন্থীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি সমর্থন দান থেকে বিরত ছিলেন। এবারো তারা রাষ্ট্রের সংহতি ও অখণ্ডতার (নেপথ্যে ভারতীয় জুজুর ভীতি)



ধুয়াটি সন্তর্পণে তুলে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিকে নিঃশর্ত ও জোরালো সমর্থন দিতে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখাচ্ছেন। মেনন তার লেখায় নিরপেক্ষতার ভারসাম্য দেখানোর জন্য বিএনপির যতোই এক আধটু সমালোচনা করে থাকুন না কেন, তার আসল বক্তব্য (চুক্তির সব কথা প্রকাশ্যে বলার আগে চুক্তি সম্পাদন ঠিক হবে না) কি বিএনপি ও জামাতিদের অসৎ ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণাকেই জোরদার করছে না?

সশস্ত্র সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও বিবাদের মীমাংসার জন্য শান্তি আলোচনা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অত্যন্ত ডেলিকেট ও নাজুক ব্যাপার। সামান্য কারণে তা ভেঙে যেতে পারে, ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহী আইরিশ, রিপাবলিকান আর্মি বা আইআরএ-র দীর্ঘ ১০ বছর ধরে গোপন শান্তি আলোচনা চলেছিল। এই আলোচনার কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও উচ্চারিত হয়নি। জন মেজরের বিদায়ী টোরি সরকারের আমলে এই আলোচনার কথা প্রকাশ করা হয় এবং আইআরও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সাময়িকভাবে মেনে নেয়। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আমেরিকার ক্লিনটন প্রশাসনকেও দূতিয়ালি করতে হয়েছিল।

আইআরএ-র পলিটিক্যাল উইঙের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের একটা স্থায়ী সমঝোতার চুক্তি হওয়ার পর তা অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে পেশ করা হবে। ইসরায়েল ও পিএলও-র মধ্যেও শান্তি আলোচনা শুরু হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে। প্রেসিডেন্ট কার্টারের আমলে প্রথম তা প্রকাশ পায়। ষাটের দশকে চীন ও আমেরিকার যোগাযোগেরও শুরু কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে। আমেরিকান কংগ্রেস বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোতে দুদেশের বিবাদ মীমাংসার শর্তগুলো আলোচনার পর ওয়াশিংটন-বেইজিং আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই আঁতাত তৈরি হয়েছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের চীন সফরের আগেই। আনুষ্ঠানিক এই সফরের পরে জানা গেলো, আমেরিকা নয়া চীনকেই জাতিসংঘে চীনের জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে যাচ্ছে এবং তাইওয়ান ওই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। চীনের সঙ্গে আমেরিকার সমঝোতার মোটা ও মূল বিষয়গুলো সিনেটে পেশ করা হয়েছে; কিন্তু চুক্তির সামরিক সমঝোতার অংশ কখনোই প্রকাশ করা হয়নি। ১৯৭১ সালের উপমহাদেশীয় যুদ্ধের পর ইন্দিরা-ভুট্টোর মধ্যে যে সিমলা চুক্তি হয়, তার ধারাগুলো কি দুই দেশের পার্লামেন্টে আগে আলোচিত হয়েছিল? না চুক্তি হওয়ার পর তা ভারতের পার্লামেন্টে আলোচিত হয়?

মেনন তার লেখায় যুক্তি দেখিয়েছেন, 'ভারতে বিভিন্ন সময় নাগা বিদ্রোহ, মিজো বিদ্রোহ, আসাম, পাঞ্জাব, দার্জিলিঙের সমস্যার মোকাবিলা

করতে হয়েছে এবং এখনো করতে হচ্ছে। এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যাবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী ঐ সকল শান্তি আলোচনায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের মতামত নিয়েছে সংসদকে সবসময় অবহিত রেখেছে।'

মেনন কোথায় এ খবরটি পেলেন যে, আঞ্চলিক প্রতিটি সমস্যায় ভারতের সাবেক কংগ্রেস সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিয়ে এগিয়েছে। নাগা মিজো বিদ্রোহ দমন থেকে শুরু করে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, হিমাচল প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্য গঠনের শান্তি চুক্তি আগে সম্পাদিত হয়েছে; পরে তা পার্লামেন্টে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হয়েছে। কংগ্রেস সরকার অবশ্যই সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা বজায় রেখে সংসদীয় বিরোধী দলগুলোকে এসব চুক্তির বিষয় সম্পর্কে অবহিত রেখেছেন। পার্লামেন্টের বাইরের রাজনৈতিক দল বা দলগুলোকে আলোচনায় ডাকেননি। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার পাহাড়িয়া শান্তিচুক্তির জাতীয় কমিটিতে সংসদের প্রধান বিরোধী দলকে যুক্ত করেছেন। সংসদের বাইরের নামসর্বস্ব দলগুলোর সঙ্গেও কি তাদের প্রতিটি ব্যাপারে আলোচনা করে চলতে হবে? এটা কোন গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য? ভারত একটি বড়ো দেশ। গণতান্ত্রিক দেশ। সে দেশে বহু মতের, বহু পথের দল আছে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে তারা সজাগ এবং সরকারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতো 'জুজুর ভয়' সৃষ্টি করে না। ব্রিটেনের নতুন লেবার সরকার গণভোটের অনুষ্ঠান দ্বারা স্কটল্যান্ডের জন্য স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দল থেকে এই অভিযোগ তোলা হয়নি যে, ব্রিটেনের সংহতি ও অখণ্ডতা বিপন্ন করা হয়েছে। পাহাড়িয়া সম্প্রদায়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন দানের বাংলাদেশের বিএনপি ও জামাত প্রভৃতি যেখানে একেবারে যুদ্ধংদেহি মনোভাব এবং মেননের মতো বামফ্রন্ট নেতাও শান্তিচুক্তির মধ্যে দেশের সংহতি, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার কল্পিত সন্দেহে উদ্বিগ্ন, সেখানে ২৫ বছর ধরে জিইয়ে রাখা এই সংঘাত ও রক্তপাতপূর্ণ সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চুক্তিটি ভালোয় ভালোয় সম্পাদিত হওয়ার আগে এর প্রতিটি ধারা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা কি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, মেনন কি তা কিছুই অনুমান করতে পারেন না?

অনুমান করতে যে তিনি পারেন, তার প্রমণ 'ভোরের কাগজের' ১১ নভেম্বরের কলামেই তিনি লিখেছেন, পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এর বিষয়বস্তু প্রকাশ হলেও 'চুক্তি সম্পর্কে পূর্ব সৃষ্ট বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকেই যাবে।' কেন থেকে যাবে, তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেননি মেনন। কারণ, তিনি অনুমান করতে পেরেছেন, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত



হওয়ার পর সংসদে পেশ করা হলে বা তার ধারাগুলো প্রকাশ করা হলে এটি আওয়ামী লীগ সরকারের আরেকট সাফল্য বলেই প্রমাণিত হবে। এর ভিতরে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সংহতি বিপন্ন হওয়ার কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বিএনপি ও জামাত চাইবে আগের বিভ্রান্তি টিকিয়ে রাখতে। তখন কি মেননদের মতো বাম নেতাদেরও উচিত হবে না, দেশের ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সেই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য রুখে দাঁড়ানো? নাকি চিরাচরিত আওয়ামীফোবিয়া থেকে বিএনপি ও জামাতিদের সেই বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস তারাও টিকিয়ে রাখতে চাইবেন এবং তার আগাম নোটিশ তার এই লেখায় দিয়ে রাখছেন?

এই শান্তি চুক্তি দ্বারা পাহাড়িয়াদের জাতিসত্তার প্রত্যাশা পূরণ হবে কিনা এবং বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষা হবে কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্ন মেনন তুলেছেন; যার উত্তর তার নিজের কাছেই আছে। এই শান্তিচুক্তির আশু লক্ষ হওয়া উচিত অশান্ত পার্বত্য এলাকায় অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করা, শান্তি স্থাপন, শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা, দুর্দশাগ্রস্ত পাহাড়িয়াদের দুর্দশা মোচন, ধন প্রাণের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ভূমির উপর তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যবস্থা। প্রশাসন অসামরিকীকরণ স্বায়ত্তশাসনমূলক রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ। জাতিসত্তার প্রত্যাশা পূরণের ব্যাপারটি রাতারাতি হওয়ার নয়। তার পূর্বশর্ত এলাকায় স্থায়ী শান্তি ও অসামরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মধ্য থেকে পাহাড়িয়া সংখ্যালঘুদের জাতিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের ধার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাংবিধানিক পদক্ষেপ নিতে হবে। সেটি শান্তি চুক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আগেই দ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে উল্লম্ফনের নীতি সমস্যার সমাধানে মোটেও সহায়ক হবে না। আর একবার যদি পার্বত্য এলাকায় প্রকৃতই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। একমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালিদের উস্কানি প্রদান ছাড়া এই প্রশ্নটির আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না।

রাশেদ খান মেনন তার কলামে পাহাড়িদের সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসেবে থাকা কালে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তুলে ধরেছেন; যা নিয়েও তর্ক তোলা যায়। কিন্তু বিষয়টি অবান্তর। খুঁচিয়ে ঘা বাড়ানোর চেষ্টা ছাড়া এই আলোচনার অন্য কোন উদ্দেশ্য আমি খুঁজে পাইনি। বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার যেখানে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে পাহাড়িয়া সমস্যার মতো আড়াই দশকের একটি জটিল সমস্যা

সমাধানে ব্যস্ত, তখন এই কাজে তাদের সহায়তা জোগানোর বদলে তাদের অতীতের পরিত্যক্ত ভূমিকার কথা তুলে বর্তমান ভূমিকাকে খাটো করার চেষ্টা দ্বারা বামফ্রন্টের অন্যতম নেতা কাদের সহায়তা জোগাচ্ছেন? এই চুক্তিবিরোধী সাম্প্রদায়িক জোটকেই নয় কি?

মেননের অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের সব সাফল্য আওয়ামী লীগ একাই ভোগ করতে চায় সব কৃতিত্ব একাই দাবি করতে চায়। গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সহায়তা জোগানোর ফলে মেনন তার এক লেখায় এই চুক্তির কৃতিত্বের ভাগিদার তারাও বলে দাবি করেছিলেন। বর্তমানেও পাহাড়িয়া শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আওয়ামী লীগ না ডাকলেও তারা এগিয়ে এসে চুক্তিবিরোধী চক্রের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেন। তখন দেশের মানুষই তাদের সাফল্য দেখবে, কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেবে। আওয়ামী লীগের কাছে তার ভাগ চাইতে হবে না।

সর্বশেষ পাহাড়িয়া সমস্যা ও ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রিক রাজনীতির কথা। প্রসঙ্গটি তুলে মেনন ভালোই করেছেন। এ সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা না হলে আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তা থেকেই যাবে। আগামী সপ্তাহে জরুরি কোনো বিষয় না থাকলে এ প্রসঙ্গটি নিয়ে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

লন্ডন ॥ ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার ॥

**আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী : লেখক ও সাংবাদিক**

**ভোরের কাগজ**

**২১শে নভেম্বর ১৯৯৭**

আগামীকাল থেকে প্রত্যাবাসন শুরু ❑ প্রথম দিন আসবে ৫৭৪ জন

## শরণার্থীদের দেশে স্বাগত জানাতে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিম উল হক :** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬টি আশ্রয় শিবির থেকে আগামী ২১ নভেম্বর থেকে চতুর্থ পর্যায়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরতে শুরু করবে। শরণার্থীদের স্বদেশে অভ্যর্থনা জানাতে জেলা প্রশাসন সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছে।

শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানাতে সীমান্তবর্তী মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি ও রামগড়ের মন্দিরাঘাট নতুন সাজে সেজেছে। এ দুই ট্রানজিট পয়েন্টে ফেনী নদীর ওপর কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। শরণার্থীরা ২১ নভেম্বর সকালে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সেতুর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে স্বদেশের মাটিতে পা



রাখবেন। দুই ট্রানজিট পয়েন্টে আশ্রয়কেন্দ্র, অভ্যর্থনা কক্ষ, চিকিৎসা কেন্দ্র, রেশন উত্তোলন কেন্দ্র, অস্থায়ী ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

দেশে ফেরার পর শরণার্থীদের বাস-জিপে করে স্ব স্ব থানায় বা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাস জিপ রিকুইজিশন শুরু হয়েছে। দুই ট্রানজিট পয়েন্টে সুরম্য তোরণও নির্মিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ট্রানজিট পয়েন্টের সড়কগুলো বিশেষ ব্যবস্থায় সংস্কার করেছে। সড়কগুলো লাল নীল পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রস্তুতি কাজ তদারকি করার জন্য শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ট্রানজিট পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষও ট্রানজিট পয়েন্টে সাময়িক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। ২১ নভেম্বর সকাল ১১টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি প্রধান চিফ হুইপ আবদুল হাসনাত আব্দুল্লাসহ জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ আনুষ্ঠানিকতা শেষে তবলছড়ি পয়েন্টে শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানাবেন। অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ও আরো কয়জন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে শরণার্থীদের বিদায় জানানো হবে।

চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম দফা প্রত্যাবাসন ২১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত টানা প্রত্যাবাসন চলবে। ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর রামগড় সীমান্ত দিয়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরবে। প্রথম দিন ১০০ পরিবারের ৫৭৪ জন শরণার্থী আসবে। এদের অধিকাংশ মাটিরাঙ্গা থানার বাসিন্দা। তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে মোট ১ হাজার ৯৩ পরিবারের ৫ হাজার ৬০০ জন দেশে ফিরবে। রামগড় সীমান্ত দিয়ে ২০০ পরিবারের ১ হাজার ৭৩ জন দেশে ফিরবে। চতুর্থ দফায় তাকুমবাড়ি শিবির থেকে ৩৭৮ পরিবার, লেবাছড়া থেকে ৩১ পরিবার, পঞ্চরাম পাড়া থেকে ৩১ পরিবার, করবুক শিবিরের ৮৫ পরিবার ও শিলাছড়ি শিবির থেকে ৩১৬ পরিবার দেশে ফিরবে। জেলা প্রশাসন ট্রানজিট পয়েন্টে প্রতি পরিবারকে ২১ হাজার টাকা দেবে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫ হাজার টাকা উন্নয়ন বাবদ, গাভীর জন্য ৩ হাজার ও কাঠের জন্য ৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া ১ বছরের রেশন সামগ্রী চাল, ডাল, তৈল, লবণও দেওয়া হবে। চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম দফায় মোট ১ হাজার ২১৬ পরিবার দেশে ফিরবে। বর্তমানে ৬টি আশ্রয় শিবিরে ৮ হাজার ১৫১ পরিবারের ৪৪ হাজার ৩৫৯ জন শরণার্থী অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, ৩য় পর্যায়ে ১ হাজার ২৪৮ পরিবার দেশে ফিরেছে। এদের মধ্যে ৯ পরিবার ছাড়া সব কয়টি পরিবারকে জেলা প্রশাসন পুনর্বাসন করেছে।

## ভোরের কাগজ
## ২১শে নভেম্বর ১৯৯৭
## বিএনপিসহ ৭ দলের সিদ্ধান্ত
## শান্তিচুক্তি সংবিধান বিরোধী হলে পরের দিন হরতাল

**কাগজ প্রতিবেদক :** বিএনপিসহ ৭টি রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সংবিধানবিরোধী হলে এর পরের দিন হরতালসহ অন্যান্য কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা করবে। গতকাল শুক্রবার রাতে মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ৭ দলের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসমষ্টির সকল অংশের সম্মতি ছাড়া কোনো সমাধান জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সংবিধানবিরোধী চুক্তি হলে হরতালসহ কঠিন কর্মসূচি দেওয়া হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আবদুস সালাম তালুকদার। উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির শামসুল ইসলাম, জাপা (জা-মো) কাজী জাফর আহমদ, শামীম আল মামুন, জামাতের আবদুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক মজিবুর রহমান, ডিএলের আল আহাদ, জাগপার শফিউল আলম প্রধান, অধ্যাপিকা রেহানা প্রধান, পিএনপির শওকত হোসেন নীলু, এনডিএ-র এ এস এম সোলায়মান প্রমুখ।

## ভোরের কাগজ
## ২২শে নভেম্বর ১৯৯৭
## শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে উন্মুখ বান্দরবান পার্বত্যবাসী

**বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, বান্দরবান থেকে :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে এবারের অনুষ্ঠিতব্য সপ্তম দফা বৈঠকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে এ আশায় বান্দরবান পর্বতবাসী অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। বিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে–এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তবে সমগ্র বান্দরবানে শান্তি চুক্তিবিরোধীরা যেমন শক্তিশালী নয় তেমনি শান্তিচুক্তির সপক্ষে প্রচারণাও তেমন জোরালো নয় বলে মনে হচ্ছে।

তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার তুলনায় বান্দরবান পার্বত্য জেলা বরাবরই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সম্প্রীতির অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এখানে চিহ্নিত একটি মহলের মধ্যেই শান্তিচুক্তিবিরোধী উত্তাপ সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন সময় বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা সংঘটিত হলেও বান্দরবানে সে ধরনের উল্লেখযোগ্য সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়নি। বিগত সরকারের সময় ভারত ও বার্মার সীমান্তসংলগ্ন এলাকার পাহাড়–অরণ্যে আশ্রয় নেওয়া বহির্দেশীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আশ্রয়স্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সীমান্ত অতিক্রম করে ঐসব বিদ্রোহী বিশেষ করে দলছুট কয়েকটি বর্মী উপদলীয় সন্ত্রাসী গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে এলেও বর্তমানে প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ঐ বহির্দেশীয় সন্ত্রাসীদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী আক্রমণ পার্বত্য পরিস্থিতি ও শান্তি প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে না বলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মনে করছেন। নেতৃবৃন্দের মতে, পার্বত্যাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বহির্দেশীয় ঐ সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে আসবে।

স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান শান্তিচুক্তির সপক্ষে দৃঢ় মত ব্যক্ত করে বলেছেন, 'যতো শিগগির সম্ভব শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক। এ মুহূর্তে পর্বতবাসী শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।' তিনি বিএনপিসহ কয়েকটি বিরোধী দলের শান্তিচুক্তির বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলেছেন, জাতীয় পার্টি বিএনপির সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে। এতে তাদের বিরোধিত না করে দেশ ও জাতির স্বার্থে সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু তারা বিরোধিতা করছে। এটা কারোর জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। সাবেক স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরী বিগত দুটি সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের সঙ্গে জনসংহতি নেতৃবৃন্দের সম্ভাব্য চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

জাতীয় পার্টি জেলা নেতৃবৃন্দ শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন, জাতীয় পার্টির পদক্ষেপকে অনুসরণ করে পার্বত্যাঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে। চুক্তি সম্পর্কে অবহিত না হয়ে নেতিবাচক দিক থেকে বিরোধিতা করা সঙ্গত নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও এনজিওকর্মী দেন্দাহা ত্রিপুরা ও ম্রো জনগোষ্ঠীর নেতা অংলাই ম্রো শান্তিচুক্তিকে পর্বতবাসীর দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিএনপি-জামাতের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য হচ্ছে, অসম চুক্তির মাধ্যমে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে অবহেলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

এদিকে বান্দরবানের অধিকাংশ পাহাড়ি বাঙালি শান্তিচুক্তির সপক্ষে হলেও জোরালো কোনো পদক্ষেপ না থাকায় জনমত সংগঠিত হচ্ছে না বলে অভিজ্ঞমহল মন্তব্য করেছেন। অনেকটা অসংগঠিত অবস্থায় শান্তির পক্ষে সমর্থন করছেন। গত ১২ নভেম্বরের শান্তি সমাবেশের আগে ও পরে চুক্তির সপক্ষে সভা-সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়নি। তবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান বলেছেন, জনমত গঠনের লক্ষ্যে তারা থানা ও ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

**ভোরের কাগজ**

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

সেনাকুঞ্জে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

**পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে সরকার**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার দেশের সুশৃঙ্খল, সুপ্রশিক্ষিত এবং সম্ভাবনাময় সশস্ত্রবাহিনীকে জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে চায়। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকার সেনাকুঞ্জে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা এ সময় বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষা ও সমুন্নত রাখায় সতর্ক থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন, দীর্ঘ বিরাজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এখন অতিনিকটে। বাসস, ইউএনবি।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়াসহ বিপুলসংখ্যক গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রীবর্গ, সাংসদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, কূটনৈতিক কোরসমূহের সদস্য, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যবৃন্দ। তিন বাহিনী প্রধানগণ মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন।

শেখ হাসিনা সমবেত অতিথিদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীরা এ সময় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গেও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের সশস্ত্রবাহিনী একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, 'তারা স্বদেশে ও



বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে'। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং গঠনমূলক কার্যকলাপে সশস্ত্রবাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি এ প্রসঙ্গে গৃহহীনদের জন্য গৃহীত 'আশ্রয়ণ' প্রকল্পে সশস্ত্রবাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কালের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য আরো নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সশস্ত্রবাহিনীর পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি মিলিটারি একাডেমি, কমবাইন্ড আর্মড স্কুল এবং অন্যান্য অনেক নামি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেও শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে গত দুদশক ধরে বিরাজমান যুদ্ধাবস্থা দেশের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যসহ শত শত লোক সেখানে প্রাণ হারিয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার এই দীর্ঘদিনের সঙ্কট সমাধানে আন্তরিক ও কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সমাধানই এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান এ কথা উপলব্ধি করে সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান করা হবে।

স্মরণীয় এ শুভদিনটিতে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি সশস্ত্রবাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সুখী জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

**ভোরের কাগজ**

২৩শে নভেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সম্ভাবনা ব্যর্থ হলে জাতিকে চরম মূল্য দিতে হবে**

**–ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক ও বাসুদেব ধর**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি সুনির্দিষ্ট সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই শান্তিচুক্তি সই হবে। কয়েক দশকের দীর্ঘ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হলে তা সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটা বিরাট প্রভাব রাখবে বলে আশা করা যায়। কায়েমি স্বার্থে আদিবাসী জনগণকে দেশের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে নির্যাতন, নিপীড়ন, বিতাড়নের মাধ্যমে পাকিস্তানি আমলে কালো অধ্যায়ের সূচনা

হয়েছিল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তার অবসান হওয়া উচিত ছিল এবং তাদের জাতিগত সত্তার স্বীকৃতি দিয়ে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি বরং পাকিস্তানি ধারা অনুসরণ করা হয়। ফলে আদিবাসী জনগণ নিজ দেশে পরবাসী হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়ায় একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতির অবসান হচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয় সংহতি জোরদার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে শান্তি চুক্তি সই হবে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির পর বর্তমান সরকারের আকেরটি সুদূরপ্রসারী বিরাট সাফল্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৮৫ সালে জাতীয় পার্টির শাসনামলে। তখন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে সেনাবাহিনী। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। বিএনপি সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও আগরতলায় আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মূল আলোচনা ঢাকায় সরিয়ে আনা হয়। ভূমি, বাঙালি বসতি স্থাপনকারী এবং জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা নিয়েই শান্তি প্রক্রিয়ার সূচনা থেকে আলোচনা চলে এবং বর্তমান সরকার এই আলোচনাকে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে আসে। জাতি অচিরে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আশা করছে।

জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফা দাবিতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগৃহীত জমি ছাড়া অন্যান্য সব শ্রেণীর জমি, পাহাড়, কাপ্তাই হ্রদ এলাকা ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য বনাঞ্চল পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনা, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় কারখানা ও রাষ্ট্রীয় অধিগৃহীত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন জমি ও পাহাড় সম্মতি ছাড়া সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, এ অঞ্চলের স্থায়ী আদিবাসী নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা বেদখলকৃত, বন্দোবস্তকৃত, ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল এবং ওইসব জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিক পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা এবং অঞ্চলের স্থায়ী



আদিবাসী নন এমন ব্যক্তি বা সংস্থার জমি ও পাহাড় চাষ, বনায়ন ও লিজ বা বন্দোবস্ত বাতিল করে ওইসব জমি ও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির পূর্ববর্তী পাঁচ দফা দাবিতে পাকিস্তানি আমল থেকে, বিশেষ করে সত্তরের দশকের শেষদিক যাদের বাইরে থেকে এনে পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসানো হয়েছে, তাদের সবাইকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেই সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সংশোধিত দাবিনামায় এই শর্ত শিথিল করে পাহাড়ি বসতিগুলোর আশপাশ থেকে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রচলিত ভূমি আইন পার্বত্য চট্টগ্রামেও কার্যকর হবে। অবশ্য শান্তি চুক্তির পর একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে ভূমি জরিপ চালানোর ব্যাপারে উভয়পক্ষ একমত হয়েছে। জানা গেছে, সরকার আরো জানিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে বসতি স্থাপনকারীদের স্থানান্তর যুক্তিযুক্ত তা করা হবে। এছাড়া পার্বত্য জেলাগুলোর বেসামরিকীকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী সেনা শিবিরগুলো সরিয়ে নেওয়া, সংবিধান সংশোধন ছাড়াই তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, বিধি অনুযায়ী জেলা পরিষদকে সকল ক্ষমতা প্রদান এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন প্রশ্নেও বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে মতৈক্য হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত মে মাসে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি নেতৃবৃন্দ প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাঁচ দফা দাবি পেশ করেছিল। দাবিসমূহ হচ্ছে : ১, সুষ্ঠু প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিকে সম্পৃক্ত করা, ২. সরকার ঘোষিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা, ৩. প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং স্বউদ্যোগে প্রত্যাগত শরণার্থীদের তৃতীয় পর্যায়ে আগতদের ন্যায় ২০ দফার সুবিধা প্রদান, ৪. ৯ মাসের স্থলে এক বছর ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করা এবং ৫. শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনীর সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচলার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্কটের সমাধান করা। এসব দাবির ব্যাপারে ত্রিপুরা সফরকারী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের আলোচনা ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের আলোচনার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির সম্পৃক্ততার দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এক বছর ফ্রি রেশন প্রদানসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে মতৈক্য হয়।

জনসংহতি সমিতির দাবিগুলোর মধ্যে যে তিনটি ছিল মুখ্য, সেগুলো হচ্ছে : ১. সংবিধান সংশোধন করে জাতিসত্তার স্বীকৃতিসহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ২. বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ভূমির ওপর আঞ্চলিক পরিষদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিকীকরণ এবং ৩. সকল বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়া। এই সঙ্গে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রধান দাবি শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস সম্পৃক্ত করার দাবি গোটা সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল। বর্তমান সরকার ও জনসংহতি সমিতির সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব এ সমস্যার সমধান সহজতর করেছে। ফলে সংবিধান সংশোধন ছাড়াই আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের সেখানকার সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন, পাহাড়ি জনগণের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সেনানিবাস রেখে অস্থায়ী সেনাশিবিরগুলো প্রত্যাহারের গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়গুলোর ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জুম্ম শরণার্থীরাও ত্রিপুরা থেকে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধান ছাড়াই দেশে ফিরে আসতে সম্মত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে আদিবাসীসহ মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী জনগণের ঐক্যবোধ সহমর্মিতার কারণে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সমঝোতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতীয়মান হচ্ছে, তা বানচাল করার জন্য দুদিক থেকেই ষড়যন্ত্র চলেছে। বিএনপি, জামায়তে ইসলামিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই সমঝোতা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিরোধী বলে আখ্যায়িত করছে এবং অভিযোগ তুলছে এর ফলে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হবে ও ভারতের হাতে চলে যাবে। এটা রুখতে তারা ইসলামি শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনকারীদের নিয়ে আত্মঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। এভাবে তারা পার্বত্য চট্টখামে আদিবাসী ও বসতিস্থাপনকারীদের মধ্যে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি করছে, আদিবাসীদের দেশের জনগণের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে এবং ইসলামি শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানের মাধ্যমে সারা দেশে ধর্মভিত্তিক বিভাজন প্রকট করে তুলে দীর্ঘ মেয়াদি সংঘাতে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে।

বিএনপি ও জামাতে ইসলামিসহ কয়েকটি সমমনা দল পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রচেষ্টাই শুধু বিঘ্নিত করতে চাচ্ছে না, ঐ অঞ্চলে বেসামরিকীকরণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ও সার্বিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেও ব্যর্থ করতে চাইছে।



কোনো গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় অঞ্চলবিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ আলোচনা ও প্রচেষ্টার পর আজ শান্তির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা বানচাল হলে গোটা অঞ্চল দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতে জড়িতে যেতে পারে, যার জন্য জাতিকে চরম মূল্য দিতে হবে।

**ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**
**বাসুদেব ধরঃ সাংবাদিক**

**ভোরের কাগজ**
**২৩শে নভেম্বর ১৯৯৭**
স্বদেশে এসে সবাই খুশি
**কাল ৮৪৮ শরণার্থী দেশে ফিরেছে**

**শিলাছড়ি থেকে ফিরে আজিম উল হক :** ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরের দুর্বিষহ জীবন শেষে নতুন প্রত্যয় নিয়ে উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অব্যাহত রয়েছে। গতকাল তবলছড়ি-শিলাছড়ি সীমান্ত দিয়ে ১৪৮টি পরিবারের ৮৪৮ জন শরণার্থী শিবিরজীবন ছেড়ে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরেছে। এ নিয়ে গত ২ দিনে ২৪৮ পরিবারের ১ হাজার ৪২৫ জন শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে।

গতকাল প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকাল পৌনে ১০টায়। ভোর থেকে ত্রিপুরা অসরপুর মহকুমা প্রশাসন ভারতীয় বাস-ট্রাকে করে পার্শ্ববর্তী শিলাছড়ি ক্যাম্প থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের শিলাছড়ি ট্রানজিট ক্যাম্পে জড়ো করে, গুলচেকা চাকমা (৫৬)-এর ৮ সদস্যদের পরিবারের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন কাজ শুরু হয়। প্রথম পরিবারকে স্বাগত জানান খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেহাজ উদ্দিন চৌধুরী। শরণার্থীদের বিদায় জানান অমর নূর মহকুমা প্রশাসক শান্তি রায় রিয়াং। গতকাল যারা ফিরেছে তাদের অধিকাংশই মাটিরাঙ্গা থানার বাসিন্দা ও অধিকাংশ চাকমা উপজাতি শরণার্থী।

শিবিরজীবন ছেড়ে দেশে ফিরে বয়োবৃদ্ধ মায়াবিনি চাকমা জানান, বহু বছর পর দেশে ফিরে আমি খুব আনন্দিত, আমার মুখে ভাষা নেই, এখন আমরা সবাই মিলেমিশে থাকবো, এই আশা রাখি। বর্ণাল কদমতলী গ্রামের সুনিল বিকাশ চাকমা (৪০) ও তার স্ত্রী কালো রানী চাকমা বলেন, দীর্ঘ একযুগ পর নিজ গ্রামের নিজ বাড়িতে ফিরছি আনন্দের সীমা নেই। তবলছড়ির মাস্টারপাড় গ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষু বেধি লেন্দু থেরো দেশে ফিরে বলেন, পাহাড়ে শান্তি ও স্থিতি ফিরেছে। সরকারের আন্তরিকতার প্রতি

বিশ্বাস রেখে দেশে ফিরে এসেছি। '৮৬ সালের পাহাড়ি বাঙালি দাঙ্গায় ক্ষতিগস্ত ত্রিপুরায় পাড়ি জমিয়েছিলেন সাজনা দেবি (২৮)। গতকাল দেশে ফিরে তিনি জানান, শিবিরজীবন বড়ো কষ্টের, থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, রোগ-শোকে ওষুধপত্রের অভাব প্রকট, মৃত্যুশিবির জীবনের নিত্যসঙ্গী। ওষুধের অভাবে শিশুদের করুণ মৃত্যু এখনো তাকে পীড়া দেয়। বছরখানেক আগে শিবিরে তার বিয়ে হয়েছে, স্বামী উজ্জ্বল চাকমাকে নিয়ে দেশে ফিরেছে। গ্রামের বাড়ি তাইন্দং এলাকায়।

শিলাছড়ি ট্রানজিট পয়েন্টে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করছেন সমিতির সহসভাপতি হেমন্ত প্রসাদ চাকমা। তিনি কবে দেশে ফিরবেন জানতে চাইলে বলেন, আমরা দেশে ফিরতে এখনো প্রস্তুত তবে কিছু সময় নিচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতি আলোচনা করছে। আমরা প্রতীক্ষা করছি শান্তি চুক্তির। চুক্তি হলেই সকলে দেশে ফিরবো।

শরণার্থীরা দেশে ফেরার পর পরিবার প্রতি ২১ হাজার টাকা রেড ক্রিসেন্ট থেকে ৩ মাসের রেশন সামগ্রী ১২ কেজি ডাল, ৬ কেজি লবণ ও ৬ লিটার সয়াবিন তেল, এবং ৫০ কেজি চালও সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে শরণার্থীদের সুবিধার্থে ট্রানজিট পয়েন্টে সোনালী ব্যাংকের শাখা খোলা হয়েছে। প্রথম দিনে ৪৯ জন শরণার্থী ব্যাংকে ৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা জমা করেছে। ২৫ জন শরণার্থী ৩৫ হাজার ৫৪৪ ভারতীয় রুপি ব্যাংকে জমা করেছে। প্রথম দিন যেসব শরণার্থী দেশে ফিরেছে তারা অনেকেই নিজ বাড়িতে চলে গেছে। আজ রবিবার তৃতীয় দিনে ১৫০ পরিবারের ৯০৯ জন দেশে ফিরবে।

**ভোরের কাগজ**

২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭

**২৬ নভেম্বরের বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে জনসংহতির মধ্যে সংশয়**

**হরি কিশোর চাকমা, দুদুকছড়ি থেকে ফিরে :** পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকারি জাতীয় কমিটির সঙ্গে আগামী ২৬ নভেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জনসংহতি সমিতি। তবে সরকারের কাছ থেকে শান্তিচুক্তির খসড়া না পাওয়ায় এ বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষর হবে কিনা সে ব্যাপারে জনসংহতির নেতাকর্মীরা নিশ্চিত নন। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার দুদুকছড়ি এলাকায় অবস্থানকারী জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের কাছ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।



উল্লেখ্য, সাবেক বিএনপি সরকারের সময় থেকে চলে আসা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির চতুর্থ দফা বৈঠকে উভয় পক্ষ 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্যের' ঘোষণা দেয়। পরবর্তীকালে গত ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন। পরে জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা ঊষাতন তালুকদার স্বাক্ষরিত এক পত্রে শান্তিচুক্তির খসড়া পাঠানোর দাবি জানানো হয় সরকারের কাছে। অবশ্য জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র জানিয়েছেন, ষষ্ঠ বৈঠকের সময় তাদের পক্ষ থেকে 'শান্তিচুক্তির খসড়া' পাঠানোর দাবি জানানো হলেও তখন জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলা হয়নি।

জনসংহতি সমিতির সূত্র জানায়, সরকারের সঙ্গে এ পর্যন্ত যেসব আলাপ-আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারে নীতিনির্ধারকরা অবহিত। জনসংহতি সমিতি যে অনেক ছাড় দিয়েছে সে ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। এখন সরকার যদি ভূমি, সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ, আদিবাসী পাহাড়ি ও স্থায়ী অপাহাড়িদের ভোটার সংক্রান্ত তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অন্তর্বর্তী ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়ে ছাড় না দেয় তাহলে তাদের পক্ষে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর সম্ভব হবে না। সূত্রমতে, জনসংহতি সমিতির 'পাঁচ দফা' দাবিমানার তুলনায় এসব দাবি ন্যূনতম। এসব দাবি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সরকারি পক্ষের 'শান্তিচুক্তির খসড়া' চূড়ান্ত করার কথা রয়েছে বলে উল্লেখ করে সূত্র বলেন, জনসংহতি সমিতি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর করার পক্ষপাতি। এখন সরকারের সদিচ্ছার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

এদিকে বৈঠকে যোগদানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির আলোচক দলের সদস্য রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা এখন দুদুকছড়িতে অবস্থান করছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমাণ্ডার ঊষাতেন তালুকদার। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) আজ সোমবার দুদুকছড়িতে এসে পৌছবেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা থেকে প্রতিদিন শত শত লোক জনসংহতির নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালিও চোখে পড়েছে।

**ভোরের কাগজ**
**২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭**
আরো ৯২৪ জন দেশে ফিরেছে
**শরণার্থীরা অস্থায়ী ক্যাম্প**
**ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছে**

**আজিম-উল হক, তবলছড়ি থেকে ফিরে :** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে গত শুক্র ও শনিবার দেশে ফিরে আসা শরণার্থীরা অস্থায়ী ক্যাম্প ছেড়ে গ্রামে যেতে শুরু করেছে। অনেকে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ নিজ নিজ পরিত্যক্ত ভিটায় বাড়ি বানাতে শুরু করেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রত্যাগতদের মধ্যে টিন বিতরণ শুরু হয়েছে।

গতকাল রোববারও তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন অব্যাহত ছিল। তৃতীয় দিনে ১৫১ পরিবারের ৯২৪ জন শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। এ নিয়ে তিন দিনে সর্বমোট ৩৯৯ পরিবারের ২ হাজার ৩৪৬ জন দেশে ফিরলো। গতকাল শরণার্থীদের স্বাগত জানান অতিরিক্ত জেলা মেজিস্ট্রেট শেহাজউদ্দিন চৌধুরী ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সৈয়দ আবু রায়হান। বিদায় জানান মহকুমা শাসক শান্তি রায় রিয়াং। যারা গতকাল ফিরেছে তারা এতদিন শিলাছড়ি ও তাকুমবাড়ি শিবিরে অবস্থান করছিল এবং অধিকাংশই পানছড়ি মাটিরাঙ্গা থানার বাসিন্দা। গতকাল সকাল ৯টায় প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে বিকেল ৩টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। শরণার্থীরা দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে জিপ গাড়িতে করে অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিডিআরের ব্যবস্থাপনায় দুপুরে খাবার বিতরণ করা হয়।

তাকুমবাড়ি শিবির থেকে ফিরে আসা শরণার্থী অশীতিপর বৃদ্ধা জয়তারা চাকমা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, অনেকদিন আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বিদেশের মাটিতে দুঃখকষ্টে ছিলাম। আজ দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরে খুব ভালো লাগছে।

গতকাল জেলা প্রশাসক মাটিরাঙ্গা থানার কয়েকটি ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল জানান, শরণার্থী পরিবারগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকতে চাইছে না।

অধিকাংশই নিজ গ্রামে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মাটিরাঙ্গা থানার তাইন্দং এলাকার কেউ কেউ নিজ জমিতে বাড়ি বানাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ১০০ পরিবারের বেশি ঢেউ টিন নিয়ে গেছে। পরিবার প্রতি ২ বান্ডিল ঢেউ টিন বিতরণ করা হচ্ছে।

গতকাল ত্রিপুরা রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নিঃশর্মা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে এপার ওপার ঘুরে গেছেন। এ সময় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক তাকে বাংলাদেশের আয়োজন ঘুরে ঘুরে দেখান এবং কার্যক্রম অবহিত করেন।



দেশে ফিরে এসে শরণার্থীরা প্রথম ২ দিনে সোনালি ব্যাংকে ১০৩টি নতুন একাউন্ট খুলেছে। জমা দিয়েছে ১৭ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। সঙ্গে নিয়ে আসা ভারতি মুদ্রা ৫৫ হাজার ৬৬৮ রুপি বিনিময় করেছে। আজ এ সীমান্ত দিয়ে ১৫০ পরিবারের ৮৮১ জন শরণার্থী দেশে ফিরবে।

**ভোরের কাগজ**
২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭
শহীদ মিনারে মহিলা পরিষদের সমাবেশ
**পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র**
**রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান**

**কাগজ প্রতিবেদক :** বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদের নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে বিএনপির অপপ্রচার সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্যও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহিলা পরিষদের সমাবেশ থেকে এ আহ্বান জানানো হয়।

সংগঠনের সহসভানেত্রী হেনা দাসের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন সহসভানেত্রী ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানাম। প্রস্তাব পাঠ করেন সারাবান তহুরা। সমাবেশ পরিচালনা করেন রেখা চৌধুরী। সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বিষয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ক্রমাগত উস্কানিমূলক বক্তব্য চরম সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশ ও জনগণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি দায়িত্বহীনতারই পরিচায়ক। তারা বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তা নিরসনের লক্ষ্যে চুক্তির খসড়া জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হোক। সমাবেশের শেষে মহিলা পরিষদের একটি মিছিল বের হয়ে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

**ভোরের কাগজ**
২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭
কিশোরগঞ্জে জনসভায় খালেদা জিয়া
**সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল সম্পদ ও**
**চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের হাতে তুলে দিতে চায়**

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া অভিযোগ করে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে ভারতের করদরাজ্যে পরিণত

করতে চায়। তিনি গতকাল বিকেলে কিশোরগঞ্জে স্থানীয় এক স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন। ইউএনবি।

বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন, 'সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতের হাতে তুলে দিতে চায়।' তিনি সরকার আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ নিরক্ষেপ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে এবং শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সংবিধান পরিপন্থী কোনো চুক্তি করলে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন।

তিনি বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি। প্রয়োজন বিদেশী আগ্রাসন থেকে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে রক্ষার জন্য আমরা আবার রক্ত দেবো।'

খালেদা জিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছে, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তারা সারসহ সকল কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা বিধানে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি সার্টিফিকেট মামলার আওতায় দরিদ্র কৃষকদের হয়রানি করার জন্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন এবং সরকারের নির্দেশে কোনো লোককে হয়রানি না করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ক্ষমতাসীন দল ভোট কারচুপির মাধ্যমে ইউপি নির্বাচনের ফলাফল তাদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করলে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিরামহীন আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

খালেদা জিয়া অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭ মাসের শাসনকালে বেশ কিছু সংখ্যক বিএনপি নেতাকর্মী নিহত এবং আরো শত শত নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে।

এদিকে জাতীয় পার্টি নেতা নাসিরউদ্দিন আহমেদ শাহজাহানসহ স্থানীয় বার কাউন্সিলের ১৭ জন আইনজীবী গতকাল বিএনপিতে যোগ দিয়েছে। পরে খালেদা জিয়া স্থানীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এবং স্থানীয় বার কাউন্সিলে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।



**ভোরের কাগজ**
**২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭**

## সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি বিষয় আলোচনার জন্য বিএনপি স্থায়ী কমিটির বৈঠক আজ

**কাগজ প্রতিবেদক :** আজ সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় ২৯ মিন্টো রোডে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এতে সভাপতিত্ব করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিএনপির কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, আজকের সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে সরকার ও জনসংহতি সমিতির আসন্ন বৈঠক এবং সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি। শান্তিচুক্তির বিরোধিতার জন্য হরতালসহ কি কি কর্মসূচি ঘোষণা করা যায় আলোচনায় সে বিষয় প্রাধান্য পাবে বলে সূত্রগুলো জানায়।

**ভোরের কাগজ**
**২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭**

## পার্বত্য শান্তি বৈঠক কাল শুরু হয়ে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত চলতে পারে

**হরি কিশোর চাকমা, রাঙ্গামাটি থেকে :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সপ্তম দফা শান্তি বৈঠক আগামীকাল ঢাকায় শুরু হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতি প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এবারের বৈঠক কতোদিন চলবে তা নির্ধারিত হয়নি। তবে সরকারি পক্ষ সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক চালাতে আগ্রহী বলে জানা গেছে। পার্বত্যবাসীও শান্তির প্রত্যাশায় বৈঠকের দিকে চেয়ে আছে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির আগামীকালের বৈঠকে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছার জোর প্রচেষ্টা চালাবে বলে দুপক্ষের সূত্রে জানা গেছে। ষষ্ঠ বৈঠকের পর সরকারি জাতীয় কমিটি প্রধান সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) মধ্যে বেশ কয়েকবার চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে দুনেতাই দ্রুত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে একে অপরের সহযোগিতা কামনা করে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ভূমি সমস্যা, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ, আদিবাসী পাহাড়ি ও স্থায়ী অপাহাড়ি ভোটার ও স্থানীয় সরকার

পরিষদসমূহে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে দুপক্ষই স্ব-স্ব অবস্থান ও আইনগত জটিলতার বিষয়ে একমত হতে পারেননি বলে জানা গেছে। সরকার পক্ষ বলছেন, এসব মেনে নিলে তাদের আইনগত জটিলতা ও রাজনৈতিক চাপে পড়তে হবে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির বক্তব্য হলো, এসব দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে পাহাড়িদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে এবং শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাহাড়িদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের শান্তিচুক্তির পক্ষে ব্যাপক প্রচারণায় সাধারণ পার্বত্যবাসী এখনো শান্তির আশায় উন্মুখ। সবার মনে একই আশা এবার শান্তিচুক্তি হবে।'

এখন গ্রামে-গঞ্জে হাট-বাজারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু শান্তিচুক্তি। গত ২১ নভেম্বর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত কয়েকজন পাহাড়ি শরণার্থীর সঙ্গে আলাপ করেও শান্তিচুক্তির ব্যাপারে তাদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। সবাই আশা করছেন যতো তাড়াতাড়ি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ততো তাড়াতাড়ি তারা স্ব-স্ব ভিটে মাটিতে ফিরে আসতে পারবেন। শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমাও দ্রুত শরণার্থী প্রত্যাবাসনে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ওপর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উপেন্দ্র লাল চাকমা ভোরের কাগজকে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে আমরা কখনো নিরাপদ বোধ করবো না। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ওপর তিনি আস্থাশীল বলে জানান।

এদিকে দুদুকছড়ি থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, আগামীকালের বৈঠকে যোগদানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) গতকাল দুদুকছড়িতে এসে পৌঁছেছেন। এবারের বৈঠকেও তাঁর সঙ্গে থাকবেন জনসংহতি সমিতির ঊর্ধ্বতন নেতা রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। বৈঠকের দিন বুধবার সকালে তাদের দুদুকছড়ি থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হবে।

**ভোরের কাগজ**
**২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭**
**দেশ কতো বার বিক্রি হয়?**
**-নুরুল ইসলাম বিএসসি**

গত সপ্তাহে আউটার স্টেডিয়ামে বিএনপির জনসভার কথা বলতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল। সার্বিক



পরিস্থিতির ওপর এই লেখা ছিল না। ছিল আংশিক। আজকের লেখাতেও সার্বিক দিক পর্যালোচনা করা মুশকিল হবে। শান্তিচুক্তির সঙ্গে দেশ বিক্রির কোনো সম্পর্ক না থাকলেও দেশ বিক্রির কথা অহরহ বলা হচ্ছে। আজকের প্রতিবেদন দেশ বিক্রির প্রসঙ্গ নিয়ে।

মালপত্র বিক্রির কথা শোনা যায়। সোনা-দানার ব্যবসার কথা প্রতিনিয়ত প্রচারিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আব্রু বিক্রির কথা কদাচিৎ শোনা যায়। কিন্তু দেশ বিক্রির কথা বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে শুনেছে বলে কেউ সাক্ষী দিতে পারবেন না। তাই দেশ বিক্রিকে নিয়ে আজকের লেখা।

পাঠক সমাজের অনেকের মনে থাকার কথা যে গঙ্গার পানিচুক্তির সময় দেশ বিক্রির ধুয়া তোলা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির বেলায়ও দেশ বিক্রির একই ধুয়া তোলা হচ্ছে। এতোদিন বিক্রেতা ছিল আওয়ামী লীগ ও ক্রেতা ভারত। ইদানীং নতুন ক্রেতার নাম শুনা যাচ্ছে। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানরত কোম্পানিগুলোর কাছে দেশ বিক্রির কথা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। তাহলে আসল ঘটনা কি? দেশ কতোবার বিক্রি হয়? গঙ্গার পানিচুক্তির সময় যদি একবার বিক্রি হয়ে থাকে তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির সময় বিক্রির বাকি থাকলো কি? এতে ফলাফল দাঁড়ায় কি? সত্যিই কি দেশ বিক্রি হচ্ছে? নাকি রটনায় ঘটনা করার কৌশল অবলম্বন? গত একুশ বছর ধরে যে দেশ বিক্রি হচ্ছে তা এখনো শেষ হলো না কেন?

শান্তিচুক্তি হবে বা হচ্ছে দেশের একাংশ নাগরিক তাদের ভাষায় বঞ্চিত মানুষ, যারা অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের সঙ্গে। শান্তিচুক্তি কোনো অবস্থাতেই ভারতের সঙ্গে হচ্ছে না। তবু কেন ভারত এ দেশ গ্রাস করবে বুঝে ওঠা মুশকিল। শান্তিচুক্তির কোন শর্তের অধীনে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করবে তা বিএনপি খুলে বললে এ দেশের মানুষ আশ্বস্ত হতো এবং তাদের বক্তব্যেরও একটা সততা খুঁজে পাওয়া যেতো।

বিএনপি বলছে, শান্তিচুক্তি গোপনে হচ্ছে। কোন কিছু কাউকে না জানিয়ে খসড়া তৈরি হচ্ছে। কিন্তু চুক্তিতে কি হচ্ছে, বিএনপি নিজেরা বলছে, তারা কিছুই জানে না। অথচ হরতাল চুক্তির বিরুদ্ধে। চুক্তি না জেনে, শর্তগুলো কি কি অবহিত না হয়ে হরতাল করার অর্থ কি দাঁড়ায়? আওয়ামী লীগ ভালো-মন্দ যাই করুক, তার বিরোধিতা করাই বিএনপির মূল লক্ষ্য? সালিস হওয়ার আগে কি রায় বের হয়। চুক্তি হওয়ার আগে শর্ত কি করে জানান যায়? বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে তারা কি করতেন? এ রকম বহু ঘটনা তাদের আমলে হয়েছে অথচ জনসাধারণ কিছুই জানতে পারেনি।

স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশ বিক্রির কথা বলে বাংলাকে আফগান বানানোর দুঃস্বপ্নে মশগুল। বিএনপি ঐ স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ দেশে কি ঘটাতে চায় জনগণ তা বুঝে ফেলেছে বলেই কোনো ইস্যুতেই কাজ হচ্ছে না। আসল কথা মিথ্যার বেসাতি বেশি দিন করা যায় না।

বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহম্মদের নেতৃত্বে কমিটি কয়েকবার বৈঠক করে। রাশেদ খান মেনন ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকায় হাজার হাজার মানুষের সামনে হলফ করে বলেছেন–বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির বিনিময়ে ঐ অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন দিতে চেয়েছিল। তাহলে বোঝা যায় কি? দেশ বিক্রি আওয়ামী লীগ করলো নাকি বিএনপি? আসল ঘটনা, বিএনপি পার্বত্য অঞ্চলে যে প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল আওয়ামী লীগ তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। এতেই বিএনপির গা জ্বালা।

বিসমিল্লাহ চলে যাওয়ার শ্লোগান তুলে বিএনপি '৯১ সালে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। '৯৬ সালে জনতা তা বুঝে ফেলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসায়। বিসমিল্লাহও ঠিক অবস্থানে আছে। কোথাও যায়নি। আযানও যথারীতি ধ্বনিত হচ্ছে। বিএনপি এখন আবার তাদের শ্লোগান বদলিয়ে দেশ বিক্রির কথা বলে মাঠ গরম করার পাঁয়তারা করছে। মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে বিএনপি ধীরে ধীরে শ্লোগান-সর্বস্ব পার্টিতে পরিণত হচ্ছে। আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা ছাড়া তাদের নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রাম আছে বলে মনে হয় না।

দেশের আসল সমস্যা চিহ্নিত করে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা রাজনীতিবিদের দায়িত্ব। সামাজিক কর্মীরা যেমন সমাজ তথা জনগণ নিয়ে চিন্তা করেন, তেমনি রাজনীতিবিদরাও দেশ ও জাতিকে নিয়ে চিন্তা করেন। প্রকৃত রাজনীতিবিদ বিনিময়ে কিছু পাবেন চিন্তা করেন না। যারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, প্রত্যেক কাজের পিছনে নিজের স্বার্থ খোঁজেন, আমরা তাদের রাজনীতিবিদ না বলে সুবিধাবাদী বলে অখ্যায়িত করতে চাই। এই সমস্ত সুবিধাবাদীরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সুবিধাবাদীরা প্রত্যেক দলেই আছে। যেই মাত্র সুযোগ আসলো ঝাঁপিয়ে পড়লো সম্পদ লুণ্ঠনে।

অনেকের বিশ্বাস সুবিধাভোগী ছাড়াও বিএনপিতে অনেক ভালো ভালো নেতা আছেন যারা জনতাকে বিভ্রান্ত না করে সার্বিক ঘটনা উপস্থাপন করতে পারেন। বিএনপির মধ্যে অনেক দক্ষ মানুষ আছেন যাদের অতীতে দেশ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনেকের মতো আমরাও আশা করি, তাদের দক্ষ হাতের পরশে নেতৃত্ব সঠিক ট্র্যাকে প্রতিস্থাপিত হবে। দেশে



সত্যিকার অর্থে কি কি সমস্যা আছে তা চিহ্নিত হবে। দেশ বিক্রির আজগুবি গল্পে মানুষ বিরক্ত। সত্যিকার অর্থে বিএনপি কি চায় জনসমক্ষে প্রচার করলে ভালোমন্দের বিচার করতে জনতা কোনো দিন ভুল করবে না। ভালো কাজের বিরোধিতা করলে এককালে মুসলিম লীগের মতো জনতা যে কোনো দলকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে দেরি করবে না। নতুন নতুন মুখ এরি মধ্যে যারা দলে ঢুকেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি, পরিষ্কার না হওয়া দর্যন্ত পরামর্শ গ্রহণ করলে দলে বিপর্যয় আসা বিচিত্র নয়।

**নুরুল ইসলাম বিএসসি : প্রাবন্ধিক।**

**ভোরের কাগজ**

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশে বক্তারা

**পার্বত্য অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা দূর করতে শান্তিচুক্তি সই করুন**

**কাগজ প্রতিবেদক :** 'জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ চাই'–এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের দাবিতে গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীলতা দূর করার লক্ষ্যে অবিলম্বে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রামেন্দু মজুমদার।

সমাবেশে সূচনা বক্তব্য রাখেন জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস। জোটের সহসভাপতি মামুনুর রশিদ তার বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংস পরিস্থিতির কারণে আমার পার্বত্য বন্ধু সুহি চাকমা অনেক দিন হলো আমার কাছে থেকে হারিয়ে গেছেন। তিনি কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তা আমি জানি না। তিনি বলেন, আর কেউ যাতে এভাবে হারিয়ে না যায় সে জন্য পার্বত্য শান্তিচুক্তি হওয়া প্রয়োজন। তিনি শান্তিচুক্তির বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, আমরা নিজেরা একটি স্বাধীন জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী বলেই অন্য জাতিসত্ত্বাকে মেনে নেওয়া উচিত।

মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা আয়েশা খানম বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি আমাদের সবার ভালোর জন্যই দরকার। কিছুলোক না জেনে আর বাকিরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এই চুক্তির বিরোধীতা করছে। শাহরিয়ার কবির বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই

বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে সরকারের বিরোধিতা করে চলছে। তারা পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধা দিচ্ছে।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে সৈয়দ হাসান ইমাম, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, নাসির উদ্দিন ইসুফ বাচ্চু, অধ্যাপক হারুনুর রশিদ, আতাউর রহমান বক্তব্য রাখেন।

**ভোরের কাগজ**

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সভা

**পার্বত্য চুক্তি মূল্যায়ন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার সিদ্ধান্ত বহাল**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা মূল্যায়ন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার মধ্য দিয়ে গতকাল বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা শেষ হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর এক সভার পর মাত্র নয় দিনের ব্যবধানে ডাকা স্থায়ী কমিটির ঐ বৈঠক পৌনে দুঘন্টাকাল স্থায়ী হয়।

২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত বৈঠকে খালেদা জিয়া সভাপতিত্ব করেন। দলীয় কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সম্ভাব্য চুক্তি, দেশের গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান নিয়ে বিভিন্ন মহলের তৎপরতা, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েই মূলত আলোচনা হয়।

গত ১৮ নভেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মুন্সিগঞ্জে ঘোষণা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরের দিনে নয়, চুক্তি দেখে পরে কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সূত্রগুলো জানায়, গতকাল স্থায়ী কমিটির সভায় বেগম জিয়ার ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দলের সমর্থিত প্রার্থীদের সহায়তা করার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নির্দেশদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠকে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কোনো ধরনের কারচুপি হলে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া দেশের মূল্যবান গ্যাস ও তেল সম্পদ অনুসন্ধানকে ঘিরে বিভিন্ন মহলের তৎপরতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখারও সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সাইফুর রহমান, কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ, ড. আর এ গণি, আঃ মতিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার



সালাম তালুকদার, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ছাড়াও দীর্ঘদিন পর ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

**ভোরের কাগজ**

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭

সংবাদ সম্মেলনে এরশাদের আহ্বান

**পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া সংসদে পেশ করুন**

**কাগজ প্রতিবেদক :** জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ পার্বত্য শান্তি চুক্তির খসড়া সংসদে পেশ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এজন্য প্রয়োজনে সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল সোমবার বারিধারায় তার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আহূত এই সংবাদ সম্মেলনে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ চার দফা প্রস্তাব উত্থান করেন।

সকল শ্রেণীর মানুষের মন থেকে আতঙ্ক, ভীতি, সংশয় মোচনের জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কাছে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করবেন–এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা–পাশাপাশি সরকারের উচিত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তার সরকারের আমলে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দেন এবং বলেন, অতীতে শান্তিবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল বলে কোনো সমাধান আসেনি। কিন্তু এবার তারা সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এরশাদ বলেন, জিয়াউর রহমানের সময় পার্বত্য অঞ্চলে অউপজাতিদের বসতি স্থাপন কর্মসূচি শুরু হওয়ায় শান্তিবাহিনী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এতে প্রায় ৩০ হাজার পাহাড়ি, বাঙালি ও সেনা পুলিশ বিডিআর সদস্য নিহত হয়। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের ঐ নীতি সঠিক ছিল না।

এক প্রশ্নের জবাবে এরশাদ বলেন, খালেদা জিয়া দেশ বিক্রি হয়ে যাবে বলে যে বক্তব্য দিচ্ছেন এর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হয় শান্তিচুক্তি হলে আওয়ামী লীগের একটা প্লাস পয়েন্ট বেড়ে যায় তাই তিনি তা চাচ্ছেন না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বীকার করেন, তার শাসনামলে উপজাতিদের ওপর অন্যায় অত্যাচার হয়েছিল তাই তাদের অনেকে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

## ভোরের কাগজ

২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭

সরকার-জনসংহতি আজ সপ্তম বৈঠক

### অবশিষ্ট অমীমাংসিত বিষয় সুরাহা হলে এবারই চুক্তি

**বিশেষ প্রতিনিধি :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি আজ বুধবার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সপ্তম দফা বৈঠকে বসছে। রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অন্যান্যবারের মতো এবারের বৈঠকটি হবে। দেশের এক দশমাংশ এলাকা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে বিরাজমান সহিংসতার অবসান ঘটাতে এবারের বৈঠকে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে উভয়পক্ষ আশাবাদী।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, টানা ৪ থেকে ৫ দিন বৈঠক চলার মতো করে তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে শান্তিচুক্তির ব্যাপারে একটি সমঝোতায় পৌঁছুনো পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যেতেও তারা আগ্রহী। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছেন সরকারের সদিচ্ছা আন্তরিকতার ওপর তারা নির্ভর করছেন। আলোচনায় এখনো ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় প্রশাসন, পাহাড়িদের স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উত্থাপিত অমীমাংসিত ইস্যুগুলো সম্পর্কে সরকার নমনীয়তা দেখালে এবারের বৈঠকেই চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে।

আজকের বৈঠকে জাতীয় কমিটির পক্ষে এর প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ নেতৃত্ব দেবেন। তার সঙ্গে থাকবেন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার প্রমুখ।

জনসংহতি সমিতির পক্ষে তাদের প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), তার সহকর্মী রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, রক্তউৎপল ত্রিপুরা বৈঠকে অংশ নেবেন। ভোরের কাগজ-এর খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে সুধাসিন্ধু খীসা বৈঠকে নাও যোগ দিতে পারেন। আর সরকারি কমিটির অপর সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী শান্তিচুক্তির পক্ষে জনমত গঠনে চট্টামের এক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় আজ নাও আসতে পারেন।



## ভোরের কাগজ

২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

### শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হোক

পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য আজ সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুদিন আগে আমাদের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, সেদিন পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির নেতারা সরকারের কাছ থেকে শান্তিচুক্তির খসড়া পাননি। যে কারণে আজকের বৈঠকে চুক্তি সই হবে কিনা সেটা অনিশ্চিত। আমরা আশা করবো, খসড়া পাওয়া না-পাওয়ার বিষয়টি যেন চুক্তি সইয়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

শান্তিকামী দেশবাসী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান একান্তভাবে চায়। তারা চায় রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান। আর সে কারণেই তারা অধীর আগ্রহে এমন একটি চুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে উল্লেখ্য, বিগত সরকারের আমল থেকেই জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা চলে আসছে। উভয়পক্ষের সমাধান-আকাঙ্ক্ষার কারণেই এই আলোচনা শুরু হয়। এবং এই আলোচনারই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে আলোচনায় অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়। বর্তমান সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির চতুর্থ দফা বৈঠকশেষে উভয়পক্ষ 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্য'-এর ঘোষণা দেয়। অতঃপর গত সেপ্টেম্বরের ষষ্ঠ বৈঠকশেষে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী বৈঠকে শান্তিচুক্তি সই হবে। আজ সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অবশ্য বিএনপিসহ কিছু কিছু রাজনৈতিক দল স্বাক্ষরিতব্য শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে। অথচ বিএনপিই এই শান্তি আলোচনার অর্থবহ অধ্যায় শুরু করেছিল। ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের সেই ভূমিকা এবং আজকের বিরোধিতার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব অনেকেরই চোখে লেগেছে। 'দেশ বিক্রি' বা 'জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন'-এর দাবিটি বিএনপির দিক থেকে উগ্র রাজনৈতিক স্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে যুক্তির অংশ কোথায়? সে প্রশ্ন অনেকেরই।

দেশে বিরাজমান একটি দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সমস্যার সমাধান হোক সেটা সকল বিবেকবান মানুষেরই একান্তভাবে কাম্য। সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা ঐকমত্যের এমন একটি পর্যায়ে এসেছেন, একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে যাকে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলে অভিহিত করা যায়। কোনো বহিস্থ বা অভ্যন্তরীণ কারণই যেন এই চুক্তি সইয়ের প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে না পারে।

কেননা এই চুক্তি পার্বত্য জেলাগুলোতেই কেবল শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে না, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশেও এক ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। জন্মভূমি থেকে উন্মুলিত মানুষগুলো নিজ বাসভূমে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এ চুক্তির ভূমিকা হবে ইতিবাচক। বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে যে অহেতুক দ্বন্দ্বের ও অবিশ্বাসের পরিবেশ বিরাজ করছে তা অবসানের ক্ষেত্রেও এই চুক্তির ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বর্তমান সরকার যেমন এরকম একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে তেমনি জনসংহতি সমিতিও একটি দায়িত্বশীল সংগঠনের সুনাম অর্জনে সমর্থ হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছেই তাই আমাদের আহ্বান, এই বৈঠকেই শান্তিচুক্তি সম্পাদন করুন। হিংসা বিদ্বেষ যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় থেকে পার্বত্য অঞ্চলকে বাঁচান।

**ভোরের কাগজ**

**২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭**

**পাহাড়িরা স্বদেশে ফিরে আসছে**

**-জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী**

পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য একটি দিন ধার্য হয়েছিল ১৬ নভেম্বর। সংবাদটি সেভাবেই প্রচারিত হয়েছিল। পরে জানা গেলো বা জানিয়ে দেওয়া হলো, ঐ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে না, তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদে কি কিছুটা উদ্বেগের কারণ ছিল? আমি জানি না। যারা এ বিষয়ে ভিতরের খোঁজ রাখেন তাঁরা বলতে পারবেন। বিরোধী দলের–প্রধান বিরোধী দল বলে চিহ্নিত করে লাভ নেই, কারণ বিরোধী দল বলতে আপাতত একটি দলই বোঝায়–দিক থেকে যে একটা ভয় দেখানো হয়েছিল, তার সঙ্গে শান্তিচুক্তির দিন পিছিয়ে দেওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কি নেই, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আশা করবো নেই। বিরোধী দল কতোদূর যেতে পারে, তার ক্ষমতা-সীমা সম্বন্ধে সরকারের নিশ্চয়ই একটা ধারণা এতোদিন হয়েছে। তবে স্বীকার করবো, ইদানীং কোনো কোনো ব্যাপারে সরকারের কথায় ও আচরণে দুর্বলতার লক্ষণ ধরা পড়ছে। আমার এ ব্যক্তিগত ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলেই খুশি হবো।

একদিকে যেমন এই অনিশ্চয়তা, প্রায় নিশ্চিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকে অস্পষ্ট ভবিষ্যতে ঝুলিয়ে রাখা, অন্যদিকে আবার খবর আসছে যা রীতিমতো আশাব্যঞ্জক। পাহাড়িরা দেশে ফিরছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সমতল চট্টগ্রামে ঘটনার দ্বিমুখী ধারা আছে। একদিকে, শান্তির পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়েছে,



এবং তা পাহাড়িদের মধ্যেই হয়েছে। যার ফলে প্রতিদিনই বেশ কিছু পরিবার ফিরে আসছে পিতৃভূমিতে। আবার অন্যদিকে, একটি রাজনৈতিক দুষ্টচক্র ভয়ানক সক্রিয় রয়েছে সবকিছু ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য। প্রকাশ্যে এদের একটি রাজনৈতিক বক্তব্য আছে–দেশের একটি অংশ ভারতকে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি–অন্যদিকে তাদের একটি অপ্রকাশ্য নাশকতামূলক কর্মধারা আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে খালেদা জিয়ার সভাশেষের উচ্ছৃঙ্খলতা, গুলিগালাজে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। হতে পারে যে, এই ঘটনায় মূল বিরোধী দলের কোনো প্রত্যক্ষ হাত ছিল না, দলের চারপাশে যারা বিভিন্ন বিবর থেকে এসে জুটেছে, এটা তাদেরই কাজ। কিন্তু ঘটনার দায় এড়াতে পারবে না মূল বিরোধী দল, যেহেতু সভামঞ্চ থেকেই– পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মতে–স্পষ্ট সঙ্কেত গিয়েছিল ও তারপরই সঙ্কেতের উদ্দিষ্ট স্থান থেকে গুলি চলেছিল।

পাহাড়িদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশত্যাগী পাহাড়িরা ভালোভাবে পুনর্বাসিত হলে, সেটা হবে আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় বিজয়। প্রথম বিজয় হয়েছিল ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি-বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়ের শূন্যতার অনেকটা ক্ষতিপূরণ করে দেবে, আশা করা যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দুইটি জয়।

তৃতীয় আর একটি জয় অর্জিত হবে, যেদিন চারটি স্তরে স্থানীয় সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে আজ সে প্রসঙ্গে যাবো না। এটা জমা রইলো ভবিষ্যতের জন্য। কেবলই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমরা।

রাজনৈতিক ইস্যুগুলো বোধহয় সবসময়ই জটিল হয়ে থাকে। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে কোনোটাই, কোনো সমস্যাই সমাধানের অতীত নয়, সেতো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আমি মনে করি, নেলসন ম্যান্ডেলার প্রাজ্ঞতা যদি আমাদের থাকতো, তাহলে এতোদিন সংসদীয় জটিলতারও মীমাংসা হয়ে যেতো। আমরা বাধা পড়ে আছি আমাদের জেদ, আমাদের সঙ্কীর্ণতা, আমাদের অদূরদর্শিতার বেড়াজালে। অতীতের ভূতগ্রস্ততা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাইলেও হতে পারি না, এ অসুবিধা তো আছেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে বিএনপির ব্যর্থতা অনেকটা এ কারণেই, আমার ধারণা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্মির ছত্রছায়ায় সমতলের বাঙালিদের বসতি স্থাপন ছিল বিএনপির জনক জেনারেল জিয়াউর রহমানের একটি রাষ্ট্রনীতি–পলিটিক্যাল পলিসি। কী ভেবে তিনি এটা করেছিলেন, তিনিই জানতেন। তবে এই পলিসির ফল কী হয়েছিল, তা আমরা জানি, বিশ্ববাসী জানে। দলে দলে পাহাড়ি তাদের স্বদেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী

ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। যারা দেশের মাটি আঁকড়ে পড়েছিল, তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক সদাসন্ত্রস্ত জীবন। এই সন্ত্রস্ত জীবনের অমানবিকতার প্রকৃত ছবি কখনো দেশের মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। মাঝখানে নিন্দিত হয়েছে কর্তব্য পালনরত সেনাবাহিনী। এরাও যে কী দুর্বিষহ জীবন-যাপনে বাধ্য হয়েছে, কিভাবে অসুস্থতা, মৃত্যুর শিকার হয়েছে, সে সংবাদও গোপন রাখা হয়েছে বছরের পর বছর। অর্ধসত্যে পরিপূর্ণ একটা বিকৃত ব্যাখ্যানই পেয়ে এসেছে দেশের মানুষ।

জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম পলিসির আরো একটি মাত্রাও আছে বলে অনুমান করা হয়, যা পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই দিকটিও ছিল যত্নে ঢাকা। গণতন্ত্রের অবর্তমানে এ বিষয়ে স্বচ্ছতারও কোনো সুযোগ ছিল না। আমরা না জানলেও বিদেশী সাংবাদিকরা জানতো, সব না জানলেও বেশকিছু জানতো, এবং বিদেশের প্রেসে তারা তা প্রকাশও করেছে। তা না হলে জার্মানির ঔপন্যাসিক গুনটার গ্রাস কদিনের জন্য বাংলাদেশে বেড়াতে এসে এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা বলতে যাবেন কেন? তিনি যা জানতেন, আমরা তা-ও জানতাম না।

একটি গোপন পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবেই বাংলাদেশ সরকার বহুদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে দেখে এসেছে বলে মনে হয়। এবং এ-ও অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, সেজন্য তাদের শান্তিপ্রচেষ্টা বেশি দূর এগোতে পারেনি। মিলিটারির সশস্ত্র অবস্থান ও দেশত্যাগীদের পুনর্বাসন, দুটোকে মেলানো সম্ভব হয়নি। এমন কোনো আশ্বাস বা ভরসা দেশত্যাগী পাহাড়িদের মনে সঞ্চার করা যায়নি যে বন্দুকধারী সৈন্যরা কেবল পাখি শিকার করতেই এসেছে এই নিসর্গের স্বর্গপুরীতে।

ধারণা করা যেতে পারে, পররাষ্ট্রনীতির (যদিও অঘোষিত) অংশ হওয়ার কারণেই শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সৈন্য প্রত্যাহার উচ্চারণমাত্র বিরোধী শিবিরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার একটি গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। আমি আগেই বলেছি, এখানেই এ সরকারের বড়ো সাফল্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই সাফল্যই অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থবিরতার গ্লানি কিছুটা হলেও মুছে দিয়েছে।

আজ সংবাদপত্রে দেখলাম, বিরোধী দল শান্তিচুক্তির প্রশ্নে তার বিরোধিতার সুর কিছুটা নামিয়েছে। বলেছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা আন্দোলনে যাবে। এরমধ্যে একটা স্বীকৃতি মনে হয় আছে যে সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে না দিয়েও শান্তিচুক্তি হতে পারে। তবু যা হোক।

পাহাড়িরা দেশে ফিরছে। এই স্রোত কেউ আটকাতে পারবে না। শান্তিচুক্তি হবে এবং দেশের সার্বভৌমত্বও যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।



এর যতোটা বিকিয়ে গিয়েছিল বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই, সেটার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট থাকতে হবে বর্তমান সরকারকে। সার্বভৌমত্ব, একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশের পক্ষে, যতোটা থাকা সম্ভব, বাংলাদেশের সূচনাপর্বেই তা ছিল। এর ওপর বাইরের কোনো শক্তি কখনো চড়াও হয়নি। তবে আমরা হয়েছি। আমরা যখন দেশবাসীকে তার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি, তার ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছি, তখন আমাদের সার্বভৌমত্ব কলঙ্কিত হয়েছে। আমরা যখন অনুন্নয়নের মূল্য পরিশোধ করেছি বিদেশী সাহায্যদাতার কাছে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর কাছে নতজানু হয়ে, যখন বাধ্য হয়েছি তাদের মনমতো বাজেট তৈরি করতে, তাদের ইচ্ছেমতো দেশের বাজারকে মুক্ত করে দিতে বিদেশী পণ্যের জন্য, তখন আমাদের সার্বভৌমত্ব কলঙ্কিত হয়েছে। যখন আমরা দিল্লিতে গিয়ে গঙ্গার পানির ওপর আমাদের দাবির কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ইসলামাবাদে গিয়ে আমাদের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের কথা বলতে পারিনি, তখন আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমরা একটি দরিদ্র ও ভীষণভাবে পরমুখাপেক্ষী দেশ হিসেবে, সব সময়ই সার্বভৌমত্বের ছায়া নিয়ে সন্তুষ্ট আছি, থাকতে বাধ্য হচ্ছি। তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশই সার্বভৌম নয়। প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম নয়। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে একটা শিষ্টাচারের ধারা আছে। সেই ধারায় আমরা অবশ্যই সার্বভৌম।

দেশত্যাগী পাহাড়িরা এতোদিন পরে দেশে ফিরছে, এর চেয়ে সুসংবাদ আর কী হতে পারে! কারো দয়ায় তারা দেশে ফিরছে না, নিজের জন্মগত অধিকারেই তারা দেশে ফিরছে, কথাটা যেন সবসময় মনে রাখি আমরা। যারা তাদের দেশে ফেরায় চিন্তিত, অকারণে চিন্তিত, যারা একটি স্বাধীন দেশের একটি অংশকে চিরস্থায়ীভাবে দেশের সেনা-অধিকৃত দেখতে চায় এবং স্বদেশের সেনা দিয়ে স্বদেশ জয়কে লজ্জার মনে করে না, তারা চুপ করে বসে থাকবে না, নানাভাবে স্বদেশ প্রত্যাগত পাহাড়িদের সঙ্গে সমতলের বাঙালিদের একটা বিরোধ বাধিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। এ ধরনের কাজকে গুরুতর শান্তি-শৃঙ্খলাবিনোধী কাজ ও অপরাধ বলে দেখতে হবে দেশের সরকারকে। সর্ষের মধ্যে ভূত থাকতে পারে। নানাভাবে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলতে পারে বিভিন্ন চিহ্নিত মহলে। সরকার নিশ্চয়ই জানে এ কথা। তবু সতর্ক থাকার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। সরকারের এই দ্বিতীয় বিজয় সম্পূর্ণ হোক আমাদের আসন্ন বিজয় দিবসের আগেই, আমরা তাই চাই।

**জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : শিক্ষাবিদ। সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।**

**ভোরের কাগজ**
২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭
শহীদ মিনারে নাগরিক সমাবেশ

**পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকারের শান্তি উদ্যোগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীগণ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সমাবেশে এই আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, দেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপন প্রয়োজন।

জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা সফল ও শান্তিচুক্তি অবশ্যই স্বাক্ষরিত হবে বলে সমাবেশে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বক্তাগণ। তারা বলেন, দেশের মানুষ শান্তি চায়, তারা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিএনপি নেত্রীর বক্তব্যে বিভ্রান্ত হবে না।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি কে এম সোবহান, এডভোকেট গাজীউল হক, সৈয়দ হাসান ইমাম, ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, শামসুন্নাহার সিদ্দিকী, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাজাহান, কৃষিবিদ ড. আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ড. এনামুল হক, ড. শামসুল হুদা হারুন, এডভোকেট সৈয়দ আহম্মদ, ড. হোসেন মনসুর, ড. শাহদৎ হোসেন, আলী আকসাদ, এডভোকেট আবদুস সালাম তালুকদার, কবি মহাদেব সাহা, ডা. জামাল উদ্দিন চৌধুরী, মাহাবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, ইসমত কাদির গামা, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমর্থনে অনুষ্ঠিত এ নাগরিক সমাবেশের সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, দেশবাসীর ইচ্ছার প্রতিফলন হবে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে।

কবীর চৌধুরী বলেন, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য অঞ্চলে ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে দেশ ভারত নিয়ে যাচ্ছে বলে বক্তব্য দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির চক্রান্ত চলেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সজাগ থাকতে হবে।

বিচারপতি কে এম সোবহান বলেন, থাইল্যান্ডে বসে একটি গোষ্ঠী বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।



এডভোকেট গাজীউল হক বলেন, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম বলেন, বেগম খালেদা জিয়া আপনি বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর প্রয়োজনে আপনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন যে, চুক্তির কোন ধারায় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, যারা ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের মৈত্রীচুক্তিকে গোলামির চুক্তি বলেছিল তারা আসলে পাকিস্তানের গোলাম ছিল। আজ তারাই পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে।

অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, অবৈধ অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেউ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করতে পারে না।

**ভোরের কাগজ**
২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য শান্তিচুক্তি হলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না –ইসলামী ঐক্যজোট**

ইসলামী ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে চুক্তি হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকবে না, ভারতের হাতে চলে যাবে। গতকাল পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আর এম আবদুল মতিন, মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, অধ্যাপক এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, মাওলানা শেখ লোকমান হোসেন প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। বিজ্ঞপ্তি।

**ভোরের কাগজ**
২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭
সরকার-জনসংহতি আলোচনা দ্বিতীয় দিনও অব্যাহত

**শিগগিরই চুক্তি করতে যাচ্ছি : সন্তু লারমা**

**বিশেষ প্রতিনিধি :** পার্বত্য তিন জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা কি হবে এবং স্থানীয় সরকার পরিষদসহ সরকারি ও পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে–এই দুটি বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির আলোচনায় এখনো

তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। অবশ্য গতকাল বৃহস্পতিবার উভয়পক্ষের এবারের সপ্তম দফা বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে সংক্ষিপ্ত প্রেসব্রিফিঙে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, 'খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। শিগগিরই আমরা চুক্তি করতে যাচ্ছি।'

গতকাল সারাদিনে দুই পর্বে মোট ৫ ঘন্টা আলোচনা চলে। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা এবং বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্থায়ী বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান, সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে তাদের প্রধান সন্তু লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা অংশ নেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার গাড়ি বারান্দায় এক ব্রিফিঙে সন্তু লারমা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। এসময় তার সঙ্গে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার ছিলেন। লিখিত এই মন্তব্য পাঠের পর উভয়পক্ষের কেউই সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভবনের ভিতরে চলে যান। আজ শুক্রবার সকালে বৈঠক আবার বসবে।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধের ইস্যুগুলো যেমন ভূমি ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় সরকার পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এখনো কোনো সমঝোতা হয়নি। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ রেখে কেবল তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে দেওয়ার পক্ষপাতি। তবে জনসংহতি সমিতি মনে করে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে না থাকলে পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। একইভাবে ভূমির ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে সরকার ও জনসংহতি সমিতি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে।

সূত্র জানায়, আগামীকাল শনিবারও বৈঠক চলবে। তবে প্রয়োজনে তা আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে। চুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো পক্ষই এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলছে না।

**ভোরের কাগজ**

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

সরকার-জনসংহতি আলোচনা

**গতকাল আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি, দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়েছে**

**হরি কিশোর চাকমা :** পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতির সপ্তম দফা বৈঠকের তৃতীয় দিনে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা



হয়নি। তবে জাতীয় কমিটির সরকারি দলের সদস্যদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির নেতাদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। সেখানে ভূমি সমস্যা, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ ছিল মূল আলোচ্য বিষয়।

গতকাল শুক্রবার বিকাল আড়াইটার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির দুই সদস্য সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় যান। পরে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমাও সেখানে উপস্থিত হন। কখনো এক সঙ্গে, আবারো কখনো পৃথক পৃথকভাবে জাতীয় কমিটির সদস্য ও জনসংহতি সমিতির নেতাদের মধ্যে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কথাবার্তা চলে। আজ সকালে দু'পক্ষের মধ্যে আবারো আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হবে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় কমিটির সরকারি দলের সদস্যদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির নেতাদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় পরস্পরের কাছে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তারা পরস্পরকে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করারও অনুরোধ জানান। জনসংহতি সমিতি ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড় দিতে রাজি হয়নি। তবে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এবং তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতাগ্রহণ, আদিবাসী পাহাড়ি ও স্থায়ী অপাহাড়িদের ভোটার সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা ছাড় দিতে পারে বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, নাটকীয় কিছু না হলে এ বৈঠকে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে দুপক্ষই 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের ব্যাপারে একমত। আজকের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ওপর নির্ভর করছে এ দফার বৈঠকের সময় আরো দীর্ঘায়িত হবে কিনা।

**ভোরের কাগজ**

৩০শে নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম আলোচনা

**কালও আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি, চুক্তির পক্ষে অগ্রগতি হয়েছে**

**হরি কিশোর চাকমা :** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির সপ্তম দফা বৈঠকের চতুর্থ দিনেও কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি। তবে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের ব্যাপারে

অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে। চুক্তির খসড়ার আলোকে প্রয়োজনীয় দিকগুলোর আইনগত বিধান করার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানা গেছে।

গতকাল শনিবার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসার কথা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ অসুস্থ থাকায় তা হয়নি। তবে জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দেখা করেন। তাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দুপক্ষের আলোচনায় অমীমাংসিত বিষয়গুলো ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পার্বত্য এলাকাসহ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দুপক্ষই উদ্বিগ্ন। সে কারণে দুপক্ষই যতো তাড়াতাড়ি সব শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে একমত হয়েছে।

সাধারণ পার্বত্য জেলা ও পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা গ্রহণ, আদিবাসী পাহাড়ি ও স্থায়ী অপাহাড়িদের ভোটার সংক্রান্ত বিষয়ে দুপক্ষেরই ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে সমঝোতা হলেও ভূমি সমস্যা বিষয়ে সামান্য কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র এ মতোভেদকে আইনগত বিষয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন, অন্য সবকিছুতে আমরা একমত।

অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় সরকারি পক্ষ জনসংহতি সমিতির নেতাদের কাছে অভিযোগ করেছেন, শান্তিবাহিনীর নামে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের ঠিকাদারদের কাছ থেকে অধিক হারে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। যার ফলে সরকারি কাজের অগ্রগতি হচ্ছে না। কর্ণফুলী হ্রদের মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে এবং শান্তিবাহিনীর দোহাই দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কিছু কিছু চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদপ্রার্থী ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছেন। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছেন বলে সূত্র জানায়।

অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া অনুযায়ী তিন জেলার স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আইনে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনা



ও পরামর্শ নেওয়া হবে। এরপর পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়াটি চূড়ান্ত করে জনসংহতি সমিতির নেতাদের হাতে দেওয়া হবে।

জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠলে আজ বিকেল ৩টায় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

**ভোরের কাগজ**

**১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭**

**সরকার-জনসংহতি সমিতির আলোচনা গভীর রাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আলোচনায় দুদিন বিরতির পর গতকাল রোববার বিকেল ৩টা থেকে গভীর রাত অব্দি বৈঠক চলে। বৈঠকের এক পর্যায় সন্ধ্যায় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর আলোচনাস্থল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এসে অবস্থান নেন।

উভয়পক্ষের এবারের সপ্তম বৈঠক গত বুধবার শুরু হয়। স্থানীয় সরকার পরিষদ বিশেষ করে পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমির ব্যবস্থাপনার মতো জটিল অমীমাংসিত ইস্যুগুলোতে আলোচনা এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে বলে জানা যায়। তবে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জনসংহতি সমিতি কিছুটা নমনীয় অবস্থান নিয়েছে। আর ভূমি ব্যবস্থাপনা, এর আইনি দিকগুলো উভয়পক্ষ এখন খতিয়ে দেখছে।

গতকাল বিকেলে উভয়পক্ষের ৩ জন করে ৬ নেতা বৈঠকে বসেন। রাত পৌনে এগারটা পর্যন্ত বৈঠকের অগ্রগতি পদ্মার বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকরা কিছুই জানতে পারেননি। প্রতিমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর সন্ধ্যায় বৈঠকস্থলে এলেও তখন পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। তবে তিনি বৈঠকে অংশ নেননি। আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বাইরে থেকে সরকারি প্রতিনিধিদের সহায়তা দেন। উল্লেখ্য, সরকারের পক্ষ থেকে যে তিনজন শান্তিচুক্তির খসড়া প্রণয়নে কাজ করছেন প্রতিমন্ত্রী তাদের একজন। এ প্রক্রিয়ায় জড়িত বাকি দুজন হচ্ছেন, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার।

**ভোরের কাগজ**

**২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭**

**আজ পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা**

**সানাউল্লাহ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা গত রোববার গভীর রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শান্তিচুক্তির খসড়ায় স্ব স্ব পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন। আজ মঙ্গলবার চূড়ান্ত চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর হতে পারে। তবে গতকাল রাত ১২টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরের দিনক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা অবশ্য ভোরের কাগজকে বলেছেন, এই বৈঠকেই শান্তিচুক্তি হবে।

গত রোববার বিকেল ৩টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে টানা ১০ ঘন্টা বৈঠক চলে। এই বৈঠকে শান্তিচুক্তির খুঁটিনাটি চূড়ান্ত হয় বলে একাধিক সূত্রে জানা যায়। বৈঠকের শেষ পর্যায়ে উভয় পক্ষের দুই প্রধান শান্তিচুক্তির খসড়ায় স্বাক্ষর করেন। পরে রাত ১টা ২০ মিনিটে জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ অতিথি ভবন পদ্মা ত্যাগ করার মুহূর্তে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান, যথাসময়ে তারা সবকিছু সকলকে অবহিত করবেন।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর আবার পদ্মায় যান। রাত সাড়ে ১০টায় তারা পদ্মা থেকে বেরিয়ে যান। সে সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে চিফ হুইপ বলেন, 'আপনাদের (সাংবাদিকদের) না জানিয়ে কিছু করা হবে না।' জানা যায়, গতরাতে উভয়পক্ষ পুরো বিষয় পর্যালোচনা করে।

খসড়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে জিইয়ে থাকা একটি বড়ো সমস্যা সমাধানের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। দেশের এক দশমাংশ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জমে থাকা ক্ষোভ অসন্তোষ নিরসনে এ ঘটনা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাহাড়ি ও বাঙালি দুই সম্প্রদায়ের সহিংস সংঘাত, পাহাড়িদের দাবির পক্ষে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সংগ্রাম এবং বিদ্রোহী তৎপরতা নিরসনে ও নিরাপত্তা রক্ষায় দেশের সামরিক বাহিনীর অভিযানে উভয় পক্ষের কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। সম্পদ নষ্ট হয়েছে কয়েকশ' কোটি টাকার। স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকার কখনো সংঘাত, কখনো আলোচনায় এ সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি।



বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০০ দিনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি গত বছরের ২১ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে প্রথম বৈঠক করে। তারপর এক বছরেরও কম সময়ে উভয়পক্ষ ৭ দফা বৈঠক করে (এর ৬ দফাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত) শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর্যায়ে পৌঁছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং শান্তির পক্ষে অনুকূল জনমতই মূলত উভয়পক্ষকে বেশ নমনীয় অবস্থান নিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছুতে সাহায্য করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করছেন।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় গঠন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন, এসব জেলার সমন্বয়ে একটি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির ব্যবস্থাপনা, করারোপ, ভূমি প্রশাসন, আইন, বিধি-বিধান, প্রবিধান প্রণয়ন, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ, সাধারণ ক্ষমা ও পুনর্বাসন, পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলার মতো সকল গুরুত্বপূর্ণ ও খুঁটিনাটি বিষয়ে একমত হয়ে গত রোববার রাতে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষর করে। সে বৈঠকে সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আতাউর রহমান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা অংশ নেন। বৈঠকে সরকার পক্ষকে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. আলমগীর এবং জনসংহতি সমিতিকে চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় সাহায্য করেন বলে জানা যায়।

সূত্র জানায়, রোববার ঠিক হয়েছিল গতকাল সোমবার চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর হবে। কিন্তু বৈঠকের সময়ই সন্তু লারমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অসুস্থতার কারণেই গতকাল চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। তিনি সুস্থ হলে আজ চুক্তি স্বাক্ষর হবে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে সরকারি জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল, মন্ত্রিসভার সদস্যরা, উচ্চপদস্থ সরকারি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ উপস্থিত থাকতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সরকার ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ একটি সংবাদ সম্মেলনেও বক্তব্য দেবেন বলে জানা যায়।

তবে চুক্তির বিস্তারিত সরকার বা জনসংহতি সমিতি কেউই এখন প্রকাশ করবে না এমন একটি সিদ্ধান্তও রোববারের বৈঠকে হয়েছে বলে জানা যায়। জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশন ডেকে সেখানে সর্বপ্রথম চুক্তি প্রকাশ করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। সংসদে চুক্তি অনুমোদন করাও হতে পারে।

তবে এসব কোনো পরিকল্পনাই এখনো চূড়ান্ত নয় বলে সূত্র জানায়। আসলে গোটা বিষয়টি নিয়ে সরকার প্রচণ্ডরকম গোপনীয়তা রক্ষা করে চলায় কোনো বিষয়েই কেউ কিছু নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। জাতীয় কমিটির সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা অবশ্য ভোরের কাগজ-এর খাগড়াছড়ি জেলা প্রতিনিধি আজিম-উল হককে জানিয়েছেন, এই বৈঠকেই চুক্তি স্বাক্ষর হবে।

**ভোরের কাগজ**

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**চুক্তিতে যা থাকছে**

**হরি কিশোর চাকমা :** গত রোববার গভীর রাতে সরকারি জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়েছে। একাধিক সূত্রে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক একটি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন ও পুনর্গঠন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, সেনাবাহিনীর অবস্থান, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের আত্মসমর্পণ, সাধারণ ক্ষমা ও পুনর্বাসনসহ সকল বিষয়ে একমত হয়ে উভয়পক্ষ একটি খসড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির বিষয়বস্তু কোনো পক্ষ প্রকাশ না করলেও একাধিক সূত্রে এ সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যায়। তাতে চুক্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকবে বলে জানা যায়।

**উপজাতীয় মন্ত্রণালয় :** সরকার উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করবে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগকে উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হবে। এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ করবে সরকার। তবে প্রথম মেয়াদে মন্ত্রী মনোনয়ন দেবে জনসংহতি সমিতি।

**পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ :** তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এ পরিষদের প্রধান হবেন একজন উপজাতীয় চেয়ারম্যান। পরিষদে থাকবেন ১৮ জন সদস্য। উপজাতীয়দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এবং অউপজাতীয়দের জন্য সদস্যদের আসনসংখ্যা সংরক্ষিত থাকবে। অউপজাতীয়দের সদস্য সংখ্যা হবে এক-তৃতীয়াংশ। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রথম গঠনের পর জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য এর দায়িত্বে থাকবেন। এ সময়ে অউপজাতীয় সদস্যদেরও মনোনয়ন দেবে জনসংহতি সমিতি।



**পার্বত্য জেলা পরিষদ :** তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তন করে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' করা হবে। প্রতিটি পরিষদের প্রধান হবেন একজন উপজাতীয় চেয়ারম্যান। এ ছাড়াও উপজাতীয়দের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অউপজাতীয়দের সংখ্যানুপাত ভিত্তিতে ৩০ জন সদস্য থাকবেন। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

**পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ উপজাতীয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। এ ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের জেলা পরিষদসমূহের এবং সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে। বিদ্যমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে নিয়ে আসা হবে। এর প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের নিয়ন্ত্রণ করবে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ।

**পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বিষয়/বিভাগসমূহের যাবতীয় কাজের নিয়ন্ত্রণ করবে পার্বত্য জেলা পরিষদ। এ ছাড়াও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিষয়/বিভাগসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন তৈরি করবেন। পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে এবং ঐ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে সরকারের বিধি অনুযায়ী অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

**উপজাতীয় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা :** পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তিন চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জাতীয় সংসদ সদস্য ও তিন পার্বত্য রাজা উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।

**ভূমি প্রশাসন ও কর আরোপ :** পার্বত্য এলাকার ভূমি প্রশাসন ও ভূমিকর আরোপের ক্ষমতা থাকবে পার্বত্য জেলা পরিষদের। পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো জায়গা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না। তবে, সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই হ্রদ এলাকা, রাষ্ট্রীয় ভারি শিল্প এলাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

**ভূমি বিষয়ক কমিশন :** পার্বত্য এলাকার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা

হবে। কমিশন যে রায় দিবে তার বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাবে না। কমিশনে চাকমা, বোমাং ও মং রাজা, পার্বত্য এলাকার তিন সাংসদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকবেন।

**তিন পার্বত্য রাজার অবস্থান :** চাকমা, বোমাং ও মং রাজারা স্ব স্ব পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় যোগদান করে তাদের বক্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। এ ছাড়াও চাকমা সার্কেলের কিছু অংশ খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত হওয়ায় খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের সভায় চাকমা রাজা এবং বোমাং সার্কেলের কিছু অংশ রাঙ্গামাটি জেলায় অবস্থিত হওয়ায় বোমাং রাজা রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদে যোগদান করে সংশ্লিষ্ট অংশের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

**ভোরের কাগজ**

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিচিত্র ভৌগোলিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সার্কেল ভিত্তিতে স্থানীয় রাজাদের রাজা শাসিত পার্বত্য অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে প্রশাসনিকভাবে চট্টগ্রাম জেলারই অংশ ছিল। ১৮৬০-এ হয় পৃথক জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ৮০'র দশকের গোড়ার দিকে গঠিত হয় তিন জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান। আইনগত ও প্রশাসনিক বিবর্তন এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের বিভিন্ন ধাপে রক্তাক্ত সংঘাতসহ নানা ঘটনাধারায় শতাব্দীর প্রান্তসীমায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে শান্তির নতুন অধ্যায়। পেছনে ফেলে আসা শতাধিক বছরের ঘটনাপঞ্জির আলেখ্য এখানে দেওয়া হলো। গ্রন্থনা করেছেন সানাউল্লাহ ও নাঈম মোহাইমেন।

**পার্বত্য চট্টগ্রাম :** আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল, যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১০ শতাংশ। এর বনাঞ্চল দেশের বনভূমির মোট আয়তনের ৪৭ শতাংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০টি উপজাতীয় গোষ্ঠী রয়েছে–চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, চাক, খিয়াং, খুমি, মুরং, লুসাই, বম এবং পাংখো।

**১৭১৫ :** চাকমা রাজা জাল্লাল খান মুঘল নওয়াবের সঙ্গে চুক্তি করেন।

**১৭১৫-১৭৬০ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং সুতা/কার্পাস থেকে মুঘল নওয়াবকে রাজস্ব পরিশোধ করা হতো। সেখান থেকে 'কার্পাস অঞ্চল' নামটি আসে।



**১৭৬০-১৭৮০ :** স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা বজায় থাকে, তবে ব্রিটিশ শাসকদের রাজস্ব প্রদান করতে হতো।

**১৭৭৭-১৭৮০ :** চাকমা যোদ্ধারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করে।

**১৭৮৭ :** চাকমা রাজা জান বখশ খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসে। ব্রিটিশরা এলাকাটির প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করে। হান্টার ১৮২৯ সালের রেগুলেশনে উল্লেখ করেন, যাতে বলা হয়েছে : '১৮২৯ সালে কমিশনার হ্যালহেড বলেন যে, পার্বত্য এলাকার উপজাতীয়রা ব্রিটিশ প্রজা নয় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার আমাদের নেই।'

**২০ জুন, ১৮৬০ :** ৩৩০২নং প্রজ্ঞাপন বলে চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকাকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করা হয় এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামে একটি নতুন জেলার উৎপত্তি হয়।

**১৮৬১ :** পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল আইন পাস হয়। এই আইনে আইনের এখতিয়ারবহির্ভূত বিষয়ে গভর্নর জেনারেল বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাসকৃত রেগুলেশনগুলোয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

**১৮৭০ :** গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আইন পাস হয়। এতে 'বিশেষ এলাকাসমূহ'-এর সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয় গভর্নর জেনারেলকে।

**১৮৮১ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ রেগুলেশন ১৮৮১-এর আওতায় পার্বত্য এলাকার জনগণকে তাদের নিজস্ব স্বাধীন পুলিশবাহিনী গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়।

**১ মে, ১৯০০ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল আইন পাস হয়। সংখ্যালঘু উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সাহায্য করার লক্ষ্যে এলাকাটিকে একটি 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে প্রশাসন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমা বোমাং ও মং সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। সর্দার ও কারবারিরা স্থানীয় প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। এই ম্যানুয়াল রেগুলেশন ৩৪-এর আওতায় এলাকাটিতে পার্বত্য এলাকার বাইরের লোকদের জমি কেনা বা জমির মালিক হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

**১৯২০ ও ১৯২৫ :** উপজাতীয় লোকদের নিরাপত্তা আরো জোরদারের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল আইনের সংশোধন করা হয়।

**১৯৩৫ :** ইন্ডিয়া রুল আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের (১৯০০) বৈধতা অনুমোদন করে ও স্বীকৃতি দেয়।

১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ : র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড পার্বত্য চট্টগ্রামকে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে।

**১৫-২০ আগস্ট, ১৯৪৭ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হলে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বোমাং রাজপরিবারের কিছু নেতা এর প্রতিবাদে বান্দরবানে বর্মী পতাকা উত্তোলন করে।

**২১ আগস্ট, ১৯৪৭ :** বালুচ রেজিমেন্টের পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন। তারা ভারতীয় পতাকা নামানোর জন্য বিক্ষুব্ধদের ওপর বল প্রয়োগ করে এবং বালুচ রেজিমেন্ট সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। পাকিস্তানে উপজাতীয়দের অধিকার সংরক্ষিত হবে কি না, তা নিয়ে উপাজীয় নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা কলহে লিপ্ত হয়। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি বড়ো গ্রুপ তাদের ভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে চলে যায়।

**১৯৪৮ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ রেগুলেশন-১৮৮১ অপসারণের পর নতুন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। নিরাপত্তার ভয়ে কয়েক হাজার উপজাতীয় ভারত ও বার্মায় আশ্রয় নেয়। পরে উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভারতীয় ও বর্মী সরকার আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির উদ্যোগ নিলে পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল আইন মেনে চলতে রাজি হয়।

**১৯৫০ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল আইন লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সরকার নানাইয়ারচর, লংগদু ও বান্দরবানে কয়েকশ মুসলমান পরিবারকে বসতি স্থাপন করতে দেয়।

**১৯৫৬ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল আইন-১৯০০ প্রথম সংবিধানে অনুমোদিত হয়।

**১৯৬২ :** পাকিস্তান সরকার ঐ আইনে 'পৃথক শাসিত এলাকা' শব্দগুচ্ছের স্থলে 'উপজাতীয় এলাকা' শব্দগুচ্ছ সংযোজন করে আইনটিতে বড়ো ধরনের পরিবর্তন করে এবং উপজাতীয় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে শুরু করে।

**১৯৫৭-১৯৬২ :** কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাঁধ নির্মিত হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০ শতাংশ কৃষি ভূমি বাঁধের দখলে চলে যায়। ফলে হাজার হাজার উপজাতীয় লোক তাদের আয়ের উৎস হারায়।

**১৯৬৪ :** পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব লোক কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের কারণে জমি হারায় তাদেরকে অন্য পুনর্বাসন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পুনর্বাসন উদ্যোগে অসন্তুষ্ট হয়ে অর্ধ লাখ পরিবার লংদু, বোরকোন ও বাঘাইছড়ি পুনর্বাসন এলাকা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। এসব চাকমা শরণার্থীর মধ্যে ২০ হাজারকে পরবর্তীকালে ভারত সরকার অরুণাচলে বসবাস করতে দেয়। বাকিরা ত্রিপুরা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বসবাস করতে থাকে।



**১৯৭১ :** বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মেজর জিয়াউর রহমান ও তার বাহিনী উপজাতীয়দের সাহায্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ভারতে চলে যান। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

**৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ :** পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের পানছড়ি এলাকা ছেড়ে যাওয়ার অ-উপজাতীয় মুক্তিবাহিনীরা ১৪ জন উপজাতীয়কে হত্যা করে। উপজাতীয় মুক্তিযোদ্ধারা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তা করতে মানা করে।

**২৯ জানুয়ারি, ১৯৭২ :** সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান চাকমা প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন যে, চাকমারা সরকারি চাকরিতে তাদের যথাযোগ্য অংশ পাবে।

**১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ :** চাকমা রাজার প্রতিনিধিরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবিসংবলিত চার দফা ইশতেহার শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশ করেন।

**২৪ এপ্রিল, ১৯৭২ :** চাকমা রাজার পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই চার দফা ইশতেহার বাংলাদেশ সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির কাছে পেশ করেন।

**২৪ জুন, ১৯৭২ :** লারমা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সংহতি দল' নামে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

**৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩ :** জনসংহতি সমিতির সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী গঠিত। সন্তু লারমা শান্তিবাহিনীর প্রধান।

**১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশে কোনো উপজাতি গোষ্ঠী নেই, প্রত্যেকেই বাঙালি।' ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে উপজাতীয় জনসংহতি সমিতি সংসদে দুটি আসনে বিজয়ী হয়। উপজাতীয়দের পক্ষ থেকে লারমা ও চাই থোয়াই রোজা নির্বাচিত হন।

**আগস্ট, ১৯৭৫ :** শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে যায়। লারমা আত্মগোপন করেন।

**১৯৭৬ :** জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয় এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের এরিষা কমান্ডারকে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত কর হয়। চট্টগ্রামের অ-উপজাতীয় বাঙালিদের পুনর্বাসনের জন্য বোর্ডটি একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। সে অনুযায়ী অ-উপজাতীয় বাঙালিদের পাহাড়ি এলাকায় পুনর্বাসন করা হয় এবং মৌলিক খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদেরকে সরকারি ঋণ দেওয়া হয়।

**২৯ মে, ১৯৭৭ :** স্থানীয় সেনাবাহিনীর ওপর শান্তিবাহিনী বড়ো ধরনের একটি হামলা চালায়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে এতোটাই শক্তিশালী করা হয় যে, স্থানীয় অধিবাসী ও সেনাবাহিনীর অনুপাত দাঁড়ায় **১ : ৫**।

**২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ :** চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মঞ্জুর শান্তিবাহিনী চাকমাদের উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'আমরা তোমাদের চাই না। তোমাদের যেখানে খুশি যেতে পারো। আমরা শুধু তোমাদের এলাকা চাই।'

**১৯৭৮ :** জনসংহতি সমিতির মধ্যে আদর্শগত বিরোধের সূত্রপাত।

**১৯৭৯ :** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর আই চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি সার্ভে টিম উপজাতীয়দের সাক্ষাৎকার নেয়। ফলাফলে দেখা যায়, কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। ৯৩% উপজাতীয় অধিবাসী মনে করে বাঁধের ফলে বিরাট অঞ্চল ডুবে যাওয়ায় আগে তারা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ছিল। ৮৯% দাবি করেছে, বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর বন্যায় তারা তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে এবং ৬৯% জানিয়েছে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তারা অপর্যাপ্ত অর্থ পেয়েছে।

**২৫ মার্চ, ১৯৮০ :** কলমপতি গণহত্যা : স্থানীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার একটি বৌদ্ধ মন্দিরে চাকমাদের একটি সভা আহ্বান করে। অভিযোগ রয়েছে সৈন্যরা ঐ সমাবেশের ওপর গুলি চালায় এতে প্রায় ৩০০ জন নিহত হয়। অ-উপজাতীয়রা এলাকার বৌদ্ধ মন্দির ও চাকমা বসতিগুলোতে হামলা চালায়। স্থানীয় সাংসদ উপেন্দ্র লাল চাকমা ন্যায়বিচার চেয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন। এলাকাটিতে সফররত দুই বিরোধীদলীয় সাংসদ শাজাহান সিরাজ ও রাশেদ খান মেনন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

**২৫ এপ্রিল, ১৯৮০ :** সংবাদ সম্মেলনে ৩ সাংসদ অবিলম্বে বাংলাদেশের সংবিধানে চাকমাদের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা, এলাকাটি থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসন বন্ধ করার দাবি আনান।

**ডিসেম্বর, ১৯৮০ :** জিয়া সরকার কলমপতি গণহত্যার সামান্য নিন্দা জানিয়ে সমস্যাবিক্ষুব্ধ অঞ্চল সংক্রান্ত একটি বিল পাস করে। নতুন আইনে চট্টগ্রাম পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর ও নন-কমিশন্ড সেনা কর্মকর্তাদেরকে অবৈধ কাজের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গুলি করার এবং অস্ত্র মজুদ রাখা হয়েছে সন্দেহে বাড়িঘর তল্লাশির অধিকার দেওয়া হয়।

**২৯ জুলাই, ১৯৮০ :** চাকমা নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের কিছু ভুলত্রুটি হচ্ছে। উপজাতীয়দের প্রতি আমরা অবিচার করছি। একটি রাজনৈতিক সঙ্কটকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মোকাবিলা করা



হচ্ছে। তবে এখনো খুব সহজেই এর রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। আমাদের পক্ষে এসব এলাকা দখলের এবং উপজাতীয় জনগণকে একদিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। আমরা অন্তত উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে একটি বৈঠক ডাকতে পারি এবং তাদের দাবিগুলো জানতে চাইতে পারি।

**৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ :** প্রেসিডেন্টের উপজাতীয়বিষয়ক সচিব সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় প্রতিনিধিদের একটি দল প্রেসিডেন্ট সাত্তারের সঙ্গে দেখা করে। সাত্তারের সরকার উপজাতি সমস্যার সমাধানে এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। জিয়ার শাসনামলে করা শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রের কয়েকটি কোটাও বাতিল করা হয়।

**২৭ জুলাই, ১৯৮২ :** জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর তিন চাকমা নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মান্নাফকে তার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রাঙ্গামাটি পাঠান।

**২৪ অক্টোবর ১৯৮২ :** জনসংহতি সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে পার্টি স্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও প্রীতি কুমার চাকমা দুই গ্রুপের নেতৃত্ব দেন।

**১৪ জুন ১৯৮৩ :** জনসংহতি সমিতির দুই গ্রুপ প্রথম পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

**৩ অক্টোবর, ১৯৮৩ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্কট সমাধানের জন্য জেনারেল এরশাদ কয়েকটি চুক্তির প্রস্তাব দেন।

**১০ নভেম্বর, ১৯৮৩ :** ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমার ইজারা গ্রামের কল্যাণপুর ক্যাম্পে প্রীতি গ্রুপের হামলায় মানবেন্দ্র লারমা তার ৮ সহযোগীসহ নিহত হন।

**৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ :** লারমা গ্রুপ জনসংহতির দ্বিধাবিভক্তি ও মানবেন্দ্র লারমা হত্যাকাণ্ডে প্রীতি গ্রুপকে দায়ী করে বিবৃতি দেয়।

**২৩ জানুয়ারি ১৯৮৪ :** প্রীতি গ্রুপ পাল্টা বিবৃতিতে মানবেন্দ্র লারমা হত্যাকাণ্ডের জন্য লারমা গ্রুপকে দায়ী করে।

**১৯৮৪ :** আদিবাসী সংক্রান্ত জাতিসংঘের ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এক রিপোর্টে লন্ডনভিত্তিক অ্যান্টিস্লেভারি সোসাইটি এর আগের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধির পেশ করা রিপোর্টের নিন্দা করে। বিশেষ করে, বাংলাদেশের কোনো আদিবাসী নেই বলে বাংলাদেশ প্রতিনিধি যে দাবি করেন এটাই সবচেয়ে বেশি নিন্দার সম্মুখীন হয়।

**২৯ জুন, ১৯৮৫ :** সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্য জীবনে ফিরে আসে। প্রীতি কুমার চাকমা ও ভবতোষ দেওয়ান-গ্রুপের এই দুই নেতা অবশ্য আত্মগোপনে থেকে যান।

**২ আগস্ট, ১৯৮৫ :** জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপে বাংলাদেশ প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত অ্যান্টিস্লেভারি সোসাইটির রিপোর্টের কড়া সমালোচনা

করেন। তিনি এই রিপোর্টকে 'ভিত্তিহীন অভিযোগ' এবং বাংলাদেশ 'মর্যাদাহানীর প্রচেষ্টা' হিসেবে উল্লেখ করেন।

**২১ অক্টোবর, ১৯৮৫ :** এরশাদ সরকারের আমলে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম সংলাপ শুরু হয়। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার পুঁজগাং এলাকায় এই আনুষ্ঠানিক বৈঠক বসে।

**২ জুন/২৭ জুলাই ১৯৮৬ :** অ-উপজাতীয় জনগণের ওপর শান্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন দুটি হামলা চালায়। বাঙালি অধিবাসীরা প্রতিশোধ হিসেবে চাকমা এলাকায় লুটতরাজ করে। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একাধিক পর্যায়ে ৫০ হাজারের বেশি উপজাতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি রয়েছে বলে চাকমারা যে অভিযোগ তোলে–সরকার তা নাকচ করে দেয়। সরকার জানায়, সেখানে ৩০ হাজার বাঙালি রয়েছে।

**১৯৮৬ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হয়।

**১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ :** এ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ জেনারেল এরশাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং চাকমা সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা চালান। সহিংসতার মাধ্যমে এ সমস্যা মোকাবিলায় শান্তিবাহিনীর প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয়। পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকারকে প্রধান করে এরশাদ একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন।

**৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ :** দুই বছর দুই মাস বিরতির পর পানছড়ি থানার পুঁজগাং এ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনসংহতি সমিতি দ্বিতীয় বৈঠকে বসে।

**২৪, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ :** পুঁজগাঙে সেনা কর্মকর্তা ও জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠক হয়।

**১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ :** সেনা কর্মকর্তা ও জনসংহতি সমিতির চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

**১৯ জুন, ১৯৮৮ :** খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে সেনা কর্মকর্তা ও জনসংহতি সমিতির পঞ্চম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

**৮ আগস্ট, ১৯৮৮ :** আদিবাসী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কিং গ্রুপ নেদারল্যান্ডে চট্টগ্রাম কমিটি গঠন করে।

**১৪, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮ :** এরশাদ সরকারের আমলে সেনাকর্মকর্তা জনসংহতির ষষ্ঠ ও শেষ বৈঠক সমাধান ছাড়াই শেষ হয়।

**২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ :** তিনটি জেলার সব কটিতেই স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত একটি বিল সংসদে অনুমোদন করা হয়।

**৪ মে ১৯৮৯ :** স্থানীয় সরকার ও তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার জন্য শান্তিবাহিনী সশস্ত্র অন্তর্ঘাতমূলক হামলা চালায়। সাব-ডিস্ট্রিক্ট কমিটির চেয়ারম্যান আবদুর রশীদ সরকারকে হত্যা করে। জবাবে অ-উপজাতীয়



অধিবাসীরা স্থানীয় চাকমা গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনাটি লংগদু হত্যাকাণ্ড হিসেবে পরিচিত। এসব সহিংসতার মধ্যেই সামরিক সরকার নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন করে।

**জুলাই-আগস্ট ১৯৯০ :** জাতিসংঘের আর্থিক ও সামাজিক মানবাধিকার সংস্থা (আদিবাসী সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির ওপর পর্যালোচনা করে। এতে বলা হয় ভারতে প্রায় ৭০,০০০ উপজাতীয় শরণার্থী রয়েছে।

**ডিসেম্বর, ১৯৯০ :** স্থানীয় সরকারের অপসারণের দাবি করে উপজাতীয় ছাত্রদের কমিটি একটি সংবাদ সম্মেলন করে।

**১০ এপ্রিল, ১৯৯২ :** অ-উপজাতীয় ও চাকমা যুবকদের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে বসতি স্থাপনকারী এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ লোদাং নামের চাকমা গ্রামে হামলা করে এবং ৩০০ জন প্রাণ হারায়। এই গণহত্যা তদন্তের জন্য খালেদা জিয়ার সরকার একটি কমিটি গঠন করে।

**১৯ মে, ১৯৯২ :** এলাকাটিতে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় অপর একটি দাঙ্গার ফলে ছাত্র আন্দোলনের জন্য একটি উপজাতীয় বৃহত্তর চট্টগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

**২০ মে ১৯৯২ :** সহিংসতা প্রতিরোধ সরকারের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে রাঙামাটির স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান পদত্যাগ করেন।

**৮ জুলাই, ১৯৯২ :** স্থানীয় সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিএনপি সরকার সংসদে একটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের উপজাতীয় সাংসদদের তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও বিলটি পাস করা হয়।

**১০ জুলাই, ১৯৯২ :** চাকমা সঙ্কট সমাধানের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমেদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচিত সাংসদদের অন্তর্ভুক্ত না করায় তিনটি স্থানীয় সরকার এই কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করে।

**১ আগস্ট, ১৯৯২ :** জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে। এ সময় থেকে দফায় দফায় মোট ৩৫ বার অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়। কখনো জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে কখনো সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথভাবে এই অস্ত্রবিরতি পালিত হয়। সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অস্ত্রবিরতির এই ৫ বছরে সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অসংখ্য লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।

**৭ অক্টোবর, ১৯৯২ :** লোদাং হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি শান্তিবাহিনীকে দায়ী করে প্রতিবেদন পেশ করে।

**৫ নভেম্বর, ১৯৯২ :** বিএনপি সরকারের আমলে অলি আহমদের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে শুরু হয়। জনসংহতির পক্ষে জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বৈঠকে নেতৃত্ব দেন।

**১৭ নভেম্বর, ১৯৯২ :** নানিয়ারচর গণহত্য : উপজাতীয় ছাত্র বিক্ষোভের জবাবে নানিয়ারচর গ্রামে সেনাবাহিনী হামলা চালায়। এতে ৯০ জন উপজাতীয় নিহত হয়। যদিও সরকার এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তবে এর ফলাফল অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

**২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়।

**২২ মে, ১৯৯৩ :** খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অলি আহমদ ও সন্তু লারমার নেতৃত্বে উভয়পক্ষের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**১৪ জুলাই, ১৯৯৩ :** বিএনপি সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়।

**১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ :** খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**২৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ :** অলি আহমদের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত।

**১৫-২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ :** বিএনপি সরকারের আমলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ৩৭৯টি পাহাড়ি পরিবারের ১ হাজার ৮৪১ জন শরণার্থী প্রথম দফায় দেশে ফিরে আসে।

**৫ মে, ১৯৯৪ :** খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বিএনপি সরকারের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**৪ জুন, ১৯৯৪ :** সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের কমিটির একটি সাব কমিটি গঠিত। সাব কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির বৈঠক হয়।

**১০ জুলাই, ১৯৯৪ :** সাব কমিটির সঙ্গে দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক।

**জুলাই, ১৯৯৪ :** দ্বিতীয় দফায় ত্রিপুরা থেকে আরো ৬৮৪টি পরিবারের ৩ হাজার ৩৪৫ জন শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন।

**২৮ আগস্ট, ১৯৯৪ :** দুদুকছড়িতে সাব কমিটি ও জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ :** মেননের সাবকমিটির সঙ্গে সন্তু লারমার প্রতিনিধিদের ৪র্থ বৈঠক দুদুকছড়িতে অনুষ্ঠিত।

**মার্চ, ১৯৯৫ :** মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের '১৯৯৪-এর মানবাধিকার প্রতিবেদন'-এ বলা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের অ-উপজাতীয় বসতি স্থাপন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭-এ যেখানে ৩% বাঙালি ছিল, ১৯৯৪-তে তা ৪৫%-এ দাঁড়িয়েছে।



**২৩ মার্চ, ১৯৯৫ :** উপজাতীয় ছাত্রদের ওপর হামলার জন্য বান্দরবান পুলিশকে অভিযুক্ত করে ৪৫ জন বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন বিচারপতি কে এম সোবহান, ড. কামাল হোসেন, আবদুল মান্নান চৌধুরী, ড. হুমায়ুন আজাদ এবং মেঘনা গুহ ঠাকুরতা।

**১২ জুলাই, ১৯৯৫ :** দুদুকছড়িতে সাবকমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ৫ম বৈঠকে বসে।

**২৫ অক্টোবর, ১৯৯৫ :** বিএনপি সরকারের আমলে কোনো সমাধান ছাড়াই মেননের সাবকমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ ও সরকারের সঙ্গে ত্রয়োদশ বৈঠক শেষ হয়।

**১৯৯৬ :** পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিকায়ন সম্পর্কে জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক অফ এশিয়া প্যাসিফিক অস্ট্রেলিয়া প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯৪ সালে পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি ১৫ জন উপজাতীয় লোকের জন্য ১ জন করে সামরিক অফিসার নিয়োগ করা হয়।

**২৩ জুন, ১৯৯৬ :** শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নির্বাচিত হয়। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী এলাকাগুলোয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা সংসদে আসন লাভ করে। নির্বাচন পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শান্তিবাহিনী ২৮ জন বাঙালি কাঠুরিয়াকে হত্যা করে।

**২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ :** স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'চাকমা সমস্যার' সমাধান সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার সামনের সারিতে নেই।

**৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ :** মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকার জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। কমিটিতে সরকার, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সাংসদদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে বিএনপির দুই সাংসদ এই কমিটির কাজে শেষ পর্যন্ত অংশ নেননি। এই কমিটিই পরে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপের প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

**২১ ও ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ :** আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে ২১ ডিসেম্বর শুরু হয়। ২ দিন মুলতবি থাকার পর ২৪ ডিসেম্বর বৈঠক অব্যাহত থাকে। সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমা বৈঠকে নেতৃত্ব দেন।

**১৯৯৭ :** 'জীবন আমাদের নয়' শীর্ষক তৃতীয় আপডেট রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন (নেদারল্যান্ডস) বলেছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকারের প্রচলিত ব্যবস্থা শুধুমাত্র মেনে নিলেই আলোচনা সফল হতে পারে।'

**২৫-২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৭ :** বিরোধের দুই যুগের মধ্যে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির নেতাদের প্রথমবারের মতো ঢাকায় আগমন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় উভয়পক্ষের তিন দিনব্যাপী দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

**১২-১৩ মার্চ, ১৯৯৭ :** ঢাকায় সরকার জনসংহতি সমিতির দুই দিনের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**২৮ মার্চ-৭ এপ্রিল, ১৯৯৭ :** বর্তমান সরকারের আমলে ত্রিপুরায় অবস্থানরত পাহাড়ি শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। তৃতীয় দফায় মোট ১ হাজার ২৪৭টি পরিবারের ৬ হাজার ৭০৮ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে।

**১১-১৪ মে ১৯৯৭ :** ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ ঘোষণা করে আলোচনায় সকল বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন এবং শিগগিরই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

**১৪-১৮ জুলাই, ১৯৯৭ :** ঢাকায় সরকার ও জনসংহতির পাঁচদিনের ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

**১৪-১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ :** ঢাকায় সরকারি কমিটি ও জনসংহতি সমিতির চারদিনের ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের জানান, তারা খসড়া শান্তিচুক্তি প্রণয়ন করেছেন।

**১৪ অক্টোবর, ১৯৯৭ :** বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বগুড়ায় এক সমাবেশে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

**১৭ অক্টোবর, ১৯৯৭ :** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করার ব্যাপারে দেশবাসীকে আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা চাই না আমাদের লোকজন, একটি সার্বভৌম দেশের নাগরিকরা, অন্য দেশে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করুক।'

**১ নভেম্বর, ১৯৯৭ :** পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া জনসমক্ষে প্রকাশের দাবির জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে তা প্রকাশ করা হলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

**২১-৩০ নভেম্বর, ১৯৯৭ :** পাহাড়ি শরণার্থীদের ৪র্থ দফায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু। এবারে ১ হাজার ৩৮১ পরিবারের ৭ হাজার ৬২০ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। ১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ থেকে পঞ্চম দফায় প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

**২৬ নভেম্বর, ১৯৯৭ :** পরবর্তী-ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক অব্যাহত।

**৩০ নভেম্বর, ১৯৯৭ :** রাত ১টা ২০ মিনিটে সমাপ্ত বৈঠকে উভয়পক্ষ শান্তিচুক্তির সকল বিষয়ে একমত হয়ে খসড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।



**ভোরের কাগজ**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত**

**সানাউল্লাহ/হরি কিশোর চাকমা :** বহু প্রতীক্ষিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি গতকাল মঙ্গলবার সকালে স্বাক্ষরিত হয়েছে। দীর্ঘ দুই যুগের বিদ্রোহ, সংঘাত, রক্তক্ষয় আর হিংসার অবসান ঘটিয়ে দেশের পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা দক্ষিণ পূর্বের পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির দুই প্রধান এই শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির প্রধানদ্বয় চুক্তি বাস্তবায়নে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তারা দেশের সংবিধানের আওতায়, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেই এই চুক্তি সম্পাদন করেছেন। তিনি একই সঙ্গে বলেন, চুক্তিটি সংবিধান অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা রাষ্ট্রপতি দেখবেন। প্রধানমন্ত্রী গতকালই রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চুক্তিটি হস্তান্তর করেন।

গত কয়েক মাস ধরে নানাভাবে আলোচিত, সমালোচিত শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষরের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে স্বস্তি দেখা গেছে। গত দুদিন ধরে সারা দেশেই মানুষের মধ্যে আলোচনার বিষয় ছিল এটি। নানারকম গুজবে মানুষ পত্রিকার অফিসে ফোন করে সঠিক খবর জানতে চেয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকরা মিছিল করে শান্তিচুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি চুক্তিটি সম্পর্কে তাদের পর্যালোচনা অব্যাহত রেখে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এর সমালোচনা করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোতে বিএনপি, জামাতে ইসলামী চুক্তিবিরোধী মিছিল করেছে।

পার্বত্য এই শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সরকার এবং জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। চুক্তিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, শক্তিশালী ও কার্যকর তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন, তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, সরকারি জমি বাদে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জমির ব্যবস্থাপনা জেলা

পরিষদের হাতে অর্পণ, জমিজমা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি কমিশন গঠন, ভূমিহীন পাহাড়িদের জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে জমি প্রদান, ভূমি জরিপ করা, শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সদস্যসহ জনসংহতি সমিতির অস্ত্র সমর্পণ, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও পুনর্বাসন, পাহাড়িদের পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটর করতে বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে।

গতকাল সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে সরকারের পক্ষে জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে এর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষরের এই সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, ঢাকার মেয়র, চাকমা রাজা, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব, সেনা ও নৌবাহিনীর প্রধান, বিমান বাহিনীর প্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

যে টেবিলে বসে দুই নেতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন তারই একপাশে একটি চেয়ারে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী এবং আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে উৎফুল্ল দেখালেও সন্তু লারমা ছিলেন কিছুটা গম্ভীর। চুক্তিতে স্বাক্ষরের আগে সন্তু লারমা কলম হাতে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ বসে থাকেন। পরক্ষণেই হাসিতে ভরে ওঠে তার মুখমণ্ডল। দুই নেতা স্বাক্ষর করে পরস্পরের কাছে চুক্তিটি বিনিময়ের জন্য দাঁড়ালেই উপস্থিত সকলে করতালিতে মুখরিত হন। ফটোসাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান মুহুর্মুহু জ্বলতে থাকে। দুই নেতা করমর্দনের পর একটু মুক্ত হতেই নানা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে সাংবাদিকরা তৎপর হয়ে ওঠেন। চুক্তি স্বাক্ষরের দিনক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায় গতকাল সকালেই। সকাল ৮টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস বিভাগ ফোন করে, সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুপুরেই সামরিক বাহিনী হেলিকপ্টারে করে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ি জেলার দুদুকছড়ি গ্রামে ফিরে যান। শান্তিচুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে সন্তু লারমার সঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা গত বুধবার ২৬ নভেম্বর ঢাকা এসেছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তারা সকলেই ছিলেন। তাদের সঙ্গে দুদুকছড়ি থেকে যোগাযোগ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক কমিটির যে সদস্যরা ঢাকা এসেছিলেন তারাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



দেশের বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শোষণ, বঞ্চনার অভিযোগ এনে দুই যুগ আগে সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে জনসংহতি সমিতি যে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল, গতকাল চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলো। এই সময়কালে বিদ্রোহ ও তার দমন প্রচেষ্টা এবং দাঙ্গায় প্রায় ২০ হাজারের মতো সামরিক ও বেসামরিক পাহাড়ি-বাঙালির জীবনহানী ঘটেছে। সম্পদ নষ্ট হয়েছে কয়েকশ কোটি টাকার। ৫০ হাজারের বেশি পাহাড়ি উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। আরো সমপরিমাণ পাহাড়ি, বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে শরণার্থী হয়েছে নিজ দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে। শান্তিচুক্তি তাদের সকলের জন্যই স্বস্তির সুযোগ করে দিয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**একনজরে শান্তিচুক্তি**

**❑ সংবিধান, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব-অখণ্ডতার আওতায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সকল জনগণের অধিকার রক্ষা ❑ উপজাতীয় মন্ত্রীসহ পৃথক মন্ত্রণালয় ❑ আঞ্চলিক পরিষদ ❑ পার্বত্য জেলা পরিষদ ❑ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ ও সাধারণ ক্ষমা ❑ সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পের ক্রম অপসারণ ❑ আদালতের এক্তিয়ারবহির্ভূত ভূমি কমিশন ❑ বাস্তবায়ন কমিটি ❑ স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই অঞ্চলের সম্ভাব্য প্রশাসন, জমি ব্যবস্থাপনা ও জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা, পার্বত্য অঞ্চলে সেনা অবস্থান থাকা না থাকা এবং জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপের অস্ত্রসমর্পণ। গতকাল জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গুরুত্ব পাওয়া এসব বিষয়ও রয়েছে।

চুক্তিতে প্রস্তাব রয়েছে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' নামে অভিহিত হবে। তিন পার্বত্য জেলা সমন্বয়ে একটি 'পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ' গঠিত হবে। পার্বত্য প্রশাসনে এটাই হবে সর্বোচ্চ সংস্থা। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। তার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন। চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্যের পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। এখানে সকল উপজাতির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে।

পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করতে পারেন।

চুক্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, পার্বত্য জেলার মধ্যে অবস্থিত বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ সকল জায়গা জমি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া ইজারা, বন্দোবস্ত, বেচাকেনা বা হস্তান্তর করা যাবে না। কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এ ছাড়া যথাশিগগির পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবে।

জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ল্যান্ড কমিশন গঠিত হবে। এ ছাড়া যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত বা বেদখল হয়েছে সেসব জমি ও পাহাড়ের মালিকানাস্বত্ব বাতিলের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না।

চুক্তির চতুর্থ খণ্ডের দ্বাদশ ধারা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতি এর সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং এর আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে দাখিল করবে। এর মধ্যে অস্ত্র জমাদানের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে। সরকার তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা দেবে। নির্ধারিত তারিখে যারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবে সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া মামলা প্রত্যাহারসহ অন্যান্য সহায়তার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে চুক্তিতে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা অবস্থান সংক্রান্ত বহুল আলোচিত বিষয়ে চুক্তিতে বলা হয়েছে, চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটিসহ মোট ছটি) ছাড়া অন্যত্র সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য



চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে গুটিয়ে নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। তবে আইনশৃঙ্খলার অবনতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা যাবে।

ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত ভিন্ন চুক্তি অনুযায়ী ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। জনসংহতি সমিতি এতে সব রকম সহযোগিতা দেবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই চুক্তি বলবৎ করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংযোজন করা হবে। তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে যে কমিটি চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**একই সংসারে দুই ভাইয়ের ঝগড়ার মীমাংসা : প্রধানমন্ত্রী**

*'সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল থেকে চুক্তি করা হয়েছে'*

**বিশেষ প্রতিনিধি :** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের সংবিধানের আওতায় এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল থেকেই পার্বত্য শান্তিচুক্তি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজের কার্যালয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

শান্তিচুক্তিকে তিনি একই সংসারের দুই ভাইয়ের ঝগড়া ও আপোস-মীমাংসার দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা যাদের সঙ্গে চুক্তি করেছি, তারা আমাদেরই সন্তান, এদেশেরই নাগরিক। একটি পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হয়। আবার সমঝোতা করে ভাই ভাই একই সংসারের ছত্রছায়ায় থাকে। এ চুক্তিকে আশা করি সকলে এই দৃষ্টিতে দেখবেন।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতি গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সাংবাদিকরা তার প্রতিক্রিয়া জানতে চান এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

শান্তিচুক্তিটি জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে কিনা জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হলে তা সংসদে পেশ করতে হয়। কিন্তু এটা সে ধরনের কোনো চুক্তি নয়। তিনি

বলেন, চুক্তিটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হচ্ছে। এটা সংবিধান অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা তিনি দেখবেন, বিবেচনা করবেন। এটা তাঁরই এখতিয়ার। উনি যদি মনে করেন সংসদে পেশ করা দরকার, তা তিনি করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণই তাঁর দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, শান্তিচুক্তি সংসদে পেশ করার বিষয়টি বিরোধী দলও চায় কিনা তা দেখতে হবে।

শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় নিজের আনন্দ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক, সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলুক, সেখানকার বাঙালি, উপজাতি সকলে মিলে একে অপরের সহযোগী হয়ে দেশ গঠন ও উন্নয়নে কাজ করবে এমনটিই তিনি চেয়েছেন। যে কারণে অতীতে যখনই সেখানে কোনো সমস্যা হয়েছে তিনি ছুটে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান আমরা চেয়েছি। বিরোধী দলে থাকতেও আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছি। সমস্যা সমাধানে আমাদের সবসময় সদিচ্ছা ছিল।' তিনি চুক্তি সম্পাদনকারী জনসংহতি সমিতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তারাও এদেশের নাগরিক। সংবিধান অনুযায়ী সকল সুবিধা ভোগ করার অধিকার তাদের রয়েছে। এ অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যায় না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান দীর্ঘদিনের সংঘাত দেশ ও জাতির উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। আমরা এদেশ স্বাধীন করেছি। এ দেশে কোনো সংঘাত, যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করুক তা চাই না। আমাদের দেশে এই সীমারেখার মধ্যে কোনো অশান্তি থাকবে এটা কারো কাম্য ছিল না। দেশের মানুষও সংঘাত চায় না, শান্তি চায়। এ কারণে আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি, অতীতের সকারগুলোও করেছে। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা একটি সমঝোতায় আসতে পেরেছি এটা সবচেয়ে বড়ো কথা।' সংঘাতময় অবস্থার অবসান ঘটে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একই সঙ্গে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের জনগণ যারা অবদান রেখেছেন, সকলকে অভিনন্দন জানান।

মহল বিশেষের বিরোধিতা, উস্কানির মুখে ধৈর্য ধরে শান্তিচুক্তিকে সফল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান। বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপির উদ্দেশে তিনি বলেন, তারা শান্তিচুক্তির জন্য কমিটি গঠন করেছিল, আলোচনা করেছিল। আগরতলায় গিয়ে ১৩ বার বৈঠক করেছে। কাজেই এখন বাধা দেওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে বসে অন্য দেশের



পতাকা বানিয়ে সে পতাকা তোলা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। তিনি বিরোধী দলের উদ্দেশে প্রশ্ন করে বলেন, তারা কেন এসব করতে চায়? কেন তারা শান্তি চায় না? অশান্তি কেন চায়?

শেখ হাসিনা বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'শান্তিচুক্তি হয়েছে, আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনাদের সহযোগিতা চাই। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশে সার্বিক শান্তি স্থাপন করতে, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে বিএনপিসহ সকল বিরোধী দলের সহযোগিতা চাই। শন্তির কথা পবিত্র ইসলাম ধর্মেও আছে।' বিএনপিকে অশান্তির পথ পরিহার করে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শান্তিচুক্তি অবশ্যই দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ছিল। ইনশাল্লাহ আমরা সফলকাম হয়েছি। আল্লাহর কাছে এজন্য শোকর আদায় করি।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে কবে যাবেন–সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা জানান যতো দ্রুত সম্ভব তিনি সেখানে যাবেন। চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পৃথক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যখন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে তখন থেকেই তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিপুল সংবর্ধনা

**দুদুকছড়িতে সন্তু লারমা**

**খাগড়াছড়ি থেকে আজিমউল হক :** শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার পর হেলিকপ্টারে করে সন্তু লারমা দুদুকছড়িতে এসে পৌঁছলে প্রত্যন্ত অঞ্চলটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। পার্বত্য জেলাগুলো থেকে উৎসাহী জনগণ তাদের নেতার আগমন উপলক্ষে এখানে এসে জড়ো হয়। জনসংহতির প্রধান সন্তু লারমার হেলিকপ্টার দুদুকছড়ির মাটি স্পর্শ করার পর তাকে প্রাণঢালা বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা, (সন্তু) লার্মাসহ শান্তিবাহিনী নেতারা দুপুরে সাড়ে ১২টায় হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ি পৌঁছলে শত শত পাহাড়ি জনতা তাকে হাতের তালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা মৃগাংক প্রসেজিৎ তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিবাদন জানায়, এ সময় সন্তু লার্মাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এ সময় সঙ্গে নিয়ে আসা স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক চুক্তির কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনান। তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার কারণে চুক্তি স্বাক্ষরে উপনীত হতে পেরেছি। এ চুক্তিতে জুম্ম জাতির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, আমরা বেশ কিছু অর্জনেও সক্ষম হয়েছি। যদি বাস্তবতা ও দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করা হয় তবে এই চুক্তি পাহাড়িদের জন্য পাওনা হিসেবে অনেক। এই চুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যে অংশ চুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে তার, বাস্তব বিবর্জিত কাজ করছে। তিনি চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সংযোগিতা কামনা করেন। তিনি গ্রামবাসী ও সচেতন ব্যক্তিদেরও এ কথা বলেন। তিনি পাহাড়িদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

জাতীয় কমিটির দুসদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দীন আহমেদ ও আতাউর রহমান খান কায়সার সন্তু লারমার সঙ্গে দুদুকছড়ি যান। জনসংহতির নেতা তাপস চাকমা ও উস্টন তালুকদার এ সময় সামরিক কায়দায় তাকে অভিবাদন জানায়।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

বান্দরবানে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ❑ ৩ পুলিশসহ আহত ২০

**উৎসবে মেতে ওঠে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির পার্বত্য জনপদ**

**কাগজ ডেস্ক :** বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাসদরসহ পুরো পার্বত্য অঞ্চল গতকাল মঙ্গলবার আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের খবর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে আনন্দের ঢল নামে। পাহাড়ি বাঙালিসহ সর্বস্তরের উৎফুল্ল জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল করে জেলা শহরগুলোর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। লোকজন আনন্দের আতিশয্যে মিষ্টি বিতরণ করেন।

তবে বান্দরবানে চুক্তি সমর্থক ও বিরোধীদের মিছিলের সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাট নিক্ষেপে ৩ জন পুলিশসহ ২০ জন আহত হয়।

বান্দরবান প্রতিনিধি জানান, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে গতকাল ঢাকায় স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তিকে বান্দরবানের জনগণ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানিয়েছেন। চুক্তি স্বাক্ষরের খবর অবহিত হওয়ার পর বিকেলে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে শান্তি মিছিল সমাবেশ হয়েছে। পাহাড়ি বাঙালি সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ মিছিলে অংশ নেয়।

এদিকে বিএনপি-জামাত সমর্থিত সর্বদলীয় পার্বত্য ঐক্য পরিষদ সন্ধ্যার দিকে চুক্তির বিরুদ্ধে মিছিল বের করলে শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাউল বাজার মাদ্রাসা শপিং কমপ্লেক্স এলাকায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া করতে দেখা যায়। এ সময় দুপক্ষের ইটপাটকেল নিক্ষেপে ৩ জন পুলিশ আহত



হয়েছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। শহরের উত্তেজনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান থোয়ায় চ প্রু মাষ্টার শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন পর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে। অনাস্থা, অবিশ্বাস দূরীভূত হয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহাবস্থানের মাধ্যমে এই এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো সেজন্য আমি আনন্দে অভিভূত। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, সকল সম্প্রদায়ের সমঅধিকার সমুন্নত রেখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বান্দরবানবাসীর পক্ষে তারা স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মংক্য চিং চৌধুরী শান্তিচুক্তির সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসবে। প্রেসক্লাবের সভাপতি বাদশামিয়ার এক অভিনন্দন বার্তায় শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিকে সন্ধ্যায় পার্বত্য জেলা সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের চুক্তি বিরোধী মিছিল ও চুক্তির পক্ষে আওয়ামী লীগের সমাবেশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশ মাঝখানে অবস্থান নেওয়ায় ঘটনা বেশি দূর এগোতে পারেনি। তবে উভয়পক্ষের ইটপাটকেল নিক্ষেপে তিনজন পুলিশ আহত হয়েছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। এ সময় ২০ জন আহত হয়। ঘটনার পর দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জানান, বহু প্রতীক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পার্বত্যবাসী শঙ্কামুক্ত হয়েছে। সকলের মাঝে নেমে এসেছে আস্থা ও বিশ্বাস। কেউ কেউ মন্দিরে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষতির হওয়ায় বিশেষ প্রার্থনা করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় মিষ্টি বিতরণ হয়েছে। গতকাল জেলা বিএনপি শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে এবং আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে চলমান সড়ক অবরোধ করে। সড়ক অবরোধ থাকায় বাঙালিদের উপস্থিতি কম ছিল।

এদিকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অভিনন্দন জানিয়েছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় খাগড়াছড়ির স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি–চুক্তির বাস্তবায়নে আমি ও আমার পরিষদ সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাবো। তিনি এ চুক্তি যথার্থ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

খাগড়াছড়িতে গতকাল চুক্তি স্বাক্ষরের খবর পাওয়ার পর হাজার হাজার বাঙালি ও পাহাড়ি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রে মিছিল বের করে। তারা বিভিন্ন

আনন্দসূচক ধ্বনি দিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তাঁরা শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে শ্লোগান দেয়।

শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম কাণ্ডারী পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বলেন, দীর্ঘ ৬ বছর ধরে শান্তি পক্রিয়ার জন্য কাজ করতে গিয়ে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার স্বীকার হয়েছি। বহু প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমি আনন্দিত এবং নিজেকে গর্বিত মনে করছি। তিনি বলেন, চুক্তি বড়ো কথা নয়, চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে আরো বেশি খুশি হবো। আজ বেশি খুশি হতেন এম এন লার্মা বেঁচে থাকলে। তিনি শান্তিচুক্তি বিরোধিকারীদের উদ্দেশে বলেন, মন-মানসিকতা পরিবর্তন করে আসুন সকলেই নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সম্পৃক্ত করি।

কাপ্তাই লেকে জেলে নাজির আলী বলেন, 'চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় আমি খুব খুশি। এটা একটা বিশাল ঘটনা। আমি মনে করি, এর ফলে শান্তিবাহিনী শান্তির পথে ফিরে আসতে রাজি হবে ও তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে।' নাজির আলীর দু'ছেলে শান্তি বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিল। স্থানীয় আওয়ামী লীগ জেলা দলের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ চাকমা বলেন, শান্তিচুক্তি পার্বত্য এলাকার উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার সমাপ্তি ঘটিয়েছে। এ সময় সাধারণ জনগণের মধ্যে আনন্দের ঢল নামে। তারা একে অপরকে মিষ্টিমুখ করান ও সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের খবরের পর বাঙালি ও পাহাড়ি নেতবৃন্দ পরস্পরের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, বহু প্রতীক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এ অঞ্চলে বসবাসকারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। উপজাতীয় নেতা উষা নু চউ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

খাগড়াছড়ি বিএনপি সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এই সমঝোতা স্মারককে দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী বলে আখ্যায়িত করে বলেন, পার্বত্যবাসী এই চুক্তিকে কোনো দিন মেনে নেবে না।

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধিত জানিয়েছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের পর সবার মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বস্তরে জনগণ স্বতঃস্ফূতভাবে আনন্দ মিছিল করে। শান্তিচুক্তি সম্পর্কে স্থানীয় সরকার পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা সম্পাদিত চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এর ফলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যার সমাধান হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ও পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান দেওয়ান বলেন, আমাদের সবাইকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে এই চুক্তির সুফল ভোগ



করতে হবে। পূজা উদযাপন পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি বিজয় রতন দে বলেন, আমরা একটি শান্তিপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম আশা করেছিলাম, আমাদের এই আশা পূর্ণ হয়েছে।

তিন পার্বত্য জেলার বাঙালি সংগঠন পার্বত্য গণপরিষদের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ আলমগীর এ ব্যাপারে বলেন, সমঝোতা স্মারকে যদি এখানে বসবাসরত পাহাড়ি অবাঙালিদের সমঅধিকারের কথা থাকে তাহলে আমি এই সমঝোতাকে স্বাগত জানাবো। কিন্তু এতে যদি কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এবং পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে অচল করে দেওয়া হবে।

রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান মনিস্বদন দেওয়ান এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘ দুই যুগ পর পার্বত্য জেলাসমূহের আপামর জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন পার্বত্য শান্তি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও জনগণের ইচ্ছার প্রতি সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## আমি খুবই আনন্দিত

**–দেবাশীষ রায়**

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বাঙালি সকলের অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। আমি সরকার ও জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পুনর্গঠিত পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ ও গঠিতব্য পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদে বাঙালিসহ পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেকটি জাতির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া মহিলা ও স্বল্প জনসংখ্যার আদিবাসী জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপদেষ্টা থাকবেন পাহাড়ি ও বাঙালি প্রতিনিধি। কাজেই পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এমনভাবে করা হয়েছে, সেখানে কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলা যায়, জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের স্থানীয় কর আরোপের মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় হবে কেবল তা দিয়ে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সরকারের সুদৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া জেলা পরিষদসমূহের কাছে হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন বাজেট জেলা পরিষদের মাধ্যমে যাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে এ চুক্তিতে। অতীতে দেখা গেছে যে, মাঝে মাঝে এমন সব প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছিল যা পার্বত্য এলাকার ভৌগোলিক, সামাজিক বা কাঠামোগত অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ফলে প্রচুর সরকারি অর্থ অপচয় হয়েছে। তাই কোনো প্রকল্প প্রণয়ন করতে হলে পার্বত্য এলাকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করা উচিত।

পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ভূমিবিষয়ক কমিশন গঠন অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে ভূমিবিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিতে স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ও কম ঝামেলায় সকলে ন্যায়বিচার পাবে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মতামত সাপেক্ষে জাতীয় কমিটির আহ্বানে পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন দুপক্ষের যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য দেখেছি, আশা করি সে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য আগামীতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। পার্বত্য এলাকাসহ দেশের সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাই– এই শান্তি প্রক্রিয়া সফল করে তুলুন। যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে তেমনি জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

## পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার এবং জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৫ জন শিক্ষক চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই চুক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো চক্রান্ত ও অপতৎপরতা রুখে দাঁড়াতে হবে।



এদের মধ্যে আছেন প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক, ড. আরেফিন সিদ্দিক, ড. ফসিউল আলম, ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, শহীদুল্লাহ তালুকদার প্রমুখ।

১৫১ জন কবি-শিল্পী-সাংবাদিক এক বিবৃতিতে চুক্তিকে স্বাগত জানান। এদের মধ্যে আছেন সাংসদ পান্না কায়সার, আলহাজ মকবুল হোসেন, সমন্বয় কমিটি প্রধান সৈয়দ হাসান ইমাম, শিল্পী অজিত রায়, মিতা হক, সমর দাশ, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলন, গোলাম সারোয়ার, কবি নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, প্রকাশক ওসমান গনি প্রমুখ।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা আইনজীবী সমিতি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, গণতান্ত্রিক আইনজীবী পরিষদ, সেক্টর করপোরেশন অফিসার্স ফেডারেশন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মকর্তা পরিষদ, চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সম্মিলিত পরিষদ, সরকারি কর্মচারী সংহতি পরিষদ, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ, চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি, সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ, সচিবালয় চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি, অগ্রণী ব্যাংক কর্মচারী সংসদ বিআইডব্লিউটিসি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী সংসদ ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতিতে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকার ও জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে আরো যারা বিবৃতি দিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা, রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান, পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

এ ছাড়া ছাত্রলীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, কমনওয়েলথ স্টুডেন্টস এন্ড ইয়ুথ অর্গানাইজেশন, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটি, বঙ্গবন্ধু লেখক গোষ্ঠী, আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ, সাংবাদিক ঐক্য আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনসহ অনেক সংগঠন ও ব্যক্তি পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক সংগঠন গতকাল এই চুক্তির পক্ষে শান্তি মিছিল বের করে। কোনো কোনো সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকেও এ চুক্তিকে ঐতিহাসিক হিসেবে উল্লেখ করে সরকার, সরকারপ্রধান ও জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানানো হয়।

## ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**পার্বত্য চুক্তিতে সরকারের এককেন্দ্রীক কাঠামোর ব্যত্যয় ঘটেছে**
**–মান্নান ভুঁইয়া**

**কাগজ প্রতিবেদক :** গতকাল স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, এই চুক্তিতে সরকারের এককেন্দ্রীক কাঠামোর (ইউনিটারি ফরম অফ গভর্নমেন্ট) ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৯, মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে গতকাল সন্ধ্যায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই চুক্তি এতদিন পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। আজও (মঙ্গলবার) চুক্তির খসড়া অনেক দেরিতে পেয়েছি। এই চুক্তি দেশের সংবিধান, বিদ্যমান আইন এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় সংসদের অধিকার খর্ব হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সংসদে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলে, এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেন, আজ (মঙ্গলবার) বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে চুক্তি পর্যালোচনা চলছে। বুধবার (আজ) দলের পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হবে এবং কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর দলীয় সাংসদ মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান উৎফুল্লচিত্তে কয়েকজন সাংবাদিককে বলেন, ‘হারতাল ঠেকাতে পেরেছি, আমরা হরতাল চাই না।’

**সাব কমিটি গঠন**

গতকাল স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে গতকাল বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তির আইনগত দিক পর্যালোচনার জন্য অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে এগারো সদস্যবিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ সকালে সাব কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আইনগত সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করে আজ বিকেলের মধ্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। আইনগত ফাঁকফোকর খুজে বের করা গেলে প্রয়োজনবোধে বিএনপির পক্ষ থেকে আদালতে আইনী চ্যালেঞ্জও করা হতে পারে বলে বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে গতকাল সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে ২৯ মিন্টো রোডে তার সরকারি বাসভবনে ঐ সভা শুরু হয় এবং



রাত ১০টা ৪০ মিনিটে শেষ হয়। আজ সন্ধ্যা ৭টায় মিন্টো রোডে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বেগম জিয়া বিএনপির পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

## ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
**বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটি সর্বোত্তম চুক্তি**
**–ড. মহীউদ্দীন আলমগীর**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরিকল্পনা, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর ভোরের কাগজকে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সোমবার রাত পর্যন্ত বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য এটি সর্বোত্তম চুক্তি। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর স্বৈরশাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের সাধারণ নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে। এতে অনেক উপজাতীয় নাগরিক দেশ ছেড়ে চলে যায়। ফলে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এই চুক্তির ফলে উপজাতীয়দের সমানাধিকার নিশ্চিত হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থ চিরতার্থ করার জন্য স্বৈরশাসকরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিত্তহীনদের জোর করে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যায় ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বসতি স্থাপনে বাধ্য করে। চুক্তি সম্পাদনের পর আমরা নিরাপদে, শান্তিতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করার পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। তৃতীয়ত বিগত ২২ বছর সমানাধিকার রক্ষিত হয়নি। বৈষম্যের মাধ্যমে উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। চুক্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সমানাধিকার ও উন্নয়নের পদ্ধতি শনাক্ত করা হয়েছে। এ জন্যে অর্থায়নের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ড. আলমগীর বলেন, বিগত বিএনপি আমলে সংবিধান সংশোধন করে উপজাতীয়দের বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। আমরা এটি গ্রহণ করিনি। দুপক্ষ মিলে সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা রক্ষা করে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে উন্নয়ন সমতা, নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা সুস্পষ্ট।

চুক্তিতে কে জয়ী হয়েছে এ প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বেশি জয়ী হয়েছে বাংলাদেশ।

## ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
### পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে নগরীতে মিছিল সমাবেশ

**কাগজ প্রতিবেদক :** কিছু কিছু সংগঠন পার্বত্য শান্তিচুক্তির স্বাক্ষরের বিরোধিতা করেছে।

জামাতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর শাখা পুরান পল্টন মোড়ে সমাবেশ করে। গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) পুরানা পল্টন মোড়ে অপর এক সমাবেশে শান্তিচুক্তি না মানার ঘোষণা দেন।

পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেনস ফেডারেশনের পক্ষে পাহাড়ি গণপরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত বি. খীসা এক বিবৃতিতে এই চুক্তিকে আপসনামা বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে।

## ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
### খালেদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু সাড়া মেলেনি

বিএনপি চেয়ারপাসরসন ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি সাড়া দেননি। বাসস।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. এস এ সামাদ গতকাল মঙ্গলবার প্রথমে সকাল ৮টায় এবং পরে সোয়া ৯টায় খালেদা জিয়াকে ফোন করেন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ অবহিত করার জন্য। কিন্তু তিনি কোনো সাড়া পাননি। পরে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব বিরোধীদলীয় উপনেতা ডা. অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে টেলিফোন করে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু বদরুদ্দোজা চৌধুরী 'আমরা ভেবে দেখি' বললেও শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের বাইরে থাকায় জাপার পক্ষে মহাসচিব আনোয়ার হোসেন এবং ঐক্যবদ্ধ জাসদের পক্ষে সভাপতি আ স ম আবদুর রব আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ঐ চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



## ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
### পার্বত্য চুক্তির কথা বিদেশী কূটনীতিকদের জানানো হয়েছে

**কূটনৈতিক প্রতিবেদক :** পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ঢাকায় দায়িত্বপালনরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের অবহিত করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল বিকেলে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকায় বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান ও প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান। তিনি চুক্তির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক তাঁদের সামনে তুলে ধরেন এবং এই চুক্তির সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কূটনীতিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এবং পররাষ্ট্র সচিব মুস্তাফিজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

## ভোরের কাগজ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
### শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে চট্টগ্রামে মিছিল সমাবেশ

**চট্টগ্রাম অফিস :** সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় গতকাল চট্টগ্রামে এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের শান্তি মিছিল বের হয়। অপরদিকে বিএনপি অত্যন্ত সীমিত আকারে নাসিমন ভবনের সামনে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে সমাবেশ করে। পরে মিছিলও করেছে বিএনপি। তবে পুলিশ সতর্কাবস্থায় থাকায় সংঘর্ষ বা কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা হয়নি।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় গতকাল চট্টগ্রামের দারুল ফজল মার্কেটের সামনে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. ছৈয়দুর রহমানের সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

**ভোরের কাগজ**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়

**ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি**

গতকাল পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এখন প্রত্যাশা, প্রায় দুই যুগের সশস্ত্র সংঘাত, হানাহানি ও রক্তপাতে সিক্ত পার্বত্য ভূমি নবজন্ম লাভ করবে। পাহাড়ি ও বাঙালি নির্বিশেষে পার্বত্য অঞ্চলের সমগ্র–জনগোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হবে। আজ আনন্দের দিন। আজ উৎসবের দিন।

পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। আর বিদ্রোহ দমনের সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকার সেখানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিল। তখন থেকেই সেখানে যুদ্ধাবস্থা। এর শিকার হয়েছে উভয়পক্ষে অমূল্য জীবন, পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে ঐ অঞ্চলের মানুষের শান্তি সুখ সম্পদ ও মানবাধিকার। আর সমস্ত দেশবাসী তাদের জন্মভূমির এক-দশমাংশ ভূখণ্ডে নির্মম হানাহানি ও রক্তপাতে প্রতিনিয়ত অন্তর্জালায় দগ্ধ হয়েছে। এই ট্র্যাজেডির আশু শান্তিপূর্ণ সমাধান জরুরি হয়ে উঠেছিল। পার্বত্য সমস্যার সামরিক সমাধান যে সম্ভব নয় সে উপলব্ধিতে পৌঁছতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। ইতিমধ্যে অনেক প্রাণ, অনেক সম্পদ আমরা নষ্ট করেছি। সম্পাদিত শান্তিচুক্তি আবারো প্রমাণ করলো অমীমাংসিত যেকোনো সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত অস্ত্র বন্দুকের নল নয়, শুধুমাত্র আলোচনার টেবিল।

প্রচলিত সামরিক ধ্যানধারণা অতিক্রম করে রাজনৈতিক সমাধানের তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে, প্রায় একই সময়ে উপনীত হয়েছে সরকার, সামরিক বাহিনী ও জনসংহতি সমিতি। দীর্ঘকাল ধরে তারা অস্ত্রবিরতি কার্যকর রেখে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

সেনাবাহিনী এই মত ব্যক্ত করেছে যে, সামরিক বল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান দীর্ঘায়িত করতে তারা অনাগ্রহী, তারা দ্রুত শান্তিচুক্তি চায়। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি বলেছে, তারা রাজনৈতিক সমাধান চায়, সামরিক নয়। উভয়পক্ষই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। যারা প্রাণ দিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাদের আন্তরিকতার প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের উদ্যোগকে জানাই অভিনন্দন।

প্রায় এক যুগ আগে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। এ যাবৎ বিএনপিসহ তিনটি সরকার এই শান্তি প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখেছে। সেইসব সৎ প্রচেষ্টাকে জানাই অভিনন্দন।



বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে শান্তি আলোচনা ত্বরান্বিত করে। এরই পরিণতিতে আজ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়েছে।

এখন সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হলো সম্পাদিত শান্তিচুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন। আমরা আশা করবো সেটা করতে সরকার বা জনসংহতি সমিতি ব্যর্থ হবে না। আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আবেদন জানাবো–পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি সকলের অভিন্ন স্বার্থ, এর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকুন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে আমরা স্বাগত জানাই।

**ভোরের কাগজ**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**রাষ্ট্রপতির কাছে**
**পার্বত্য শান্তিচুক্তির**
**কপি হস্তান্তর**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য শান্তিচুক্তির একটি কপি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেছেন।

বেসামরিক ও বিমান চলাচল, পর্যটন ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর চিফ হুইপের সঙ্গে ছিলেন। সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে গতকাল এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিনিধিগণ শান্তিচুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কাজী গোলাম রহমান সে সময় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভবন থেকে পাঠানো এক সরকারি বার্তায় এ কথা জানানো হয়।

**ভোরের কাগজ**
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**পার্বত্য শান্তিচুক্তির**
**প্রতিবাদে বিএনপির**
**বিক্ষোভ মিছিল**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে ঢাকায় বিএনপির উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে তাতে নেতৃত্ব দানকারী বিএনপির মহানগরী আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা দুই দফা বক্তৃতায় বলেন, এই চুক্তি

স্বাক্ষরের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসনিকভাবে আর বাংলাদেশের অংশ থাকলো না। এই চুক্তিকে আমরা লাথি মারি।

নয়াপল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে গতকাল বিকেল ৫টায় বের করা ছোট আকারের এ বিক্ষোভ মিছিলটি বিজয়নগর রোডে দুই দফা পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। জিরো পয়েন্টে যাওয়ার পর পুলিশ আবার মিছিলের গতিরোধ করলে সাদেক হোসেন খোকা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন এবং চুক্তির বিষয়বস্তু ছাপানো হয়েছে এমন একটি পত্রিকার টেলিগ্রাম সংখ্যায় অগ্নিসংযোগ শেষে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

**সকালে আ.লীগের শান্তি মিছিল**

**বিকেলের সমাবেশে চুক্তিবিরোধীদের প্রতি হুঁশিয়ারি**

**কাগজ প্রতিবেদক :** পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকে নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ হিসেবে অভিহিত করে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে চুক্তি স্বাক্ষর প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ যা বলে তাই করে।

সপ্তাহান্তে চট্টগ্রামে হরতালের সময় বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের পূর্ব ঘোষিত প্রতিবাদ সমাবেশ পরিণত হয় বিজয় ও শান্তি সমাবেশে। গতকাল মঙ্গলবার পল্টন ময়দানের সমাবেশে নেতারা এই কথা বলেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া বানচালের যেকোনো ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার প্রত্যয় ঘোষণা করে সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সংবিধান অনুযায়ী চুক্তি হয়েছে। বিরোধী দলের বক্তব্যে জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে শান্তিমিছিল বের করা হয়। বঙ্গবন্ধু এভিনিউর দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে মিছিলটি নূর হোসেন চত্বর, পুরানা পল্টন, তোপখানা সড়ক হয়ে আবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গিয়ে শেষ হয়। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এমপি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রহমান বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন বাংলার মানুষের সার্বিক উন্নয়ন



ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে সফল হয়েছেন তখন শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। খালেদা জিয়া নিজেই অশান্তির পক্ষে।

দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেন, জনগণের ভোট নিয়ে বিএনপি কিছুই করতে পারেনি। নির্বাচনের সময় আমরা বলেছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করবো। তা করেছি।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম বলেন, নির্বাচনী ওয়াদায় আমরা বলেছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনবো। সেই ওয়াদা রক্ষা করে আমরা প্রমাণ করেছি, আওয়ামী লীগ যা বলে তা করে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকবে, পাহাড়ি থাকবে, বাঙালিরাও থাকবেন।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, হরতাল ডেকে শান্তিচুক্তি বানচালের যেকোনো ষড়যন্ত্র বোঝাপড়ায় আমরা প্রস্তুত। সমাবেশ শেষে একটি বিরাট শান্তিমিছিল নগরীর বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

আজ সারা দেশে বিক্ষোভ

**জামাত শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে**

**কাগজ প্রতিবেদক :** জামাতে ইসলামী পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে। দলের নির্বাহী পরিষদের এক সভায় চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, সম্পাদিত চুক্তি বাংলাদেশের সংবিধান, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় স্বার্থবিরোধী।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

**দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের আনন্দ মিছিল, বিএনপির বিক্ষোভ**

**কাগজ ডেস্ক :** সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় গতকাল মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো আনন্দ মিছিল বের করে। অন্যদিকে বিএনপি, জামাত ও এর অঙ্গসংগঠন শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

**টঙ্গী :** দুপুরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের উদ্যোগে শান্তি মিছিল হয়েছে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টার।

**কুষ্টিয়া :** পৌর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিকেলে শহরে একটি শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মজমপুর গেটে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে পৌর চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার আলীসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

**কিশোরগঞ্জ :** জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট আনন্দ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে এসে শেষ হয়। মিছিলের পর এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট জিল্লুর রহমান, এডভোকেট জিন্নাতুল ইসলাম ও শরিফসাদী প্রমুখ।

**গোপালগঞ্জ :** জেলা আওয়ামী লীগ, পৌর আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের একটি যৌথ বিজয় মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে চৌরঙ্গীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ, মাহবুব আলী খান, শেখ মোঃ ইউসুফ জামিল সারোয়ার, হাফিজুর রহমান লিকু প্রমুখ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

**মুন্সীগঞ্জ :** আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ যৌথভাবে শহরে একটি আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের পুরাতন কাচারি চত্বর থেকে শুরু করে শহর প্রদক্ষিণ করে ঐ স্থানে এসে শেষ হয়। সে সময় একটি বর্ণাঢ্য ট্রাক মিছিলও বের হয়। মিছিলের পর সাধনার মোড়ে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**যশোর :** আওয়ামী লীগ শহরে দু দফায় মিছিল করেছে। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চুক্তি স্বাক্ষরের খবর প্রচারিত হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আপাতঃ স্বস্তি প্রকাশ করলেও চুক্তি সম্বন্ধে কোনো কিছু অবহিত না হয়ে অনেকে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করতে চাননি। দুপুর থেকে রাত অব্দি শহরের বিভিন্ন স্থানে শান্তিচুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্নজনকে আলাপ আলোচনা করতে দেখা গেছে।

**নীলফামারী :** আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যৌথভাবে শহরে একটি বিজয় মিছিল বের করে। এর আগে বাজার মোড়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে জেলা সিপিবি।

**দিনাজপুর :** জেলা আওয়ামী লীগ শহরে একটি আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে।



**নারায়ণগঞ্জ :** জেলা ও শহর আওয়ামী লীগ যৌথভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শহরে আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ শামীম ওসমান। এর আগে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, এডঃ আসাদুজ্জামান খোকন, খোকন সাহা, আবু হাসনাত মোঃ শহীদ বাদল, ওয়াজেদ আলী খোকন, চন্দন শীল প্রমুখ। এদিকে নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আলহাজ বজলুর রহমান, বণিক সমিতির সভাপতি গিয়াসউদ্দিন, বিকেএমইএ সহসভাপতি সেলিম ওসমান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামিউল্লাহ মিলন, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের সাহাবউদ্দিন আহমেদ সরকারও জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

**নোয়াখালী :** জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ যৌথ উদ্যোগে শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

**জামালপুর :** জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিশাল শান্তিমিছিল বের হয়। অধ্যাপক শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বিরাট এ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ শেষে রেল গেটে পথ সভা হয়।

**রাজশাহী :** সন্ধ্যায় মহানগরীতে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ যৌথভাবে এবং বিএনপি মিছিল করেছে।
সন্ধ্যায় আ. লীগ ও যুবলীগ মিয়াপাড়াস্থ দলীয় কার্যালয় থেকে এক বিরাট আনন্দ মিছিল নগরীতে বের করে। বিএনপিও শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

**নরসিংদী :** জেলা আ. লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগের উদ্যোগে সন্ধ্যায় শান্তি মিছিল হয়েছে। নেতৃত্ব দেন স্থানীয় আ. লীগ সভাপতি মুসলেহউদ্দিন ভুঁইয়া।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** শহরে, ছাত্রলীগ (শাপা) বিরাট আনন্দ মিছিল বের করে।

**সিলেট :** জেলা আওয়ামী লীগ বিকেলে একটি বিরাট মিছিল বের করে। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ আবু নছর।

এছাড়া সন্ধ্যার পর আদালত মোড়ে সৈয়দ মোস্তফা কামাল মস্তইর সভাপতিত্বে জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের এক সমাবেশে জাফর চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, রাজুন, এজাজুল হক এজাজ, জুবের খান, শামীম রশীদ

চৌধুরী, আউয়াল হোসেন, মদরিম আহমদ, মোদাব্বির হোসেন, মর্তুজ আলী, সাজা মিয়া, নূরুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

ন্যাপ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এডভোকেট দিতীশ্বর পাল কানন ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল ওদুদ এক যুক্ত বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

**খুলনা :** মহানগরী খুলনা ও খালিশপুরে মহানগর ও থানা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শান্তি ও আনন্দ মিছিল বের হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় আ. লীগ কার্যালয় চত্বর থেকে নগর আ. লীগ সভাপতি এড. মঞ্জুরুল ইমাম ও যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজানের নেতৃত্বে নগরীতে একটি শান্তি মিছিল বের হয়।

এছাড়া নগরীর শিল্প শহর খালিশপুরে থানা আ. লীগের উদ্যোগে একটি বিরাট শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন এলাকায় প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় আ. লীগ অফিসে এসে শেষ হয়।

**ভোরের কাগজ**

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও সন্তু লারমার আশাবাদ

## চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ফিরে আসবে

**বিশেষ প্রতিনিধি :** আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়পক্ষের দুই প্রধান নেতা এর বাস্তবায়ন সম্পর্কেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়ায় তারা বলেন, তাদের আশা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উভয় নেতা স্ব-স্ব পক্ষে শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তারা দুজনই গত প্রায় এক বছর ধরে উভয়পক্ষের শান্তি সংলাপে নিজ নিজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। চুক্তি স্বাক্ষরের সব সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দুই নেতা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটির প্রধান, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। আমার মতো একজন লোক এ ধরনের একটা বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি সেজন্য আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করি। যারা এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।’



পৃথক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে একটা গণতান্ত্রিক সরকার যে জনগণের কল্যাণে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে এই শান্তিচুক্তি তারই প্রমাণ।

জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সংঘাত বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবশ্যই শান্তি ফিরে আসবে। চুক্তির মাধ্যমে শান্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। পৃথক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা আত্মগোপন অবস্থা থেকে এবার স্বাভাবিক জীবনে অবশ্যই ফিরে আসবে।

সন্তু লারমা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিন আমরা জুম্ম জনগণ, পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায় ও স্বার্থরক্ষায় আন্দোলন করে এসেছি। এ ভূমিকা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে সন্তু লারমা বলেন, চুক্তি সম্পাদন অবশ্যই কঠিন কাজ। তবে তার বাস্তবায়ন আরো কঠিন। এ কাজে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল, ছাত্র, শ্রমিকসহ সকল সংগঠন, দেশবাসী এবং বিশ্ববাসী সকলের কাছেই এই চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা চাই। এ ব্যাপারে সরকার তাদের কাছে কোনো সহযোগিতা চাইলে সবসময় পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এতদিন কেন সমস্যার সমাধান হয়নি, অতীতের সরকারগুলো কি এ ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না–এরকম একাধিক প্রশ্নের জবাবে জনসংহতি সমিতির প্রধান বলেন, ‘আমি এমন কোনো কথা বলতে চাই না। সকলেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এখন চুক্তি বাস্তবায়নে সকলের সহায়তা চাই।’